শারদীয়া
শুকতারা
১৩৯৩

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি. স্ক্যান. ও এডিট : নীলাচল বৈদ্য

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

শারদীয়া শুকতারা

আশ্বিন ১৩৯৩, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

সূচীপত্র

দাম : আঠারো টাকা মাত্র

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫০ বৎসর পূর্তি বর্ষে

দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

অখন্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ

(Chronological Edition)

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ★ ২১, ঝামাপুকুর লেনঃ কলিকাতা-৭০০০০৯

৩৯শ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন, ১৩৯৩/সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

মণ্ডূক মহলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘোলা জলে সন্ধ্যাবেলা
সোনা কোলা জুটে মেলা
ডোবা ঘিরে বসি চারিধার
টাইটুম্বুর যাত্রা বরিষার
গায় সুমেদুর দাদুর ফোস্কা তোলা
পাঁদড়ে রাগিনী তাল গলাফোলা
—ঙাক্ ওঁক ক্রোঁক ওকা ওলা

ছবি: রাহুল মজুমদার

ফুটপাথের বই

(তুক না তাক)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সামান্য একটা বই কেনা নিয়ে এমন ব্যাপার হবে ভাবতেই পারিনি।

তাও একটা পুরানো ছেঁড়াখোঁড়া বই। রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর পুরানো বই ছড়িয়ে যারা বিক্রী করতে বসে সেই এক ফেরিওয়ালার কাছে কেনা।

বইটাও এমন কিছু আহামরি নামকরা বইও নয়। বেশ কয়েক বছর আগে বিলেতে ছায়াছবি হিসেবে যে কাহিনীটা কিছুটা নাম করেছিল, বইটা তারই ছাপানো চিত্র-নাট্য মাত্র। চিত্র-নাট্যটা অবশ্য বেশ পাকা হাতে লেখা, পড়তে ভালো লাগে।

কয়েক বছর আগে ছায়াছবিটা এই কলকাতা শহরেই একটা নামকরা সিনেমা হলে দেখেছিলাম। এতদিন বাদে হঠাৎ রাস্তার ফুটপাথে ছাপানো চিত্র-নাট্যটা পেয়ে তাই সেটা কিনে ফেলি।

বইটা বেশ সস্তাতেই পেয়েছিলাম। সস্তা পাবার কারণ ছিল অবশ্য। একটা নয়, অমন দশ বারোটা ওই বই-এর কপি পাশাপাশি ফুটপাথের ফেরিওয়ালাদের অন্য সব বেচবার বইয়ের মধ্যে যেভাবে ছড়ানো ছিল তাতে বোঝাই গেছল যে কোনও বই-এর দোকানের এক লট-এ চালান হয়ে আসা এ

বইটার বাণ্ডিল যে কারণেই হোক বিক্রী না হয়ে দোকানেই এতদিন পড়েছিল। এখন হয় দোকানটাই উঠে যাওয়ার দরুন কিংবা বইটার আর বাজার নেই বলে ওগুলো পুরানো বই-এর ফেরিওয়ালাদের হাতে চলে এসেছে।

আগেই বলেছি বইটা এমন কিছু 'আহামরি' দুষ্প্রাপ্য সওদা নয়। তার ওপর বিক্রীর জন্যে পড়েও আছে গাদাখানেক। তাই বেশ সস্তায় সেটা পাওয়া কোনোরকম দাঁও বলে মনে করবার কোনো কারণই ছিল না।

কিন্তু বইটা কিনে আনার দিন দুই বাদেই সেই রকম একটা সন্দেহের কারণ ঘটায় অবাক হয়ে গেলাম।

পুরানো বইটা কিনে এনে আমি তখনই সেটা পড়বার সময় পাইনি। সে রকম একটা দারুণ উৎসাহও যে ছিল তাও নয়। বইটা আমার লেখার টেবিলের ওপর অন্য সব পত্রপত্রিকা আর বইয়ের গাদার মধ্যেই ফেলে রেখে সেটার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

মনে করিয়ে দিলে বইটা যার কাছ থেকে কিনেছিলাম সে-ই বা তারই মতো চেহারা পোশাকের এক পুরানো বই-এর ব্যাপারী। বই-পাড়ার মধ্যে বড় রাস্তাটার ধারে কাঠের শেল্‌ফে সাজিয়ে আর ফুটপাথে ছড়িয়ে যারা পুরানো বই বেচাকেনা করে থাকে তাদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে চিনব এমন ঘনিষ্ঠ কারবার তাদের সঙ্গে আমার নয়। তবে মাসে একবার দুবার ও-পাড়ায় গিয়ে বই ঘাঁটাঘাঁটির একটু নেশা আছে বলে ব্যাপারীদের কেউ কেউ কিছুটা মুখ-চেনা হয়ে গেছে।

সেদিন সকালে বাড়ি থেকে বার হবার সময় গেটের কাছে সেইরকম একজনকে দেখে একটু অবাক হলাম।

গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে সে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিল, আমি বার হতেই এক পা এগিয়ে এসে সেলাম জানিয়ে বললে—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, আজ্ঞে।

আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ!—তার সম্ভাষণের ধরনে একটু হেসে বললাম—তা আমার এ সৌভাগ্যের কারণটা তো বুঝতে পারছি না।

আজ্ঞে, সেদিন আপনি যে বইটা কিনেছেন আমার কাছে...

সেটার দাম যা চেয়েছিলে, বই-এর ব্যাপারীকে একটু অধৈর্যের সঙ্গেই তার কথার মাঝখানে থামিয়ে বললাম—তা তো পুরোই দিয়ে এসেছি বলে মনে পড়ছে...

না, না,—অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে অপরাধীর মতো গলায় পুরানো বই-এর ব্যাপারী বললে,...দাম আপনি ঠিকই দিয়েছিলেন। আমি সে জন্যে আসিনি। আমি ...মানে, আমি বইটা আপনার কাছে ফেরৎ চাইতে এসেছি।

ফেরৎ চাইতে এসেছ!—কথাটা ঠিক শুনেছি কিনা বুঝতে না পেরে প্রশ্নটা আবার করে বললাম—বইটা বিক্রী করে আবার তুমি তা ফেরৎ চাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ—অত্যন্ত অপরাধীর মতো ব্যাপারী অনুনয় করে বললে,—ও বইটার বড় দরকার পড়ে গেছে। আপনি দাম যা দিয়েছেন তা আপনাকে দেবার জন্যে এনেছি। যদি বলেন তো তার চেয়ে বেশী কিছুও দিচ্ছি। বইটা শুধু আমাকে ফেরৎ দিন।

এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার! —হেসে উঠে না বলে পারলাম না—এই দুদিন আগে যে বইটা কিনে এনেছি সেইটেই আবার ফেরৎ চাইতে এসেছ? তার জন্যে আরো বেশী দাম দেবার জন্যেও তৈরী।

আজ্ঞে,—লোকটি বেশ একটু কুণ্ঠিত হয়ে জানালে,—আপনি পছন্দ করে বইটা কিনে ছিলেন, সেইটে আবার ফেরৎ চাইছি। তাই আপনি যাতে এটা লোকসান বলে না মনে করেন, সেই জন্যে দামটা বাড়িয়ে...

সেই জন্যে দামটা বাড়িয়ে কিনে নিচ্ছ!—লোকটার কথায় বাধা দিয়ে নিজেই সেটা শেষ করে দিয়ে বললাম,—কিন্তু কিনে নিতে চাইছ কেন সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। বইটা দারুণ নাম-করা কিছু নয়, আর তা যদি হয়ও, তাহলেও সাত রাজার ধন এক মাণিক তো নয়। যখন গোটা দশ বারোটা বই তো সেদিন তোমাদের ক'জনের কাছাকাছি দোকানে জমা হয়ে থাকতে দেখেছি, তার একটা কিনে নিলেই তো তোমাদের ল্যাঠা চুকে যায়।

আজ্ঞে, তা যায় কিনা জানি না।—লোকটি বিনীত ভাবে জানালে,—আমাকে আপনার কাছেই এই বইটি কিনে নিতে পাঠিয়েছে।

আমার কাছের এই বইটিই কিনে নিতে পাঠিয়েছে!—বেশ একটু রহস্যের গন্ধ এবার পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কে পাঠিয়েছে? কে?

আজ্ঞে, আমাদের দোকানের মালিক।

তোমাদের দোকানের মালিক আমার কেনা বইটিই বেশী দাম দিয়েও ফেরৎ নেবার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়েছে!—বলতে বলতে মনে যা হলো তা তখনকার মতো মনের মধ্যেই রেখে বললাম,—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কেনা বইটিই তোমাদের দোকানের মালিক কিছু বেশী দাম দিয়েও ফেরৎ চান। বেশ! তাঁর প্রস্তাবটা আমি শুনলাম। কিন্তু এখন বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়েছি। এখুনি তো তোমাদের বইটা খুঁজে বার করে আনার জন্যে আবার বাড়িতে ফিরে যেতে পারব না। তা ছাড়া ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখার সময়ও তো আমার চাই। তাই বলছি কাল সকালে এরকম সময়ে এসো। যা ভাববার ভেবে নিয়ে বইটা তখন তোমাদের দিতে পারব বলে মনে হয়।

আজ্ঞে না বাবু, আমার কথা শেষ হবার আগেই লোকটি যেন কাৎরে উঠে বললে,—দোহাই আপনার, কাল পর্যন্ত দেরী করবেন না। আমি নেহাৎ গরীব দুঃখী মানুষ। আজ শুধু হাতে ফিরে গেলে আমার চাকরিটি যাবে। আপনি বরং যা দাম দিয়েছিলেন তার ডবল, না হয় তিন ডবল লাভ নিন। বইটা আজ আমায়...

না,—বেশ কঠিন স্বরেই ধমক দিয়ে এবার বললাম,—তোমার

গ্ল্যাক্সো'র অবদান
নিমেষে শক্তি যোগানের অপূর্ব পানীয়—
কমলা লেবুর চমৎকার স্বাদে!
ভিটামিন সি'র
গুণে ভরপুর!
মাগ্নির চিনি
মেশানোর
দরকারই নেই
এখন আপনার বাচ্চাকে দিন নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়,যা কমলা লেবুর চমৎকার স্বাদে ভরা।
নতুন গ্লুকন-সি'তে রয়েছে গ্লুকোজ, যাতে আছে চট্‌পট্ শক্তি যোগানের খাদ্যগুণ, যা আপনার বাচ্চাকে সুস্থ-সবল স্বাস্থ্যে, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরিয়ে রাখে।
এতে রয়েছে ভিটামিন সি'র ভরপুর গুণ, যা বাচ্চাদের দাঁত, শরীরের হাড় ও টিস্যু সবল গড়ে তুলতে একান্তই দরকার।
এক গ্লাস বরফ-ঠাণ্ডা জলে চার চা-চামচ গ্লুকন-সি গুলুন, আর দেখুন কমলা লেবুর চন্‌মনে স্বাদের তরতাজা করা কি অপূর্ব পানীয় না তৈরী হ'ল। এই চমৎকার পানীয় আপনার বাচ্চাকে দিন রোজই—দু'বার করে।
আর দেখুন, এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়ের জন্যে ও কেবলই আবদার করে।
GLUCON-C
The unique, refreshing instant energy drink with a tangy orange taste.
Ingredients:
ARTIFICIALLY COLOURED AND ARTIFICIALLY FLAVOURED
17.5 mg of vitamin C and 120 calories.
Glaxo
গ্লুকন-সি
GLL-1174 R

কাছে যা শুনলাম আর বইটার জন্যে তোমাদের যা ছটফটানি দেখছি তাতে এখন আর সেটা কিছুতেই ভালো করে না বুঝে শুনে খোঁজ না নিয়ে ফেরৎ দিতে পারব না। বইটা যদি শেষ পর্যন্ত ফিরিয়েও দিই তাও আজ নয়—কাল সকালে এই সময়ে এলে তবে জানাতে পারব।

কথাগুলো বলে আর অপেক্ষা না করে আমি চলে এসেছিলাম। কিন্তু—বইটা নিয়ে মনে বেশ একটু অস্বস্তি ছিল বলে দুপুরের কাজকর্ম সারা হবার পর বিকেলেই বইপাড়ার সেই রাস্তার ধারের পুরানো বই-এর ব্যাপারীদের কাছে গিয়েছিলাম, আমার আগের দিনের কেনা বই-এর আর একটা কপির খোঁজে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। আগের দিন যে বই-এর অন্ততঃ দশ বারোটা কপি কাছাকাছি স্টলের সামনে ছড়ানো থাকতে দেখেছি, তার একটারও আর সেখানে চিহ্ন নেই। বইটা সম্বন্ধে আমার খোঁজ নেওয়াতেও দোকানদারদের কেউ বা বিরক্ত হলো একটু, কেউ বা ঠাট্টা করে বললে—আপনিও সেই বইয়ের খোঁজ করছেন? সে বই পেতে হলে এখন যেখানকার ছাপা সেই খাস বিলেতে যেতে হবে।

কেউ বা বিরক্ত, কেউ বা রসিক এসব পুরানো বই-এর ব্যাপারীদের সঙ্গে অল্প চেনাশোনা একজনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটু ভালো করে জানতে পারলাম। তার বিবরণ মতো জানা গেল—হপ্তাখানেকও নয়, মাত্র তার চার-পাঁচ দিন আগে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পাড়ায় একটি পুরানো বাড়ির মালিক যত সব পুরানো কাগজপত্র আর বইটই তাদের ঐ পুরানো বই-এর বাজারে প্রায় জলের দরে বেচে দিয়ে যায়। এরকম ঘটনা তাদের বাজারে একেবারে অদ্ভুত কিছু নয়। পুরানো এক একটি বাড়ির নতুন মালিক কি ওয়ারিসন মাঝে মাঝে নিজের কাছে অকেজো আগেকার এইরকম বই কাগজের পুঁজি প্রায় জলের দরে বিকিয়ে দিয়ে বাড়িঘর সাফ করবার ব্যবস্থা করে।

এবারের সস্তায় বিকিয়ে দেওয়া বই-এর গাদার মধ্যে একেবারে নতুন এক সেট বইও যে ছিল সেটাও খুব আশ্চর্য কিছু নয়। মালিকের অবহেলায় কি খামখেয়ালে ওরকম ব্যাপারও কখনো যে ঘটে না এমন নয়।

এবারের ব্যাপারটা শুধু এই দিক দিয়ে একটু বেশী অদ্ভুত যে, ভিন্ন ভিন্ন নয়, একই বই-এর পুরো একটি দশ বারোটি নতুন কপির সেট বাজারে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারটাকে যদি একটু অদ্ভুত মনে করা যায় তাহলে তার চেয়ে অনেক বেশী অদ্ভুত, রীতিমত অবাক করা ব্যাপার ঘটেছে বইগুলো বাজারে আসবার হপ্তা খানেক বাদে। সদ্য ছাপা নতুন বইয়ের মতো ঝকঝকে তকতকে হলেও বহুকাল আবার সামান্য একটু সুনামের লেখকের লেখা বলে ফুটপাথের বাজারে আসবার পর বইটির কোনও চাহিদা হয়নি বললেই হয়। ফুটপাথে ছড়াবার পর তিন চার দিনে আমার মতো আর একজনই এ বই-এর একটি কপি কিনে নিয়ে যান। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কি যেন ভোজবাজি হয়ে যায়। আমি বইটির একটি কপি নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বইটার জন্যে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ফুটপাথের স্টলে যে সব বই তখনও ছিল সেগুলিও চক্ষের নিমেষে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে খোঁজ পড়েছিল অন্য যে দুটি বই আজ বিক্রী হয়ে গিয়েছিল সে দুটিরও।

কিন্তু হেলায় যা প্রায় বিকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বই-এর জন্যে হঠাৎ কাড়াকাড়ি কেন? বইগুলি সংগ্রহ করবার জন্যে হঠাৎ এমন আগ্রহই বা কার, আর কেন?

ব্যাপারটা যে মোটেই সামান্য নয়, সেদিন রাত্রেই তা জানতে পারলাম আরো ভালো করে। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে যা নিয়ে এত রহস্য, আমার সম্প্রতি কিনে আনা সেই বইটাই একটু উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

ফোনটা তুলে সাড়া দেবার আগেই ওদিক থেকে বেশ ভারী আর রুক্ষ গলায় একটা শাসানি শুনলাম,—সাধ করে নিজের বিপদ যদি না ডাকতে চান, তাহলে কাল সকাল আটটায়—মাথায় তিনটে শূন্য লেখা চিঠির কাগজ শুধু 'অজানা' এই সই নিয়ে যে যাবে তার কাছে আপনার কেনা বইটি দিয়ে দেবেন। বই-এর যা দাম তার পাঁচ-গুণ মূল্য আমার পত্রবাহকই আপনাকে দেবে। শেষে আবার জানাচ্ছি, যা লিখেছি তা অগ্রাহ্য করে নিজের চরম বিপদ ডেকে আনবেন না।

এ শাসানির উত্তরে কিছু বলতাম কি না জানি না, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে ওদিক থেকে ফোনটা নামিয়ে রাখা হলো।

এরপর পরাশরকে ফোন করে পরের দিন সকালে সাতটার মধ্যেই আসতে বলা ছাড়া আর কি করা যায়।

তাই করলাম, কিন্তু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না। পরাশরের বোধহয় একটু ঢিলে সময় যাচ্ছিল, মাথাটা পুরোপুরি খাটাবার মতো কিছু গোলমেলে ধাঁধা হাতে ছিল না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সে আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়ে রাতের খাবারটা আমার সঙ্গেই খেল।

খেতে খেতে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে জানালাম। কোনো রকম মন্তব্য-টন্তব্য না করে সে আমার কেনা পুরানো বই-এর দোকানের বইটা নিয়ে গেস্টরুমে শুতে গেল।

সকালে ওঠবার পর সে যা করল তা অতি সোজা চালাকি বলেই সেটার কথা আমার মাথায় আসেনি।

'সামনাসামনি দেখা দিলে বইটি বিনামূল্যেই দিতে প্রস্তুত' শুধু এই কথাগুলি নাম-টাম না ছাপা একটা সাদা কাগজে লিখে সেটা সকালে যে পত্রবাহক এসেছে তাকে দিতে বলে নিজে সেই চিঠি নিয়ে আসা বেয়ারাকেই লুকিয়ে অনুসরণ করবার জন্যে দূরে এক জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করেছে।

রহস্যটার প্রথম জট-টা এত সহজে খুলে যাবার পরই কিন্তু ব্যাপারটার আসল চেহারাটা পুরোপুরি ভাবে ধরা পড়েছে।

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো
ক্লান্তিদায়ক গরম
হোকনা যতই,
থাকে উচ্ছ্বল ও
প্রাণবন্ত সদাই !
Glaxo
Glucon-D®
Glucose-D
GL
High-grade, finely powdered glucose enriched with vitamin D and calcium phosphates
200 GRAMS NET
GLAXO LABORATORIES (INDIA) LTD
Dr. Annie Besant Road, Bombay 400 025, India
® Trade Mark
Maximum Price Rs.
Local Taxes Extra
LOT
MONTH
নতুন, আসল, রঙচঙে প্যাকটিরই খোঁজ করুন।
ক্লান্তিকর গরম হোক যতই নিদারুণ, গ্লুকন-ডি দিয়ে আপনার বাচ্চাকে প্রাণচঞ্চল রাখুন — এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়তে থাকে গ্লুকোজ, ভিটামিন — ডি এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট।
গ্লুকন-ডি, জ্যুস, দুধ, চা, কফি বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান, আর, পরিবারের সবাই এক অপূর্ব সতেজ করা পানীয় পান। ১০০ গ্রা., ২০০ গ্রা. ও ৫০০ গ্রা, প্যাকে পাবেন।
গ্ল্যাক্সো-র অবদান গ্লুকন-ডি
গ্লুকন-ডি ⓣ
শক্তি যোগানের পানীয়, সুপারহিরোর অতি প্রিয়
GLL-2389
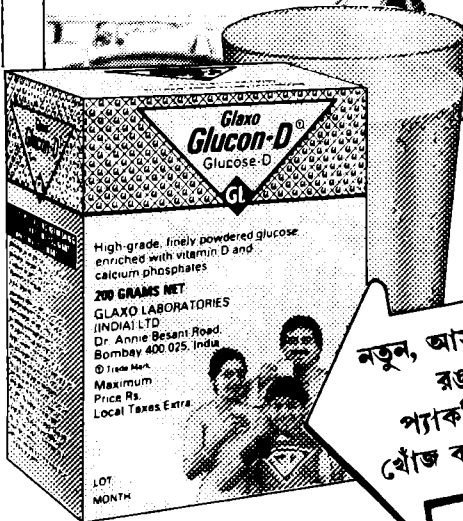
উত্তর কলকাতায় শোভাবাজারের একটা ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত পাড়ায় সরু একটা আঁকাবাঁকা গলি। সেই গলির একটা বাঁকেই তেতালা একটি পুরানো বাড়ি।

লুকিয়ে অজানা বেয়ারার পিছু নিয়ে পরাশর এই বাড়িটিই দূর থেকে দেখে এসেছিল। বেয়ারাকে পরাশরেরই নির্দেশে আমি তাকে আরও একটু দূর থেকে অনুসরণ করে আসছিলাম। নিজেদের গুপ্ত রাখার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল না বলে বেয়ারার পিছু নিয়ে তার মনিবের বাড়িটা লুকিয়ে দেখে আসা তা মোটেই কঠিন হয়নি।

বেয়ারা মনিবের বাড়িতে আমার চিঠিটা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করেই গলির বাঁকের পুরানো তেতালা বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছি।

বাড়ির আর একজন চাকর এসে দরজা খুলে দেবার পর ভেতরে ঢুকে সত্যি যে বেশ একটু অবাক হয়েছি তা স্বীকার না করে পারব না। পুরানো সরু গলি, বেশীর ভাগ জীর্ণ সব দোতালা একতলা সেকেলে দালানকোঠা। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার পর এ বাড়িটি যে একেবারে আলাদা জাতের তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। এ যেন ছেঁড়া গায়ের কাপড় মুড়ি দেওয়া রীতিমত দামী চোগা চাপকান পরা আমীর-টামীর। বাইরের দেওয়ালের নোনা-ধরা ইটের ঘরের অভাব নেই, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই মেঝেতে যেমন দামী রীতিমত ঝকঝকে তকতকে কার্পেট পাতা, ঘরের চারি-পাশের আসবাবপত্রও তেমনি খানদানি আর বাহারী। সে ঘরের ভেতরে এসে যে দুটি মানুষকে দেখলাম তাদের চেহারা পোশাকের মিল আর তফাৎও বেশ একটু নজর করবার মতো। বয়স যার কম তার রংটা রীতিমত ময়লা হলেও মানানসই, ঢিলেঢালা পাজামা পাঞ্জাবিতে তার চেহারাটা যথার্থই সুঠাম সুন্দর। আর তারই পাশে ফতুয়া গায়ে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে যিনি আমার কেনা বইটিরই আরেকটি কপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলছিলেন তাঁর গায়ের রংটা অনেক ফরসা আর প্রথম জনের সঙ্গে মুখচোখের যথেষ্ট মিল থাকলেও তিনি সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটি ভুষির বস্তা বিশেষ।

আমাদের ঢুকতে দেখে তিনি বেশ একটু চমকেই আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে উঠে বসে ভ্রূকুটি ভরে আমাদের দিকে চাইলেন।

চমকে উঠে ভ্রূকুটি ভরে চাওয়ার কারণ শুধু আমাদের আচমকা প্রবেশই নয়, পরাশরের হাতের বইটাও।

পরাশর আমার কেনা বইটাই তার বাড়ানো হাতে এগিয়ে ধরে আমার আগে আগে ঘরে ঢুকেছিল।

আরাম-কেদারার ভদ্রলোক কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ওঁর বলা হলো না। তার আগেই তাঁর কাছে পৌছে আরাম-কেদারার একটা হাতলের ওপর আমার কেনা বইটা রেখে পরাশর সবিনয়ে জানালে—আমাদের কথা আমরা রেখেছি কিনা দেখুন। বেয়ারার-টেয়ারার হাতে নয়, নিজেরাই আপনার হাতে বইটা তুলে দিলাম।

কিন্তু...আপনারা ?—আরাম-কেদারার ভদ্রলোক বেশ একটু সন্দিগ্ধভাবে যা বলতে চাইছিলেন আগেই তা অনুমান করে পরাশর এবার বললে—কেমন করে আপনার এ বাড়িটা খুঁজে বার করলাম তাই ভাবছেন তো! কিন্তু এ ভাবনা তো আগুন জ্বালার পর ধোঁয়া দেখে অবাক হওয়ার মতো। আপনার পাঠানো বেয়ারার পিছু নিয়েই আপনার ডেরার খোঁজ যে আমরা পেতে পারি এই সোজা কথাটাই আপনাদের মাথায় আসেনি দেখেই বুঝছি, এসব গোয়েন্দাগিরি-টিরির ব্যাপারে আপনি একেবারে কচিকাঁচা—অ আ ক খ-র পড়ুয়া। তা হোক। একদিক দিয়ে তাই ভালো বলে আমাদের প্রস্তাবটা এখন আপনাদের জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রস্তাব !—আরাম-কেদারার লোকটি এবার একটু সন্দিগ্ধ অসন্তোষের সঙ্গেই আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের আবার কি প্রস্তাব আমায় জানাতে এসেছেন। না, না, মশাই—এ বই-এর একটা কপি এনে দিয়েছেন তার জন্যে যা লাভ-টাভ চান নিয়ে যান। আপনাদের ওসব প্রস্তাবটস্তাব শোনার সময় কি উৎসাহ আমার নেই।

সময় আর উৎসাহ যদি না থাকে শুনবেন না।—এবার আমাকেই একটু ঝাঁঝালো গলায় বলতে হলো—তবে অযাচিত ভাবে কার সাহায্য পাচ্ছিলেন সেইটে একটু জেনে রাখুন। যদি একেবারে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দা না হন তাহলে পরাশর বর্মার নামটা বোধ হয় শুনেছেন। ইনি সেই পরাশর বর্মা যিনি নিজে থেকে উৎসাহী হয়ে আপনাদের যা সমস্যা আর রহস্য তার একটা মীমাংসার চেষ্টা করতে চাইছেন।

পরাশর নামটা শুনে প্রতিক্রিয়াটা কি আর কতখানি হলো তা বোঝবার অবকাশ না দিয়ে পরাশর তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—না, না, ওসব নাম-টামের কথা ছাড়ুন মিঃ চক্রবর্তী! আমি...

চক্রবর্তী—পরাশরের কথার মাঝখানে বেশ একটু অবাক হয়ে বাধা দিয়ে আরাম-কেদারার ভদ্রলোক বললেন, আমি যে চক্রবর্তী তা জানলেন কি করে ?

না, না—পরাশর হেসে বললে—ওটা শার্লক হোম্স মার্কা বাহাদুরী মনে করবেন না। সেরকম কিছু ক্ষমতা দেখাতেও চাইনি। ওটা নেহাৎ চোখ কান খোলা রাখা ছাড়া আর কিছু নয়।

চক্রবর্তী এরপর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে বাধা দিয়ে পরাশর বললে—আপনার নাম যে অঘোর চক্রবর্তী তা চোখের দৃষ্টির কোনো দোষ না থাকলে দু মিনিট এখানে থাকলেই জানা যায়। আপনি একেবারে অগোছালো যেমন নন তেমনি খুব গোছালো মানুষও নন। আপনার ওই টেবিলের ওপর বেশ ক'টা চিঠির তাড়া পেপারওয়েট দিয়ে চাপা আছে। সেগুলো খুব গুছিয়ে নয়, একটু এলোমেলো ভাবেই রাখা। দুটো চিঠির নাম-ঠিকানা তাই বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। তার

বাড়ির আর একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল

একটায় ইংরেজিতে এ গলির ঠিকানার ওপরে এ চক্রবর্তী বলে নামটা লেখা। আরেকটা পোস্টকার্ডে নাম-ঠিকানা বাংলায় লেখা। তাতে স্পষ্ট শ্রীঅঘোর চক্রবর্তী নামটা পড়া যাচ্ছে। কিন্তু এসব ফালতু কথা এখন থাক, আমি যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে ঘটনাচক্রে আমার বন্ধু ফুটপাথের ওপর থেকে একটা পুরনো বই কেনার জন্যে আমরা আপনাদের এরকম একটা রহস্য-জড়ানো সমস্যার সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়েছি তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের খুলে-ই বলুন না। আপনারা যা খুঁজছেন নিজে থেকে আমাদের তা ফেরৎ দিতে আসা থেকে এইটুকু আপনাদের বুঝতে বলি যে এ ব্যাপারে কোনও দাঁও মারবার লোভ-টোভ আমাদের নেই। যা আছে তা এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল। যোগাযোগ যখন হয়েই গেছে তখন আপনাদের সঠিক পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে খুলেই বলুন না। দেখা যাক্ না তাতে কিছু সাহায্য আপনাদের করতে পারি কিনা।

ঠিক! ঠিক!...এতক্ষণ কোনো কথা না বলে আরাম-কেদারার একপাশে একটি ছোট আলমারির কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যিনি মাঝে মাঝে শুধু মিটি-মিটি হাসছিলেন সেই সুদর্শন মানুষটি এবার মুখ খুলে বললেন—ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার আগে নিজেদের পরিচয়গুলো ঠিকমত দিয়ে ফেলা দরকার। তা সেদিক দিয়ে আমার বড়দার একটু চক্ষুলজ্জা হতে পারে বলে কাজটা আমিই সেরে দিচ্ছি। আমায় বড়দা বলে সম্বোধন করায় আমাদের সম্বন্ধের কিছুটা আভাস এইমাত্রই পেলেন কিন্তু সেইটেই সব নয়, উনি আমার আপন বড়দা ঠিকই কিন্তু বড়ো দা-র বদলে কাস্তে কাটারি কি খাঁড়া বললেই ঠিক বর্ণনা হয়। ছেলেবেলা থেকে বড় হওয়ার সুবিধের দরুন উনি সব কিছুতে আমায় ঠকিয়েছেন। আমি সাবালক হবার পর, পড়াশুনার জন্যে বিদেশে যাওয়ার পর আমাদের সমস্ত বিষয়-আশয়-সম্পত্তি নানান প্যাঁচে দখল করে...

আঃ অখিল!—আরাম-কেদারা থেকে অঘোর চক্রবর্তী এবার বকুনি দিয়ে বললেন,—এটা হাসি তামাসার ব্যাপার নয়, তোমার ওই বিলেতি রসিকতা শুনে কেউ কেউ ভুল করে সত্যিও মনে করতে পারেন!

হায়, তাই যদি সত্যি হত!—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গি করে অঘোর চক্রবর্তীর ভাই অখিল বললেন—আমার মুখে সত্য কথা যখন তামাসা বলে মনে হয় তখন তুমিই যা বলবার বলো বড়দা।

হ্যাঁ, তাই বলছি, তোর মতো আহাম্মক দুনিয়ায় আর আছে কিনা এঁরাই বিচার করে দেখুন—বলে আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে বসে অঘোরবাবু যে বিবরণ আমাদের শোনালেন তা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। সংক্ষেপে বিবরণটা হলো এই যে অঘোর আর অখিল চক্রবর্তীর এক অদ্ভুত খেয়ালী মামা ছিলেন। তিনি এখনও আছেন কিনা তা ঠিক বলা যায় না, কারণ গত বারো বছর তিনি ভাগনেদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেননি। অঘোর অখিলের এই খেয়ালী মামা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রথম-যৌবনেই দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে কোথায় না গিয়েছেন আর কি না করেছেন তার সঠিক বিবরণ কেউ জানে না। ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকায় কখনো তিনি সার্কাসের দলে যোগ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঘ সিংহ-বশের খেলা দেখিয়ে, কখনো রাশিয়া কি অস্ট্রেলিয়ায় কোনো পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-গবেষণার কাজে কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর। এই খেয়ালী ভবঘুরে জীবনের মধ্যে ভাগনেদের সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু তিনি রেখেই চলতেন। দু দশ মাস চুপ করে থাকলেও দু তিন বছরে একবার তিনি ভাগনেদের খবর নিতে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে কখনো ভুলতেন না। শেষ এই যোগাযোগের চেষ্টা তিনি করেন প্রায় বারো বছর আগে। তাঁর যোগাযোগ করার চেষ্টার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার ছিল, ভাগনেদের

কাছে কিছু-না-কিছু টাকা পাঠানো, আর সেই সঙ্গে এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে তারা যদি যথার্থই সাচ্চা হয় তাহলে তিনি তাদের বড়লোক করে দিয়ে যাবেনই। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ফাঁকি থাকলে তাদের সব পাওয়া ফক্কিকার হয়ে যাবে।

এসব বুকনি মামার বুড়ো বয়সের মাথা খারাপের লক্ষণ বলেই মনে হয়েছে তাঁর ভাগ্নেদের। কারণ টাকাকড়ি নয়, বারো বছর আগে মামার কাছ থেকে শেষ যা এসেছে তা একই বই-এর বারোটা কপির একটি সেট। বইটাও অসাধারণ কিছু নয়। বহুকাল আগে সেই চল্লিশের দশকে তোলা একটি ইংরেজি ছবির ছাপানো চিত্র-নাট্য মাত্র। এই বই-এর সেটের সঙ্গে মামার একটা চিঠিও যা এসেছিল তাতে মাথা খারাপের লক্ষণ একেবারে স্পষ্ট। সে চিঠিটা এইভাবে লেখা যে মামাবাবু তাঁর আসল কাজটা সেরে বিলেতে এসে পৌঁছে প্রথমেই যে নতুন বই-এর খোঁজ পেয়েছেন তার বারোটা কপি একসঙ্গে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এ বই-এর কদর যে বুঝবে তার...

ভাগ্নে অখিল মামার মতই ভবঘুরে বলে মামাবাবু তাঁর চিঠিপত্র টাকাকড়ি কলকাতায় ভাগ্নেদের পৈতৃক বাড়ির ঠিকানাতে পাঠাতেন। শেষ চিঠি আর বই-এর সেটও তাই পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা আর তার সঙ্গে পাঠানো বই-এর পার্সেলসুদ্ধই—মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রমাণ বলে ধরে নিয়ে বইগুলো বাড়ির একটা চোরা কুঠরির মতো ঘরে বন্ধ করে, প্রলাপ মার্কা চিঠিটা একটা দেরাজের ড্রয়ারে তুলে রেখে তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।
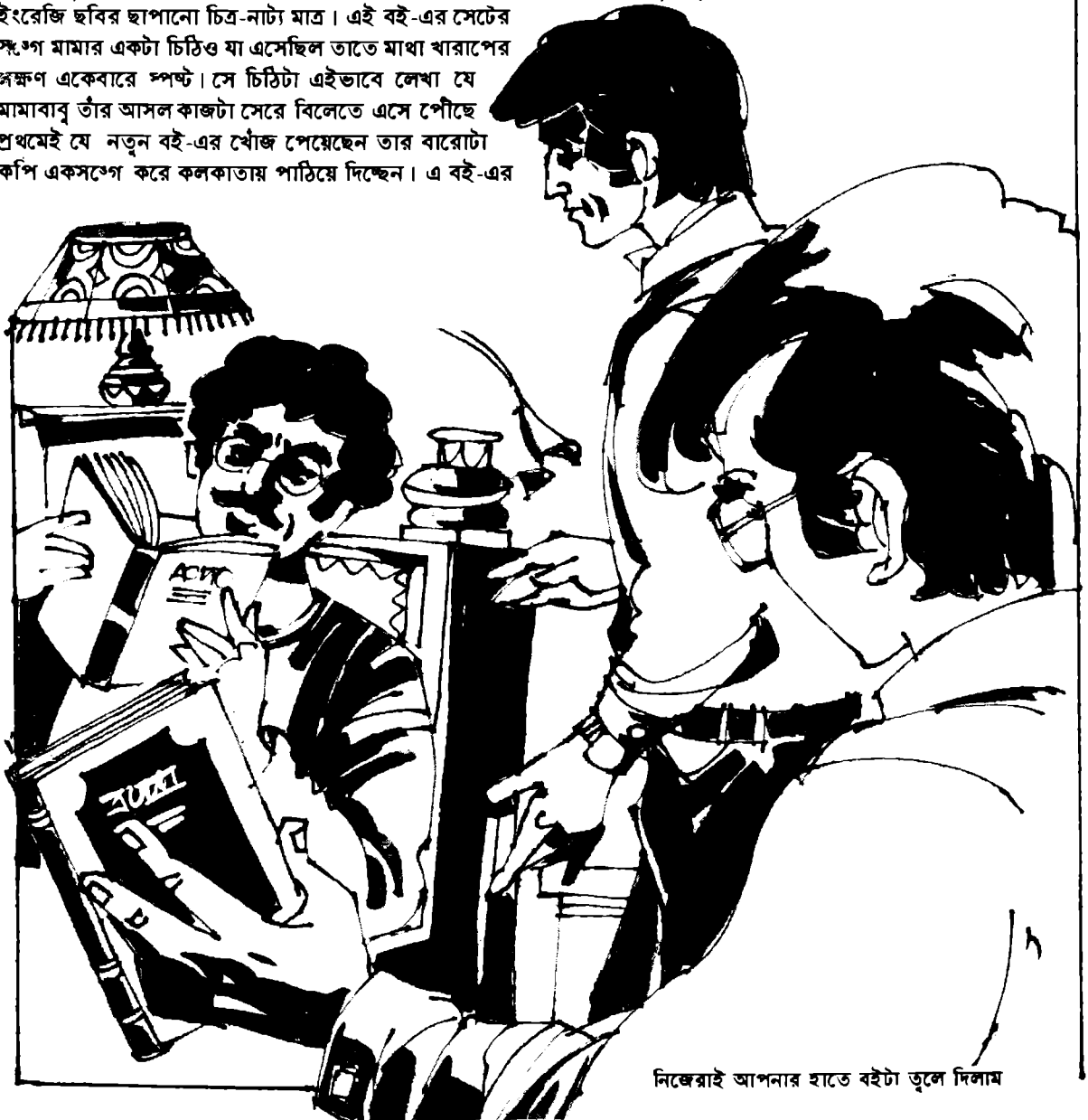
নিজেরাই আপনার হাতে বইটা তুলে দিলাম

এ বই-এর পার্সেল আর চিঠি যখন কলকাতার বাড়িতে আসে তখন অখিল তাঁর স্বভাব অনুযায়ী বিদেশে কোথায় ঘুরছিলেন। তিনি ফিরে আসবার পর অঘোর তাঁকে বই-এর সেটটা দেখিয়ে মামাবাবুর প্রলাপ সে চিঠিটার কথাও বলেছেন। অখিল তাতে কোনও উৎসাহ কিন্তু দেখাননি। তাঁর টনক নড়েছে এতদিন বাদে, কুঠুরি ঘরে অকারণে জমা হয়ে থাকা বইগুলো তাঁর বড়দা অঘোর নেহাৎ ফালতু জঞ্জাল বলে পুরনো বই-এর দোকানদারদের কাছে বিক্রী করে দেবার পর। এই সূত্রে মামাবাবুর চিঠিটার কথাও তাঁর মনে পড়েছে। অঘোরকে দিয়ে চিঠিটা বার করে তার কোনও অর্থ বুঝতে না পারলেও হয়ত দোকানীদের কাছে বিক্রী করে দেওয়া বইগুলোর কোনোটার মধ্যে গুপ্ত কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে মনে করে অস্থির হয়ে তাঁরা বিক্রী করে দেওয়া বইগুলো আবার ফিরে পাবার জন্যে ছোটাছুটি করেছেন ও করছেন।

নিজের বিবরণ শোনাতে শোনাতে অঘোর চক্রবর্তী পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছেন—কি রকম হদিস সেখানে পাওয়া যেতে পারে তা কিছু বুঝতে পারছেন ?

না। তা এখনো পারছি না।—বলেছে পরাশর,—কিন্তু আপনার কাছে পাঠানো মামাবাবুর চিঠিটা একবার দেখতে পারলে ভালো হত।

সে আর কি দেখবেন। পাগলের প্রলাপ।—বলে মুখে বিদ্রূপ করলেও অঘোর চক্রবর্তী আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে ভেতরের ঘরের কোনো দেরাজ থেকে চিঠিটা বার করে এনে পরাশরের হাতে দিয়েছে—

সত্যিই পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু ওকে ভাবা যায় না।

ছোট্ট মাপের চিঠি।

তাতে বারবার শুধু এই লেখা,—

লিন্‌থ গিয়ে পড়,
লিম্মাত আসে বেরিয়ে
কেল্‌টিক হেলভেতি দেয় আদি বসতি
রোম্যানরা শুল্ক-ঘাঁটি বসায়
নাম দেয় টিউরিক্যাম।
সেখানে কুবেরের বন্ধ মুঠো খুলতে
আসুক শুভংকরী অংকে দুলতে দুলতে।

এরপর চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা নেহাৎ প্রলাপ ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে! সেখানে লেখা—

খুঁজে পেতে প্রকাশনার বছর
তার পেছনে লাগাও
শেষ পাতায় যা আছে ছাপা
সেই গোনা নম্বর।
তবেই দেখবে—
এর পরে আর থাকবে বাকি
আরো কিছু খেল কি ?

চিঠিটা দেখাতে দেখাতেই হেসে ফেলে অঘোর চক্রবর্তী বলেছেন, দেখছেন তো স্রেফ বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরার পরে পাগলের প্রলাপ। চিঠিতে কিছু হবে না, তবে যে দু একটা বই এখনো বাজারে হারিয়ে আছে সেগুলো পেলে হয়তো অন্য হদিস মিলতেও পারে।

সেই আশাই করা যায়—বলে পরাশর আমার সংগে দুই ভাই-এর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটু বিষণ্ণ মনেই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছি—আচ্ছা, ওই চক্রবর্তীদের মামার ওই চিঠির কথাগুলো তাহলে নেহাৎ প্রলাপ! সত্যিকার মানে-টানে ওর কিছু হয় না।

কে বললে হয় না—পরাশর-ই হাসিমুখে জোর গলায় বললে—আসবার আগে ছোট ভাই অখিল চক্রবর্তীর মুখটা লক্ষ্য করেছিলে? চোখ দুটো যেন উৎসাহে উত্তেজনায় জ্বলছে। কাল পর্যন্ত ও এদেশে থাকবে কিনা সন্দেহ।

তার মানে? কোথায় যাবে!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কোথায় আবার, সোজা সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে—উৎফুল্ল মুখে বললে পরাশর।

তার মানে?—বিস্ময় বিহ্বল ভাবে বললাম,—ওই জুরিখ শহরের হদিসই ও-চিঠিতে দেওয়া আছে ?

তা ছাড়া কি—বললে পরাশর,—শুধু জুরিখ শহরেরই হদিস নয়, সেখানকার সুইস ব্যাংকের টাকা জমা এবং তা তোলার যা একমাত্র উপায় সেই গুপ্ত সংখ্যাও বলে দেওয়া আছে ছড়ার ঢঙে। শোনো, লিন্‌থ যেখানে পড়ে আর লিমাথ নদী যেখান থেকে বার হয় সে হলো জুরিখ হ্রদ। বহু বহুকাল আগে হেলভেতি নামে এক কেল্‌টিক জাতির শাখা ওখানে বসতি করে। তারপর রোম্যানরা ওখানে শুল্ক আদায়ের এক ঘাঁটি বসায়, যার নাম ছিল ট্যুরিকম্। এরপর সুইজারল্যান্ডের সব-চেয়ে ধনী শহর জুরিখ সেখানে গড়ে ওঠে। সেখানকার ব্যাংক সারা পৃথিবীর তুলনাহীন। অঘোর আর অখিলের মামা সেই ব্যাংকেই তাঁর টাকা রেখে কাগজপত্রের সংগে ব্যাংকের নিজস্ব সিন্দুক খোলার গুপ্ত সংখ্যা পর্যন্ত এই চিঠিতে এমনভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যাতে বড় ভাগ্নে অঘোর যাঁকে এ যাবৎ ঠকিয়ে এসেছেন, সেই ছোট ভাগ্নেই যাতে তাঁর গুপ্ত সঞ্চয় পান। বড় ভাগ্নের স্বার্থপরতার কথা জানতেন বলেই এই ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন।

অখিলের মুখচোখের ঝলমলানি দেখে বুঝেছি তাঁর মামাবাবুর শেষ ইচ্ছা পূরণের আর খুব দেরী হবে না।

ছবি: সরোজ সরকার

স্বর্গ নামাও
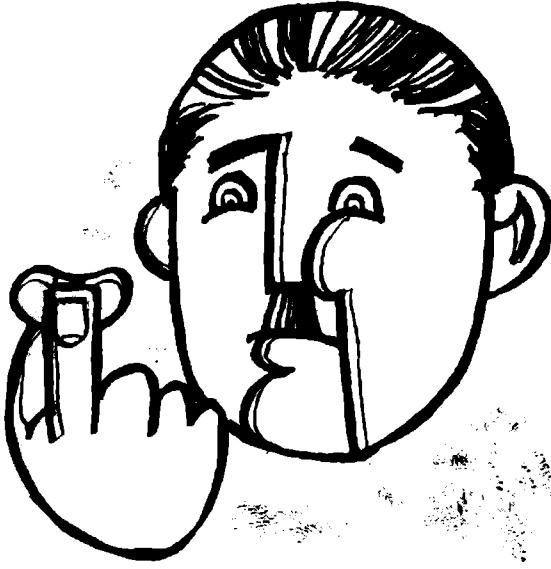
লীলা মজুমদার

না, না, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। গোড়া থেকেই বলে রাখছি এ গল্পে একটা লোকও মরে-টরে যায়নি। অন্ততঃ মলেও ঝানু দাদারা কেউ সে-কথা জানতে পারেননি। ব্যাপারটা কিছুই নয়; সকাল ন'টার পর রোজই যানবাহনে আপিসযাত্রীর ভিড় হয়। বাসের গায়ে পোকা ধরার মতো মানুষ ঝুলছিল। তা ঝানুদার সামনে ঝোলা ভদ্রলোক আরেকটু হলেই খসে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, কারণ তাঁর ঠ্যাং দুটো শূন্যে দুলছিল আর তিনি নিজেও জানলার শিকে ছাতার বাঁটটা আটকে দিয়ে দিব্যি বাতাসে ঝুলছিলেন। এই সময় বাঁটটা হঠাৎ ছাতার ডান্ডা থেকে আলগা হয়ে যাওয়াতে, আরেকটু হলেই বেঁড়ে ছাতা-হাতে উনি সটাং সগ্গে হাজির হতেন। কিন্তু ঝানুদা তা হতে দেবেন কেন? পুলিশের সাদা পোশাক-পরা গোয়েন্দা বিভাগে তাঁর চাকরি। তাঁর সামনে ও সব ট্যাফুঁ চলবে না। এক হাতে কোমর জাপ্টে ধরে তাঁকে মাঝশূন্য থেকে লুফে নেওয়াটা, নানা জাতীয় প্রতিযোগিতায় মেডেল পাওয়া ঝানুদার পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।

ভদ্রলোকের দেহটা অস্বাভাবিক রকমের হাল্কা হওয়াতে উদ্ধার কার্যে সুবিধাই হয়েছিল। তবে বিশ্রী খ্যাংরা গোঁপ ছিল তাঁর, তার খোঁচা খেয়ে ঝানুদার প্রাণ যায় আর কি। এসব দুঃখ-কষ্টকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। পরের স্টপে ভদ্রলোককে বগলদাবাই করেই নেমে পড়লেন। খ্যাংরা-গোঁপ কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে বললেন, 'ভারি উব্‌গার করলে, ভাই! নইলে স্রেফ অক্কা পেতাম। ভাবো দিকিনি যেখানে সব কিছু নিখুঁত নির্দোষ, সেখানে এই খ্যাংরা গোঁপ আর বেঁড়ে ছাতা নিয়ে—আ, ছি ছি! সে যাকগে, এখন তোমাকে কি দিই বল দিকিনি? সংগে কিছু থাকেও না ছাই। যা ভুলো মন, থাকলেও এখানে ওখানে ফেলে যাই। সব গিয়ে অপাত্রে পড়ে। ঠিক বড়কর্তার দানের মতোই' এই বলে পকেট হাতড়ে একটা শুকনো শিমবিচির মতো কি বের করে বললেন, 'এ্যাঁ! ঠিক হয়েছে। এই নাও বাছা। এটা হলো গিয়ে সর্বসিদ্ধিসাধনের ৩নং বিচি, এর বেশি দিতে সাহস পাইনে। তবে এটুকুর যোগ্যতা তোমার নিশ্চয় আছে। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের চাকরি নিয়েছ যখন। তা কে দুষ্ট কে শিষ্ট তাই বা কে বলে! এক্ষুণি খেয়ে ফেল। নইলে ফের কোনো অপাত্রে পড়ে আমি তখন কি এক্সপ্ল্যানেশন দেব বল দিকিনি। এর গুণে চাই কি স্বর্গ টেনে নামাবে। বিচিটা পকেটে রেখেছিলেন। ধোয়া উচিত। কিন্তু এ কথা শোনার সংগে সংগে ঝানুদা সেটি বের করে কচর মচর করে খেয়ে ফেললেন। বেশ লাগল, টকটক মিষ্টিমিষ্টি ঝাল-ঝাল, অনেকটা হজমিগুলির মতো। তারপর চেয়ে দেখেন, এই ফাঁকে হাল্কা ভদ্রলোক অন্য একটা বাসের পিছনের জানলার শিক ধরে দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে
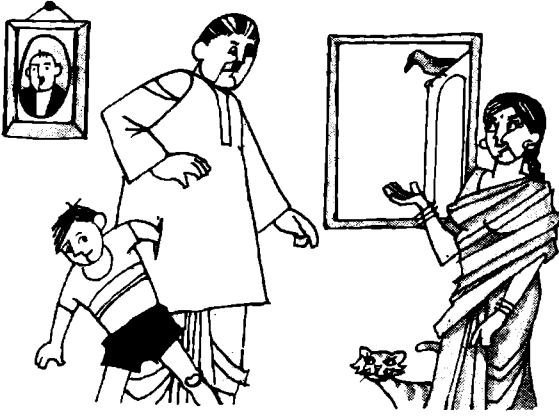
বড় ছেলে গুটে তাঁর পকেট হাতড়াতে শুরু করল

অনেক দূর চলে গেছেন। হঠাৎ মনটা ভালো হয়ে গেল।

আপিসে নিত্যিকার মতো লিফ্‌ট বন্ধ। গুনগুন করে গাইতে গাইতে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠবার সময়ে ঝানুদার মনে হচ্ছিল বিচিটা তাহলে কাজ দিচ্ছে। গা থেকে যেন একটা অদৃশ্য জ্যোতি বেরুচ্ছে। এতে হাসবার কিছু নেই। অদৃশ্য রশ্মি নিয়ে গল্প ফিল্ম, কি না হয়েছে।

তা ছাড়া মাথায়ও ভারি তেজ এসেছিল। নিজের সীটে না গিয়ে সটাং গেলেন বড় সায়েবের ঘরে। এক্ষুণি একটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলবেন। কিচ্ছু করতে হলো না। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই বড় সায়েব বলে উঠলেন—'আরে তোমাকেই খুঁজছিলাম। এই দেখ তোমার বিলম্বিত প্রমোশন অর্ডার আর পাওনা টাকাকড়ির কাগজপত্র সইসহ এসে গেছে আর তার চেয়েও ভালো কথা, ওঁরা এ বছরের শ্রেষ্ঠ কর্মীর ১০ হাজার টাকার পুরস্কারের জন্য তোমাকে নির্বাচন করেছেন।' এই ভাবে দিনটা শুরু হলো। হাল্কা ভদ্রলোকের ধুলোমাখা চটিতে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করে, মনে মনে সব শত্রুরদের ক্ষমা করলেন। যারা যারা ৬ মাস ধরে টাকা নিয়ে শোধ করছিল না, প্রত্যেকের কাছে যেচে গিয়ে ধার মাপ করে দিলেন। আপিসে একজনও শত্রুর রইল না। উপরন্তু গোপন তথ্যের হারানো চাবিটে, যেটা ১৫ দিন ধরে খুঁজে খুঁজে হন্দ হচ্ছিলেন, সেটাকে নিজের দেরাজের নিচের টানায় বৃষ্টির দিনের বাড়তি জুতোর মধ্যে খুঁজে পেলেন। তার ফলে যে সব সহকর্মী বন্ধুদের সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তাদের মনে মনে বেকসুর খালাস করে দিলেন। তাছাড়া টিপিনের সময় রামা পিওন ঘরে ঘরে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাক্সে করে দুটো ভেজিটেব্‌ল্ চপ আর বড় বড় দুটো কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে গেল। নাকি ঝানুদাদার প্রমোশন পাবার জন্য আপিস থেকে আনন্দ প্রকাশ করা হচ্ছে।

যদিও এক-আধবার মনে হয়েছিল যে উনি খেলেন সিদ্ধিসাধনের বিচি, তার ফলভোগ কেন সবাই করবে? তখুনি মন থেকে এমন অযোগ্য নিকৃষ্ট চিন্তা ঝেড়েও ফেলে দিয়েছিলেন। যে লোকটা চাই কি পৃথিবীতে স্বর্গ নামাতে যাচ্ছে, এ সব তাকে সাজে না। সে যাই হোক, সারাটা দিন অন্য সব দিনের চেয়ে একেবারে অন্যভাবে কাটল। লিফ্‌ট ঠিক হয়ে গেল। লোড্‌শেডিং হলো না। কি একটা শুভ কারণে পরদিন ছুটি বলে ঘোষণা করা হল। আপিসের বাইরেও যদি দিনটা এইভাবে কেটে গিয়ে থাকে, তাহলে মানতেই হবে পৃথিবীতে স্বর্গ যদি নাও নেমে থাকে, তবু নির্ঘাৎ পা বাড়িয়ে জায়গা খুঁজছে। নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ঝানুদাকে আর ছুটির দিনেও হাজিরা দিতে হবে না। তেমন তেমন হলে ওরা ফোন করে পরামর্শ নেবে।

বোঝা গেল, স্বর্গটা শুধু আপিসের এলাকায় কাজ করছে না। এখন থেকে জীপে যাওয়া-আসা। স্বর্গও সঙ্গে গেল মনে হলো। বাড়ির একতলায় ঢুকতেই মেয়ে বলল, 'দাদা সেই চাকরিটা পেয়েছে বাপি।' গিন্নির আহ্লাদ আর ধরে না। কোমরে কাপড় জড়িয়ে, বাতের কথা ভুলে—কিংবা হয়তো সেটা সেরেও গিয়ে থাকা অসম্ভব নয়—নিজের হাতে ছানার পোলাও আর মাংসের দো-পেঁয়াজা রাঁধতে বসেছেন। বড় মেয়ে জামাই এসেছে। ছোট মেয়ের সঙ্গে বড় জামাইয়ের সেই ডাক্তার ভাইয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে তারা।

ঝানু দাদা আবার হাল্কা ভদ্রলোককে মনে করে নমো করতে যাবেন, এমন সময় বড় মেয়ের ছয় বছরের বড় ছেলে গুটে তাঁর পকেট হাতড়াতে শুরু করে দিল। ঝানুদাদা পকেট চেপে ধরে 'কি করিস, কি করিস' বলে উঠলেন। সে বললে, 'গত রবিবার এগজিবিশনে সেই যে হজমি গুলির নমুনা দিয়েছিল, তুমি বললে, ময়লা হাতে খাস্ না, আমার পকেটে রেখে দে। সেইটে খুঁজছি।'

ঝানুদাদার মাথা ঘুরে গেল; তবে কি—তবে কি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পকেট হাতড়ে একটা বড় চেনা শুকনো শিমবিচির মতো জিনিস গুটে বের করে এনেছে! তার কি রাগ!! 'নিশ্চয় তুমি সেটা খেয়ে ফেলেছ। এ তো ছাদের টবে লাগাতে হয়।' ঝানু-দাদার মনে হল সমস্ত স্বর্গ তাঁর মাথায় ভেঙে পড়ছে। কিন্তু তাই কখনো হয়? একবার ও জিনিস পেলে আর ছাড়ান ছোড়ান নেই। ঝপ করে মনে পড়ল টিপিনের বাক্সের সঙ্গে কৌটারার তো ছোট্ট খামে দুটি হজমি গুলিও দিয়েছিল। বুকপকেটে রাখা ছিল। বলা যায় না, সুসময়ে-অসময়ে এ-সব কাজে দিতে পারে। এই হল সেই সুসময়। একগাল হেসে খামটি গুটেকে দিলেন। গুটে বিচিটা টেবিলের উপর ফেলে দিতেই জানলা দিয়ে একটা কাগ ছোঁ মেরে সেটি তুলে কোঁৎ করে গিলে, কোকিলের মতো গাইতে গাইতে উড়ে গেল।

ছবি : রাহুল মজুমদার

‘শিং’ ‘পিং’ দুই বোন

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

‘শিং’‘পিং’ দুই বোন শিং হলো বড়ো যে
পিং হলো ছোট বোন বুদ্ধিতে দড়ো সে!
শিং রোজ স্কুল যায় খেলা তার লুকিয়ে
পিং তাকে টা-টা বলে মুখটাকে শুকিয়ে!
দিদির বাসটা যেই রাস্তাটা ঘুরে যায়
খেলনা খুঁজতে পিং ঘোরে সাড়া বাড়িটায়
আধ খাওয়া ‘ক্যাড্‌বেরী’ গোটাগুটি মুখে ফেলে
লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে দিদির সাইকেলে।
টিভির নিচটা থেকে বার করে খেলনা
ফ্রিজের পিছন থেকে হাঁড়ি-কুঁড়ি-বেলনা!
বাবার এ্যাটাচি থেকে বার করে গন্ডার
মায়ের ভ্যানিটি থেকে পুতুলের সংসার।
স্কুল থেকে ফিরে শিং নেচে ওঠে ধেই ধেই
গম্ভীর মুখে পিং বসে থাকে সোফাতেই।
শিং বলে,–“ডেকে আনি পুলিশের কুকুরে
পিং বলে,–“হাঁকা বুড়ো এসেছিল দুপুরে!!”

ছবি : দিলীপ দাশ

বাঁটুল দি গ্রেট

আরে ধ্যেৎ! কোন অসতর্ক বুদ্ধু এখানে বালতি ফেলে গেছে?

ধুত্তোর! বালতিটা আমার পায়ে শক্ত ভাবে আটকে গেছে।
বাড়ির জন্যে জায়গা
ঠনাৎ! ঠনাৎ!

ঐ যে—ওটা খুলে বেরিয়ে গেছে।

চমৎকার—এবার খাবি খেতে না চাইলে চাবি দিয়ে ঝট করে সিন্দুকটা খুলে ফেলুন।
ব্যাঙ্ক

ঘড়াম!
ঠনাৎ!
ব্যাঙ্ক

ঘড়াস!
জেল

এঃ! আমি বোধহয় বালতিটা দিয়ে কাউকে চোট লাগিয়েছি এখুনি গিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আরে! বেশ, বেশ! গুবলেই তাহলে বালতির ঘায়ে জেলে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে!

আপনি জানলে খুশি হবেন কমিশনার, স্যার, যে, খুনে গুবলে নির্বিঘ্নে ফাটকে আটক আছে এবং আমি পুরস্কারটা আনতে যাচ্ছি।
জেল

খুনে গুবলেকে পাকড়াবার পুরস্কার স্বরূপ টাকা তো পেয়েইছি এবং ডেপুটিও হয়েছি।

তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি। এবার ব্যাঙ্ক ফাঁক করা আমার পক্ষে অতি সোজা। আর আমি লেদো মস্তান, গুবলে নই, বেশী ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে চোখ খুবলে নেবো!

ধুত্তোর! বাইরে আবার একটা ডেপুটি আছে তাতো জানা ছিলো না!

আমি জলদি ওর ব্যবস্থা করছি।
ওফ্! আজ বেজায় গরম!

ঘটাস!

গরমেই নির্ঘাত ডাঁশের কামড় বলে মনে হলো!

এই ডেপুটিটাকে কি করে অকেজো করা যাবে সেটা আমার জানা আছে।
সাবধান
বাড়ি ভাঙা হইতেছে

হাঃ হাঃ! বাড়ি ভাঙার সাইন বোর্ডটা লুকিয়ে ফেলেছি, আর এই বুদ্ধুটা বিপজ্জনক অঞ্চলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এও গুঁড়ো হবে!

তুমি ডেপুটি হয়েছো চমৎকার – সাবধান বাঁটুল, দেখো!

ওহ্! বাড়ি ভাঙার লোহার বল ওর গায়ে গিয়ে লেগেছে!
ঘড়াক!

শব্দতেই মালুম ঘা লেগেছে এবং উজবুকটা ইহলোক ছেড়ে ভেগেছে। সুতরাং ব্যাঙ্কের টাকা ফাঁকা করতে কোনো অসুবিধে হবে না।
সাবধান
বাড়ি ভাঙা হইতেছে

এবারে কি করে আমরা এখন ঐ বাড়িটাকে ভাঙবো?

এটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়!
চড় চড়!

হেঃ হেঃ! এবার এই মালমাল আমি বেশ নিরাপদেই সামাল দিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।
ব্যাঙ্ক

ঘটাক!

আপনার জন্যে আর একটা নয়া ভেট এনেছি, স্যার!
দারুণ করেছো, বাঁটুল। এই ব্যাটাই আমাকে বেঁধে হেনস্থা করেছিলো! এবার আমাকে বাঁধার ফল স্বরূপ ওর কাঁদার শেষ থাকবে না!
জেল

বুদ্ধ ও অপালা

মায়া বসু
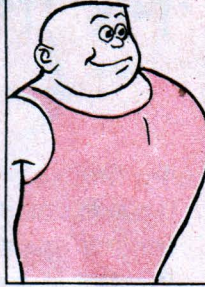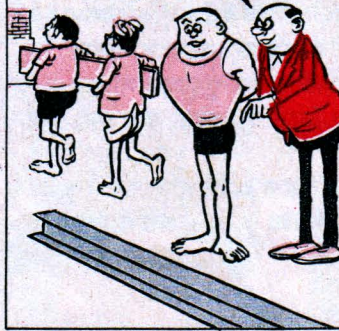
জেত বনে বসে প্রভু তথাগত উপদেশ দেন লোকে,
যারা জর্জর জরা ও ব্যাধিতে, দুঃখে অভাবে শোকে।
দীন নরনারী, রাজা ও শ্রেষ্ঠী, ভিক্ষু শ্রমণগণ,
দূর দূরান্ত হতে আসে সবে, পেতে তাঁর দর্শন।
একদা প্রভাতে অপালা নামেতে স্বামীহীনা এক নারী,
উন্মাদিনীর মতন সহসা চরণে লুটায়ে তাঁরি
কহিল কাঁদিয়া, "দয়া কর প্রভু, তুমি অন্তর্যামী,
এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী, অতি অভাগিনী আমি!

একটি মাত্র সন্তান ছিল, জীবনের বন্ধন,
এই বিধবার বেঁচে থাকিবার শেষ অবলম্বন।
দারুণ ব্যাধিতে সেই শিশু মোর, হারালো যে আজ প্রাণ,
দয়া করে তুমি পুত্রের মোর কর হে জীবনদান।
মৃত সন্তান বাঁচিবে তোমার অমৃত স্পর্শ পেলে,
আবার আমার হৃদয় জুড়ায়ে বেড়াবে সে হেসে খেলে।

এই কৃপা যদি না কর আমাকে, নিশ্চয় জেনো তবে,
অভাগী অপালা তোমার চরণে আত্মঘাতিনী হবে।"
বিলাপ শুনিয়া তারি–
সান্ত্বনা দিয়ে কহেন বুদ্ধ, "হায় মায়া মূঢ়া নারী!
মোছ আঁখিজল, স্থির হয়ে মোর, কথা শোন যদি তবে,
মৃত শিশু তব নিশ্চয় জেনো পুনর্জীবিত হবে।"
শুনে বুদ্ধের জীবনদায়িনী অমৃতময় কথা,
জননীর বুকে আশা জাগে পুনঃ, ভোলে সে মর্মব্যথা।

অশ্রু মুছিয়া কহিল অপালা, "আজ্ঞা কর হে স্বামী,
পুত্রে বাঁচাতে যা বলিবে তুমি, তাহাই করিব আমি।"
ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন তথাগত,
"মাত্র একটি মুষ্টি সরিষা, যদি মোর মনোমত,
সূর্যাস্তের আগে এনে তুমি দিতে পার মোর হাতে
সেই সর্ষপ ছোঁয়ালে তোমার মৃত শিশুটির মাথে,

নয়ন মেলিবে বালক আবার, ফিরে পাবে তার প্রাণ,
ফিরে পাবে তুমি, হে মাতা, তোমার আদরের সন্তান।
কিন্তু একটি শর্ত স্মরণে সদা জাগরূক রেখো,
জীবিত পুত্রে ফিরে পেতে হলে সেই গৃহ খুঁজে দেখো।
মৃত্যু প্রবেশ করেনি যে গৃহে, আনন্দ উচ্ছল,
যে ঘরের কেউ প্রিয় বিচ্ছেদে ফেলেনি চোখের জল।
শোকতাপহীন সেই গৃহ হতে সরিষা আনিলে তবে,
তোমার মনের বাসনা, জননী, জেনো সার্থক হবে।"

বুদ্ধবাক্যে আশায় বাঁধিয়া প্রাণ–
সারাদিন ধরে করিল অপালা সরিষার সন্ধান।
একটি মুষ্টি অ-শোক সরিষা তরে–
এ ঘর ও ঘর এ বাড়ি ও বাড়ি কেবলি ঘুরিয়া মরে।
প্রবেশ করেনি মৃত্যু যে গৃহে, সে গৃহ খুঁজে না পায়,
শ্রান্ত ক্লান্ত শোকাতুরা মাতা কেঁদে মরে হতাশায়।

বেলা যায় যায়, দিন হলো শেষ, সূর্য পড়িল ঢলে,
ফিরে এসে নারী লুটায়ে পড়িল বুদ্ধচরণ তলে।
রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "হে প্রভু! তুমি অগতির গতি,
সন্তান শোকে আমি যে অন্ধ, নির্বোধ মূঢ়মতি!
যেখানেই যাই একটি মুষ্টি অ-শোক সরিষা তরে,
সেই গৃহ হতে ক্রন্দনরোল হৃদি বিদীর্ণ করে!
মর্মে মর্মে বুঝিলাম প্রভু, তোমার কথার মানে,
প্রবেশ করেনি মৃত্যু, এমন গৃহ নেই কোনোখানে।

মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারে না, অসীম ক্ষমতা তার,
মৃত্যুর হাত থেকে, জানিলাম, নেই কারো নিস্তার।
সম্রাট হোন, হোন সন্ন্যাসী, দীনহীন অভাজন,
সময় ফুরালে পায় সকলেই মৃত্যুর দর্শন।
মায়ামোহে আমি ছিলাম অন্ধ, ক্ষমা কর অপরাধ,
চরণের ধূলি দাও অপালারে, কর গো আশীর্বাদ।"

ছবি : দিলীপ দাস

পুরস্কার

নটরাজন

কুসুমপুর গ্রামের বাহাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ শ্রীনিবাস নট্ট বলতে গেলে রাতারাতিই বিখ্যাত হয়ে গেল। শহর থেকে দলে দলে বাবুরা এলেন। শুনলেন শ্রীনিবাসের বাজনা। তারিফ করলেন তাকে। ছবি তুলে নিয়ে গেলেন। তারপরেই শহরের খবরের কাগজে ছাপা হলো শ্রীনিবাসের ছবি। লেখা হলো শ্রীনিবাসের প্রশস্তি। তারই একখানা পাতা নিয়ে একদিন শ্রীনিবাসের পনের বছরের নাতি কার্তিক হাঁপাতে হাঁপাতে তার দাদুর কাছে এসে বললে, দেখ দাদু, দেখ, খবরের কাগজে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তোমার সম্পর্কে কত কি লিখেছে। কথা বলতে বলতে ঠাকুর্দার গর্বে গর্বিত কার্তিকের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে বসে ঢাকের পরিচর্যা করছিল শ্রীনিবাস।

কালো ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল সাদা, গলায় কণ্ঠী, নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি, সামনের অনেকগুলো দাঁতই নেই—এই চেহারায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসা ধুতিখানার এক কোণ দিয়ে ঢাকের চামড়া ঘষে ঘষে মসৃণ করে তুলছিল শ্রীনিবাস। করার মধ্যে এই একটা কাজ শ্রীনিবাস এখনও নিজের হাতেই করে থাকে। প্রাণের চাইতেও প্রিয় নিজের ঢাকটির পরিচর্যার ভার অন্য কারুর ওপর ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি পায় না সে। অবশ্য অন্য কেউ বলতে নিজের ছেলে সতীনাথ ও তার মা-মরা ছেলে কার্তিক। সতীনাথকে তো বাদ দিয়েই রেখেছে শ্রীনিবাস। বাপের এই ঢাক বাজানো বৃত্তি তার দু'চোখের বিষ। শ্রীনিবাসের যে দু'চার বিঘে জমি আছে, তারই দেখাশোনা করে সতীনাথ, আর শহরের বাবুরা যখন মাঝে মধ্যে কুসুমপুর গাঁয়ে আসে তখন তাঁদের দলে ভিড়ে গিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাজনীতির কথা বলে বেড়ায়। একমাত্র মা-মরা ছেলে কার্তিককেও সতীনাথ নিজের দলে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছেলেটার দাদুঅন্ত প্রাণ। বাপের চাইতে দাদুই তার বেশি আপন। তাই নিজের সবটুকু বিদ্যে উজাড় করে দিয়ে শ্রীনিবাস কার্তিককে একের পরে এক ঢাকের বোল শিখিয়ে চলছিল।

কার্তিকের কথায় হাতের কাজ বন্ধ রেখে নাতির মুখের দিকে তাকায় শ্রীনিবাস। কার্তিক তাড়াতাড়ি খবরের কাগজের পাতাখানা তার দাদুর চোখের সামনে মেলে ধরে, ঘোলাটে চোখ মেলে সেই দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে শ্রীনিবাস। তারপর ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, পয়সা-কড়ি কিছু দেবে নাকি রে, দাদুভাই?

—পয়সা-কড়ি দেবে কেন? বলে ওঠে কার্তিক, তোমার ছবি ছেপেছে, তোমার কথা লিখেছে। কত সম্মান তোমার।

—কেন? সরল কণ্ঠে নাতিকে জিজ্ঞেস করে শ্রীনিবাস, আমি কী করেছি যে হঠাৎ আমার এত সম্মান?

—বারে, বলে ওঠে কার্তিক, তোমার মত ওস্তাদ ঢাক-বাজিয়ে নাকি আর এ দেশে নেই।

—আর ওস্তাদ! কথার মধ্যে একটা নৈরাশ্যের সুর ভেসে ওঠে শ্রীনিবাসের। আর কিছু না বলে সে আবার মন দেয় নিজের কাজে।

অন্য কেউ না জানলেও দাদুর মনের কথা তার নাতি কার্তিক বেশ ভালই জানে। এ তল্লাটে শ্রীনিবাসের মতো ওস্তাদ ঢাক

বাজিয়ে আর দ্বিতীয়টি নেই। কেউ সেই কথা শ্রীনিবাসকে বললেই তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে কেমন যেন এক নৈরাশ্যের ছায়া। মাঝে মাঝে নাতিকে বলে, জানিস দাদুভাই, কাঠি দিয়ে ঢাকের বুকে যেমন তেমন করে বোল তুলতে পারলেই ওস্তাদ ঢাকী হওয়া যায় না। এর জন্যে চাই সাধনা। সারাটা জীবন তো এ-কাজই করলাম, কিন্তু সত্যিকারের ওস্তাদ হতে পারলাম কৈ?

—কেন দাদু, বলতে থাকে কার্তিক, সবাই তো তোমার বাজনার কত সুখ্যাতি করে।

—কিছু না—কিছু না, বলে ওঠে শ্রীনিবাস, আসল ওস্তাদ ছিল আমার ঠাকুর্দা বসন্ত নট্ট। বাবার মুখে শুনেছি দুর্গাপুজোয় সন্ধ্যারতির সময় বুড়ো বসন্ত নট্ট যখন ঢাক বাজাতো তখন মা দুর্গার মুখে নাকি হাসি ফুটতো। বুঝলি দাদুভাই, আমিও চেষ্টা করেছি।এতটুকু বয়স থেকে বামুনপাড়ার ভট্টাচায্যি বাড়িতে মা দুর্গার সামনে ঢাক বাজাই। কিন্তু কোনোদিন তো মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না।

কেবল মাত্র ঐ একদিনই নয়, শ্রীনিবাস এ-কথা মাঝে মাঝেই তার নাতিকে শোনায়, আর বলে, শোন্ দাদুভাই, আমি যা পারি নি, তোকে তাই পারতে হবে। পুজোয় যেমনি ফুল-বেলপাতা, নৈবিদ্যতে এতটুকু খুঁত না থাকলেই কেবল মা প্রসন্ন হন, তেমনি ঢাকের বোলও একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। মনে রাখিস দাদুভাই, মায়ের পুজোয় ঢাকীও কিন্তু একজন পুরুতঠাকুর।

—সে কি দাদু, ঢাকী কেমন করে পুরুত হবে? বিস্ময় প্রকাশ পায় কার্তিকের কণ্ঠে।

মৃদু হেসে জবাব দেয় শ্রীনিবাস, হ্যাঁ দাদুভাই, ঠিক তাই। পুরুত পুজো করে মন্ত্র দিয়ে, আর ঢাকী পুজো করে ঢাকের বোল দিয়ে।

সম্মানের পর সম্মান। কুসুমপুর গাঁয়ের শ্রীনিবাস নট্ট যেদিন শ্রেষ্ঠ ঢাক-বাজিয়ে হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হলো সেদিন কেবল কুসুমপুর গ্রাম নয়, আশেপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের মানুষ এসে ভেঙে পড়েছিল শ্রীনিবাসের বাড়িতে। গাঁয়ের যে মানুষেরা তাকে দুবেলা দেখে, এ-কথা শোনার পরে তারাও আবার নতুন করে দেখতে চাইছিল তাকে। একি চাট্টিখানি ব্যাপার! রাষ্ট্রপতির পুরস্কার বলে কথা!

দিল্লী গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করার কথা উঠতেই কিন্তু ঘাবড়ে গেল শ্রীনিবাস। পুত্র সতীনাথ মনের আনন্দ মুখে প্রকাশ না করে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ এসব সম্মান কেবল লোক-দেখানো হলেও পুরস্কার আনতে বাবাকে তো দিল্লী যেতেই হবে।

দারুণ দুশ্চিন্তা শ্রীনিবাসের। যে মানুষটা তার বাহাত্তর বছরের জীবনে দু'তিন বারের বেশি কলকাতায় আসে নি, তার পক্ষে দিল্লী গিয়ে খোদ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে আসা তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। নাতি কার্তিক দাদুকে বোঝায়, এত ভয় পাচ্ছো কেন দাদু? তুমি তো আর একা যাচ্ছো না। সরকারী লোকেরা থাকবে তোমার সংগে। সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তারাই করবে।

অখুশি কণ্ঠে জবাব দেয় শ্রীনিবাস, তা না হয় হলো, কিন্তু এত বড় ঢাকটা বইবে কে?

—বলছো কি দাদু? হেসে বলে ওঠে কার্তিক, তুমি ঢাক সংগে নিয়ে দিল্লী যাবে নাকি?

জবাব দেয় শ্রীনিবাস, নয় তো কী? আমার বাজনা না শুনেই তারা আমাকে পুরস্কার দেবে নাকি?

শ্রীনিবাসের অজ্ঞতায় এবার হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে কার্তিক। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, না দাদু, ভয় নেই তোমার। ঢাক নিয়ে যেতে হবে না তোমাকে। রাষ্ট্রপতি তোমার বাজনা না শুনেই তোমাকে পুরস্কার দেবে।

—কি জানি বাপু, এ আবার কেমন ধারা ব্যবস্থা। কথাটা বলেই চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে শ্রীনিবাস।

শেষ পর্যন্ত দিল্লী যেতেই হলো বৃদ্ধ শ্রীনিবাসকে এবং সেখান থেকে নিয়ে এলো পুরস্কার। আর, এরপর থেকেই কুসুমপুর গাঁয়ের কেউকেটা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠলো শ্রীনিবাস নট্ট।

কুসুমপুর গাঁয়ের প্রবীণেরা যারা নাকি এতকাল শ্রীনিবাসকে নাম ধরে ডাকতেই অভ্যস্ত ছিল তারা এখন তার নামের শেষে একটা 'বাবু' যোগ করে শ্রীনিবাসবাবু বলে ডাকে তাকে। যাদের বাড়িতে গেলে এতকাল বসার জন্যে শ্রীনিবাস বড়জোর একখানা চাটাই পেত, তারাই এখন তার জন্যে চেয়ার নিয়ে ছুটে আসে। অভ্যস্ত আচরণের বাইরে তার প্রতি অন্যের এ ধরনের আচারব্যবহার কিন্তু ভালো লাগে না শ্রীনিবাসের। তার কেবলই মনে হয় সে যেন গাঁয়ের মানুষের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। আর এ জন্যে সে দায়ী করে ঐ রাষ্ট্রপতির পুরস্কারকে। তা ছাড়া শ্রীনিবাস কাউকে বলেও বোঝাতে পারে না যে সে নিজে ঐ পুরস্কারের উপযুক্ত নয়। যে ঢাকী ঢাক বাজিয়ে দেবীমূর্তির মুখে হাসি ফোটাতে পারে না সে কেমন করে পুরস্কারের উপযুক্ত হতে পারে?

অন্যকে যে-কথা বলতে পারে না শ্রীনিবাস, সে-কথা কিন্তু সে অনায়াসেই বলতে পারে তার নাতি কার্তিককে। বলে, জানিস দাদুভাই, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে যখন পুরস্কার নিচ্ছিলাম তখন আমার যেমনি ভয় করছিল, তেমনি আবার হাসি পাচ্ছিল।

—কেন দাদু, হাসি পাচ্ছিল কেন? জিজ্ঞেস করে কার্তিক।

জবাব দেয় শ্রীনিবাস, বারে, হাসি পাবে না? রাষ্ট্রপতির মতো একটা মানুষের এমনি ভুল দেখলে কার না হাসি পায়? সারাজীবন চেষ্টা করেও যেখানে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দেবীমূর্তিকে জাগাতে পারলাম না সেখানে আমাকে পুরস্কার দেওয়া কি ভুল নয়?

হঠাৎ বলে ওঠে কার্তিক, এ কেমন করে হয়, দাদু? মাটির মূর্তির মুখে কখনও হাসি ফোটানো যায় নাকি?

নাতির কথায় একটু যেন আহত হয় বৃদ্ধ শ্রীনিবাস। একটু সময় চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, বিশ্বাস কর দাদুভাই, যায়—খুব যায়। আমার দাদু বসন্ত নট্ট, তাই পারতো। আমার বাবা, আমি কেউ তা পারি নি। তাই তো বলি দাদুভাই, চেষ্টা কর, তুই হয়তো পারবি।

শ্রীনিবাসের কথায় পনেরো বছরের কিশোর কার্তিকের চোখে মুখে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একটা মিশ্রভাব খেলা করতে থাকে সেই মুহূর্তে।

দুর্গাপুজো আসন্ন। কুসুমপুর গ্রামের একমাত্র পুজো হয় বামুনপাড়ার ভট্চাজ বাড়িতে। পারিবারিক পুজো হলেও ওটিই এই গাঁয়ের সকলেরই পুজো। গাঁয়ের সবাই এসে ভিড় করে এই বাড়িতে। দীর্ঘকাল এই বাড়িতে মায়ের সামনে ঢাক বাজিয়ে এসেছে শ্রীনিবাস। বাড়ির বুড়ো কর্তা ভট্চাজ মশায় প্রতিবারই পুজোর দিন কয়েক আগে এসে শ্রীনিবাসকে বলে যান, ওহে শ্রীনিবাস, বোধনের দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে হাজির থেকো কিন্তু। শ্রীনিবাসের কাছে এটুকুই যথেষ্ট। মনে মনে ভাবে, এরই বা দরকার কি? সে তো দীর্ঘকাল ধরে পুজোর সময় এ বাড়িতেই ঢাক বাজিয়ে এসেছে। প্রতি বছর তাকে নতুন করে বলতে হবে কেন?

এবারেও তাই আগে থেকেই কার্তিকের সাহায্যে নিজের ঢাকটিকে ঘষে-মেজে, আগুনে সেঁকে প্রস্তুত হয়েই ছিল শ্রীনিবাস। অবশ্য তার এই প্রস্তুতি নিয়ে ছেলে সতীনাথের কাছে তাকে কম অপ্রস্তুত হতে হয় নি। ঠাকুর্দা ও নাতিকে ঢাকের পরিচর্যা করতে দেখে সতীনাথ বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, দু'জনে মিলে আবার ঢাক নিয়ে পড়েছেন কেন, বাবা? আপনি কি এবারও ভট্চাজবাড়ির পুজোয় ঢাক বাজাতে যেতে চান নাকি?

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে শ্রীনিবাস। নিজের ছেলের মেজাজকে সে ভালই চেনে। এখনই হয়তো চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করবে।

বাপকে নিরুত্তর দেখে সতীনাথ এবার ছেলের দিকে তাকায়। তারপর ঠাট্টার সুরে কার্তিককে বললে, এই যে ক্ষুদে ওস্তাদ, দাদুর জায়গা এবার তুই দখল করবি নাকি রে?

বদমেজাজী বাপকে কার্তিকও ভয় করে। সতীনাথের কথায় একটা ঢোক গিলে মিন্‌মিন্ করে সে জবাব দেয়, না—না, দাদুর শরীর খারাপ। এই শরীর নিয়ে দাদু পুজোয় ঢাক বাজাবে কেমন করে? তা'ছাড়া—। কথাটা শেষ না করেই কার্তিক থামে।

ছেলেকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বলে ওঠে সতীনাথ, তা'ছাড়া কি?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় কার্তিক, দাদু ভারতের রাষ্ট্রপতির

শ্রীনিবাসের দু'হাতের কাঠি দু'খানা খেলা করে চলেছে ঢাকের ওপর

পুরস্কার পেয়েছে। দাদুর পক্ষে কি এখন এ-কাজ মানায়?

মনে মনে ছেলের বুদ্ধির তারিফ করে সতীনাথ শ্রীনিবাসকে বললে, দেখুন বাবা, এই একরত্তি ছেলেটাও বোঝে যে এখন আর অন্যের বাড়ির পুজোয় আপনার পক্ষে ঢাক কাঁধে করা উচিত নয়। যাক গে, ভট্চাজমশায় এলে তাকে স্পষ্ট না করে দেবেন। কথার শেষে আর সেখানে দাঁড়ায় না সতীনাথ।

শুক্‌নো মুখখানা অভিমানে ভারি হয়ে ওঠে শ্রীনিবাসের। ছেলে প্রকারান্তরে বাপকে বলে গেল যে ঠাকুর্দার নাকি নাতির মতো বুদ্ধিটুকুও নেই। বেশ তো, বলুক ওরা। যা ইচ্ছে বলুক, যা ভাবে ভাবুক। সম্বৎসরে মায়ের পুজোর দিন ক'টিতে ঢাকে কাঠি না পড়লে ঢাকীর মনের কষ্ট অন্যে বুঝবে কেমন করে?

নাতি-ঠাকুর্দা কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। ঢাকটিকে সামনে রেখে বাহাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ ও পনেরো বছরের এক কিশোর যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে। দাদুর মনের কষ্ট যেন সেই মুহূর্তে নাতিকেও স্পর্শ করে।

একসময় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শ্রীনিবাস কার্তিককে বললে, জানিস দাদুভাই, আমার ইচ্ছে করে দিল্লী গিয়ে পুরস্কারটা রাষ্ট্রপতিকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে আবার ঢাকটা কাঁধে তুলে নিই।

কোনো কথা না বলে দাদুর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কার্তিক। হঠাৎ আবার বলে ওঠে শ্রীনিবাস, শোন্ দাদুভাই, এবার মায়ের পুজোয় ভট্চাজ বাড়িতে আমার বদলে তুই ঢাক

বাজাবি। আমার মতো তোর তো আর পুরস্কার পেয়ে মায়ের সামনে ঢাক বাজাবার অধিকার চলে যায় নি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভট্চাজ বাড়ি থেকে আর ডাক আসে না শ্রীনিবাসের। তারাই বা আর কেমন করে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার-পাওয়া ঢাকীকে ঢাক বাজাতে আমন্ত্রণ করবে? তাই তারা ভিন্ গাঁ থেকে এক নতুন ঢাকীর ব্যবস্থা করে।

বেজে ওঠে বোধনের বাজনা। তারপর এক এক করে মহাপুজোর সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিও কেটে যায়। যথারীতি গাঁয়ের মানুষ এসে জড়ো হয় কুসুমপুরের ভট্চাজ বাড়ি। কিন্তু শ্রীনিবাস নট্ট আর এবার নেই। আর, তার অভাব পূরণ করার মতো কেনো ঢাকীও নেই এই তল্লাটে। তাই এ-বাড়ির বরাবরের বিশেষত্ব সন্ধ্যারতির সেই জৌলুসও এবার অনুপস্থিত। কোথায় সেই শ্রীনিবাস নট্টের ঢাকের বোলের জাদু? কোথায় তার বাদ্যির সঙ্গে নৃত্যের সেই ছন্দ যা দেখে এতকাল গ্রামবাসীরা তাদের চোখ জুড়িয়েছে? সন্ধ্যারতি দেখতে দেখতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে বুড়ো ভট্চাজমশায়।

অভিমানে জগদ্দল পাথরের মতো ভারি মন নিয়ে পুজোর ক'টা দিন নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না শ্রীনিবাস। নাতি কার্তিকও ম্লান মুখে ঘুরঘুর করে দাদুর কাছে। অবশেষে নবমী পুজোর দিন বিকেলে শ্রীনিবাস কার্তিককে ফিসফিস করে বললে, চল্ দাদুভাই, ঢাক ও কাঁসর নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

–কোথায়? তেমনি ফিসফিস করে প্রশ্ন করে কার্তিক।

জবাব দেয় শ্রীনিবাস, ভট্চাজ বাড়ি। সন্ধ্যারতি এখনও শুরু হয় নি।

–বাবা যদি জানতে পারে?

–পারলে পারবে, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে শ্রীনিবাস, তোর বাবার ভয়ে ঢাক বাজিয়ে মায়ের পুজো করবো না নাকি?

সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি চলছে ভট্চাজ বাড়িতে। হঠাৎ পুজোমণ্ডপে শ্রীনিবাস ও কার্তিককে দেখে সবাই চমকে ওঠে। কিশোর কার্তিকের কাঁধে ঢাক ও শ্রীনিবাসের হাতে কাঁসর দেখে বাড়ির ভট্চাজ কর্তা হাসিমুখে কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এভাবে হঠাৎ কী মনে করে শ্রীনিবাস?

ভট্চাজ কর্তার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে শ্রীনিবাস তার ফোক্‌লা দাঁতে সামান্য হেসে বললে, সন্ধ্যা হয়ে এল কর্তা। সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করুন।

শ্রীনিবাস নট্ট এসে পড়েছে–রাষ্ট্রপতির পুরস্কার-পাওয়া কুসুমপুরের গর্ব শ্রীনিবাস এই মহানবমীর সন্ধ্যায় আবার ঢাক কাঁধে তুলে নেবে। কথাটা ছড়িয়ে পড়তেই দলে দলে নরনারী এসে ভিড় করে দাঁড়ায় পুজোমণ্ডপে। এমনকি রাগে কাঁপতে কাঁপতে সতীনাথও এসে হাজির হয় বাপকে নিরস্ত করতে। কিন্তু সেই সুযোগ আর পায় না সে।

বাদ্যি তো নয়, যেন ঢাকের বোলে জাদুমন্ত্র। কাঁধে ঢাক নিয়ে নেচে নেচে দেবীর সামনে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ শ্রীনিবাস নট্ট। মায়ের সেই পুজোয় কাঁসর বাজিয়ে তাকে সাহায্য করে চলেছে নাতি কার্তিক। পিতামহ ও পৌত্রের ছন্দময় বোল-তাল-লয়ে দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ। মায়ের সামনে পুরুতঠাকুরের হাতে আরতির দীপ শিখা। সারা মণ্ডপ জুড়ে ধূপ-গুগ্গুল ও অগরুর সুগন্ধ।

বাজছে ঢাক, বাজছে কাঁসর। সেই সঙ্গে একটানা বেজে চলেছে পুরুত ঠাকুরের হাতের ঘণ্টা। শ্রীনিবাসের দু'হাতের কাঠি দু'খানা খেলা করে চলেছে ঢাকের ওপর। চোখ দু'টো তার দেবীমূর্তির দিকে। সে যেন কি খুঁজে চলেছে মূর্তির মুখে।

চলছে আরতি। হঠাৎ কি যেন হলো। দাঁড়িয়ে পড়ে ক্লান্ত শ্রীনিবাস। দাদুর অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে কার্তিক। মাঝ পথে আরতির বাজনা বন্ধ করা চলে না। দাদুর কাঁধ থেকে ঢাক নামিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নেয় কার্তিক। কাঁসরখানা দাদুর হাতে দিয়ে নীচু কণ্ঠে কেবল বললে, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁসর বাজাও দাদু।

পিতামহের বদলে এবার পৌত্রের হাতে জেগে ওঠে ঢাকের বোল। কিন্তু একি? আরতির বোলে এমন সূক্ষ্ম হাতের কাজ কোথায় পেল তার দাদুভাই? এ তো ঢাকের বোল নয়, এ যে পরিষ্কার মন্ত্র উচ্চারণ। এই মন্ত্রেই কি ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঘটিয়েছিলেন অকালবোধন? এই মন্ত্রেই কি এককালে শ্রীনিবাসের ঠাকুর্দা বসন্ত নট্ট হাসি ফুটিয়েছিল দেবী প্রতিমার মুখে?

কাঁসর বাজাতে বাজাতে তন্ময় হয়ে দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রীনিবাস। হঠাৎ তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সারা দেহখানি শিউরে ওঠে তার। একি দেখছে সে মায়ের মুখে? মা হাসছেন। শ্রীনিবাস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে প্রতিমার মুখের সেই স্বর্গীয় হাসি।

হঠাৎ কি যেন হলো শ্রীনিবাসের। হাতের কাঁসরখানা ফেলে দিয়ে সে ছুটে যায় কার্তিকের কাছে। তারপর বিস্মিত কার্তিককে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে ওঠে, দেখ দেখ দাদুভাই, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি যা পারি নি, তুই তা পেরেছিস। মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিস তুই। কথার শেষে শ্রীনিবাস জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

মাত্র একটা রাত বেঁচেছিল শ্রীনিবাস। গভীর রাতে একটু সময়ের জন্যে জ্ঞান ফিরতেই মাথার কাছে বসে থাকা কার্তিকের একটা হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে অস্পষ্ট কণ্ঠে কেবল বলেছিল, দাদুভাই, আমি পেয়েছি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার। তুই যে তার চাইতে অনেক বড় জিনিস পেয়েছিস রে। মায়ের মুখের হাসির পুরস্কার পেয়েছিস তুই, দাদুভাই।

পরের দিন দেবীর বিসর্জন। দেবীর সঙ্গে নিজের দাদু শ্রীনিবাস নট্টকেও চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফেরার পথে ঐ একটা কথাই কেবল ভাবতে ভাবতে আসছিল পনেরো বছরের কিশোর কার্তিক–সত্যিই কি ঢাকের বোলে দেবীমূর্তির মুখে হাসি ফোটানো যায়?

ছবি : সন্তোষ সরকার

সবুজ পাঁচিল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এই রোমাঞ্চকর অদ্ভূত ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ছেলেবেলায়। এখন থেকে ঠিক ৪৪ বছর আগে, ১৯৪২ সালে। তারিখ মনে নেই। তবে মাসটা ছিল আশ্বিন।

ক'দিন থেকে আকাশের হালচাল ভাল ঠেকছিল না। ধূসর মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ। এলোমেলো বাতাস বইছিল সারাক্ষণ। সেই সঙ্গে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি। তারপর হঠাৎ একরাত্রে শুরু হয়ে গেল প্রচন্ড ঝড়। কী ঝড়! কী ঝড়! সেই সঙ্গে তুলকালাম বৃষ্টি। কত গাছপালা ভেঙ্গে পড়ল তার লেখাজোখা নেই। পুকুর ঝিল দীঘি আর নালা ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে প্রায় বন্যার দশা। মফস্বল শহরের শেষদিকটায় আমাদের বাড়ি। খেলার মাঠ আর সামনের রাস্তা ছাপিয়ে একহাঁটু জল উঠোনে ঢুকে থইথই করতে থাকল। বাড়িতে মানুষজন বলতে শুধু আমার বিধবা পিসিমা আর আমি। বাবা চাকরি করেন কলকাতায়। পিসি-ভাইপো মিলে বারান্দায় দুরুদুরু বুকে বসে রইলুম সারাটি রাত। শহরে বিদ্যুৎ ছিল। কিন্তু ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে শহর জুড়ে থমথমে আঁধার। এখনও মনে পড়ে, লণ্ঠনের আলোয় পিসিমা বারবার বারান্দার ধারে গিয়ে উঠোন-ছাপানো জলের মাপজোক করছেন আর গম্ভীরমুখে বলছেন, "আর তিনটে ইঞ্চি বাড়লেই ঘরে জল ঢুকবে রে বীরু!" তাই শুনে বারো বছর বয়সী ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

তো পিসিমার মুখে বিড়বিড় করে ঠাকুরদেবতার নাম জপার জন্যই হোক, কিংবা পালোয়ানি পাঁয়তারার দরুন ক্লান্তিতেই হোক, পরদিন সকাল থেকে দুষ্টু ঝড় ব্যাটাচ্ছেলে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু টিপটিপ বৃষ্টিটা থামল না। সারাটা দিন চিমটি কাটার মতো পৃথিবীটাকে জ্বালাতেই থাকল। এজন্যই

বুঝি বলে, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"। পিসিমা খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন, "হাকিমের চেয়ে পেয়াদার দাপট !" পিসিমার এই অভ্যাস ছিল। আপনমনে বকবক করতেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বাইরের ঘরে পড়তে বসেছি। তখন স্কুলে পুজোর ছুটি। স্কুল খুললে পরে আর একটা মাস বাদে ক্লাস এইটের ফাইনাল পরীক্ষা। টিমটিমে হেরিকেনের আলোয় ইতিহাস মুখস্থ করছি। বাইরে জল থইথই। টিপটিপ বৃষ্টির শব্দ। খেলার মাঠের দিকে গ্যাঙোর গ্যাঙ করে বিকট গলায় অসংখ্য ব্যাঙ ডাকছে। গাছপালায় জ্বলছে জোনাকির ঝাঁক। থমথম করছে কালো আঁধার। পিসিমা রান্নাঘরে রাতের রান্নায় ব্যস্ত। সেই সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ, তারপর ধাক্কাধাক্কি। চমকে উঠলুম।

চমকে উঠলুম কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে বলে। "বীরু ! বীরু ! ও বীরু !" তারপর–"পুঁটু ! ও পুঁটু ! পুঁটু রে !"

পুঁটু আমার পিসিমার ডাকনাম। তারপরই গলাটা চেনা মনে হলো। এদিকে ডাকাডাকিটা পিসিমারও কানে গিয়েছিল। আমি চুপচাপ বসে আছি দেখে খাপ্পা হলেন আমার ওপরই। বললেন, "পৃথিবীতে হুলুস্থুল–আর এদিকে বইপড়া ! তুই কি ছেলে রে !"

বলে দরজা খুলে দিলেন। কেউ ঘরে ঢুকে পড়ল। ভিজে জবুথবু যেন কাকতাড়ুয়াটি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। এদিকে পিসিমা একগাল হেসে "কুড়োদা ! তুমি হঠাৎ অসময়ে কোত্থেকে ?" বলে ঢিপ করে লম্বা চওড়া ভিজে লোকটির পায়ে প্রণাম ঠুকে ফেললেন।

পিসিমার "কুড়োদা" আমার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, "কী বীরু ! চিনতে পারছিস না নাকি ? ইস্ ! তুই কত্তো বড়ো হয়ে গেছিস রে ! এ্যাঁ ?"

পিসিমার আমাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। ততক্ষণে মাথার ঘিলু সাফ হয়ে গেছে। ঝটপট উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম পায়ে। কুড়োমামার ভিজে পাঞ্জাবির চাপে আমি প্রচুর ভিজে গেলুম। এত জোরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন !

একটু আদর করে কুড়োমামা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পুঁটু ! শীগগির আমাকে শুকনো কাপড়-চোপড় দাও ! ব্যাগের ভেতরসুদ্ধু ভিজে একশা হয়ে গেছে। বাপ্স্ ! স্টেশন থেকে রাস্তায় নেমেই দেখি জলে জলাক্কার চারদিক ! ছাতি নিয়ে বেরুতে মনে ছিল না ! ভিজে নাকাল একেবারে।"

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কুড়োমামাকে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পড়ার বইয়ে আর আমার মন বসল না। কুড়োমামা এসে পড়েছেন ! সেই কুড়োমামা ! কত অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প না বলতে পারেন ! হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রূপকথার গল্প, ইতিহাসের গল্প !

কুড়োমামা আমার মায়ের দূরসম্পর্কের দাদা। বছর দুই আগে মায়ের মৃত্যুর পর এসেছিলেন। তখনই আমি ওঁর অনুগত হয়ে পড়েছিলুম। মায়ের মৃত্যুশোক ভুলিয়ে দিয়েছিলেন কুড়োমামা। সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন আর কত রোমাঞ্চকর গল্প না শোনাতেন।

পিসিমার কাছেই শুনেছি, কুড়োমামা "স্বদেশী আন্দোলন" করে বেড়ান। বক্তৃতা দেন জনসভায়। সেবার আমাদের এই শহরে ওই খেলার মাঠে জনসভায় ওঁকে বক্তৃতা দিতে আমিও দেখেছিলুম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা ওই বয়সে ঠিক মাথায় ঢুকত না। পিসিমার কাছেই শুনেছি, এসবের জন্যে ওঁকে নাকি কতবার জেল খাটতে হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এসব কারণেই কুড়োমামাকে বড়ো রহস্যময় মানুষ বলে মনে হত। সেই সন্ধ্যারাতে যখন কুড়োমামা পাশের ঘরে পিসিমার সঙ্গে কথা বলছেন, তখন মনে পড়ে গিয়েছিল, রাণাপ্রতাপ, শিবাজি ও সিরাজউদ্দৌল্লার গল্প, কুড়োমামার কাছে অমন করে না শুনলে সেবার ইতিহাসে হয়তো এত ভালো নম্বরই পেতাম না ! ইতিহাসের পরীক্ষায় ওই প্রশ্নগুলো ছিল। হ্যাঁ, অশোক আর আকবরের প্রশ্নও ছিল। কুড়োমামার কাছে তাঁদের কথা গল্পের মতো করে না শুনলে অমন করে পরীক্ষার খাতায় লিখতেই হয়তো পারতাম না। বই মুখস্থ করে কি ভালো নম্বর পাওয়া যায় ?

তাই কুড়োমামা কখন আগের মতো আমার কাছে গল্প বলতে আসবেন, সেই প্রতীক্ষায় বই বুজিয়ে বসে রইলুম। দুচ্ছাই ! পিসিমার বকবকানিই যে থামছে না !

কুড়োমামা এলেন অবশেষে। হাতে চায়ের গেলাস। মুখোমুখি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, "তারপর বীরু, তোর খবর বল্। কোন ক্লাস হলো ?"

কুড়োমামার মুখে হাসি দেখছিলুম বটে, কিন্তু ওঁকে কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছিল। অল্প কথায় ওঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললুম, "অ্যাদ্দিন আসেননি কেন মামাবাবু ?"

কুড়োমামা চায়ে চুমুক দিয়ে গলার ভেতর বললেন, "আমার যা কাজ, তাই করে বেড়াচ্ছিলুম।"

"কী কাজ ?"

"গান্ধীজীর ডাকে 'কুইট ইন্ডিয়া'–'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন করে বেড়াচ্ছিলুম।"

হাসতে হাসতে বললুম, "ধুস ! ওসব কী বুঝি না !"

কুড়োমামা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝতে হবে বৈকি বাবা ! কত্তো বড়োটি হয়েছিস ! এখন থেকে যদি না বুঝবি, তো আর কবে বুঝবি ? তোর মতো ছেলেরা–"

ঝটপট বাধা দিয়ে বললুম, "ও মামাবাবু ! ওসব থাক। বরং একটা গল্প বলুন ! কতদিন আপনার গল্প শুনিনি !"

"আহা ! তোকে তো গল্প করেই বলতে চাইছি। গান্ধীজী–"

"না মামাবাবু! এখন ভূতের গল্প জমবে ভালো। ওই দেখুন না, কেমন আঁধার হয়ে আছে সব। এমন রাতেই তো ভূতেদের মজা, তাই না মামাবাবু? বলুন না একটা ভূতের গল্প!"

কুড়োমামা চুপচাপ গম্ভীর মুখে চা খেতে থাকলেন। তারপর গেলাস শেষ করে টেবিলে রেখে আস্তে বললেন, "ভূতের চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার আছে—জানিস বীরু? তোদের এই শহরেই সেটা ঘটেছিল।"

খুশিতে নড়ে বসে বললুম, "এই শহরে? ভূতের চেয়ে অদ্ভুত?"

"হুঁ—ভারি অদ্ভুত।"

"বলুন মামাবাবু! বলুন না সেই গল্পটা!"

কুড়োমামা আবার একটু চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "তাহলে বলি, শোন্।"
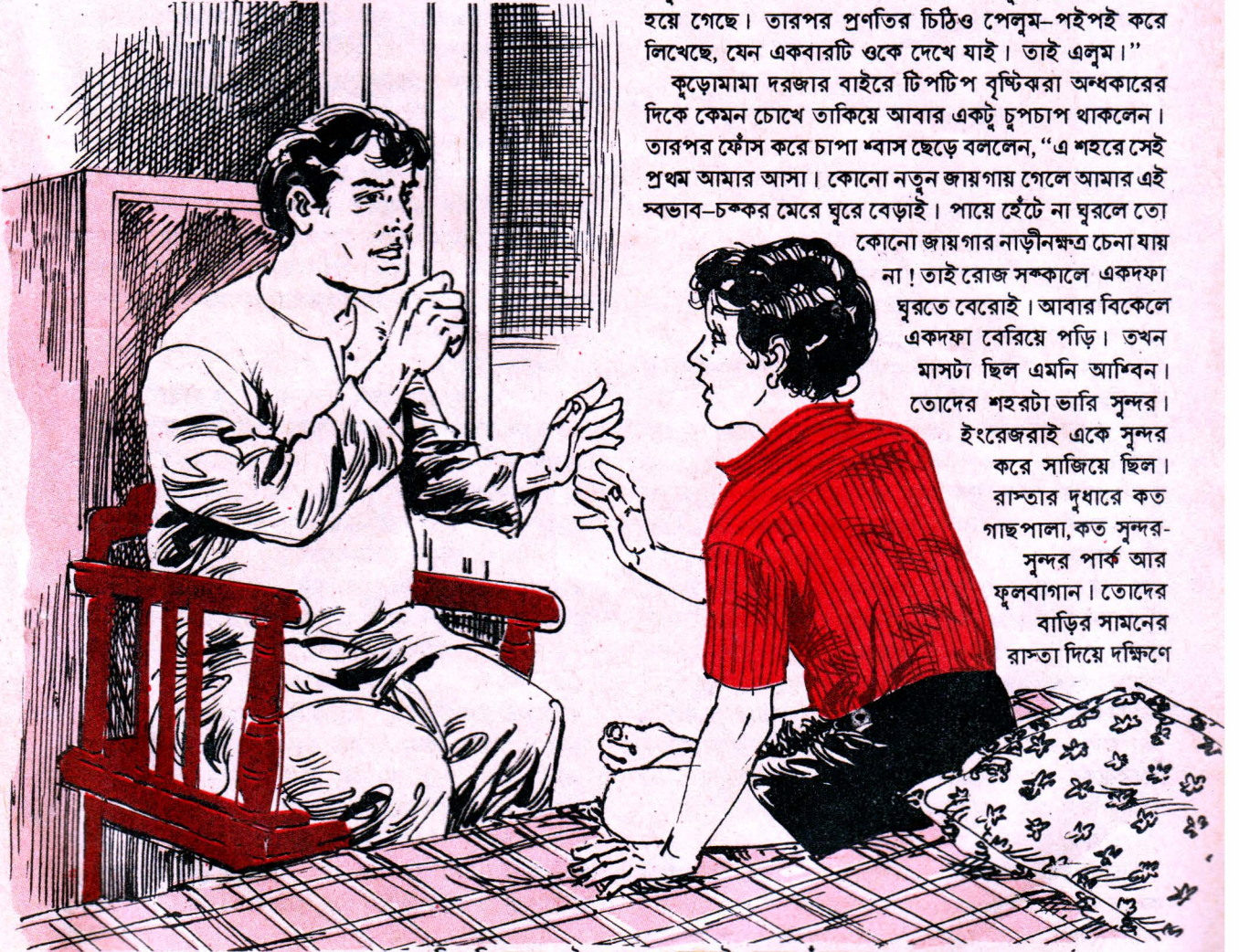
"....তোদের এই শহরে প্রথম যখন আসি, তখন তোর জন্মই হয়নি। তোর মা প্রণতি ছিল আমার খুড়তুতো বোন। প্রণতির বিয়ের সময় গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাকে কলেজ ছেড়েছি। ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেই আন্দোলনে। শ্লোগান কি দিতুম জানিস? 'বিলিতি কাপড় গাধায় পরে!' ....গান গেয়ে বেড়াতুম, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!' সব জায়গায় আপিসে-কাছারিতে পিকেটিং করে বেড়াতুম! তো ...."

বিরক্ত হয়ে বললুম, "আবার ওসব কথা! অদ্ভুত গল্পটা বলুন না মামাবাবু!"

কুড়োমামা কেন যেন ম্লান হাসলেন। বললেন, "সেই তো বলছি। চুপচাপ শোন্ না বাবা! ...তো সেই অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমি ইংরেজ সরকারের জেলে বন্দী হলুম। ছ'মাস জেল খেটে বেরিয়ে এসে শুনি, প্রণতির বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর প্রণতির চিঠিও পেলুম—পইপই করে লিখেছে, যেন একবারটি ওকে দেখে যাই। তাই এলুম।"

কুড়োমামা দরজার বাইরে টিপটিপ বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আবার একটু চুপচাপ থাকলেন। তারপর ফোঁস করে চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "এ শহরে সেই প্রথম আমার আসা। কোনো নতুন জায়গায় গেলে আমার এই স্বভাব—চক্কর মেরে ঘুরে বেড়াই। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে তো কোনো জায়গার নাড়ীনক্ষত্র চেনা যায় না! তাই রোজ সক্কালে একদফা ঘুরতে বেরোই। আবার বিকেলে একদফা বেরিয়ে পড়ি। তখন মাসটা ছিল এমনি আশ্বিন। তোদের শহরটা ভারি সুন্দর। ইংরেজরাই একে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিল। রাস্তার দুধারে কত গাছপালা, কত সুন্দর-সুন্দর পার্ক আর ফুলবাগান। তোদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণে

সেদিন বিকেলে ওটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ালুম

কিছুদূর হেঁটে গেলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। একধারে ব্যারাক–মানে সেনানিবাস। রোজ সকাল-বিকেলে সেখানে সৈন্যরা মার্চ করত। বিউগল বাজত। ব্যান্ড বাজত।"

বললুম, "এখনও তাই হয়, মামাবাবু!"

কুড়োমামা কানে নিলেন না। বললেন, "সেই শরৎকালে এমন ঝড়বৃষ্টি ছিল না। একদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ব্যারাকের পর জেলখানার মস্তো উঁচু পাঁচিল চলে গেছে অনেক দূর। তারপর পুরনো খ্রীষ্টান কবরখানা। তার ওধারে একটা তেমনি পুরনো গির্জা!"

"সে তো এখনও আছে!"

"আছে।" কুড়োমামা চাপা গলায় বললেন। মুখটা ভারি গম্ভীর। "জেলখানার টানা পাঁচিলের পর জঙ্গুলে পুরনো কবরখানা–কেমন? রোজই ওখান দিয়ে গেছি। কিন্তু ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। তাই সেদিন বিকেলে ওটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ালুম। ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম ওটা দেখে।"

"কী মামাবাবু? কী দেখে ভীষণ অবাক হলেন?"

"একটা সবুজ পাঁচিল।"

"সবুজ পাঁচিল!"

"হ্যাঁ–ঘন সবুজ ঝকমকে রঙের একটা পাঁচিল। মাঝখানে একটা দরজা। দরজাটা খোলা ছিল!"

"কিন্তু তেমন কোনো সবুজ পাঁচিল তো–"

কথায় বাধা দিয়ে কুড়োমামা বললেন, "হ্যাঁ–সেটাই তো অদ্ভুত! জেলখানা আর কবরখানার মাঝখানটিতে একটা দরজা খোলা সবুজ পাঁচিল! থমকে দাঁড়ালুম। ওদিকটায় ঘরবাড়ি ছিল না। জনমানুষ নেই। খাঁ খাঁ জায়গা। আমার খালি অবাক লাগছিল, কেন এটা চোখে পড়েনি? কতবার দুবেলা ওদিকে ঘুরতে গেছি। এটা তো চোখে পড়েনি। তাই খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারতে গেলুম। দেখি কী, একটা সুন্দর–আশ্চর্য সুন্দর ফুলের বাগান। কত রকমের কত রঙের ফুল ঝলমল করছে। কত সব সুন্দর-সুন্দর পাতাবাহারের গাছ। কত বিচিত্র গড়নের ঝাউগাছ, ক্যাকটাস, লতাকুঞ্জ। মধ্যিখানে মার্বেল পাথরের একটা গোল বেদী। আর বেদীর কেন্দ্রে একটা ফোয়ারা। ঝরঝরিয়ে জলের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে। ফোয়ারার মাঝখানে একটা সাদা থাম। থামের ওপর তেমনি সাদা একটি পরীমূর্তি। সামনে ঝুঁকে একটা সাদা কলসে যেন জল ভরছে। আর সেই সুন্দর বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে রঙবেরঙের পাখি বসে গান গাইছে। কী তাদের ডানার রঙ, কী তাদের মিঠে বুলি! বীরু, আমি থ বনে গেলুম।"

"তারপর মামাবাবু, তারপর?"

"তারপরই আমি চমকে উঠলুম। ফোয়ারার সেই পরী কলসে জল ভরছিল। হঠাৎ কলস তুলে কাঁধে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমাকে দেখে ফেলল। তুই বিশ্বাস কর, বীরু! তোকে কত গল্প বলেছি। কিন্তু এমন সত্যিকার গল্প কখনও বলিনি, বাবা!"

"তারপর কী হলো মামাবাবু?"

"পরী একলাফে নেমে এল বেদীতে। বেদী থেকে নিচের ঘাসে ঢাকা মাটিতে। তারপর মিঠে গলায় বলল, 'কে গো তুমি? ভেতরে এস না বাপু! অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস–চলে এস।' তখন সাহস করে ভেতরে গেলুম। পরী বলল, 'আমার সঙ্গে এস। তুমি আমাদের অতিথি।' ওর সঙ্গে চলতে থাকলুম। যত যাই, তত ফুল আর গাছের রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভয় করে, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে? রূপকথার গল্পে আছে, রাক্ষুসীরা মানুষকে এমনি ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিবিয়ে খেত। তাই করবে না তো? কিন্তু সেই সময় কানে ভেসে এল আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি! এত সুন্দর বাজনা কখনও শুনিনি, বীরু! মন ভরে গেল আনন্দে। তারপর দেখি ছোট্ট খোলামেলা মাঠ। সেই মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক পরা একটা সুন্দর চেহারার লোক। সেই বেহালা বাজাচ্ছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তোর বয়সী একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। পরী তাদের কাছে গিয়ে অজানা ভাষায় কী বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার দিকে ছুটে এল। আমাকে ঘিরে ধরে হইচই করতে লাগল, 'অতিথি এসেছে! অতিথি এসেছে!' ওদের পাল্লায় পড়ে আমিও ছোট্টটি বনে গেলুম। ওদের সঙ্গে খেলতে লাগলুম। বেহালা বাজতে থাকল মধুর সুরে। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। শেষ বেলার লালচে আলোয় সেই চিকন সবুজ ঘাসের মাঠে আমরা খেলায় মেতে আছি। তারপর–"

"সেই পরী?"

"পরীর দিকে আর চোখ ছিল না। মনে হচ্ছিল, হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাটা কীভাবে ফিরে পেয়েছি। আমিও ছোট্ট ছেলেটি হয়ে উঠেছি। ছুটোছুটি করে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছি। এদিকে সূর্য ডুবে গিয়ে আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে কখন। হঠাৎ সেই সময় একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। সেই ভীষণ গর্জন শোনামাত্র অবাক হয়ে দেখলুম, ছেলেমেয়েগুলো সঙ্গে সঙ্গে কাঠপুতুল হয়ে গেল। তাদের মুখেচোখে প্রচন্ড ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সবাই জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওদের জিগ্যেস করলুম, 'ও কে অমন গর্জন করছে? চলো তোমরা, ও কি জন্তু না মানুষ?' ছেলেমেয়েগুলো আমার কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ দৌড়ে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। সেই বেহালাবাজিয়ে লোকটিকেও দেখলুম ছুটে গিয়ে গা-ঢাকা দিল লতাকুঞ্জের আড়ালে। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলুম, কলস কাঁধে নিয়ে সেই সাদা পরীও ছুটে গিয়ে ফোয়ারার স্তম্ভে উঠে আগের মতো ঝুঁকে জল ভরার ভঙ্গিতে স্থির পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি। কিছু বুঝতে পারছি না–কে অমন অমানুষিক গর্জন করল, আর তাই শুনে কেনই বা ওরা অমন

ভয় পেয়ে লুকিয়ে গেল?....আমাকে তুই তত চিনিস নে বীরু। আমি ভয় পাই বটে, কিন্তু তারপর রুখে দাঁড়াতেও পারি। আমার ভীষণ রাগ হলো। বেশ তো ওরা সব আনন্দ করে খেলছিল। বেহালা বাজাচ্ছিল। এই আনন্দ পন্ড করল কে সে? তাই চিৎকার করে বললুম, 'কোন ব্যাটা রে? সাহস থাকে তো সামনে আয় দেখি—তুই জানোয়ার, না মানুষ?' তখনও আমি জোয়ান মানুষ। ডনবৈঠক করতুম। লাঠি-তলোয়ার খেলা শিখতুম আখড়ায়। ওগুলো স্বদেশী আন্দোলনেরও অংগ ছিল জানিস তো?"

গল্পটা দারুণ। তাই বিরক্ত হয়ে বললুম, "আবার সেই স্বদেশী-স্বদেশী! তারপর কী হলো বলুন?"

কুড়োমামা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়ে আছি। আস্তিনও গুটিয়েছি। সেই সময় আবছা আঁধারে আমার চেয়েও প্রকান্ড চেহারার একটা লোককে দেখতে পেলুম। সে আবার অমানুষিক গর্জন করে উঠল। তারপর এসে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। অমনি টের পেলুম লোকটার গায়ে অসুরের জোর। একে এঁটে ওঠা আমার সাধ্য নয়। মাটি থেকে উঠে ঘুষি মারতে হাত তুলেছি, সে আমার হাতটা ধরে মোচড় দিল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলুম। তারপর সে অন্য হাতে আমার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। সবুজ পাঁচিলের দরজার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।"

কুড়োমামা চুপ করলেন। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকোতে থাকলেন। মুখে চাপা রাগের বা অপমানের স্পষ্ট ছাপ। বললুম, "তারপর?"

কুড়োমামা আস্তে বললেন, "জীবনে কত ইংরেজকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। পরে গান্ধীজীর আদর্শে অহিংসা ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলুম। কিন্তু সেই ঘটনার পর প্রতিজ্ঞা করলুম, অহিংসাব্রত আমার পথ নয়। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সেই গল্পটা তোকে বলেছিলুম মনে আছে তো? সাপের গল্পটা?"

"মনে আছে। ঋষি বলেছিলেন, ওরে! কামড়াতে না হয় বারণ করেছি। ফোঁস করতে তো বারণ করিনি! এবার রাখালেরা তোকে জ্বালাতে এলে ফোঁস করবি। ফোঁস করতে দোষ কী?"

কুড়োমামা সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ফোঁস করেও সব জায়গায় কাজ হয় না। তাই সবুজ পাঁচিলঘেরা বাগানের সেই বদমাশটাকে মরণকামড় কামড়ানোর প্রতিজ্ঞা করলুম। সারারাত রাগে অপমানে দঃখে আমার ঘুম এল না। ভোরবেলা উঠে উপযুক্ত অস্ত্র খুঁজতে শুরু করলুম। তখন তোদের একটা গাইগরু ছিল। সেই গরু ওই মাঠে একটা লোহার গোঁজ পুঁতে বেঁধে চরতে দেওয়া হত। সেই গোঁজটা—"

ঝটপট বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—বুঝেছি। গরুটা নেই আর। কিন্তু গোঁজটা আছে। পিসিমা ওই দিয়ে কয়লা ভাঙে। রান্নাঘরে কয়লা রাখার জায়গায় গোঁজটা এখনও আছে।"

কুড়োমামা আনমনে বললেন, "আছে বুঝি? তো সেইটে জামার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড ছাড়িয়ে জেলখানার টানা পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টান কবরখানার কাছে থমকে দাঁড়ালুম। অবাক কান্ড!"

"কী অবাক কান্ড, মামাবাবু?"

"সবুজ পাঁচিলটা নেই!! জেলখানার উঁচু পাঁচিলের আর কবরখানার নিচু পাঁচিলের মাঝখানে একটা সবুজ পাঁচিল আগের দিন দেখেছি। এত কান্ড হয়েছে। এখন ভোরবেলা গিয়ে দেখি, তেমন কিছু নেই। এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তো গাঁজাখোর নই। লোকটার টানে আমার জামার খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই জামাটাই গায়ে আছে আমার। অথচ কোনো সবুজ পাঁচিল নেই!!"

হাসতে হাসতে বললুম, "সত্যি মামাবাবু, ওখানে তেমন কোনো সবুজ পাঁচিল নেই!"

কুড়োমামা জোর গলায় বললেন, "ছিল। দেখেছি। যাই হোক, তাজ্জব হয়ে ফিরে এসে তোর বাবা-মাকে জিগ্যেস করলুম, জেলখানা আর কবরখানার মাঝে একটা সবুজ পাঁচিল দেখেছে কি না! দুজনেই আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, না তো! তখন ফের বেরিয়ে পড়লুম। এ শহরে আমার চেনাজানা অনেক লোক আছে। তাদের কাউকেই আসল ঘটনাটা না বলে শুধু জানতে চাইলুম, জেলখানা আর কবরখানার মাঝে একটা সবুজ পাঁচিল আছে কি না। প্রত্যেকে বলল, না। তেমন কিছু নেই। তখন আবার ফিরে গেলুম সেখানে। কবরখানায় ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে বসে রইলুম। সবুজ পাঁচিলটা—সেই বাগানটা কোথায় গেল তাহলে? ...তারপর যে কয়েকটা দিন তোদের বাড়িতে ছিলুম, রোজ দুবেলা গিয়ে ওটা খুঁজতুম। মাথায় জেদ চেপে গিয়েছিল। আসলে সেই ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার অপমান! আর সেই ফুল, পাখি, পরী, ফুটফুটে ছেলেমেয়ের দল, বেহালাবাজিয়ের বাজনা! আমাকে সেখান থেকে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়েছে—এও বড় কথা। কিন্তু নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল আসলে। তাহলে কি সবটাই স্বপ্ন?...বেশ—তাহলে আমার জামা ছিঁড়ল কে? কেন ডানহাতে মোচড়ানোর যন্ত্রণা?"...

একটু চুপ করে থাকার পর কুড়োমামা বললেন, "তারপর যেখানেই গেছি, যা কিছু করেছি—ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বারবার একটা সবুজ পাঁচিল মনে ভেসে উঠেছে। আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে—দঃখে, অভিমানে, রাগে। মাঝে মাঝে প্রায়ই রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেতুম। ঘুম ভেঙে গিয়ে কষ্ট হত। দুবছর আগে তোর মায়ের মৃত্যুর খবর পেলুম। তারপর আমাকে আসতে হলো আবার। সেই সময় আবার ওখানে গেলুম। নাঃ, তেমন কোনো সবুজ পাঁচিলই নেই। তোর মনে আছে বীরু? তোকে সঙ্গে নিয়ে রোজ ওদিকে বেড়াতে যেতুম?"

মনে পড়ে গেল। বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি জেলখানা আর কবরখানার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমি জিগ্যেস করলে জবাব দিতেন না কিন্তু। বিড়বিড় করে আপন মনে কী যেন বলতেন।"

কুড়োমামা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আমি সেই আশ্চর্য সবুজ পাঁচিলটা খুঁজতুম, বীরু!"

জোর গলায় বললুম, "কিন্তু মামাবাবু, সত্যি ওখানে কোনো সবুজ পাঁচিল—"

কুড়োমামা চাপা ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর। আছে—থাকতেই হবে। আমার ভুল হতেই পারে না। এখনও ডানহাতের সেই যন্ত্রণাটা থেকে গেছে, জানিস? ...তো দুদিন আগে রাত্রে আবার স্বপ্নে দেখতে পেলুম সবুজ পাঁচিলটাকে। সকালে উঠেই ঠিক করলুম, এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। প্রচন্ড ঝড়-জল অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়লুম। বীরু, আবার আমি এসেছি সেই সবুজ পাঁচিলটাকে খুঁজে বের করতে। ওটা আছে—থাকতে বাধ্য। আসলে আমারই খোঁজার ভুলে ওটা খুঁজে পাচ্ছি না! ওটা খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই বাবা, তাতে যদি মৃত্যু হয় তো হোক।"

পিসিমা এসে বললেন, "আর কতক্ষণ মামা-ভাগ্নে মিলে গল্প জমাবে, কুড়োদা? খেতে হবে না? এস।"

সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কুড়োমামার পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ সাধাসাধি করছিলুম অন্য গল্প কিন্তু কুড়োমামার খালি সেই সবুজ পাঁচিল আর তার ভেতর যা ঘটেছিল, ইনিয়ে বিনিয়ে ফের সেই কাহিনী। তবে শুনতে খুব ভাল লাগছিল বৈকি! যদি আমিও অমনি করে কোনোদিন হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যাই সবুজ পাঁচিলটা, কী মজাই না হবে! কিন্তু সেই বদমাশ লোকটার পাল্লায় যদি পড়ি! এই ভেবে দমেও যাচ্ছিলুম।

তবু সবুজ পাঁচিলের ওধারে এক আশ্চর্য সুন্দর ফুলবাগান, জীবন্ত পরী, আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের খেলা, সুন্দর বেহালার বাজনা, পাখপাখালির গান! আমি ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, সেই সবুজ পাঁচিলের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মার্বেল পাথরের বেদীর কেন্দ্রে সাদা পরীটাও কলসে জল ভরতে গিয়ে আমাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মিঠে গলায় ডেকে বলল, 'এস বীরু! ভেতরে এস!'...

সকালে ঘুম ভেঙে জানলুম, ওটা স্বপ্ন—নিছক স্বপ্ন! মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে একটাই আনন্দের কথা, স্বপ্নে কোনো বদমাশ লোকের অমানুষিক গর্জন শুনিনি। আমাদের খেলায় কেউ বাধা দেয়নি।

পাশে কুড়োমামা নেই। ওঁর ভোরে ওঠা অভ্যাস। বেরিয়ে দেখি, রোদে ঝলমল করছে চারদিক। জল নেমে গেছে উঠোন থেকে। রাস্তা শুকনো। কিন্তু কাদা, ছেঁড়া ডালপালা পড়ে আছে। কাদা থকথক করছে কোথাও কোথাও।

পিসিমার আবছা বকবকানি কানে আসছিল। বেরিয়ে গিয়ে

দেখলুম, বাড়ির কাজ-করা মেয়ে লক্ষ্মীকে বকাঝকা করছেন। বললুম, "কী হয়েছে পিসিমা? ওকে বকছ কেন?"

পিসিমা খাপ্পা হয়ে বললেন, "কয়লাভাংগা লোহার গোঁজটা—"

চমকে উঠেছিলুম। কথা কেড়ে ঝটপট বললুম, "আমি জানি গোঁজটার কী হয়েছে। তুমি ওকে বকো না পিসিমা!"

পিসিমা আরও রেগে গিয়ে বললেন, "বলছিস তো! এখন কয়লা ভাংগবে কি দিয়ে?"

লক্ষ্মী অতশত বোঝে না। গুম হয়ে বলল, "আহা! দিচ্ছি গো, ভেংগে দিচ্ছি কয়লা! শুধু ওইটে দিয়ে ছাড়া কি সংসারে কেউ কয়লা ভাংগে না, না ভাংগা যায় না?"

বললুম, "পিসিমা! মামাবাবু কখন বেরিয়েছেন দেখেছ?"

পিসিমা ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "কে জানে বাবা তোর মামাবাবুর খবর? আমায় কি বলে গেছে? চিরটাকাল মাথা খারাপ লোক। এত বয়স হলো। চুল পাকল, তবু বাউন্ডুলেপনা ঘুচল না!"

তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। স্যান্ডেল হাতে নিতে হলো—রাস্তায় যা পাঁক আর আবর্জনা! ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে গিয়ে দেখলুম, কাদামাখা ঘাসের ওপর গোরা সেপাইরা রোজকার মতো মার্চ করছে। বিউগল বাজছে। ব্যান্ড বাজছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, জেলখানার টানা পাঁচিলের শেষে কবরখানার শুরু যেখানে, সেখানে একটা ভিড়। লাল টুপিপরা অজস্র পুলিশ। পুলিশের গাড়ি। আমার পাশ দিয়ে শহরের লোকেরা হন্তদন্ত ছুটে চলেছে। পাড়ার চাটুয্যে-কাকাকে জিগ্যেস করলুম, "ওখানে কী হয়েছে কাকাবাবু?"

চাটুয্যেমশাই বললেন, "গত রাতে কে নাকি জেলের পাঁচিলে গর্ত খুঁড়েছে। সেই সুড়ংগ দিয়ে অনেক কয়েদী নাকি পালিয়েছে। সেন্ট্রি গুলি ছুড়েছিল। একজন মারা পড়েছে।"

হঠাৎ আমার ভেতর কী একটা নড়ে উঠল। বুকের ভেতর একটা শব্দ হলো। শরীর ঠান্ডা হিম হয়ে গেল। দৌড়ুতে শুরু করলুম। তারপর ভিড় ঠেলে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

জেলের পাঁচিলের কোণায় খোঁড়া একটা সুড়ংগ। তার নিচে চিত হয়ে পড়ে আছেন—হ্যাঁ, কুড়োমামাই বটে! হাতের মুঠোয় পিসিমার হারানো সেই লোহার গোঁজটা। কুড়োমামার বুকে রক্তের ছোপ। চোখ ফেটে জল এল। আস্তে আস্তে সরে এলুম।...

অনেক পরে, আরও বড়ো হয়ে বুঝেছিলুম, কুড়োমামা স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দী সহকর্মীদের জেল থেকে পালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাহলেও ওই সবুজ পাঁচিলের গল্পটা মিথ্যে নয়। কক্ষণো নয়।...

ছবিঃ দিলীপ দাশ

হেঁতাল বনে মৌলীটাকে করল ধরে শেষ তো
বিয়ে পাগলা কেঁদো বাঘ। তারই হেস্তনেস্ত,
করবে বলে ফন্দি এঁটে; বিয়ের আর্জি পেশ তো—
করল গিয়ে বাঘের কাছে মৌলী মেয়ের মেষ তো!
দিন চলে না মৌলী মেয়ের বাড়িতে নেই রেস্ত,
বাঘের বউ তাই হতে চায় নইলে কাছে ঘেঁষতো?
রূপের ছটায় ভিরমি খাবে কাজল কালো কেশ তো,
এমন মেয়ে কোথায় পাবে? নোনাজলের দেশ তো!
খাঁচায় চেপে যেতে হবে ভীষণ জটিল কেস তো,
'তাই যাব রে'—বলেই কেঁদো ঢুকল খাঁচায় বেশ তো!
মৌলীখেকো বন্দী এখন নেই যে ভয়ের লেশ তো,
বদলা নিয়ে মেষের মুখে ফুটল হাসির রেশ তো।

পান্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

একদিন বিকেলে মিত্তিরদের বাগানে পান্ডব গোয়েন্দারা সবাই জড় হয়েছে। সঙ্গে পঞ্চুও আছে। গুলঞ্চ গাছের ধনুকের মতো বাঁকানো ডালে

দোলনা বেঁধে বাচ্চু বিচ্চু মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে। বাবলু অনেকদিন পরে তার মাউথ অর্গানটা বাজাচ্ছে।

পঞ্চু বাচ্চু বিচ্চুর দোল খাওয়ার সংগে তাল দিয়ে একবার এদিক একবার ওদিকে ছুটছে।

এমন সময় সেখানে যাঁর আবির্ভাব হলো তাঁকে দেখবে বলে বাবলু মোটেই আশা করেনি। তাই সবিস্ময়ে বলল—একি, চিনুমামা! আপনি কখন এলেন?

প্যান্ট শার্ট আর টাই পরা রোগা ডিগডিগে চিনুমামা হেসে বললেন—ঘাঁটিটা বেড়ে জায়গায় গেড়েছিস তো তোরা। বাঃ!

চিনুমামাকে দেখে বাবলুর খুব আনন্দ হলো। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু ও পঞ্চুর সংগে চিনুমামার পরিচয় ছিল না। তাই বাবলু একে একে সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল চিনুমামার। পঞ্চু তো লেজ নেড়ে নেড়ে চিনুমামার পা শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

চিনুমামা লাফিয়ে উঠলেন—মাই গড্। বাবলু, আগে তোর এই কুকুরটাকে সামলা। কুকুর দেখলেই আমার ভয় লাগে। বাবলু হেসে বলল—আমাদের এ কুকুর সে কুকুর নয় মামা। বুঝলেন তো? একেবারে মানুষের মতো আদব-কায়দায় তৈরি। দেখবেন? বলেই ডাকল—পঞ্চু!

পঞ্চু ছুটে গেল বাবলুর কাছে।

—স্ট্যান্ড আপ।

পঞ্চু দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল।

—চিনুমামার সংগে হ্যান্ডশেক্ করো।

বলার সংগে সংগেই সামনের পায়ের থাবাটা এগিয়ে দিল পঞ্চু।

চিনুমামা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—থা—থা—থাক বাবা। খুব হয়েছে। আমার অত সার্কাসি ব্যাপারে কাজ নেই। তা যাক। তুই একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়। তোর নামে কি একটা জরুরি চিঠি এসেছে। রেজিস্ট্রি চিঠি। পিওন এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে তুই না সই করলে দেবে না।

পান্ডব গোয়েন্দারা এসে হাজির হলো বাবলুদের বাড়ি। এসে দেখল একজন নতুন পিওন এসে বসে আছে ওদের গেটের পাশে।

বাবলুকে দেখেই বলল—এই চিঠিটা সই করে নাও।

বাবলু হেসে বলল—আপনি নতুন বুঝি?

—হ্যাঁ। চিঠিটা খুবই জরুরী, তাই পোস্টমাস্টার মশাই বলে দিয়েছিলেন এটা তোমার হাতেই দিতে, সেইজন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য। না হলে তোমার মায়ের হাতেই দিয়ে যেতাম।

বাবলু সই করে চিঠি নিতেই পিওন চলে গেল।

মা বললেন—একদম ঘরে থাকিস না তুই। দেখ দিকিনি চিনুটা এলো অতদূর থেকে, কোথায় একটু চা করে দেবো, জল- টল খাওয়াবো তা আসতে না আসতেই ওকে পাঠালাম তোদের খোঁজে।

চিনুমামা বিনয়ের হাসি হেসে বললেন—তাতে কি হয়েছে? ভাগ্যে এসে পড়লাম। না হলে পিওন চলে যেত।

চিনুমামা বাবলুর ঠিক আপন মামা নন। ওর মায়ের খুড়তুতো ভাই, চাইবাসায় থাকেন। কি করেন তা ভগবানও জানেন না। তবে কাজের থেকে পাগলামিটাই বেশি করেন। বাবলুদের এখানে আসবেন বলে বছরে দু'বার তিনবার চিঠি দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আসছি বলেও আসেন না। এবারে চিঠিপত্তর না দিয়েই চলে এসেছেন।

বাবলুরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ঘরে ঢুকলে চিনুমামা বললেন—দিদি, তোর ছেলে তো এসে গেছে। ওর

বন্ধু-বান্ধবরাও এসেছে সব। এবারে তাহলে আমি যেগুলো এনেছি ওগুলো বার করে এদের সবাইকে ভাগ করে দে।

বাবলু বলল—কি এনেছো মামা ?

—প্যাঁড়া। চাঁইবাসার প্যাঁড়া। তোরা দেওঘরের প্যাঁড়া খেয়েছিস তো ? এবার চাঁইবাসার প্যাঁড়া খেয়ে দেখ।

ভোম্বল তো প্যাঁড়ার নাম শুনেই মুখে চাকুম-চুকুম শব্দ করে জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে চেটে নিল একবার।

বাবলুর মা নিজেদের জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকি সব প্যাঁড়াই সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন।

ততক্ষণে বাবলু সেই রেজেস্ট্রি চিঠিটার খামের মুখ খুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কয়েক ছত্র পড়েই লাফিয়ে উঠল সে—আরে! এযে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।

সবাই বাবলুর মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বলল—কি রকম!

বাবলু বলল—কাননের চিঠি।

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল—কাননের! কি লিখেছে রে ?

বাবলু জোরে চিঠিটা পড়ে সকলকে শোনাতে লাগল।

প্রিয় পান্ডব গোয়েন্দারা,

তোমাদের ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিন। বাবার এবং আমার খুব ইচ্ছে, তোমরা সকলে ঐদিন আমাদের এখানে আসো। তোমাদের টাকা পয়সা দিয়ে ছোট করতে পারব না। তবু আমার প্রীতির নিদর্শন হিসাবে তোমাদের যাতায়াতের দায়িত্বটা আমিই নিলাম। তোমাদের শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্রকেও সংগে এনো কিন্তু। ওকে তোমরা কি ভাবে আনবে জানি না, তবু তোমরা পাঁচজন এবং পঞ্চুর মোট ছটা বার্থ ১লা ফেব্রুয়ারি দিল্লি এক্সপ্রেসে রিজার্ভ করিয়েছি। গিরিডি কোচে। তোমাদের আসা চাই। না এলে দুঃখ পাবো। তোমরা যথা-সময়ে স্টেশনে চলে এলেই রেলের চার্টে তোমাদের নাম দেখতে পাবে। আর বগীর কাছে এলেই দেখবে রায়বাবু নামে একজন ভদ্রলোক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁর কাছে টিকিট থাকবে। তোমরা গেলেই টিকিট দিয়ে দেবেন উনি। তবে হ্যাঁ, একটু সময় নিয়ে যাবে কিন্তু! ইতি—

কানন

চিঠি পড়া শেষ হতেই যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ঘরের ভেতর। কি আনন্দ! কাননের জন্মদিন। তাও আবার গিরিডিতে। কি মজা! স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে এই জায়গার যেমনি সুনাম তেমনি আকর্ষণীয় এর উশ্রী ফলস্টি। কাননের জন্মদিনে গেলে হই-হুল্লোড়, আনন্দ এবং নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো সবই হবে। টিকিট কাটার ঝামেলা নেই, কোনো কিছু নেই। শুধু কষ্ট করে স্টেশনে গেলেই ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাওয়া।

চিনুমামা বললেন— তোদের তো কালই যেতে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি আমরা। দিল্লি এক্সপ্রেসে।

চিনুমামা বললেন—যা ব্বাবাঃ। আমি কোথায় এলুম তোদের নিয়ে একটু হৈচৈ করব বলে আর তোরাই পালাচ্ছিস ? আমিও তাহলে পালাই। কালই রাতে সম্বলপুরে যাবো।

বাবলুর মা বললেন—তোদের কি যেতেই হবে ?

চিনুমামা বললেন— যেতে তো হবেই, না গিয়ে উপায়ই বা কি ? পাছে না যায় সেইজন্যে ওরা একেবারে টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করে চিঠি দিয়েছে। না গেলে অতগুলো টিকিট নষ্ট হবে।

বাবলু বলল—আচ্ছা চিনুমামা, এক কাজ করলে হয় না ?

—কি কাজ ?

—যদি আপনিও আমাদের সংগে যান ?

—ওরে বাবা। তোরা যাচ্ছিস নেমন্তন্ন পেয়ে মাছ মাংস দই মিষ্টি ওড়াতে, আমি সেখানে হংস মধ্যে বক যথা হয়ে কি করব বল ?

—তাতে কি হয়েছে ? আপনি হচ্ছেন আমাদের গেস্ট। কাজেই আপনি সংগে থাকলে তো কারো কিছু মনে করবার কথা নয়। দু'চার দিন থেকে আবার ফিরে আসব আমরা। চলুন যাবেন ?

বাবলুর মাও আগ্রহ দেখিয়ে বললেন—যা না তুই। ঘুরে আয়। কানন মেয়েটি খুব ভালো। ওদের সংগে তুই গেলে খুব খুশি হবে ও।

—বলছিস ?

পরদিন রাত্রিবেলা যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছুল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়াই ছিল দিল্লি এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে গিরিডি কোচের সামনে এসে দাঁড়াবার জন্যে। সেই নির্দেশমতো ওরা এলো।

চিনুমামার তো রিজার্ভেশন ছিল না। তাই একটা টিকিট কেটে নিলেন।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঢুকে প্রথমেই ওরা চার্টে ওদের নাম খুঁজে নিল। হ্যাঁ, আছে। পর পর নাম আছে ওদের। বাবলু বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু এবং মিঃ পঞ্চুর।

চিনুমামা বললেন—ভালোই হয়েছে। তোদের পঞ্চুর বার্থটা আমি নেবো।

বাবলু বলল—একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, যে কোনো রিজার্ভ টিকিটেই নামের সংগে বয়সের উল্লেখ থাকে। এখানে পঞ্চুর টিকিটে কিন্তু তা নেই। শুধু একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে।

চিনুমামা বললেন—তাতে তোর কি ? এসব নিয়ে মাথা ঘামাস না। না থেকে বরং ভালোই হয়েছে। চেকার এলে আমি বলব আমারই নাম মিঃ পঞ্চু। কে অত খতিয়ে দেখছে ?

সবাই হেসে উঠল।

এমন সময় একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হাসতে হাসতে

ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন—এই যে! তোমরা এসে গেছো দেখছি। তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা তো?

—হ্যাঁ।

—মিত্তিরবাবু আমার বন্ধু। তাঁর নির্দেশমতো ক'টা টিকিট কেটে রেখেছি। এই নাও। তোমাদের পঞ্চুচন্দ্রর জন্যও আলাদা একটা টিকিট কাটা হয়েছে বার্থ সমেত। দেখি, এ গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্ট কে আছে তাকে একটু বলে যেন ওকে তোমাদের সংগেই যেতে দেয়।

বলতে বলতেই চার্ট হাতে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভদ্রলোককে দেখেই বললেন—আরে রায়দা? কি খবর?

—ও, তুমি আছো? ভালোই হয়েছে।

—মধুপুর যাচ্ছেন নাকি?

—না। আজকে যাচ্ছি না। আজ এই ছেলেমেয়েগুলোকে তুলতে এসেছি। আমার বড় নাতিটার খুব অসুখ। তাই ভাবছি এ সপ্তাহটা কসবাতে থেকেই যাই।

—এরা কারা?

—এরা হচ্ছে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা। তা শোনো, এই ছেলেমেয়েগুলো গিরিডিতে যাচ্ছে। মিত্তিরবাবুর বাড়ি। এদের সংগে একটা কুকুরও আছে। অনেক ঝামেলা করে ওর জন্যে একটা বার্থ ম্যানেজ করিয়েছি। তা ভাই তুমি একটু দেখে শুনে নিয়ে যেও ওকে।

চিনুমামা টিকিট দেখাতেই অ্যাটেনডেন্ট বললেন—নিন উঠে পড়ুন। এখনো দশ বারোটা বার্থ এমনিতেই ফাঁকা আছে। কাজেই অসুবিধার কিছু নেই। তবে তোমরা বরং এক কাজ করো, কুকুরটাকে বার্থের নিচে শুইয়ে দাও। যাতে কারো চোখে না পড়ে।

ওরা তাই করল।

দিল্লি এক্সপ্রেসের গিরিডি কোচের বার্থে শুয়ে গিরিডি যাবার আনন্দে ভোম্বল তো গানই শুরু করে দিল গলা ছেড়ে। চিনুমামাও আনন্দের আতিশয্যে একটা আপার বার্থ দেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

যাবার আগে রায়বাবু বললেন—শোনো, এই বগিটা মাঝরাত্তিরে মধুপুরে কেটে রেখে দিল্লি এক্সপ্রেস চলে যাবে। তোমরা যেন ঘাবড়ে যেও না। তারপর ওখানকার একটা লোক্যাল ট্রেন এসে বগিটা তার সংগে জুড়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে গিরিডিতে। খুব ভোরবেলা।

বাবলু বলল—বেশ। আমরা তাহলে পরম নিশ্চিন্তে শয্যা নিতে পারি এবার?

রায়বাবু ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাতের গাড়িতে কোথাও গেলে ওদের খাওয়া-দাওয়ার একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যেমন মুরগীর মাংস, তন্দুরি রুটি অথবা লুচি আর থাকে বড় বড় সন্দেশ। এ-ছাড়া জলযোগের জন্য বিস্কুট চানাচুর তো থাকেই।

ট্রেন ছাড়তেই ওরা গোল হয়ে বসল সকলে। তারপর শুরু করল খাওয়া-দাওয়া। খাবার সময় চিনুমামাও ওপর থেকে নেমে এলেন।

এদিকে ওদের ঠিক পিছন দিকে তিন থাকের সারিতে বসেছিল গায়ে নামাবলি কপালে তিলক এক বুড়ি। এবং তার এক সঙ্গিনী। সম্ভবতঃ প্রতিবেশী কেউ। বুড়ি মালা জপছিল আর মাঝে মাঝে বলছিল 'হরে কৃষ্ণ'। হঠাৎ মুরগীর মাংসর গন্ধ নাকে যেতেই লাফিয়ে উঠল বুড়ি—অ্যাঁ! একি কান্ড! গাড়িতে বসে আর কিছু খাবার জিনিস পেল না, শেষকালে মুরগীর মাংস! ছ্যা ছ্যা ছ্যা। গৌর শ্রীহরি, গৌর শ্রীহরি! বলি হ্যাঁগা ল্যাংচার মা, তুমি একবার উঠে গিয়ে দেখে এসো তো মুখপোড়ারা ক'জন আছে।

ল্যাংচার মা বলল—তুমি চুপ করো দেখি বামুনমা, গাড়িতে কত রকমের লোক উঠবে, কত কি খাবে, তা নিয়ে রাগ করলে চলে কখনো? ওরা শুনবে কেন তোমার কথা?

—শুনবে না? শুনবে না বললেই হলো? এটা কি হোটেল পেয়েছে যে যা ইচ্ছে করে যাবে? যা খুশি তাই খাবে ?

বাবলুরা সবই শুনল। আর মুখ টিপে হাসতে লাগল। হঠাৎ তেড়ে এলো বুড়ি। বলল—হ্যাঁগা বাছারা, বলি তোমাদের ব্যাপারটা কি? গাড়ির মধ্যে কী এ সব! এই যে নামের মালা নিয়ে বসে আছি, তা ঐ গন্ধ নাকে এলে আমার খাওয়া হবে?

চিনুমামা বুড়িকে দেখেই খাওয়ার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। গপাগপ, গপাগপ। তারপর চটপট সব মুখে পুরে যেই না বুড়ির পাশ কাটিয়ে কলে মুখ ধুতে যাবেন, বুড়ি অমনি রুখে দাঁড়াল—দেখো, ভালো হবে না বলছি। এদিককার কলে আসবে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবো। ঐ ঐদিকে যাও। এত বড় বড় ছেলে গাড়িতে বসে মুরগী খেতে লজ্জা করল না? ঐ হাতে সর্বস্ব করবে তোমরা। তোমাদের ঘরে কি ঠাকুর-দেবতা নেই?

চিনুমামা বললেন—সব আছে। শুধু তোমার মতো একটি দিদিমা আমাদের নেই। তা দিদিমা, একটু পায়ের ধুলো দেবে? বলেই ঝুঁকে পড়ে বুড়িকে প্রণাম করতে গেলেন চিনুমামা।

বুড়ি তো তেলে বেগুনে। আরো রেগে বলল—ছুঁয়ো না আমাকে। মুরগীর হাত নিয়ে যদি সর্বস্ব ছোঁয়া ন্যাপা একসা করবে তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক এসে পড়লেন সেখানে। তারপর সব কিছু দেখে শুনে বুড়িকে বললেন—তা দিদিমা, আপনার যদি অসুবিধা হয় তো বলুন। আমি ঐদিকের সিটে সরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ওদিকটা খালি আছে।

—না বাবা। আমাদের জায়গা ছেড়ে আমরা কারো জায়গায় যাবো না। আমার গণেশ এসে যেখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে আমরা সেইখানেই বসব। তারপর রাতদুপুরে কে কখন এসে তুলে দেয় তার ঠিক নেই।

একটু পরে যে দৃশ্য দেখা গেল তা দেখলেই কেউই জিভের জল ঠিক রাখতে পারবে না। বুড়ি আর ল্যাংচার মা করল কি, সিটের ওপর কলাপাতা বিছিয়ে সাবুর খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আর ইয়া বড় বড় মালপো টিফিন কৌটো থেকে বার করে সাজাতে লাগল।

তাই না দেখেই চিনুমামা করলেন কি সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন বুড়ির পায়ের তলায়।

বুড়ি তো হাঁ হাঁ করে উঠল—আরে একি ! একি! কর কি বাছা? গায়ে ধুলো লাগবে যে!

চিনুমামা বললেন—লাগুক। তোমাকে একটা পেন্নাম করবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। তাই করলাম। আমার ছোঁয়া তো তুমি নেবে না, তাহলে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতাম।

—তা হঠাৎ এত পেন্নামের ধুম কেন বলো দিকিনি ?

—ঐ মালপো আর খিচুড়ির ভাগ আমার চাই। আঃ, কতদিন যে খাইনি!

বুড়ি বলল—এই কথা? তা বললেই তো হতো বাছা। একটু খিচুড়ি আর মালপো খাবে এ এমন কি? এই বলে বুড়ি একটা কলাপাতায় একটু খিচুড়ি, তরকারি আর মালপো নিয়ে যেই না চিনুমামাকে দিয়েছে, অমনি পঞ্চুবাবু সিটের তলা থেকে বেরিয়ে একেবারে বুড়ির সামনে এসে হাজির।

বুড়ি আবার হাঁ হাঁ করে উঠল। পঞ্চুকে দেখেই 'হ্যাট হ্যাট' করতে লাগল। তারপর চেঁচাতে লাগল—টি টি বাবু! অ টি টি বাবু! বলি গেলে কোথায়! কি কুক্ষণেই যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম। একদিকে মুরগীর হল্লা, একদিকে কুকুর। হরে কৃষ্ণ। ট্রেনের ভেতর কোত্থেকে কুকুর এলো রে বাবা।

চিনুমামা বললেন—যেখান থেকেই আসুক। হাজার হলেও কৃষ্ণের জীব। দিন না একটু। খাবার পেলেই চলে যাবে।

পঞ্চু তখনও নড়েনি দেখে বুড়ি একটা মালপো ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

পঞ্চু সেটা মুখে নিয়েই আবার চলে গেল যথাস্থানে।

ট্রেন তখন বর্ধমানে থেমেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর শোবার পালা। চিনুমামা একটি আপার বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল। আর পান্ডব গোয়েন্দারা যে যার পছন্দসই বার্থে। পুরো কামরাটাই খালি বলতে গেলে। মাঝে মধ্যে কয়েকজন লোক শুয়ে আছে শুধু। আর বাবলুর বার্থের নিচে ওদের মালপত্তরগুলো আগলে শুয়ে আছে পঞ্চু।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পঞ্চুর বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। সবাই ঝেড়ে মেড়ে উঠে বসে দেখল সম্পূর্ণ বগিটা ঘন অন্ধকারে ভরা। তারই মাঝে দু'তিনজন প্রাণের দায়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আর তাদের ভয়ংকরভাবে তাড়া করে চলেছে পঞ্চু।

ওরা কে বা কারা এবং কেনই বা পঞ্চু ওদের তাড়া করছে তা ভেবেই পেল না কেউ। কেননা এই অন্ধকারে মনে হচ্ছে ওটা

রেলের কামরা নয়, যেন একটা প্রেতপুরী। এদিক ওদিক থেকে যাত্রীদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে—ওরে বাবারে, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল রে! আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল ওরা। কেউ বা—আমার স্যুটকেস! স্যুটকেস নেই কেন? এরই মধ্যে বুড়ির গলাও শোনা গেল—ওরে বাবা রে, আমার নামের ঝুলি কে নিয়ে গেল রে?

ব্যাপারটা যে কি ঘটছে সেটা বুঝতেই বাবলু টর্চ বার করে জ্বালল। টর্চ জ্বেলেই দেখল যেন একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাবলু বলল—বিলু, ভোম্বল, কুইক।

বাবলুর পিস্তলও রেডি। কিন্তু কাকে গুলি করবে তাই দিয়ে? এই হুটোপাটিতে কে যে চোর, কে যে যাত্রী তা বোঝা মুশকিল।

এতক্ষণে ওদেরই একজনের হাতে একটি ছোরা দেখা গেল। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে লোকটি ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। যেই না আসা বাবলু অমনি লোকটিকে ফেলবার জন্য ওর একটা পা এগিয়ে দিল। লোকটি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানে। আর পঞ্চু অমনি তার পিঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।
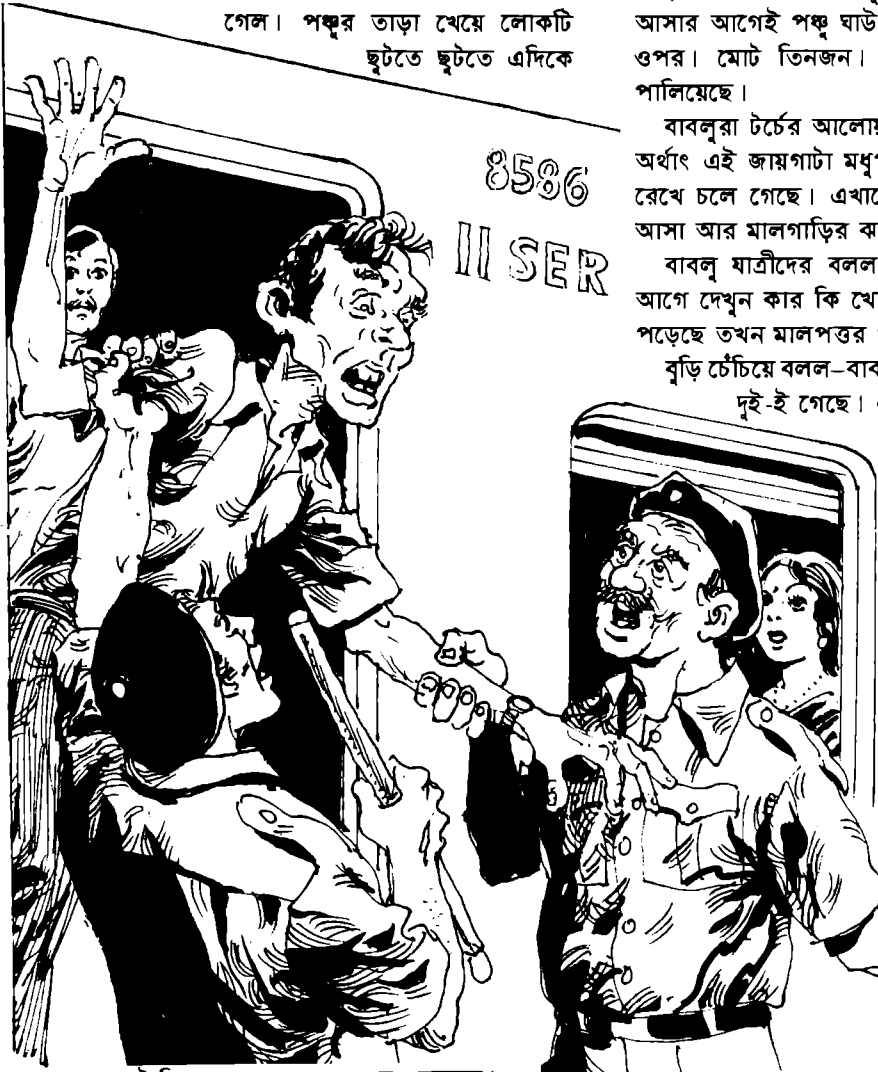
বিলু লোকটির হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিল।

বাবলু চেঁচিয়ে বলল—আমি যাত্রীদের অনুরোধ করছি আপনারা অযথা ছুটোছুটি না করে যে যার জায়গায় বসে পড়ুন। না হলে আমাদের কুকুরের কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনারা যে যার সিটে না বসলে আসল চোরেদের চিনতে পারব না।

বাবলুর কথায় কাজ হলো। যে যার সিটে বসে পড়তেই দুজন লোককে এদিকে আসতে দেখা গেল। তারা নিশ্চয়ই পড়ে যাওয়া লোকটিকে তুলতে আসছিল। কিন্তু তারা কাছে আসার আগেই পঞ্চু ঘাউ ঘাউ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। মোট তিনজন। দলে আর কেউ থাকলেও তারা পালিয়েছে।

বাবলুরা টর্চের আলোয় দেখল বগিটা সানটিংয়ে আছে। অর্থাৎ এই জায়গাটা মধুপুর। দিল্লি এক্সপ্রেস বগি কেটে রেখে চলে গেছে। এখানে চারিদিকে শুধু ইঞ্জিনের যাওয়া আসা আর মালগাড়ির ঝনঝন শব্দ।

বাবলু যাত্রীদের বলল, আপনারা সবাই টর্চের আলোয় আগে দেখুন কার কি খোয়া গেছে। কারণ চোর যখন ধরা পড়েছে তখন মালপত্তর পাবেনই।

বুড়ি চেঁচিয়ে বলল—বাবা, আমার তোরঙ্গ আর নামের ঝুলি দুই-ই গেছে। একটু দেখো না বাবা খুঁজে-পেতে।

পঞ্চু হঠাৎ সেই অন্ধকারে কোথা থেকে নামের ঝুলিটা কুড়িয়ে এনে বুড়িকে দিল। বুড়ি তো আনন্দে গদগদ।

বাবলু বলল—আমার মনে হয় এরা মালপত্তর চুরি করে লাইনের ধারেই কোথাও নামিয়ে রেখেছে। যদি এদের দলের লোকেরা নিয়ে চলে গিয়ে না থাকে তাহলে সবার সবকিছুই পাওয়া যাবে।

বাবলু এই কথা বলতেই কয়েকজন লোক ওদিক এদিক করে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল লাইনের ধারে। বাবলুরাও নামল।

বাবলুর অনুমানই ঠিক। টর্চের আলোয় দেখা গেল একগাদা মাল লাইনের

এই কি করতা হ্যায়? ছেড়ে দাও হামকো।

ধারে নামানো আছে।

বাবলু বলল—তার মানে এটা একটা ছিঁচকে চোরের দল। চুরির ব্যাপারে এই তিনজনই তাহলে ছিল। সবার সব মালপত্তর চুরি করে আমাদের সম্পত্তিতে হাত দিতে গিয়েই মজা টের পায়। কেননা পঞ্চু ছিল আমাদের সম্পত্তির পাহারাদার।

কয়েকজন লোক খোয়া-যাওয়া মালপত্তরগুলো কামরায় ওঠাতে লাগল। আর কয়েকজন চেপে ধরল সেই আহত লোক দুজনকে। একজন তো মেঝেয় শুয়ে ছটফট করছিল। তাকেও ধরে ওঠালো সকলে। তারপর চলল মারধোর ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

ইতিমধ্যে একটি কয়লার ইঞ্জিন এসে কামরাটাকে কট করে কামড়ে ধরল। তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য।

বাবলু বলল—আর ভয় নেই। প্ল্যাটফরমে আরো লোকজন পাবো। কামরাতেও এবার আলো জ্বলবে।

সত্যিই তাই। কামরাটা গিরিডি প্যাসেঞ্জারে জুড়ে দিতেই আলোয় ভরে উঠল চারিদিক। সবাই তখন আহত লোক তিনজনকে প্ল্যাটফরমে নামাল।

মধুপুরের প্ল্যাটফরমে যাত্রী পুলিশ সবাই ছুটে এলো হৈ হৈ করে।

স্টেশনে তখন ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি পড়েছে। বাবলুরা সবাই উঠে পড়ল কামরায়। ট্রেন চলতে শুরু করলে ডাঁই করা মালপত্তরগুলো থেকে যার যার জিনিস তাকে ফেরত দেওয়া হলো।

মধুপুর ছেড়ে ট্রেন থামল জগদীশপুরে। তারপর মহেশমুন্ডায়। তারও পরে আলো ফোটার সংগে সংগেই গিরিডিতে। স্টেশনের নাম অবশ্য গিরিডি নয়। গিরিডিহি।

ওরা প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে যেই না রাস্তায় নেমেছে অমনি ফুটফুটে সুন্দর এক কিশোরী বেণী দুলিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাচ্চু বিচ্ছুকে। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা প্ল্যাটফরম থেকে বেরোতে এত দেরি করলে কেন বাবলুদা? আমি তো ভাবলাম বুঝি এলেই না।

বাবলু হেসে বলল—একে তোমার জন্মদিন, তার ওপর তুমি যেভাবে টিকিটের ব্যবস্থা করে নেমন্তন্ন জানিয়েছ তাতে কি না এসে থাকতে পারি?

বাবলুদের সংগে চিনুমামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কানন একটু অবাক হয়ে বলল—এঁর পরিচয় পেলাম না তো বাবলুদা? ইনি কি তোমাদের সংগে এসেছেন?

বাবলু বলল—ও: হো:।কানন, তোমার সংগে তো এঁর পরিচয়ই করিয়ে দেওয়া হয়নি। উনি আমাদের চিনুমামা। আমাদের সকলের এবং তোমারও। খুব মজার লোক। চাঁইবাসায় থাকেন। আমাদের সংগে জোর করে টেনে এনেছি তোমাদের এখানে।

পঞ্চু এতক্ষণ একটু একা একা বোধ করছিল ওর সংগে কেউ কথা বলছিল না বলে। এবার কানন ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই একেবারে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল পঞ্চু।

বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল সকলের। বাড়ি তো নয় যেন একটা রাজপ্রাসাদ। সামনে ফুলের বাগান। আর বাড়ির পিছনে উঁচু পাঁচিল ঘেরা জমিতে ফলের বাগান। তাদের মধ্যে ধবধবে সাদা গুঁড়ির বিশাল কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছ।

কাননের বাবা ধূর্জটিবাবু বাড়িতেই ছিলেন। বাবলুরা যেতে খুব খুশি হলেন তিনি। বললেন—এসো বাবা এসো। আজ তোমাদের বোনের জন্মদিন। ওর খুব ইচ্ছে তোমরা আসো।

কানন চিনুমামার সংগে ওর বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওদের সকলকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল—এই ঘর তোমাদের। পছন্দ তো?

বাড়ির চাকর দয়ালদাও সংগে ছিল। বলল— না পছন্দ হলে অন্য ঘরও দেখাতে পারি।

বাবলুরা সবাই বলল—এমন সুন্দর ঘর পছন্দ হবে না মানে? এই ঘরেই আমরা থাকব।

বাবলুরা ঘরে মালপত্তর রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল।

রসিক চিনুমামা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে গান গাইতে লাগলেন। আর পঞ্চু করল কি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। একটু পরেই পঞ্চু ছাদ থেকে নেমে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে শুরু করল টানাটানি। কি ব্যাপার! হলো কি পঞ্চুর?

কানন বলল—ও কি কিছু দেখেছে?

বাবলু বলল—মনে হয়। না হলে এমন তো ও করে না।

সবাই তখন পঞ্চুর সংগ নিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চু দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগল—ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।আর তারপরই কুঁই কুঁই করে আনন্দে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বাবলুরা ওপরে উঠেই অবাক। দেখল চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেন ঢেউ খেলে গেছে। কি চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার! অথচ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যখন ওরা শহরের ওপর দিয়ে এসেছিল তখন কিন্তু মনে হয়েছিল এটা পাহাড়ী এলাকাই নয়। সমতল একটা জায়গা। দেওঘরের মতো। কিন্তু এইসব বড় বড় পাহাড়ের আড়ালে অমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা কে জানত?

বাবলু বলল—বুঝেছি। আসলে এই চোখ-জুড়ানো দৃশ্য দেখেই পঞ্চুবাবুর এত আনন্দ এবং সেইজন্য আমাদের সকলকে ডেকে আনল এখানে। আচ্ছা, ঐ যে পাহাড়টা, ওখানে

যাওয়া যায় না?

কানন বলল—কেন যাবে না? ওটার পাশ দিয়েই তো তোমরা ট্রেনে করে এলে। ঐ পাহাড়টার নাম খাণ্ডুলি। উশ্রী নদীর ওপারে সাড়ে চার মাইল দূরে। আর ঐ যে পাহাড় দেখছো, ওর নাম কৃশ্চান হিল। কত মিশ্রী পাথর আমি কুড়িয়ে আনতাম ওখান থেকে। আর ঐদিকে যে পিচ রাস্তাটা চলে গেছে ওটা গেছে পচম্বায়। খুব নামকরা জায়গা। গিরিডিরই একটা অংশ ঐ পচম্বা। ওখান থেকে একটু দূরে একটা নদী আছে। তার নাম শ্লেট নদী। শ্লেট পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা। আগে এখানকার বেশির ভাগ বাড়ির ছাদই শ্লেট পাথর দিয়ে তৈরি হতো।

বাচ্চু বলল—আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে না?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। এখানে দেখার জায়গা এত বেশি যে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ করতে পারবে না। হাজারিবাগের পথে মাইল পাঁচেক গেলে পরে জোড়া পাহাড়। মার্চ এপ্রিলে ওখানকার পলাশ মাদার আর শিমুল বন লালে লাল হয়ে যায়। আরো কিছুদূর গেলে পাবে সাতঘুন্টি।

—সাতঘুন্টি! মানে কোনো পাহাড়ের নাম নাকি?

—হ্যাঁ। শুধু খাড়াই উঠতেই সাতটা পাকদন্ডী। এরপর আরো কিছু দূরে আছে পরেশনাথ পাহাড়। তোপচাঁচি লেক। আবার এদিকে পচম্বা ছাড়িয়ে গেলে বরাকর নদী। বরাকরের বালিয়াড়ি রঙ-বেরঙের পাথরে ভরা। পাথরের ফাটলে নানান রঙের শিরা। ঐ পথেই কোডারমা। মানে যেখানে বিখ্যাত অভ্রের খনি। এই অভ্রের জন্যই আজকের গিরিডির সমৃদ্ধি। গিরিডির শ্রমিকরা পাতলা পাতলা করে অভ্র চিরতে খুব ওস্তাদ।

এমন সময় নিচে থেকে দয়ালদা ডাকল—দিদিমণি, ও দিদিমণি। বাবুদের সবাইকে পাঠিয়ে দাও। জলখাবার দিয়েছি।

কানন বলল—চলো সবাই। আসুন মামা।

ওরা দোতলায় এসে দেখল ডিশ ভর্তি সিংগাড়া, কচুরি, রাজভোগ আর প্যাঁড়া থরে থরে সাজানো। মোট ছ' জায়গায়। তার মানে ওরা পাঁচজন এবং চিনুমামার।

কানন বলল—একি! পঞ্চুর প্লেট কই?

দয়ালদা বলল—পঞ্চু! পঞ্চু কে মা?

—আরে পঞ্চুকে জানো না? ঐ তো।

দয়ালদা জিভ কেটে বলল—এই রে! কুকুরটার কথা মনেই ছিল না আমার। এক্ষুণি ওরও খাবার নিয়ে আসছি।

কানন বলল—সকলকে যা যা দিয়েছ ওকেও তাই দিও। কম দিও না যেন। ও আমার ছোট ভাই।

বাবলু বলল—তা না হয় হলো। কিন্তু তোমার খাবার কই?

দয়ালদা বলল—আছে। দিদিমণিরও আছে। আপনারা বসুন।

বাবলুদের জলযোগ শেষ হলে কানন বলল—আজ আমার

জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধ্যার সময় প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে। বহু লোকজন আসবে বাড়িতে। কাজেই বিকেলে কোথাও বেরনো যাবে না। এখন চলো, তোমাদের কোলিয়ারি দেখিয়ে আনি।

বাবলু বলল—এখানে কোলিয়ারি আছে নাকি?

—হ্যাঁ। ঐ যে পাহাড়গুলো দেখলে ওর কোলেই।

বাবলুরা তৈরিই ছিল। তাই আনন্দে নেচে উঠল। কানন শুধু পাশের ঘরে গিয়ে পোশাকটা পাল্টে এলো। সাদা প্যান্ট আর নাইলনের লাল গেঞ্জিটা পরে হাসতে হাসতে ঘরে এসে বলল—চলো।

ওরা সবাই যখন যাবার জন্য প্রস্তুত, চিনুমামা তখন শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বললেন—আমার অত ঘোরার বাতিক নেই বাবা। তোরা যা। আমি একটু ঘুমোই। ঘুমে আমার দু'চোখ জুড়ে আসছে।

কানন বলল—বেশ তো। আমি তাহলে এদের নিয়েই যাই। তবে মামা আপনি আমাদের সংগে একটু এসে এখানকার কালীবাড়িটা দেখে যেতে পারেন।

চিনুমামা বললেন—কতদূর?

—কাছেই। আসুন না।

অতএব চিনুমামা চললেন।

যাবার সময় ধূর্জটিবাবু বললেন—যাও, আমাদের গিরিডির রাস্তাঘাট ঘুরে বেড়িয়ে এসো। এখানে কোনো ভয় নেই। খুব ভালো জায়গা। স্বাস্থ্যকর। এখানকার হজমী জলে খিদে বাড়ে। তারপর কাননকে বললেন, তুই নিজে গিয়ে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দে। তবে বেশি দূরে নিয়ে যাস না যেন। আর কাল যদি উশ্রী যাস তো রহমৎকে একবার পাঠিয়ে দিস আমার কাছে।

কানন বলল—ঠিক আছে।

গিরিডির পথঘাট সত্যিই চমৎকার। অনেকে বলেন নোংরা জায়গা। কিন্তু বাবলুদের তা বলে মনে হলো না। খানিক হেঁটে এসেই ওরা কালীবাড়িতে পৌছুল। ছোট্ট মন্দির। মেন রোডের ওপর।

মন্দিরে কালীর মূর্তি দর্শন হলে চিনুমামা বললেন—তোরা তাহলে কোলিয়ারি দেখতে যা। আমি ঘরে গিয়ে দয়ালদার হাতে এক কাপ চা খেয়ে শুই। একটু না ঘুমোলে শরীর ঝর-ঝরে হবে না।

একটি পরিচিত টাংগা দেখতে পেয়ে কানন ডাকল তাকে—রহমৎ! রহমৎ!

রহমৎ টাংগা নিয়ে এগিয়ে এসে বলল—কি দিদিমণি!

—তোমাকে বাবা একবার দেখা করতে বলেছেন। আজই, যখন হোক। আর আমার এই বন্ধুরা এসেছেন বেড়াতে। এদের নিয়ে চলো একবার বেনিয়াড়ী কয়লাখনি থেকে ঘুরে আসি।

—বেনিয়াড়ী! চলো। তা বন্ধুদের উশ্রী ফলস্ না দেখিয়ে বেনিয়াড়ী কেন?

—উশ্রী ফলস্ যাবো। তবে বন্ধুরা আজই এসেছেন তো। তাই ভাবছি কাল যাবো। বাবা ঐজন্যেই তোমাকে ডেকেছেন।

বাবলুরা সবাই টাংগায় উঠল।

টাংগা ছুটল টগবগ টগবগ। প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে বড় বড় অট্টালিকার পাশ দিয়ে ডানদিকে সংকটা মন্দির ও বাঁদিকে থানা ফেলে রেখে টাংগা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌছুল। সে কি পাহাড়ের সৌন্দর্য সেখানে! চারিদিকে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। ছোট বড় অগুনতি টিলা আর পাহাড়।

কানন বলল—এইটাই বেনিয়াড়ী খনি এলাকা। এর নাম ভাদুয়া। এই কোলিয়ারিটা ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের। এখানে কয়লা কোক করা হয়। কয়লার সংগে আরো অনেক জিনিস উৎপন্ন হয় এখানে। যেমন আলকাতরা, ন্যাপথলিন, সালফেট অব অ্যামোনিয়া, আরো কত কি!

এক জায়গায় টাংগা থামিয়ে ওরা একটি টিলার ওপর চড়-চড় করে উঠে গেল। তারপর সেখান থেকে নেমে উঠল আর এক টিলায়। এইভাবে দু'একটা টিলায় ওঠা-নামা করে ওরা নেমে এলো খনি এলাকায়। এখানে চারিদিকে রঙ-বেরঙের পাথর। আর তারই মাঝে মাঝে কালো কয়লার গভীর খাদ। ওরা সেই খাদের ধারে ধারে উঁচু-নিচু প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কত কুলি-কামিন খাদে নেমে কয়লা কাটছে। টাংগাটাকে বহু দূরে রেখে ওরা যখন একেবারে খনির অপর প্রান্তে চলে গেছে তখন হঠাৎ এক নির্জনে কি দেখে যেন গর্‌র্ গর্‌র্ করে উঠল পঞ্চু।

যেই না করা অমনি একটা ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন একটা পাথর ছুঁড়ে মারল পঞ্চুকে লক্ষ্য করে। পঞ্চু এক লাফে সেটার আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাল। তারপর হাউ হাউ করে সেদিকে ছুটে যেতেই দুজন লোককে রিভলভার হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল।

বাবলুরা চমকে উঠল। এরা তো সেই লোক। কাল রাতের তাড়া খাওয়া মারধোর খাওয়া এবং পঞ্চুর দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত সেই তিনজনের দুজন। ওদের দুজনকেই সশস্ত্র দেখে বাবলু পঞ্চুকে ডাকল—পঞ্চু! কাম ব্যাক।

বিপদ বুঝে পঞ্চু থেমে দাঁড়াল। না থামা ছাড়া উপায় নেই। এক্ষুণি গুলি করে দেবে ওরা।

লোক দুজনের মাথায় ব্যান্ডেজ। নাকে ও গালে লাল লিকো প্লাসটার করা। তারা বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঝোপের আড়াল থেকে। এখানে কি করছিল ওরা? ঝোপের আড়ালে ছায়ায় কচি কচি ঘাসের উপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল? হয়তো তাই হবে।

বাবলু তবুও ভয় না পাওয়ার ভংগিতে বলল—কি ব্যাপার! তোমাদের সংগে তো আরো একজন ছিল। সে কোথায়?

—ও মর চুকা। আভি তুম মরোগে।

লোক দুটি রিভলভার উঁচিয়ে ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কি বিচ্ছিরি সাপের মতো চাউনি। ওরা এগিয়ে আসতে লাগল আর বাবলুরা এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল। এ ছাড়া উপায়ই বা কি? পোশাক পালটানোর সময় বাবলু ওর পিস্তলটা কাননের বাড়িতেই ফেলে রেখে এসেছে। ওটা যদি কাছে থাকত তাহলে খেলা দেখাত বাছাধনদের।

ওদের ভেতর থেকে একজন হিংস্র গলায় বলল—চুপচাপ খাড়া রহো। হটো মাৎ।

বাবলুরা থেমে পড়ল।

ওদের একজন করল কি রিভলভারটা পকেটে রেখে ওদের খুব কাছের দিকে এগিয়ে এলো। তারপর কাননের গলার মূল্যবান হারটি খুলে নিতেই ম্যাজিক।

পঞ্চু কারো কোনো নির্দেশ পাবার আগেই 'আঁক' করেই লাফিয়ে উঠে রিভলভার ধরা লোকটির হাতটিকে কামড়ে ধরল। আর সেই সুযোগে বাবলুরা করল কি সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছিনতাইকারীর ওপর। বিলু সর্বাগ্রে তার পকেট থেকে বার করে নিল রিভলভারটা। তারপর সেটা বাবলুর হাতে দিতেই প্রাণের দায়ে ছোটা শুরু করল লোকটি।

বাবলুও রিভলভার উঁচিয়ে তাড়া করল তাকে—যাবি কোথায়? দে শীগগির হারটা। দে বলছি।

লোকটা কোনোরকমে হারটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আরো জোরে ছোটা শুরু করল। ততক্ষণে তার ওপর এলোপাথাড়ি পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু কানন কেউ আর বাদ নেই। সবাই হাতের কাছে যা পেল তাই ছুঁড়তে লাগল।

হঠাৎই ঘটে গেল অঘটন। লোকটি জোরে ছুটতে গিয়ে নুড়ি পাথরে পা হড়কে একেবারে হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ল

আপনার এই অবস্থা কি করে হল দয়ালদা?

পরিত্যক্ত এক অতলস্পর্শী খাদে। কয়েকজন লোক ওদের কাছেও এগিয়ে এলো। বাবলু সব কথা বলল সকলকে।

আর একজন লোক, মানে পঞ্চু যার হাত কামড়ে ধরেছিল সে তখনো সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে না থাকা

ছাড়া উপায় তো নেই। কেননা বাবলু না বলা পর্যন্ত পঞ্চু ওর হাত ছাড়বে না।

বাবলু বলল—পঞ্চু, ওকে ছেড়ে দে এবার।

পঞ্চু ছেড়ে দেবার সংগে সংগেই লোকটি ধুপ করে বসে পড়ল। ওর হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ল সেখানেই।

শ্রমিকের দল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল—আরে বাবা। এ তো পহেলা নম্বরকা ডাকু হ্যায়। পুলিশ মে ভেজ দো বদমাশ কো।

দু'একজন শ্রমিক চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো এই লোকটিকে তারা আগে থেকেই চেনে।

বাবলুরাও আর দেরি না করে বাড়ি ফিরে এলো। তবে ফেরবার সময় ওরা কোথাও কোনো বাধা না পেলেও বেশ বুঝতে পারল একজন ভয়ংকর দর্শন লোক মোটর বাইক নিয়ে ওদের অনুসরণ করছে।

ঘরে ফিরে ধূর্জটিবাবুকে সব কথা বলতেই ধূর্জটিবাবু বললেন—দেখো বাবা, তোমরা ছেলেমানুষ। কিন্তু এখানকার এই গ্যাঙটা বড় ডেঞ্জারাস। এরা চুরি ডাকাতি রাহাজানি কি না করে? প্রথমতঃ রাতের অন্ধকারে ট্রেনের কামরা থেকে মালপত্তর চুরি এবং দ্বিতীয়তঃ এই কয়লার চোরা কাটরার কাজ দুই-ই করে—এই ব্যবসায় ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে কত লোক। এরা সেই দলের। কাজেই স্টেশনে যে গণধোলাই হয়েছে এবং তাতে যে ওদের একজন লোক মারা গেছে এবং এই খাদে পড়ে আর একজনের ঐ নৃশংস মৃত্যু—এর বদলা কিন্তু ওরা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনার পর তোমাদের আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক নয়।

কানন দুঃখের সংগে বলল—কি বলছো তুমি বাবা? তার মানে ওরা চলে যাবে?

—হ্যাঁ মা। ওদের নিরাপত্তার জন্যই বলছি। আজ রাত্তিরটা থেকে কালই ভোরে চলে যাবে ওরা। তবে ট্রেনে নয়। আমি মোটরের ব্যবস্থা করছি। তাইতে চেপে শেষ রাতের অন্ধকারে ধানবাদ গিয়ে ট্রেন ধরবে ওরা। পরে এদের গ্যাঙটা ধরা পড়লে আবার আমি চিঠি লিখে বা নিজে গিয়ে নিয়ে আসব ওদের।

কানন বলল—কিন্তু......

—কোনো কিন্তু নয়। মোটর বাইকে চেপে পিছু নিয়ে ওরা যখন বাড়ি দেখে গেছে তখন কিছু একটা মতলব ওদের আছেই।

ঘটনাটা যে ভাবে মোড় নিল এবং ধূর্জটিবাবু যা আশংকা করছেন পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকে অমূলক বলে মনে করল না। কাজেই ওদের জন্য উনিও যাতে ব্যতিব্যস্ত না হন সেটাও তো একবার দেখা দরকার।

বাবলুরা দোতলায় উঠে দেখল চিনুমামা তখনও নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবলুরা সবাই মিলে ডেকে তুলল চিনুমামাকে। তারপর ছাদে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। ঠিক করল, কাল ভোরে ওদের ধানবাদ চলে যেতে হলেও ধানবাদ থেকে আবার ফিরে আসবে ওরা। এবং এখানকার রাজঘরিয়া ধর্মশালায় উঠে রীতিমতো পিছনে লাগবে ঐ দুষ্ট চক্রের।

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন দলে দলে অতিথিরা এসে ভরিয়ে তুলল কাননদের বাড়ি তখন রীতিমতো একটা উৎসব লেগে গেল। দুপুরের পর থেকেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা এসে লাল নীল টুনির মালায় সাজিয়ে দিল গোটা বাড়ি। সন্ধ্যায় আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল চারিদিক।

অতিথিতে ঘর ভরে উঠল।

খাবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাদের ওপর তারা গাড়ি ভর্তি খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন খুব কম করেও শ'খানেক লোক। এদের অধিকাংশই বাঙালী।

কাননকে ওর বান্ধবীরা মনের মতো করে সাজিয়ে দিল। যেন বিয়ের কনে।

কত উপহার উপঢৌকন যে পেল কানন তা বলবার নয়! পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওর জন্য একটি সোনার লকেট এনেছিল। তাইতে লেখা ছিল 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। বিচ্ছু সেটি আদর করে পরিয়ে দিল কাননের গলায়।

এর পর এখানকার এক ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সূরজমল আগরওয়ালা দিলেন একটি হীরের নেকলেস।

যাই হোক, সমস্ত অতিথি অভ্যাগতরা যখন কাননকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে তখন হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। লোডশেডিং? না। তা যদি হতো তাহলে বাইরের সর্বত্র আলো জ্বলত না। শুরু হলো কোলাহল। এবং সেই অন্ধকারে সবাই যে যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো যখন জ্বলল তখন দেখা গেল সবাই যে যার নিজ নিজ জায়গাতেই আছে। শুধু যাকে ঘিরে এই উৎসব, সেই কাননই নেই।

ধূর্জটিবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন—এমন হবে আমি জানতাম। এ আমার কি সর্বনাশ হলো! আর কি আমার মাকে আমি ফিরে পাবো?

কি ভাবে যে কি হয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ। কোনো চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই। শুধু নিঃশব্দে অপসারণ। তার মানে অতিথিরা ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল অথবা ধারে-কাছেই কেউ ওৎ পেতে ছিল। যেন সুইচ অফ করে কাননকে নিয়ে গেল ওরা।

এমন সময় দয়ালদা ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই বলল—পারলাম না বাবু, দিদিমণিকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমার দিদিমণিকে নিয়ে মোটর বাইকে চেপে চলে গেল একটা লোক।

মোটর বাইক? এ তো তাহলে সেই লোক। যে সকালে বেনিয়াড়ী থেকে ফলো করেছিল। ও-মুখ তো চেনা। কাজেই তাকে খুঁজে বার করতে তো অসুবিধে হবে না।

বাবলুরা দেখল দয়ালদার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাবলু জিজ্ঞেস করল—কিন্তু তোমার এই অবস্থা কি করে হলো দয়ালদা?

—ওরা আমার মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে পালাল।

—ওরা ক'জন ছিল বলতে পারো?

—একজন তো দিদিমণিকে নিয়ে গেল। আর দু'জন লুকিয়েছিল অন্ধকারে। আমাকে ঘা মেরেই পালাল।

বাবলু বলল—চিনুমামা, আপনি দয়ালদাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় চলে যান। আমি এক্ষুণি আসছি।

ধূর্জটিবাবু বললেন—না না। তুমি যেও না। কোথায় যাবে তুমি? আমার যা হবার হয়েছে। তাই বলে তোমাকে ছাড়তে পারি না। কারণ ওদের আসল টারগেট তুমি।

বাবলু বলল—আপনি আমার জন্যে ভাববেন না। আমি চুপচাপ বসে থাকবার ছেলে নই কাকাবাবু। তারপর বিলুকে বলল, বিলু, তুই আমার সংগে আয়। পঞ্চুও থাকবে আমাদের সংগে। পঞ্চু! পঞ্চু! ...

কিন্তু কোথায় পঞ্চু? বার বার ডেকেও পঞ্চুর কোনো সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

অতএব পিস্তলটা সংগে নিয়ে বাধ্য হয়েই বিলুসহ পথে নামল বাবলু। বেনিয়াড়ীতে যাবার সময় থানাটা কোনখানে তা একনজরে দেখে নিয়েছিল।কাজেই সোজা বিলুকে নিয়ে এগিয়ে চলল থানার দিকে।

কিন্তু থানার কাছাকাছি যেই না এসেছে ওরা, অমনি এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ। চারিদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাবলু বিলু কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল কয়েকটি বজ্রবাহু ওদের শক্ত করে টিপে ধরে নিমেষের মধ্যে হাত মুখ বেঁধে তুলে নিল একটি মোটরে।

ওরা দুজনে বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু যখন বুঝল কোনো উপায়ই আর নেই তখন নীরবে আত্মসমর্পণ করল ওরা। ওদের দুজনকে সিটের নিচে শুইয়ে প্রায় পাঁচ সাতজন লোক গাড়িতে উঠে পা দিয়ে শক্ত করে টিপে রইল ওদের। মোটর রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

অনেকক্ষণ চলার পর এক জায়গায় এসে থামল গাড়িটা।বাবলুরা অনুমানে বুঝল একটা গভীর জংগলের মধ্যে চলে এসেছে ওরা। কাছে বা দূরে কোথাও কোনো ঝর্ণা আছে। তারই ক্ষীণ ছরছর শব্দ কানে আসছে ওদের। লোকগুলো সেই জংগলের ভেতর দিয়ে ওদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

বাবলু বিলু দুজনেই চতুর। ওরা বুঝল এই রকম অবস্থায় অযথা ধস্তাধস্তি না করে নীরবে আত্মসমর্পণ করাই ভালো। তাই চুপচাপ ওদের অনুগামী হলো ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার পর জংগলের মধ্যে একটি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট চালাঘরে ওদের আটকে রাখল ওরা। তারপর একজনকে পাহারায় রেখে চলে গেল।

বাবলু ও বিলু বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করল। এটা যেন এক মারাত্মক কয়েদখানা। জংগলের এই ঝোপড়ি ঘরে সাপখোপও থাকতে পারে। তাছাড়া প্রচন্ড মশার কামড়ে দু'এক মিনিটেই যেন অস্থির হয়ে উঠল ওরা। এই ঘর দেখে মনে হলো কাঠুরেরা জংগলে কাঠ কাটতে এসে দুপুরবেলা এখানে বিশ্রাম করে।

বাবলু বলল—হলো ভালো। এ কোন খপ্পরে পড়লাম রে বিলু!

বিলু বলল—আর ভালো লাগে না। দু'দিন কোথায় ঘুরবো বেড়াবো। তার জায়গায় একি গেরো বল দেখি?

বাবলু বলল—আমার চিন্তা হচ্ছে কাননের জন্য।

—রাখ তোর কানন। এখন নিজেরা কি করে বাঁচবো তাই দেখ।

—ও কথা বলিস না রে বিলু। একবার ভেবে দেখ দিকিনি, কাননের বিপদ স্রেফ আমাদের জন্যে নয় কি? আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, কাননকে নিয়ে গিয়ে ওরা কোথায় রাখল? এদের কি আরো অনেক ঘাঁটি আছে? হয়তো হবে। এখন একটা মতলব বার কর।

—কি মতলব?

—কি ভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

বিলু বলল—আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।

বাবলু বলল—এক কাজ কর, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে তোর কাছে যাই। তুই চেষ্টা কর কোনো রকমে আমার বাঁধনটা খুলতে।

—কি করে খুলবো? হাত তো পিছমোড়া করে বাঁধা।

—তাহলে আমি ঘুরে শুই। তুই গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিকে আয়। আমি ঠিক খুলে দেবো।

বিলু তাই করল। সেই অন্ধকারে অনুমানে ভর করে গড়িয়ে গড়িয়ে বাবলুর কাছে এলো। বাবলু ঠিক কায়দা করে খুলে দিল বাঁধনটা। বাঁধনমুক্ত হতে বিলু নিজেই এবার পায়ের বাঁধন খুলে মুক্ত করল বাবলুকে।

মুক্ত হয়ে বাবলু বলল—দেখ বিলু, এরা আমাদের এই জংগলে সাময়িকভাবে আটকে রাখলেও এটা কিন্তু এদের আসল ঘাঁটি নয়।এদের আসল ঘাঁটি যেখানে কাননকে ঠিক সেখানেই নিয়ে গেছে এরা।

—কিন্তু সেটা কোথায় এবং কিভাবে আমরা যাবো?

—তা জানি না। তবে আগে এই বন্দীশালা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। তারপর দেখছি কি করে কি করা যায়।

ওরা সেই ঝোপড়ি ঘরের আগলটার কাছে এসে অনেক টানাটানি করল সেটাকে খোলবার জন্য। কিন্তু না। বৃথাই চেষ্টা। কিছুতেই কিছু করা গেল না।

বাবলু আর বিলু তখন অভিনয়ের ভঙ্গিতে কান্নার সুরে বিকট চিৎকার করতে লাগল। এতেই কাজ হলো এবার। যে লোকটি পাহারায় ছিল সে ছুটে এলো—এই, চিল্লাও মাৎ।

বাবলু আর বিলু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে বলল—চেল্লাচ্ছি কি সাধে? আমার হাতে একটা দু ভরি সোনার পদক ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছি না। একটু আগেও ছিল। এই অন্ধকারে কোথায় পড়ে গেল সেটা?

—তাই নাকি?

বিলু বলল—হ্যাঁ। আমার হাতে সোনার ঘড়ি ছিল। সেটাও খুলে গেছে।

বাবলু বলল—শুধু তাই নয়। এত জোরে তোমরা বেঁধেছো আমাদের যে হাতের সোনার আংটিগুলো পর্যন্ত আঙুলে গেঁথে গেছে। জ্বালা জ্বালা করছে সব।

লোকটি বলল—আর ঘন্টাখানেক বাদেই তো তোদের দু'জনকে ঝর্ণার ধারে রেখে আসব আমরা। তখন জ্যান্ত বাঘের পেটে যাবি তোরা। তা ঘড়ি আংটি পদক নিয়ে করবি কি? ওগুলো আমাকেই দে। বলে লোকটা টর্চ নিয়ে যেই না আগল খুলে ভেতরে ঢুকল অমনি বাবলু ও বিলু বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। বাবলু পিস্তলের নল দিয়ে লোকটার মাথায় দু'ঘা দিতেই 'মর গয়া, বাপরে' বলে বসে পড়ল সেখানে। সেই সুযোগে ওরা দু'জনেই বাইরে বেরিয়ে আগলটা শক্ত করে এমন করে এঁটে দিল যে হাজার চেষ্টা করেও যাতে ও বাইরে না বেরোতে পারে। ওর দলের লোকেরা এসে যখন মুক্তি দেবে ওকে তখনই মুক্তি পাবে ও।

বাবলুরা ঐখান থেকে বেরিয়ে এসেই জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল।

বিলু বলল—এই যাঃ! খুব ভুল হয়ে গেল রে বাবলু।

—কি হলো?

—লোকটার হাতে একটা টর্চ ছিল না? সেটা নিয়ে পালিয়ে এলেই হতো। যাবি আর একবার?

—মাথা খারাপ? বিপদের ঝুঁকি কখনো নিজের থেকে নিবি না।

যাই হোক, ওরা কোন দিক দিয়ে যে এসেছিল কিছু ঠিক করতে না পেরে সোজা রাস্তা যেদিকে গেছে সেই দিক ধরেই ছুটতে লাগল। খানিক ছোটার পরই একটা হড়হড় শব্দের প্রবল বেগ কানে এলো ওদের। শব্দটা এত বেশি হতে লাগল যে কান পাতা দায় হলো।

ওরা একসময় ছোটা বন্ধ করে বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে একটু নিচের দিকে নামল। এখানটা পুরোপুরি পাহাড়ী এলাকা। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। একসময়ে বিস্তীর্ণ উপলাকীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল। দেখল এক খরস্রোতা নদী সেই প্রান্তরের উপর দিয়ে প্রবল বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে সশব্দে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।

বাবলু বলল—সম্ভবতঃ এইটাই উশ্রী ফলস্।

বিলু বলল—ঠিক বলেছিস। কিন্তু তা যদি হয় তাহলে তো আমরা গিরিডি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন এই বনে জঙ্গলে এইভাবে ঘুরে কি বাঘের পেটে যাবো শেষকালে?

হঠাৎ এক জায়গায় একটু আলো দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। এই ঘন বন জঙ্গল টিলা পাহাড়ের রাজত্বে আলো কোথা থেকে আসে?

বাবলু বলল—চল তো বিলু, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের ঘাঁটি ওটা।

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা নেই। তার ওপর সেই জ্যোছনা রাতের আরো মনোরম। শাল ও মহুয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস এখানে ভরে আছে। ওরা ছিল নদীগর্ভের উপরাংশে। এইখান দিয়ে প্রবল বেগে ঝর্ণাটা জলপ্রপাতের মতো নিচে নামছে। অজস্র জলকণাগুলি মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ার কুন্ডলী। ঝর্ণার এখানে অনেকগুলি ধারা। তবে প্রধান তিনটি। বাঁদিকেরটি সবচেয়ে ছোট। তারপর মাঝারি। তারপরে সবার বড়। ওরা বড় বটগাছের ডাল ধরে নিচে নামতেই দেখল একটি প্রকান্ড কষ্টিপাথরের পাশে বড় একটি কুন্ডের মতো জায়গায় জল জমেছে। তার ঠিক পাশেই আছে একটি গুহা।

ওরা গুহার কাছে এসে যেই না এক ধাপ নেমেছে অমনি যা দেখল তাতে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। দেখল ছায়া ছায়া কালো কালো কারা যেন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

বাবলু চাপা গলায় বলল—বিলু, কিছু বুঝতে পারছিস?

—তা আর পারছি না? শয়তানরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে আমাদের।

—আরে তা না। ভালো করে চেয়ে দেখ।

বিলু সবিস্ময়ে দেখল কতকগুলো ভালুক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নদীতে জল খাচ্ছে। কেউ বা পাথরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর কেউ বা....। আরে! ওটা কি?

ওরা হঠাৎ দেখতে পেল একটা মোটর বাইক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পড়ে আছে এক জায়গায়। দু একটা ভালুকও সেখানে আছে।

বিলু বলল—সর্বনাশ। নিশ্চয়ই এটা সেই বাইক। যেটা কাননকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কেননা দিনমানে এই দুর্ঘটনা ঘটলে কারো নজরে পড়ত। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রান্তরে কে কাকে রক্ষা করে? এ সেই।

বাবলু বলল—তাহলে কানন কোথায়? পঞ্চু কই?

ওরা এক পাও না এগিয়ে চুপচাপ ঝর্ণার দিক ঘেঁষে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। এ ছাড়া উপায় কি? আর এগুনো যাবে না, পিছনোও না।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকার পর ভালুকগুলো এক এক করে চলে যেতেই ওরা দেখতে পেল পাথরের ফাঁকে ফাঁকে

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে একটা কুকুর ছুটতে ছুটতে এসে সেই মৃত লোকটিকে শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

বাবলু বলল—এ তো পঞ্চু। পঞ্চু এখানে কি করে এলো রে? তাহলে তো তোর অনুমানই ঠিক? বাবলু ডাকল—পঞ্চু!

পঞ্চু কান খাড়া করে একবার বাবলুর ডাক শুনল। তারপর এদিক ওদিক চঙমঙ করে তাকিয়ে ওদের দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ভৌ—উ—উ—উ।

বাবলু বলল—আমরা এখানে—এ—এ—এ।

এবার দেখতে পেল পঞ্চু। তারপর লাফাতে লাফাতে এসে ওদের প্যান্ট কামড়ে ধরে টানাটানি লাগাল। ওরা পঞ্চুর সঙ্গে একটু এগিয়েই দেখল মোটর বাইকটা যেখানে পড়েছিল তার একটু ওপরে এক জায়গায় ঢালের গায়ে বড় একটি পাথরের খাঁজে রক্তাক্ত কলেবরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কানন। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সে। ওরা দুজনে ছুটে গিয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বড় একটি পাথরের ওপর চিৎ করে শোয়াল। এই তো গা বেশ গরম। নিঃশ্বাসও পড়ছে। অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শুধু প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন। ভাগ্যে পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। না হলে ভালুকেই দিত শেষ করে।

কাননের কপালের ওপর মাথার কাছে একটা পাশ বেশ গভীর ভাবে কেটে গেছে। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে অনবরত। উপুড় হয়ে পড়ার জন্য নাকেও আঘাত লেগেছে। তাই নাক দিয়েও রক্ত ঝরছে খুব। গলায় ওদের দেওয়া সেই লকেট, আগরওয়ালার হীরের নেকলেস সবই ঠিক আছে। তার মানে ছিনতাই হবার আগেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এখন কি করা যায় ওকে নিয়ে? এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে তো কোথাও যাওয়া যায় না। অথচ ওর এখুনি চিকিৎসার প্রয়োজন।

বাবলু বলল—দেখ বিলু আপাততঃ কাননকে নিয়ে আমরা ঐ ঝর্ণার নিচের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই। না হলে এই রাতদুপুরে বাঘের পেটে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে। তারপর কাল সকালে যে কেউ গিয়ে বরং কোথাও থেকে একটা টাঙ্গা অথবা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করব।

বিলু বলল—কিন্তু বাবলু, ঐ গুহাই কি নিরাপদ? ঝর্ণার নিচে গুহা মানে যত রাজ্যের বিষাক্ত সাপ আর কাঁকড়াবিছের আড়ৎ।

বাবলু পিস্তলের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় দু'ঘা দিতেই—

–তাহলে ঐ যেখানে আলো জ্বলছে সেখানে যাবি?

–যদি ওটা শয়তানের ঘাঁটি হয়?

–ঠিক বলেছিস। দরকার নেই ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে আমার মতে ঐ গুহাই ভালো। যা আছে কপালে। চল তো।

কিন্তু চল বললেই তো চলা যায় না। অত বড় একটা মেয়েকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে যাবে কি করে? তবু যেতেই হবে। বিলু বহু কষ্টে কাননকে বাবলুর পিঠের ওপর শুইয়ে দিল। বাবলু ওকে পিঠে নিয়ে দুহাত শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল গুহার দিকে।

সবে কয়েক পা গেছে এমন সময় হঠাৎ ডোরাকাটা গেঞ্জি এবং ফুল প্যান্ট পরা কালো ভূতের মতো চেহারার চারজন লোক ধুপধাপ করে লাফিয়ে পড়ল ওদের সামনে। ওরা চারজনই সশস্ত্র। প্রত্যেকেরই হাতে রিভলভার।

ওরা বলল–ও, তুম সব হিঁয়া তক চলা আয়া!

বাবলু বলল–এলাম কি সাধে? মেয়েটাকে মেরে ফেলার সত্যিই কি কোনো দরকার ছিল?

–ও মর চুকা!

–মরবে না? অত উঁচু থেকে পড়লে তোমরাই কি বাঁচতে?

–লেকিন তুম দোনোনে হিঁয়া তক ক্যায়সে চলা আয়া?

–কেন, আমরা যেভাবে আসি? কৌশলে বাঁধন খুলে তোমাদের পাহারাদারকে লোভ দেখিয়ে ভেতরে এনে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে চলে এসেছি। এ তো আমাদের কাছে জল ভাত।

রিভলভারধারী লোকগুলো এবার অনেক কাছে এগিয়ে এলো ওদের। তারপর একজন কর্কশ গলায় বলল–উসকো রাখ দো মিট্টিমে।

বাবলু বলল–যা বাবাঃ এখানে মাটি কোথায়! পাথর তো।

–ওঁহী পর রাখখো।

বাবলু পাথরের ওপর কাননকে শুইয়ে দিতেই দুজন লোক রিভলভার পকেটে গুঁজে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল কাননকে। একজন বলল–আরে, এ তো জিন্দা হ্যায়। বলে ওর লকেট ও নেকলেস ছিনতাইয়ের কাজে মন দিল।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চু বাকি দুই রিভলভারধারীর ভয়ে কিছু করতে পারল না। একটু পিছিয়ে এসে বলল–ও বেঁচে আছে? তবে ভাই তোমরা যা নেবার নিয়ে দয়া করে ওকে একটু হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।

লোকগুলো হেসে বলল–হাঁ হাঁ জরুর করেগা। হামারা কাম হো জানে কা বাদ ও লেড়কিকো ফিক দেগা বাবড়ি (ঝর্ণা) মে। উসকে বাদ তুম দোনোকো ভি গিরায়গা ইস পাহাড়সে। ঔর মার ডালেগা ও কুত্তেকো।

ওদের কথা শেষ হবার সংগে সংগেই সেই পাহাড় ঝর্ণা ও বনভূমি কাঁপিয়ে দু'বার শব্দ হলো 'গুড়ুম গুড়ুম'। রিভলভারভারী লোক দুটো তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

বাকি দুজন লোক হতভম্ব হয়ে কাননকে ছেড়ে যেই না পকেটে হাত দিতে যাবে অমনি বিলু করল কি জোড়া পায়ে লাফিয়ে উঠে একজনের হাঁটুর পিছনে মারল এক লাথি। লোকটি পা মুচড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিচে। আর একজন চাপা আর্তনাদ করে সেখানে বসেই ছটফট করতে লাগল। তার আর রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। কেননা সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পঞ্চু কঠিনভাবে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে।

ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল। আসলে ওদের সংগে কথাবার্তার সময় বাবলু একটু পিছু হটে ওর পিস্তলটাকে কব্জা করে। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই পিছন দিক থেকে দড়াম্দুম চালিয়ে দেয়। লোক দুটি এই অভাবিত আক্রমণের জন্য মোটেই তৈরি ছিল না। কাজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ার সংগে সংগেই বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের রিভলভার দুটো ছিনিয়ে নিল।

পঞ্চু যার গলা কামড়েছে সে তখন পকেট হাতড়ে রিভলভার বার করার চেয়ে দু'হাতে পঞ্চুকে আঁকড়ে ধরে তার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। লোকটার চোখ দুটো অসম্ভব রকমের ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ টুঁটি কামড়ে থাকায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছে ওর। আর যে লোকটা বিলুর লাথি খেয়ে পড়ে গেছে সে এমনই আহত যে যতবার মাথা তুলে দাঁড়াতে যায় ততবারই পড়ে যায়। একসময় বহু কষ্টে যদিও বা সে পকেট হাতড়ে বার করল রিভলভারটা কিন্তু সেখানে সে মারবে কাকে? চারিদিকেই পাথরের দেওয়াল।

বাবলুরা আরো উঁচুতে । সেদিকে তার দৃষ্টি গেল না। আসলে ঐখান থেকে নিচে পড়লে সচরাচর কেউ বাঁচে না। যদিও বাঁচে তার আর করবারও কিছু থাকে না। কাজেই হাতের রিভলভার হাতেই রইল লোকটির। হাত এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে কিছুই করতে পারল না সে।

বাবলু ওপর থেকে নিচে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বলল–কি ভাই, রিভলভার তাগ করতে পারছ না?

লোকটি অতিকষ্টে বলল–নেহি।

–আচ্ছা দাঁড়াও। আমি ঠিক করে ধরিয়ে দিচ্ছি। তা কাকে মারতে হবে বলো?

লোকটি কি যেন বলতে গেল।

বাবলু বলল–বিলু, তুই এদিকটা দেখ। আমি ততক্ষণ কাননের একটা ব্যবস্থা করি। এই বলে কাননকে একবার পাঁজাকোলা করে তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বড্ড ভারী। অগত্যা আবার পিঠে করেই বহন করে নিয়ে চলে এলো ঝর্ণার কাছে। ঝর্ণার জলের ঠিক পাশেই একটি পাথরের ওপর শুইয়ে দিল ওকে। ঝর্ণার জলকণায় ওদের সর্বাংগ ভিজে সপ সপ করতে লাগল। তবুও বাবলু অঞ্জলি করে জল কাননের মাথায় কপালে দিতে লাগল। কত জ্বর তা কে জানে? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় কপালে জল দিলে

জ্বর একটু কমবে নিশ্চয়ই।

বাবলু এখন মরিয়া। কেননা ওর হাতে নিজের পিস্তল ছাড়াও চার চারটে রিভলভার।

এমন সময় হঠাৎ কতকগুলো লোকের দ্রুত ছুটে আসার শব্দ ওদের কানে এলো। বিলু সিটি দিয়ে বাবলুকে সতর্ক করেই চোখের পলকে বড় বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। বাবলুর হাতে শোভা পেতে লাগল পিস্তলটা। কাননকে ফেলে রেখেই লুকোতে হলো দুজনকে। প্রকাশ্য স্থানে কাননের অচৈতন্য দেহটা তেমনি শায়িত রইল।

ওরা দেখল জনা পাঁচেক সশস্ত্র লোক ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হলো। তারপর ঝুঁকে পড়ে একজন মৃত এবং তিনজন অর্ধমৃতের দিকে তাকাল। ওদের কাতর আর্তনাদে চারিদিক বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে এইখানে। আগন্তুকদের একজন বলল–আরে দোস্ত! তুম সবকো অ্যায়সা হাল কৌন বনায়া?

আহতদের ভেতর থেকে একজন অতিকষ্টে বলল–ভাগো হিঁয়াসে। জিনা চাও তো ভাগো।ঐ খতরনক লেড়কা আউ কুত্তানে অ্যায়সা হাল কর দিয়া হামারা।

আগন্তুকরা বলল–ও কাঁহা হ্যায়? পহলে বতাও। হাম মার ডালেগা উসকো।

–আরে বাবা ভাগো না। উসকো কুছ করনে নেহি শেখোগে তুম লোক।ও কুত্তা বহৎ ডেঞ্জারাস হ্যায়।

এই না শুনে তো একজন হাঃ হাঃ করে এমন হাসি হাসতে লাগল যে বিলু আর থাকতে না পেরে পটাং করে একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারল লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক। লোকটা করল কি ভ্রমরের মতো বোঁ বোঁ শব্দ করতে লাগল। বিলুর পাথরটা গিয়ে লেগেছে ওর হাঁ মুখে। কয়েকটা দাঁত ভেঙে নিয়ে সেটা মুখের ভেতর গলার কাছে আটকে গেল।

অন্যেরা তখন শিয়ালের মতো 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে তার দিকে ছুটে আসতেই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের একজনের ঘাড়ে। বাবলু আর বিলুও তখন মারমুখী। লোকগুলো ঘুরে দাঁড়াবার আগেই বাবলু পিস্তল নয়, ওদেরই রিভলভার দিয়ে পটাপট শুইয়ে দিয়েছে সব ক'টাকে।

বাবলুর গুলি অবশ্য ওদের পা ও কোমরেই লেগেছিল। তাই প্রাণে না মরে বসে পড়ে ছটপট করতে লাগল ওরা। গুলি করেই বাবলুরা আবার লুকলো পাথরের আড়ালে। কেননা ওরা তখনো সশস্ত্র।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন পঞ্চুকে লক্ষ্য করে গুলি করল। পঞ্চু বুঝতে পেরেই লাফিয়ে পড়ল পাশের খাদে। লোকটি যখন আবার ওকে গুলি করবার চেষ্টা করল, বাবলুকে তখন বাধ্য হয়ে আরো একটা গুলি খরচ করতে হলো।

বাবলু আড়াল থেকেই বলল–আমি তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যে যার হাতের অস্ত্রগুলো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দাও। না হলে কিন্তু আবার গুলি করতে বাধ্য হবো। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু আমি তোমাদের প্রত্যেককে দেখতে পাচ্ছি।

লোকগুলো একটুও দেরি না করে এক একবারে রিভলভারগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগল ওদের দিকে। বাবলু আর বিলু সেগুলো নিয়ে এক জায়গায় জড় করল।

বাবলু আবার কাননের কাছে গেল। সে তখনও সেই একই অবস্থায় শুয়ে আছে। বাবলু আবার গিয়ে ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই একসময় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল। বলল–আমি কোথায়?

–এই তো এখানে। এখানে আমি আছি, বিলু আছে। তোমার কোনো ভয় নেই কানন।

–কে বাবলুদা? এখানে এত জল কেন?

–আমরা উশ্রী নদীর ঝর্ণার কাছে আছি।

–কিন্তু তোমরা এখানে কি করে এলে?

–সে সব পরে বলব। এখন কেমন বোধ করছ তুমি?

–মাথায় খুব কষ্ট হচ্ছে। আর

–আর কি?

–সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। পঞ্চু কোথায়? ও ঠিক আছে তো?

–হ্যাঁ। আমরা সবাই ঠিক আছি।

কানন বলল–উঃ, সে কি ভয়ানক ব্যাপার! লোকটা যখন আমাকে টেনে হিঁচড়ে বাইকে তুলল পঞ্চু তখন কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে।

–কিন্তু এই দুর্ঘটনাটা ঘটল কি করে?

–পঞ্চু লোকটার ঘাড় কামড়ে ধরেছিল। ঐ অবস্থাতেও লোকটা এতদূর এনে যখন আর যন্ত্রণায় ঠিক রাখতে পারেনি নিজেকে তখনই ব্যালেন্স হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়।

বাবলু সস্নেহে বলল–কি ভাগ্যিস প্রাণে বেঁচে আছো তুমি! যাক, এখন কি একটু উঠে বসতে পারবে?

–পারব। বলে বহু কষ্টে একবার উঠে বসতে গেল কানন। তারপর আধবসা অবস্থাতেই আবার লুটিয়ে পড়ল।

বাবলু বলল–কি হলো কানন?

কানন আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। বাবলু ওকে সময়মতো ধরে ফেলল তাই রক্ষে। না হলে আবার আঘাত পেত।

বাবলু বলল–বিলু! যত কষ্টই হোক, কাননকে এখুনি চিকিৎসার জন্য বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। এক কাজ করি আয়, ওকে পিঠে নিয়েই একটু কষ্ট করে আমরা জঙ্গল পেরিয়ে কোনো গ্রামের দিকে যাই চল। তারপর সেখান থেকে একটা গরুর গাড়ি অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি নিয়ে যাবো ওকে।

বিলু বলল–কিন্তু তার আগেই তো আমরা বাঘ ভালুকের পেটে যাবো। তাছাড়া এই পাহাড়ী চড়াই পথে কাউকে বয়ে

নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাকি? তার চেয়ে তুই বরং ওকে দেখ। আমি পঞ্চুকে নিয়ে ঘুরে দেখি জঙ্গলের বাইরে কোথাও কিছু পাই কিনা? তোর কাছে তো এতগুলো রিভলভার আছে। নির্ভয়ে থাকবি তুই।

বাবলু বলল—না না না। তুই একা পঞ্চুকে নিয়ে যাবি কি? গেলে সবাই যাবো। জঙ্গলে কোথাও কিছু না পাই, মেন রোডে গিয়ে পড়তে পারলে তো দূরপাল্লার বাস ট্রাক সব কিছুই পেয়ে যাবো।

—কিন্তু মেন রোড কোথায় জানব কি করে?

—জানবার দরকার নেই। ঝর্ণার পাশ দিয়ে এই যে চওড়া রাস্তাটা উঁচুতে উঠে গেছে এটাই যে প্রধান পথ তাতে সন্দেহ নেই। অতএব এই পথে গেলেই ধানবাদ-গিরিডির মেন রোড পেয়ে যাবো আমরা।

বিলু বলল—তবে তাই চল। আমরা দুজনে বরং পাল্টা-পাল্টি করে বয়ে নিয়ে যাবো ওকে। কিন্তু ঐ লোকগুলোর কি হবে?

—কি আর হবে? বাঘ-ভালুকের খাদ্য হবে সব। আর যদি বেঁচে যায় তো কাল পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে।

বাবলু বলল—বিলু, তোর হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু তবু বলছি একটু কষ্ট করে তুই ওকে নে। আমি রিভলভার উঁচিয়ে এগোতে থাকি। বিপদ বুঝলেই ....।

বিলু অতিকষ্টে পিঠে নিল কাননকে। যেতে যেতে পা টলতে লাগল ওর। বলল—আর পারছি না রে বাবলু।

বাবলু বলল—না পারিস আমাকে দে। নিয়ে ওকে যেতেই হবে। কন্ডিশন খুব খারাপ।

নদী থেকে ওঠার পর পথটা অসম্ভব চড়াই। দুপাশে পাহাড় জঙ্গল। মধ্যে পথ। বাবলু, বিলুর কাছ থেকে কাননকে নিয়ে উঠতে শুরু করল।

এমন সময় হঠাৎ দুটো জোরালো আলো ওদের গায়ের ওপর এসে পড়ল। একটা জিপ। জিপটা ব্রেক কষতেই চিনুমামার গলা শোনা গেল—ঐ তো। ঐ তো ওরা।

ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল—বাবলু! আমরা এসে গেছি।

বাবলু আর বিলু সবিস্ময়ে দেখল ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চু এবং চিনুমামা একদল পুলিশ নিয়ে ওদের খোঁজে এসেছেন এখানে। জিপের পিছনে পুলিশের একটি ভ্যানও আছে।

বাচ্চু, বিচ্চু এবং ভোম্বল ছুটে এসে বাবলুর পিঠ থেকে নামিয়ে নিল কাননকে। বলল—কাননের কি হয়েছে বাবলুদা?

—ও খুব আঘাত পেয়েছে। কিন্তু তোরা কি করে জানলি আমরা এখানে আছি?

চিনুমামা বললেন—তোদের ফিরতে দেরি দেখে থানায় যোগাযোগ করলাম। থানাতেও তখন সাজ সাজ রব। থানার সামনে থেকেই তো তোদের দুজনকে বোমা ফাটিয়ে তুলে নিয়ে যায় ওরা। তারপর পুলিশ আমাদের মুখে সব কথা শুনেই প্রথমে চলল বেনিয়াড়ী খনি এলাকায়। কিন্তু ওখানে কারো কোনো সন্ধান না পেয়ে শুরু হলো খোঁজখবর। দু'একজন দোকানদার বলল, একজন ভয়ঙ্কর চেহারার লোক মোটর বাইকে করে একটি মেয়েকে নিয়ে উশ্রীর দিকে মেন রোড ধরে গেছে। একটি কুকুরও খুব আঁচড় কামড় করছে বাইকের চালককে। আর একজন বলল, একটি মোটরও খুব দ্রুত গেছে ঐ পথে। তাতে বেশ কয়েকজন লোক ছিল। দেখে মনে হলো খুব বাজে লোক তারা। সেই সূত্র ধরেই আমরা এসেছি এখানে। অবশ্য পুলিশ ফোন করে আশপাশের সমস্ত থানায়, ধানবাদে, হাজারিবাগে সর্বত্র জানিয়ে দিয়েছে ঐ বাইক এবং মোটর গাড়িকে আটক করবার জন্য। তোদের যে এখানেই পেয়ে যাবো তা অবশ্য ভাবতেও পারিনি।

বাবলু পুলিশদের বলল—আপনারা এখুনি এই জিপে করে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। কেননা এক্ষুণি ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা না করালে কাননের ক্ষতি হবে। আর ঐ ভ্যান নিয়ে আপনারা ঝর্ণার কাছে চলে যান। জীবিত মৃত অনেক ডাকাতকে আপনারা দেখতে পাবেন। এইবার সরকারী নিয়মে তাদের যার প্রতি যেমন ব্যবহার করা উচিত তা করবেন। আর এই নিন। এগুলো আমরা আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।

—একি! এত রিভলভার তোমরা পেলে কোথায়? এতে পুলিশের খোয়া যাওয়া কয়েকটাও রয়েছে দেখছি।

—এগুলো কৌশলে আমরা ওদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি।

পুলিশের লোকেরা সেগুলো নিয়েই হৈ হৈ করে ছুটল ঝর্ণার দিকে। ভ্যানটাও গেল পিছু পিছু। শুধু জিপটা গেল না। জিপটা ওদের সকলকে নিয়ে ফিরে এলো বারগন্ডায় কাননদের বাড়িতে।

ওরা যখন ফিরে এলো তখন সবে ভোর হয়েছে। ধূর্জটিবাবু মেয়েকে ফিরে পেয়ে এবং বাবলুর মুখে সব শুনে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। একটু পরেই খবর পেয়ে ডাক্তার এলেন। তারপর ওষুধ ইনজেকশান দিতে সকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো কাননের।

কানন ফুলের মতো হাসি ছড়িয়ে বলল—সত্যি বাবলুদা, তুমি না থাকলে এ যাত্রা বাঁচতাম না।

বাবলু বলল—ভুল বললে কানন, পঞ্চু না থাকলে কিছুই হতো না।

পঞ্চু তখন চিনুমামার কোলে মাথা রেখে দু'চোখ পিটপিট করে সবাইকে দেখছে।

ছবি: দিলীপ দাস

জীও, ঔর জীনে দ্যো

বুদ্ধদেব গুহ

উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর শহর থেকে অল্প দূরেই বিন্ধ্যাচল গ্রাম। সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। বিন্ধ্যাচলও ছাড়িয়ে গিয়ে,পাহাড়ের একেবারে গায়ে শিউপুরা গ্রাম। তার পাশ দিয়ে গঙ্গামাঈ বয়ে গেছেন। গঙ্গার পাড়ে অনেক পুরোনো এক মস্ত বটগাছ। বটগাছের ডালে ডালে টিয়া আর চন্দনাদের সংসার। গাছের নিচে নৌকো বাঁধা থাকে সারা দুপুর। জোয়ারের সময় ঢেউ এসে ছলাৎ-ছলাৎ করে আদরের মৃদু থাপ্পড় মারে নৌকোর তলপেটে।

শিউপুরার ঠিক সামনে দিয়ে একটা পথ চলে গেছে। পীচ বাঁধানো। তার একদিকে পাহাড় আর বাজরা আর মকাইয়ের ক্ষেত। অন্যদিকে নদী। নদীর পাড়ে পাড়ে সর্ষে, সুরগুজা, কিতারি, মটর ছিম্মি আরও কত কী ফসলের ক্ষেত। সেই রাস্তাটি ধরে ডানদিকে গেলেই এলাহাবাদ। আর বাঁ-দিকে গেলে বেনারাস। দুইয়েরই দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো।

তখন স্কুলে পড়ি। ক্লাস সেভেন কী এইট হবে ঠিক মনে নেই। ছোট ভাইয়ের পেটের রোগ ভালো হবে বলে ডাঃ জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীর কথামতো পুজোর ছুটিতে আমরা শিউপুরায় গেছি বেড়াতে। ওখাননের জল পেটের পক্ষে খুবই ভালো। চমৎকার একটি দেওয়াল ঘেরা বাগানওয়ালা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন বাবা।

মাছ সেখানে তখন বেজায় সস্তা এবং নানারকম। দুধ-ঘিও ফারস্ট-ক্লাস। ছোট ভাইয়ের হজমের ক্ষমতা বেড়েছে কি বাড়েনি জানা নেই কিন্তু আমার ক্ষমতা সাংঘাতিক রকমই বেড়ে গেছে। জম্পেস করে খাই দাই আর বাবার দোনলা বন্দুকটি নিয়ে শিউপুরার সামনের সীমাহীন পাহাড়ের উপরের মালভূমির মতো মাইলের পর মাইল সমান, অল্প-অল্প জঙ্গলে ভরা জমিতে ঘুরে বেড়াতাম। উপত্যকাও ছিল। সবুজ নরম সকালের শিশিরে ভেজা, রোদের হরেক-রঙ লাগা স্বপ্নের মতো। নীল গাই আর ময়ূর চরে বেড়াতো তাতে, খরগোশ কান উঁচু করে দৌড়াতো এদিক ওদিক শিশিরে হীরে ছিটকে। তবে ঐ অঞ্চলে নীলগাই আর ময়ূর মারার জো়টি ছিল না কারো। কেউ তা মারলে মীর্জাপুরের ছফুটি সব লেঠেলরা তার মাথা আস্ত রাখতো না।

পাহাড়ের উপরে কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির ছিল। সাধুবাবারা তার সামনে ধুনি জ্বালিয়ে বসে পুজো-টুজো করতেন।

মা বলতেন, ওরে কাপালিকেরা ওখানে থাকে। ওদিকে একা একা যাস না কখনও।

বলতাম, একা তো যাই না। হাতে তো বন্দুক থাকেই। ভয় কিসের ?

মা বলতেন, এতটুকু ছেলে, কখখনো দুঃসাহস করবি না।

মা মানা করতেন বলেই হয়ত আমাকে ঐ সাধুবাবারা যেন বারবার অদৃশ্য হাতছানি দিতেন আমার যাতায়াতের পথে। দূর থেকে।

কোনো কোনো দিন পাহাড়ের গড়ানো ঢালে আমার চাষী-বন্ধু বাজীরাও-এর বজরা ক্ষেতে শূয়োর শিকারের জন্যে

যাওয়ার সময় দেখতে পেতাম লাল-লুঙি পরে একজন খুব বুড়ো সাধুবাবা বসে আছেন একা একা। মাথায় ঘোরতর লাল সিঁদুরের টিপ পরে, বুক ভর্তি চুল নিয়ে গাছতলার পাথরের উপর। কখনও বা পাহাড়ের উপর বড় বড় পাথরভরা জলপ্রপাতের কাছের গুহাতে যে এক জোড়া বিরাট চিতাবাঘ ছিল, তাদের খোঁজখবর করতে যাওয়ার পথে দেখতে পেতাম, অন্য সাধুবাবারা খেতে বসেছেন। অবাক লাগত দেখে! সাধুরাও আমাদের মতো খান, ঘুমোন?

ঐ পাহাড়ে চিঁকারা হরিণের একটি দল ছিল। চিংক, চিংক করে হাঁচির মতো আওয়াজ করে ডাকে ওরা। তাই ওদের নাম চিঁকারা! তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখে থাকবে। ছোট ছোট বাদামী ছাগলের মতো দেখতে। প্রচণ্ড জোরে দৌড়তে পারে। তাদের বন্দুকের পাল্লায় আনতে পারা বড়ই মুশকিল। রাইফেল থাকলে তাও হতো। অবশ্য যেদিন আমরা শিউপুরা থেকে কলকাতায় চলে আসি ঠিক তার আগের দিন একটি চিঁকারা শিকার করেছিলাম। বাবার থার্টি-ও-সিক্স রাইফেল দিয়ে। অনেক দূর থেকে পাহাড়ের উপর থেকে প্রায় চারশ গজ দূরে নিচের ঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে-যাওয়া হরিণটি মারতে পারাতে মনে আছে বাবা হ্যান্ড-শেক করেছিলেন।

আজ তোমাদের যে গল্প বলতে বসেছি, তা কিন্তু শিকারের গল্প নয়, স্বীকারের গল্প।

একদিন শেষবিকালে বন্দুক কাঁধে নিয়ে আমি যখন হেঁটে আসছি পাহাড়ের উপর দিয়ে শিউপুরার দিকে তখন সেই সাধুবাবা ডেকে বললেন, বেটা, শিকার খেলনেকা জ্যাগা নেহী মিলা ক্যা তুমকো? আজীব লেড়্‌কে হো তুম! জীওন দেনে শক্‌তে হো। যো জীওন লেনেমে বচপন্‌সেহিমে বাহাদুর বনে টইঁ?

আমি তখন বাপকো বেটা সিপাহিকা ঘোড়া কুছ নহী তো থোড়া থোড়া। কোনো জবাব না দিয়েই নেমে এলাম পাহাড় থেকে। মনে মনে বললাম, শিকার খেলায় কি মজা তা তুমি কী করে জানবে? দিল খুশ্‌ হো যাতা হ্যায়। সাচমুচ্‌।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তখন আমি শিকার-পাগল। ঐ সব গোলমেলে কথা-টথা একদমই ভালো লাগত না আমার। ঐ "জ্ঞান" দেওয়ার পর থেকে সাধুদের আখড়া দূরে রেখেই আড়াল আবডাল দিয়ে আমি দিনশেষে পাহাড় থেকে আধো অন্ধকারে নেমে আসতাম। কখনও শিকার-করা খরগোশ হাতে ঝুলিয়ে কখনও বা বাজীরাও-এর সঙ্গে বুনো শুয়োরের চার পা বেঁধে তার মধ্যে লাঠি ঢুকিয়ে তা ঘাড়ে করে

একদিন শেষ বিকেলে আমলকি বনে বনে চিঁকারার ঝাঁককে তাড়া করে করে ক্লান্ত হয়ে মালভূমির উপরের দিক থেকে

ফিরতেই দেরি হয়ে গেছিল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আসছি। সূর্যদেব গঙ্গার মধ্যে গলা অবধি ডুবিয়ে লালমুখ বের করে ইতিউতি চাইছেন। দেশলাইয়ের বাক্সের মতো রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে এলাহাবাদের দিকে। আজ বাড়ি ফিরতে রাতই হয়ে যাবে। খুবই বকুনি খাবো মায়ের কাছে। বাবা কিছু বলতেন না। বলতেন, ও কী খুকি নাকি? পুরুষ মানুষের ঘরবাড়ি বাড়ির বাইরেই হয়।

তা মাইল দেড়েক ছিল তখনও পাহাড় থেকে নিচে নামার রাস্তা। রাস্তা অনেকগুলোই ছিল নামার। তবে আমি রোজই নামতাম তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সুন্দর বাড়িটার পাশ দিয়ে। সে রাস্তাটিই চওড়া এবং ভালো। সোজা উঠলে কালি-কুঁয়োর দিকে পৌঁছে যেতো তা।

সেদিন সাধুদের আখড়ার কাছাকাছি পৌঁছতেই মনটা যেন কেমন করে উঠল। মায়ের ভাষায় "ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ" করা যাকে বলে। আবছা অন্ধকারও হয়ে গেছিল। পিঠের রাক্-স্যাক্ থেকে টর্চটা বের করলাম। বন্দুক কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিলাম। পাহাড়-নামার পথ তখনও অনেকই দূরে। কাঁধের গুলির ব্যাগ থেকে গুলি বের করে একটি এল-জি ও একটি বুলেট ভরলাম দুই ব্যারেলে। কেবলই মনে হতে লাগল কোনো হিংস্র জানোয়ার যেন আমাকে দেখছে খুব কাছ থেকে লুকিয়ে। জায়গাটা চাপা ও ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। মনে 'কু' ডাক দিল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে একটু হেঁটে গিয়েই বড় বড় পাথরের টিলামতো একটি উঁচু জায়গাতে উঠে দাঁড়ালাম, যাতে ভালো করে দেখতে পারি। বন্দুকটা রেডি করে উরু আর ডান হাতের মধ্যে ধরে বাঁ হাত দিয়ে আলো ফেলতে লাগলাম এদিকে ওদিকে টর্চ দিয়ে। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। আলোটা একবার গোল করে ঘুরিয়ে নিলাম বাঁ থেকে ডানে তারপর ডান থেকে বাঁয়ে। ঘোরানো শেষ হয়নি, হঠাৎ একজোড়া লাল বড় বড় চোখ জ্বলে উঠল সামনের ঝোপের মধ্যে। পরক্ষণেই চোখ দুটো সার্কাসের আগুনের খেলার মতো উপরে-নীচে, এদিকে-ওদিকে হতে লাগল। চিতাবাঘ। চোখের আকার দেখে তাই-ই মনে হলো। বাঘটার শরীর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। চিতাবাঘ কেন, এক শেয়াল আর হায়না ছাড়া ক্লাস সেভেনের শিকার-পাগল আমি তখনও কোনো মাংসাশী জানোয়ারই মারিনি। খুবই শখ হলো যে, আজ বাঘ মেরেই বাড়ি ফিরব। যা হবার তা হোক। বাবা হ্যান্ড-শেক করবেন।

টর্চটাকে জ্বেলে রেখে বাঁ হাত দিয়ে বন্দুকের ব্যারেলের সঙ্গে ঠেকিয়ে বন্দুক তুলে ডান হাতে শক্ত করে ধরে, ঘোরাতে লাগলাম। আবার পাওয়া গেল চোখ দুটিকে। এবারে একেবারে কাছে। ট্রিগার টানলাম। গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চোখজোড়া লাফিয়ে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আমি জানতাম না যে, চিতাবাঘের মতো চালাক জানোয়ার খুব কমই আছে। আর চিতাবাঘ বড়বাঘের মতো অত সহজে চোখ পাতে না আলোতে। ধূর্তচূড়ামণি চোখ নামিয়ে; মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চোখ কখন যদি বা পাতেও আলোতে তো সে চোখ পিট্‌পিট্ করে। এমন জোর হয়ে, স্থির হয়ে জ্বলে না তাদের চোখ কখনই রাতে এতক্ষণ ধরে।

কী হলো তা বোঝার জন্যে আলোটা আবার এদিক-ওদিক ফেলতেই আবারও একজোড়া চোখ। এবার ডানদিকে। খুবই কাছে।

ভাবলাম আমার হাত কি এতই খারাপ হয়ে গেল? অত কাছ থেকেও দু চোখের মাঝখানে গুলি লাগাতে পারলাম না? রাগ হলো খুব নিজের ওপর। আরেকবার চোখ-জোড়া দেখা যেতেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম, কিন্তু যখন গুলি করলাম ঠিক তার একমুহূর্ত আগেই আরেক জোড়া চোখ সেই চোখ-জোড়ার ডান পাশে ভেসে উঠল। দ্বিতীয়বার গুলি করেই ভয়ে আমার হাত-পা ঘেমে উঠল, মুখ শুকিয়ে এল।

মানুষের অভিজ্ঞতা যত কম থাকে, তার ভয়ও তত কম থাকে। যাকে ইংরেজীতে বলে "ব্লিসফুল ইগনোরেন্স"। আমার তখন সেই সুখকর অজ্ঞান অবস্থার দিন। তা নাহলে অত কাছ থেকে মাটিতে দাঁড়িয়ে আনাড়ি শিকারী হয়েও রাতের বেলা চিতাবাঘকে গুলি করতাম না। অভিজ্ঞতাজনিত ভয় যখন থাকে না তখনই কল্পনা-প্রসূত ভয়ের লম্বা-বেঁটে রোগা-মোটা ভূতেরা সব গিসগিস করে মাথায়। দ্বিতীয়বার

গুলি করার পর আবার আলো ফেলতেই একই সংগে পাশাপাশি দুজোড়া চোখ জ্বলে উঠল, জ্বলে উঠেই এদিক ওদিক হতে লাগল। তার মানে, একটা চিতাবাঘ নয়, একাধিক চিতাবাঘ। এবং আমার একটি গুলিও লাগেনি। পরক্ষণেই আমার চর্তুদিকে অনেক জোড়া চোখ জ্বলতে লাগল, ঘুরতে লাগল, উঠতে লাগল, নামতে লাগল, নিভতে লাগল। ক্রমাগত চোখগুলো সামনে শূন্য থেকে ঝুলতে লাগল জোড়ায়-জোড়ায় যদিও আমার সামনে কোনো বড় গাছ ছিল না, যেখান থেকে চিতাবাঘ উঠে আমাকে দেখতে পারে। আমি টর্চ নিভিয়ে দেবার পরও অন্ধকারেই চোখগুলো জ্বলতে লাগল চারদিকে। ভীষণই ভয় পেলাম আমি।

জংগলের জানোয়ারদের চোখ কখনও কখনও অন্ধকারেও জ্বলে, কারণ তারার আলোও তাদের চোখে এসে পড়ে, প্রতিফলিত হয়ে রাতের অন্ধকারেও তাদের চোখকে জ্বলজ্বল করায়। মাংসাশী জানোয়ারদের চোখের আলোর রঙ সাধারণত তৃণভোজীদের চোখের রঙ থেকে আলাদা হয়। লালচে।

এতক্ষণে নিজেকে বাঘ-শিকারীতে উন্নত করার কল্পনায় খুবই উত্তেজিত লাগছিল। কিন্তু ঐ শূন্যে জোড়া-জোড়া চোখ দেখে আমার হাত-পা সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে এল। একটু ভয়, বেশ ভয়; তারপর ভীষণ ভয়। আমার পকেটে যে-কটা গুলি ছিল সবকটা গুলিই এমনকি, পাখিমারার ছররাগুলো পর্যন্ত ঐ ভূতুড়ে অবয়বহীন জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখেদের দিকে তাক করে দমাদ্দম শেষ করে বন্দুকের দু'নলই খালি করে পাথরটার উপর বসে পড়লাম দুপা ছড়িয়ে। চোখগুলো যে চিতাবাঘেরই, সে বিষয়ে আমার নিজের কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ বাবার সংগে জংগলে গিয়ে আমি রাতে তার আগে অনেকবার চিতাবাঘের চোখ দেখেছি। তাছাড়া জলপ্রপাতের কাছের গুহাতে একজোড়া চিতাবাঘ যে ছিলই সে সম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কারণ, তাদের পায়ের দাগ, ময়লা
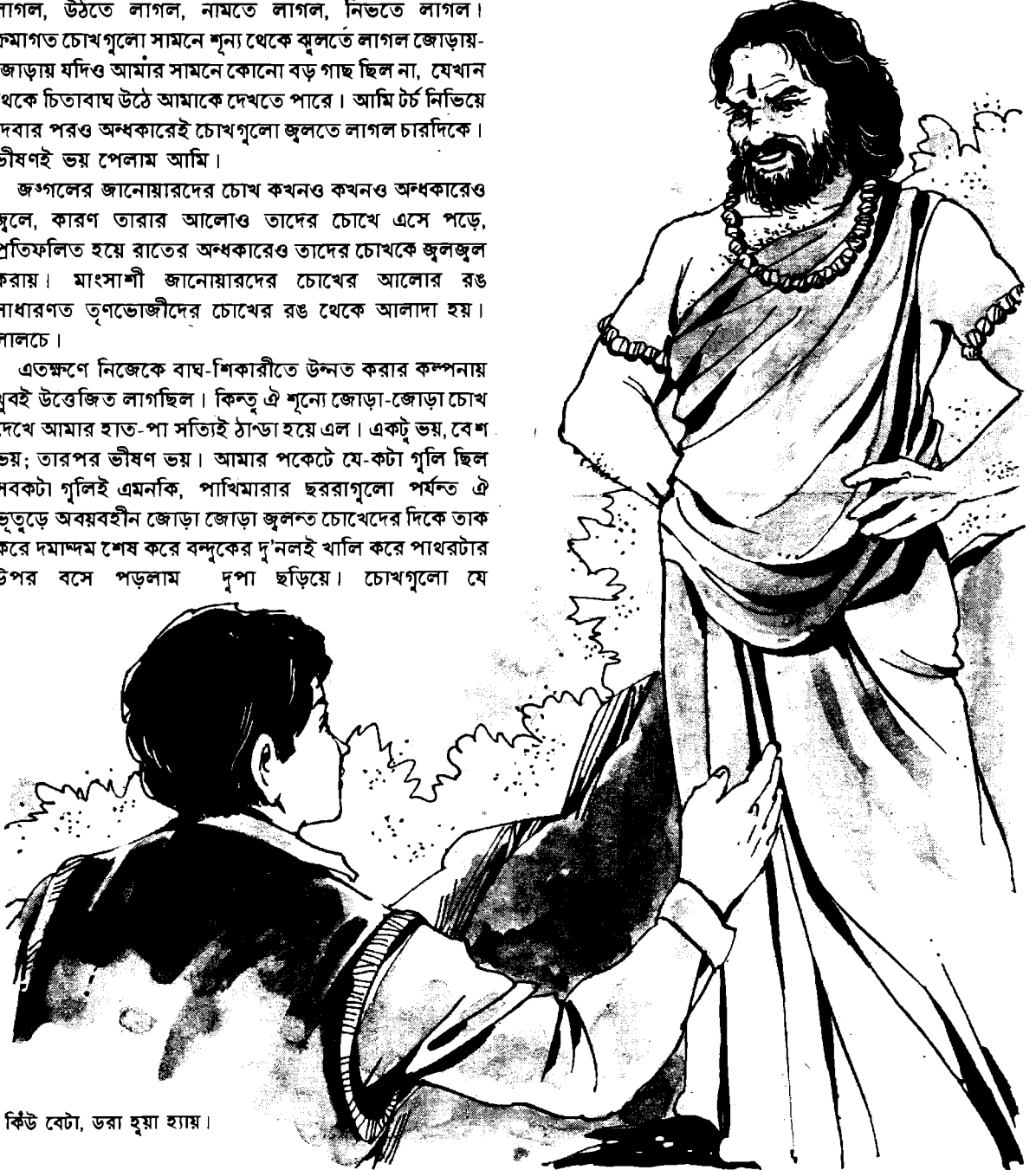
কিঁউ বেটা, ডরা হুয়া হ্যায়।

সবই আমি নিজের চোখে দেখেছি অনেক দিন এই মালভূমিতে।

ঘেমে নেয়ে আতঙ্কিত হয়ে গুলিশূন্য বন্দুক হাতে বসে আমার যখন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছিল ঠিক তক্ষুণি কে যেন সেই অন্ধকার জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমিকে খান্ খান্ করে বিকট অট্টহাসি হেসে উঠল। সেই হাসির দমকে দমকে গাছ-পালা বন-প্রান্তর যেন কাঁপতে লাগল। আমি বোধ হয় অজ্ঞানই হয়েগেছিলাম মানসিক ক্লান্তিতে ভয়ে, উত্তেজনায়।

কে যেন এসে আমার হাত ধরল। মৃত-মানুষের মতো ঠান্ডা সেই হাত। হাত ধরে সে আমায় দাঁড় করালো টেনে। বন্দুকটা পাশের পাথরেই পড়ে রইল। টর্চও।

উঠে দাঁড়িয়েই দেখলাম সেই বৃদ্ধ সাধুবাবা! যিনি আমাকে শিকার করতে মানা করেছিলেন।

আশ্চর্য! অন্ধকারে তাঁর চোখ দুটিও জ্বলছিল। তবু, যে-চোখগুলি আমি কিছুক্ষণ আগেই দেখেছিলাম তা যে চিতাবাঘেরই চোখ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সাধুবাবা বললেন, কিঁউ বেটা। ডরা হুয়া হ্যায়?

আমি চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। বলতে গেলাম ভয় পাই না, পাইনি আমি। কিন্তু সে কথা গলার মধ্যেই গলে গেল।

সাধুবাবা আবারও দমকে দমকে হেসে উঠলেন।

বললেন, আও, চলো হামারা সাথ।

হঠাৎই আমার মায়ের সাবধানবাণী মনে পড়ল। কাপালিকরা ওখানে থাকে। ওখানে কক্ষণো যাবি না।

দৌড়ে পেছনে গিয়ে বন্দুকটা আর টর্চটা তুলে নিতে গেলাম।

সাধুবাবা আবারও হেসে উঠলেন।

—টোটা হ্যায় তুম্হারা পাস? ফেক্ দ্যে উও চিজ। বেকাম্‌কি!

তারপর বললেন, খয়ের। ঠিক্কে হ্যায়। চলো! তুম্হারা ইয়ে খেলোনাভি লেতে চলো উঠাকে। বলেই দোনলা বন্দুকটার দিকে দেখালেন।

ভাবছিলাম, এবার আমাকে বলি দেবেন ওঁরা এই জনমানবশূন্য মালভূমিতে। রাতের পাখি আর গাছেরা ছাড়া আর কেউই সাক্ষী থাকবে না।

যখন ওর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাতে এসে পৌঁছালাম, তখন আকাশ তারায় ভরে গেছে। মিষ্টি মিষ্টি হিম পড়ছে শরতের কৃষ্ণপক্ষের রাতে। নানা হরজাই গন্ধ উঠছে কার্তিকের রাতের গা থেকে। সামনে বিস্তৃত মালভূমি, গাছ-গাছালি; অন্ধকার।

সাধুবাবা, সামনের বিস্তীর্ণ মালভূমি আর তারা-ভরা আকাশের দিকে আঙুল তুলে আমাকে বললেন,দেখা, কিত্না শান্তি চারো তরফ্? বন্দুক তুমহারা, গঙ্গা মাঈকো দে দেনা। যাও—ঘর যাও বেটে। খুদ্ জীও, ঔর দুসরোকোভি জীনে দেও। গজব করো, মেরি ওয়াদেপে। গজব করো।

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

ছবির মজা
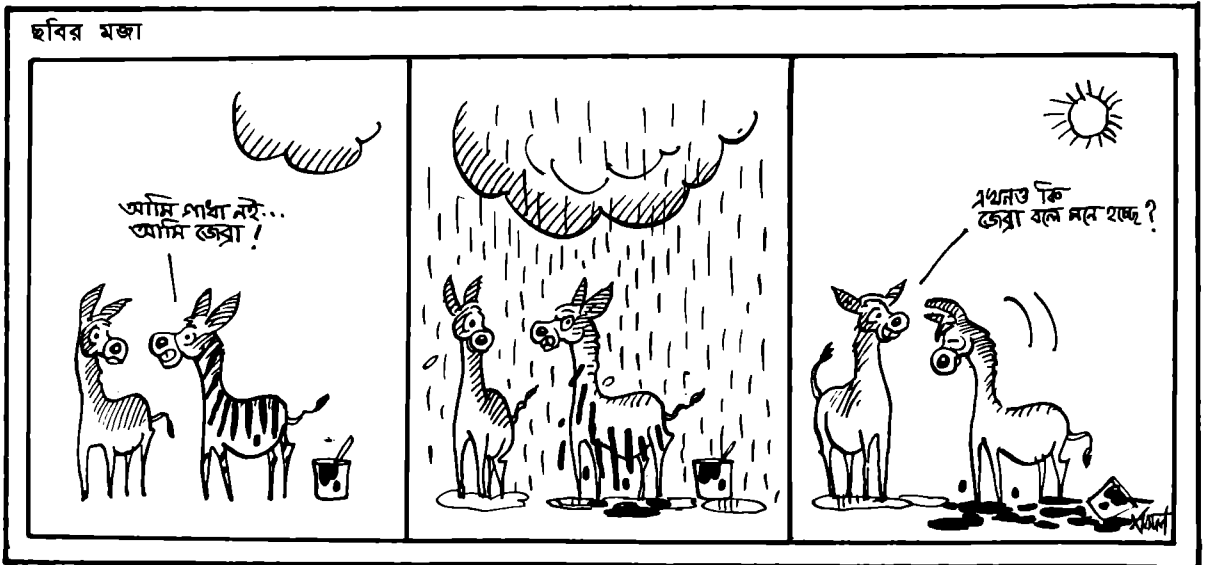
নন্দপুরে অঘটন

অজেয় রায়

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেসের এক অংশে বঙ্গবার্তার সম্পাদকের ছোট্ট অফিস ঘরে উঁকি দিল দীপক। সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তখন চেয়ারে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়েছিলেন। মাঝবয়সী দৃঢ়কায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। কপালে চিন্তার ভাঁজ। দীপককে দেখে তিনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'এস দীপক, তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

দীপক উল্টো দিকে চেয়ারে বসল।

দীপক রায় বঙ্গবার্তা কাগজের একজন রিপোর্টার। বছর পঁচিশ বয়স। ভবানী প্রেসের মালিক কুঞ্জবাবু বঙ্গবার্তা নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটি প্রকাশ করে লাভের মুখ মোটেই দেখেন না। তবু এই কাগজ চালাতে কুঞ্জবাবু এবং তাঁর বিনি মাইনের সাংবাদিকদের উৎসাহে কমতি নেই।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'কাছারিপট্টির ভোলানাথ সরকারকে চেন? প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন।'

দীপক বলল, 'দেখেছি। নাম শুনেছি। তবে আলাপ নেই।'

'হুম্। নন্দপুর গ্রাম কোথায় জান?'

'জানি। বোলপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে। ইলেমবাজার যাওয়ার পথে, বাস রাস্তার কাছে। বাঁ পাশে। একবার গেছলাম ওখানে।'

সামনের টেবিলে টোকা মারতে মারতে কুঞ্জবাবু বললেন, 'নন্দপুরের একটা ইন্টারেস্টিং খবর শুনলাম। গ্রামটায় ঘুরলে দেখতে পাবে কয়েকটা ছোট বড় পাকাবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বাড়িগুলোর ভিতরে আর চারপাশে জঙ্গল হয়ে গেছে। কেউ থাকে না। এর কারণ জান?'

'না।' দীপক ঘাড় নাড়ে।

'একটা স্যাড হিস্ট্রি আছে। প্রায় ষাট বছর আগে নন্দপুরে একবার ভয়ঙ্কর মড়ক লাগে। স্মল পক্স। মারাত্মক গুটি-বসন্ত। প্রায় উজাড় হয়ে যায় গাঁ। বেশির ভাগ লোক মারা

যায়। বাকিরা প্রাণভয়ে পালায়। বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। খাঁ খাঁ গ্রামে ঘরে ঘরে শুধু মৃত বা মরণাপন্ন মানুষ। শিয়াল কুকুরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ছিঁড়ে খেয়েছিল মৃত এবং মুমূর্ষু অসহায় লোকগুলিকে। শকুনের দল নেমে এসেছিল গ্রামে। আতঙ্কে দুতিন বছর কেউ আর ওই গ্রামে বাস করতে আসেনি। যারা ফিরল পরে তাদের অনেকেই আর তাদের পুরনো ভিটেতে থাকেনি। নতুন বসতবাড়ি বানায়। ভূত-প্রেতের ভয়ে আর কি! বাড়িগুলোয় কত প্রাণ বেঘোরে গেছে। তাদের সৎকার হয়নি ঠিক মতো। পরিত্যক্ত পাকা বাড়িগুলো এখনো প্রায় টিকে আছে, তবে মাটির বাড়িগুলো ধসে গেছে।

'ভোলা সরকারের দেশ ওই নন্দপুর। ওখানে ওর পূর্বপুরুষের বিশাল বাড়ি আছে। কিন্তু সে বাড়ি এখন পোড়ো। মড়কের পর ওদের বংশের কেউ আর নন্দপুরে বাস করেনি। এখন ভোলা সরকারের নাকি শখ হয়েছে পূর্বপুরুষের ওই পোড়ো বাড়ি সংস্কার করে ভবিষ্যতে সেখানে বাস করবেন। অন্য শরিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এ বিষয়ে। তবে আগে ক'দিন বাড়িটার ভিতর ঘুরে-ফিরে, রাতে থেকে বুঝে নিতে চান বাড়িটায় বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা? অর্থাৎ ভূত-টুতের উপদ্রব আছে কিনা? যদি ভয়ের কিছু না থাকে তবেই পয়সা ঢালবেন বাড়ি সারাতে। শরিকদের অংশগুলোও কিনে নিতে পারেন। অবশ্য দরে পোষালে। বাড়ির অন্য শরিকদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই এই প্রস্তাবে। কারণ ওই পোড়ো বাড়ির ভাগের জন্য যা মেলে তাই লাভ। গতকাল থেকে ভোলা সরকার তাঁর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছেন। তোমায় নজর রাখতে হবে ব্যাপার কি দাঁড়ায়? ভাল স্টোরি হতে পারে বার্তায়। হেডিং দেওয়া যাবে—অতীতের টানে। কিংবা—পূর্বপুরুষের ভিটের টানে।'

প্রেসের কম্পোজিটর বৃদ্ধ দুলালবাবু এক ফাঁকে পাশে এসে শুনছিলেন কথাবার্তা। তিনি রেগে মন্তব্য করলেন, 'ভোলা সরকারের ভীমরতি হয়েছে। বুঝবে ঠেলা।'

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'ফলটা ভাল হলে ভাল।' এরপর মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে যোগ করলেন, 'আর অঘটন কিছু ঘটলে আরও ভাল। মানে আমার কাগজের স্বার্থে। জব্বর খবর হবে। দীপক, নন্দপুরের কাউকে চেন তুমি?'

'চিনি,' জানাল দীপক।

'উত্তম। চলে যাও নন্দপুর। পারলে দু এক রাত থেকে যেও ওখানে। ভূত-প্রেতের আবির্ভাব সাধারণত রাতেই হয়। বরাতে থাকলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিখতে পারবে। উইস্ ইউ গুড্ লাক।'

পরদিন সকালে নন্দপুরে গিয়ে নিতাইকাকার কাছে সরকারদের পোড়ো বাড়ির খোঁজ নিল দীপক। বাড়িটা পুবপাড়ায়, অল্প দূরে। গতকাল থেকে ভোলানাথ সরকার বাড়িটা সাফ করতে লেগেছেন। ভোলাবাবুর এক বন্ধুও এসেছেন সঙ্গে। দীপক পুবপাড়ায় চলল।

সরকার বাড়িটা দোতলা। মাঝারি আকারের অট্টালিকা বলা চলে। বোঝা যায় রীতিমত ধনী ছিল এই পরিবার। একদা বাড়ি ঘিরে ইঁটের পাঁচিল আজ নিশ্চিহ্ন। কম্পাউন্ডের ভিতরে মস্ত মস্ত গাছ। পুরনো আমলের বাগানের আম কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে মিশে আছে অনেক বুনো গাছ। বড় গাছগুলোর তলায় এবং বাড়ির চারধারে ঘন আগাছা। তবে সামনে কিছু ঝোপঝাড় সদ্য কাটা। বাড়িতে ঢোকার প্রকান্ড সদর দরজার মুখে ঠাসা ভিড়। গ্রামের যত নিষ্কর্মা পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ভিতরে। সদর দরজায় পাল্লার চিহ্ন নেই। কেবল কাঠের ফ্রেমের সামান্য অংশ তখনো আটকে আছে দেয়ালে। দীপক ভিড় কাটিয়ে সামনে গেল।

চারকোণা বিরাট উঠোন। বাঁধানো। তিন দিকের উঠোন ঘিরে উঁচু রোয়াক। রোয়াকের ধার ঘেঁষে গোল মোটা থামের সারি খাড়া হয়ে আছে দোতলার বারান্দার ভার মাথায় নিয়ে। রোয়াকের লাগোয়া পরপর ঘর। ঘরগুলোর দরজা জানলার যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই আর আস্ত নেই। তাদের অধিকাংশের পাল্লা ফ্রেম উইয়ে খাওয়া জরাজীর্ণ অথবা বেমালুম লোপাট। উঠোন ও রোয়াকে মেঝে ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে প্রচুর আগাছা। দেয়াল আর মেঝের ফাটল থেকে ডালপালা মেলেছে অনেক বট অশ্বত্থ।

দু'জন মজুর কাটারি দিয়ে উঠোনে ঝোপ কাটছে। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভোলা সরকার। দোতলায় নজরে আসে লোহার রেলিং দেওয়া বারান্দা। মানুষের হঠাৎ উৎপাতে বিব্রত এই পোড়ো বাড়ির বাসিন্দা অজস্র পায়রা ও শালিক পাখি চেঁচামেচি ওড়াউড়ি করছে।

ভোলানাথ সরকারের চেহারা ছোটখাটো কৃশকায় গৌরবর্ণ। পরনে ধুতি ও ফুলহাতা শার্ট। পায়ে চটি। বয়স বছর পঞ্চাশ। দীপক শুনেছে যে মানুষটি অতি নিরীহ। ওঁর পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কাজে নামা যেন ঠিক মানায় না। দীপক গুটিগুটি গিয়ে ভোলানাথের পাশে হাজির হলো। ভোলাবাবু সপ্রশ্নভাবে তাকাতে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয় পারবেন থাকতে?'

'দেখি, ইচ্ছে তো আছে।' মৃদুস্বরে জানালেন ভোলাবাবু।

'হঠাৎ এমন ইচ্ছে হলো কেন?' প্রশ্ন করে দীপক।

একটু ইতস্তত করে ভোলানাথ বললেন, 'মানে দু দিন স্বপ্নে দেখলাম এই বাড়ি। মনে হলো পূর্বপুরুষরা বুঝি চাইছেন আমি তাঁদের পুরনো ভিটে উদ্ধার করি। বাস করি এই বাড়িতে।'

'বোলপুরের বাসা তুলে দেবেন?'

'না না, এখুনি নয়। আপাতত মাঝে মধ্যে আসব। পরে স্থায়ীভাবেও থাকতে পারি। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে—'

ঢোঁক গিলে চুপ করে যান ভোলাবাবু।

'মানে এ বাড়িতে বাস করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তাই তো?' দীপকের জিজ্ঞাসা।

'হুঁ, তাই।' আড়ষ্টভাবে মাথা ঝাঁকান ভোলাবাবু।

'কাল রাতে ছিলেন এ বাড়িতে?'

'না। আগে একটু সাফসুফ করি। দেখছেন তো কি হাল।'

'আজ এখানে রাতে থাকার প্ল্যান আছে কি?'

'দেখি, কিছু ঠিক করিনি।' ভোলানাথ আমতা আমতা করেন।

দীপক বোঝে, ভোলাবাবু এখানে রাত কাটাতে ভয় পাচ্ছেন। সে উৎসাহ দেয় ভোলাবাবুকে, 'বাড়িটা এখনো কিন্তু খুব মজবুত আছে। দেয়াল কি পুরু! ছাদের অবস্থা কেমন দেখলেন?'

'ভাঙেনি, তবে ফাট ধরেছে কয়েক জায়গায়,' জানালেন ভোলাবাবু।

এই সময় একজন মাঝবয়সী পুরুষ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন একতলায়। লোকটি লম্বা, বলিষ্ঠ। রং কালো। মুখের ভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি ও মালকোঁচামারা ধুতি। পায়ে রবারের জুতো। হাতে একটা শাবল। তিনি এসেই মজুরদের কর্কশ স্বরে ধমকে উঠলেন—'এই, হাত চালা চটপট। নিচের ঘরগুলো আজ সাফ করা চাই।'

মজুর দু'জন একটু বিশ্রাম নিতে বিড়ি ধরিয়েছিল। তাড়া খেয়ে কয়েক টান দিয়ে বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে ব্যাজার মুখে ফের কাজ শুরু করল। আগন্তুক খরদৃষ্টিতে দীপককে একবার দেখে নিয়ে, উঠোনের কোণে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলেন।

'উনি কে?' জিজ্ঞেস করে দীপক।

'তারাপদ,' জানালেন ভোলাবাবু, 'আমার বন্ধু। আত্মীয়ও বলা যায় শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। ওই আমায় সাহস দিয়ে এ কাজে নামিয়েছে। নইলে আমার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না।'

আধঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরকার বাড়ি পরিষ্কার করা দেখে দীপক নিতাইকাকার বাড়িতে ফিরল।

বিকেলে সন্ধ্যার খানিক আগে দীপক সরকার বাড়িতে একবার ঢুঁ মারল। বাড়িটার সামনে গ্রামের লোকের ভিড় তখন আর নেই। বোধহয় অনেকক্ষণ সাফাই করা দেখে একঘেয়ে হয়ে চলে গেছে তারা। সরকার বাড়ি তখন নিঝুম। বাইরে তখনো দিব্যি দিনের আলো। কিন্তু চারপাশে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ থাকায় এ বাড়িটাকে ইতিমধ্যেই আঁধার ঘিরে ধরেছে। সদর দরজাপথে আবছা দেখা যাচ্ছে ভিতরের দালানের কিছু অংশ।

ভোলাবাবুরা আছেন না সটকেছেন? ভাবে দীপক। সহসা দোতলায় একটি জানলা দিয়ে দেখা গেল তারাপদবাবুর মুখ, কয়েক পলকের জন্য। খানিক বাদে খুটখাট শব্দ শোনা গেল বাড়ির ভিতর থেকে। তবে বোধহয় ভোলাবাবুরা এখানে

কি মনে হয়, পারবেন থাকতে?

থাকছেন আজ রাতে। দীপক ঠিক করল, সেও আজ রাতে থেকে যাবে নিতাইকাকার কাছে। যদি কিছু ঘটে সংগে সংগে জানা যাবে।

রাত ন'টা নাগাদ খাবার পর দীপক ফের এল সরকার বাড়ির খোঁজ নিতে। গোটা বাড়ি তখন ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই। গ্রামের লোকের কারও সাড়াশব্দ কানে আসছে না। সরকার বাড়িও নিস্তব্ধ। বাড়ির সদর থেকে হাত তিরিশ তফাতে পায়ে চলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর করে দীপক। সংগে টর্চ থাকলেও বাড়িটার বেশি কাছে ঘেঁষতে তার সাহস হলো না। যে সরু পথটা সদর দরজা অবধি পৌঁছেচে তার দুধারে ঝোপঝাড়। গরমকাল। সাপখোপ বেরতে পারে। নানান কীটপতংগের বিচিত্র ডাক শোনা যাচ্ছে। অজানা অদেখা কত জীবের গোপন চলাফেরার খসখস আওয়াজ। আবছা চাঁদের আলোয় বিশাল বাড়িটাকে সত্যি ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। দীপকের গা ছমছম করে।

একটু আলোর আভা না? হুঁ, তাই। সদর দরজা দিয়ে চোখে পড়ল মিটমিটে একটা আলো। জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে যেন কেউ হেঁটে গেল একতলার রোয়াক দিয়ে। অদৃশ্য হয় আলোটুকু। ফের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যায় অট্টালিকা।

আরও খানিকক্ষণ নজরদারির ইচ্ছে ছিল দীপকের। কিন্তু বাধ সাধলো গ্রামের ক'টা খেঁকি কুকুর। দীপককে নির্জনে ভূতের মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুকুরগুলো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসে। কিরে বাবা, কামড়াবে নাকি? গাঁয়ের লোক চোর ভেবে তাড়া না করে? বেগতিক বুঝে দীপক সরে পড়ল। কাল ভোরে এসে জানতে হবে ভোলাবাবুদের অভিজ্ঞতা। নিতাইকাকাকে বলে রাখবে, সরকার বাড়ির কোনো খবর থাকলে যেন তাকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়।

খুব ভোরে দীপককে ডেকে তুলল নিতাইকাকা।–'ওহে শোন, ভোলাবাবুর সংগে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি মারা গেছেন।'

দীপক ধড়মড় করে উঠে বলল, 'কি করে?'

'তা জানি না। সরকার বাড়ির কাছে পথের ওপর পড়ে আছেন। আমাদের পাড়ার জগবন্ধু প্রথম দেখে। সেই এসে খবর দিয়েছে।'

নিতাইকাকার সংগে দীপক ছুটল সরকার বাড়ির উদ্দেশে।

পথের ধারে মাটিতে পড়ে রয়েছেন তারাপদ। চিৎ অবস্থায় কুঁকড়ানো আড়ষ্ট দেহ। বিকৃত মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তখনো খবরটা বিশেষ চাউর হয়নি। মাত্র আট দশজন গ্রামের লোক মৃতদেহের পাশে থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

দীপক প্রাণহীন তারাপদবাবুকে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সরকার বাড়ির ভিতর ঢুকল।

তারাপদবাবুর সাইকেলটা দেখা গেল একতলায় বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা। 'ভোলানাথবাবু'–চেঁচিয়ে উঠল দীপক।

কোনো সাড়া নেই।

দীপক উঠে গেল দোতলায়। পর পর ঘরগুলোয় উঁকি দিয়ে চলে। একটা ঘরের মেঝেতে একখানি শতরঞ্চি পাতা। কিন্তু ভোলাবাবুর পাত্তা পাওয়া গেল না।

দীপক নোংরা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদে উঠল। ফাঁকা ছাদ।

দীপক নেমে এল একতলায়। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় সে থমকে গেল। এরপর কয়েকটা ঘরে উঁকি দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সরকার বাড়ি ছেড়ে।

তারাপদবাবুর মৃতদেহ ঘিরে তখন রীতিমত ভিড়। চারদিক থেকে লোক আসছে হন্তদন্ত হয়ে। দীপক সেখানে দাঁড়ায় একটুক্ষণ। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে।

'কি ভাবে মরল লোকটা?'

'কে জানে? আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখছি না তো!'

'হাসপাতালে নিয়ে যাবে?'

'কি লাভ? একদম মরে কাঠ। বরং পুলিশে খবর দিই।'

দীপক আর অপেক্ষা করে না। নিতাইকাকার বাড়ি এসে নিজের বাইসাইকেলখানা বের করে জোর প্যাডেল মারল।

বোলপুর শহরে কাছারিপট্টির বাসিন্দাদের তখনো ভাল ভাবে ঘুম ভাঙেনি। ভোলাবাবুর বাসার দরজায় টোকা দিল দীপক। কপাট খুলে এক মাঝবয়সী বিবাহিতা ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন–'কি চাই?'

'ভোলানাথবাবু আছেন?' বলল দীপক।

'হ্যাঁ।'

'একবার ডেকে দিন, দরকার আছে।'

মহিলা ভিতরে গেলেন।

ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে দীপককে দেখে ভোলাবাবু অবাক–'আপনি?'

দীপক চাপা সুরে বলল, 'জরুরী কথা আছে, আসুন বাইরে, ওই গাছটার নিচে।'

হতভম্ব ভোলাবাবু দীপককে অনুসরণ করেন।

নিরালা গাছতলায় থেমে দীপক বলল, 'সেদিন আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি দীপক রায়। বংগবার্তা কাগজের রিপোর্টার। নন্দপুরে আপনার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। আপনাদের পরিত্যক্ত বাড়ি উদ্ধারের বিষয়ে রিপোর্ট করতে। আচ্ছা কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'কেন? এখানে নিজের বাড়িতে,' জবাব দেন ভোলাবাবু।

'আর তারাপদবাবু?'

'তারাপদ ওর গাঁয়ে চলে গিছল।'

'ঠিক জানেন?'

'হ্যাঁ। দু'জনে একসংগে বেরোই। বাস স্টপেজের কাছে একটা চায়ের দোকানে ও চা খেতে বসল। আমার তাড়া ছিল, তাই আমায় বলল চলে যেতে। আমি বাসে চলে এলাম। ও

সাইকেলে যায়।'

'উনি কোথায় থাকেন?'

'বেশি দূরে নয়। নন্দপুর থেকে মাইল দুই দক্ষিণে।'

'বোলপুরে ফিরে আপনি সোজা বাড়ি এসেছিলেন, না থেমেছিলেন কোথাও?'

'না, সোজা বাড়ি আসিনি। বাজার করেছি কিছু। কি ব্যাপার বলুন তো?'

দীপক গম্ভীরস্বরে কাটা কাটা ভাবে বলল, 'আজ ভোরে তারাপদবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে নন্দপুরে সরকার বাড়ির কাছে।'

'এ্যাঁ, সেকি!' আঁতকে উঠলেন ভোলাবাবু।

'হুঁ। খুব সম্ভব তিনি আপনাকে বিদায় দিয়ে আবার ফিরে গিছলেন সরকার বাড়িতে এবং রাতে কোনো রহস্যময় কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

ভোলানাথবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। উঃ, কি ভীষণ কান্ড। এই ভয়েই আমি রাজী হইনি ওখানে রাতে থাকতে।'

দীপক বলল, 'পুলিশ হয়তো একটু বাদেই আপনার খোঁজে আসবে।'

'এ্যাঁ, পুলিশ! পুলিশ কেন?' চমকে যান ভোলাবাবু।

'কারণ আপনারা দু'জনে ওই বাড়িতে গিছলেন। দু'জনের মধ্যে একজনের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। খুনও হতে পারে। সুতরাং অপরজন অর্থাৎ আপনার ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আমি তো রাতে ছিলাম না ওখানে।'

'সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।'

ভোলাবাবু গাছের গায়ে হাত ঠেকিয়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলালেন। নইলে হয়তো টলেই পড়তেন মাটিতে। আর্ত চাপা কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ওঃ, কেন যে ওর কথায় নেচে এ কম্মে নামলাম। গোঁয়ার্তুমি করে নিজের প্রাণটা খোয়াল। এখন আমারও সর্বনাশ হবে। ওঃ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্লিজ বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।'

দীপক তীক্ষ্ণ চোখে ভোলাবাবুর মুখপানে চেয়ে বলল, –'ওই বাড়িতে, আপনারা কি খুঁজছিলেন? গুপ্তধন?'

'মানে মানে'–ভোলাবাবু তোতলাতে থাকেন।

'সত্যি কথা বলুন,' ধমকে ওঠে দীপক, 'আমার কাছে কিছু চেপে গেলে মুশকিলে পড়বেন। মনে রাখবেন এই ঘটনার আমি একজন প্রধান সাক্ষী।'

'হুঁ, তাই। ঠিক ধরেছেন। মানে ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন'–থেমে থেমে ঢোক গিলতে গিলতে ভোলাবাবু যা বলে গেলেন তার সারমর্ম এই–

'মাসখানেক আগে ভোলাবাবু পুরী বেড়াতে যান। সেখানে

টান দিতেই খুলে গেল বাক্সর ডালা

এক বৃদ্ধ ওড়িয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ভোলাবাবু বোলপুর থেকে এসেছেন শুনে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে যে বোলপুর শহরের কাছে নন্দপুর গ্রাম তিনি জানেন কিনা? ভোলাবাবু বলেন, নন্দপুর তাঁর পূর্বপুরুষের গ্রাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে, নন্দপুরে সরকার বাড়ি কি চেনেন?

ভোলাবাবু বলেন যে তিনি সরকার পরিবারেরই বংশধর।

বৃদ্ধ তখন জানায় যে সে পেশায় রাজমিস্ত্রী। ছেলেবেলায় উড়িষ্যা থেকে নন্দপুরে সরকার বাড়িতে তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল কিছু কাজ করতে। মনে আছে, বাবা একটা ঘর বানিয়েছিল একতলায়। ঘরের মেঝের নিচে ইঁট গেঁথে ছোট সিন্দুকের আকারের একটা চোরকুঠুরি বানায়। ফোকরের ওপরটা মিলিয়ে দেয় বাকি মেঝের সঙ্গে। তবে ভবিষ্যতে খুঁজে পাবার জন্য ওই চোরা গর্তের ঠিক মাথায় মেঝেতে একটি খুব ছোট পদ্ম এঁকে দেওয়া হয়। ওই চিহ্নের নিচে ইঁট সরালে আছে একটা চৌকো পাথর। পাথরখানা তুললে দেখা যাবে গুপ্ত ফোকর। বোধহয় কিছু দামী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয় ওই ফোকরে। আগে ডাকাতের ভয়ে এমনি ভাবে লুকিয়ে রাখা হতো ধনদৌলত। কাজটা সেরে তারা ফিরে আসে উড়িষ্যায়। বাংলাদেশে তারপর সে বার দু'তিন গিয়েছে তবে নন্দপুরে আর যাওয়া হয়নি। নন্দপুরে সরকার বাড়িতে এখন কেউ থাকে না শুনে বৃদ্ধ খুব আপশোস করে।

বৃদ্ধের কথাগুলি মাথায় নিয়ে বোলপুরে ফিরে আসেন ভোলাবাবু। সেই ভয়াবহ মহামারী হয়েছিল তাঁর ঠাকুর্দার আমলে। ঠাকুর্দারা দুই ভাই মারা যান। তাঁদের আট ছেলের মধ্যে দু'জন মাত্র জীবিত থাকেন। ভোলাবাবুর বাবা এবং বাবার এক খুড়তুতো ভাই। ভোলাবাবু ভাবেন, সরকার বংশে যে ক'জন রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা কি জানতেন ওই গুপ্ত ফোকরের খোঁজ? কখনো শুনিনি এ বিষয়ে। খুঁজে দেখলে হয় যদি কিছু সোনাদানা মেলে? কিন্তু ওই ভূতুড়ে বাড়িতে একা একা খুঁজতে তাঁর সাহসে কুলোয়নি। খবরটা নিজের বাড়িতেও বলেননি, পাছে রটে যায়। শেষে বলে ফেললেন তারাপদকে। তারাপদ বেপরোয়া স্বভাবের। শুনেই লাফিয়ে উঠল। ঠিক করল খুঁজতে হবে গোপনে। এরপর সরকার বাড়ি সংস্কার করে বাস করবার ছুতো করে তারা গুপ্তধন খুঁজতে লাগে। শর্ত ছিল যদি কিছু মেলে দু'জনের আধাআধি বখরা। মুশকিল হচ্ছিল, একতলায় প্রচুর ঘর। এবং প্রত্যেক ঘরের মেঝেতে ধুলো আবর্জনা বা খসে পড়া পলেস্তরা পুরু হয়ে জমেছে। মেঝে ফেটে চটা উঠে গেছে অনেক জায়গায়।'

ভোলাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চুলোয় যাক গুপ্তধন, এখন খুনের দায় থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।'

দীপক ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, 'তারাপদবাবু বোধহয় আপনাকে ফাঁকি দেবার মতলবে ছিলেন। তাই আপনার অজান্তে গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলেন। আপনার কিন্তু এখন একবার নন্দপুরে যাওয়া উচিত। তবে এই গুপ্তধনের গল্প আর কাউকে না বলাই ভাল। তাহলে ফ্যাসাদ বাড়বে। আপনাদের আগের গল্পটাই আপাতত চালিয়ে যান।'

দীপক ও ভোলাবাবু নন্দপুরে তারাপদবাবুর মৃতদেহের পাশে হাজির হয়ে দেখল যে পুলিশ এসে পড়েছে। বোলপুর থানার দারোগা একমনে শব পরীক্ষা করছেন। একটু বাদে দারোগা উঠে দাঁড়িয়ে ভোলানাথবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম ভোলানাথ সরকার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ইনি কে?' মৃত তারাপদকে দেখান দারোগা।

'তারাপদ ঘোষ। আমার বন্ধু।'

'আপনি রাতে ছিলেন সরকার বাড়িতে?' দারোগার প্রশ্ন।

'আজ্ঞে না। আমি বিকেলে বোলপুরে বাসায় ফিরে গিছলুম। তারাপদরও নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবার কথা ছিল। অথচ ও কেন যে ফিরে এল বুঝছি না? হায়, হায়। আমি বারণ করেছিলুম ওকে এখানে রাত কাটাতে।' কাতর কণ্ঠে বলেন ভোলাবাবু।

'আপনারা সরকার বাড়িতে কি করছিলেন?'

বোঝা গেল দারোগা ইতিমধ্যে ভোলাবাবুদের নন্দপুরে যাতায়াতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছেন। তবু একবার ঝালিয়ে নিতে চান খবরটা।

ভোলাবাবু দীপকের শেখানো মতো জবাব দিলেন।

'হুম্।চলুন বাড়িটা একবার দেখা যাক।' দারোগা গটগট করে এগোলেন। ভোলাবাবু সম্বন্ধে তার মনের ভাব ঠিক ধরা গেল না।দারোগার পিছনে শুকনো মুখে চললেন ভোলানাথ।

তাঁর পেছনে এক কনস্টেবল। তারপর দীপক। এবং দীপকের পেছনে বিরাট গ্রাম্য জনতা।

সরকার বাড়িতে ঢোকার মুখে দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে হুংকার দিলেন, 'নো নো, এতজন ঢুকবেন না। কেবল তিন-চারজন সংগে আসুন সাক্ষী হিসেবে।' তিনি গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ মাতব্বরকে সংগী বেছে নিলেন। দীপক অবিশ্যি সংগ ছাড়ল না।

একতলায় ঘুরতে ঘুরতে এক কোণায় গিয়ে থমকে দাঁড়ায় দলটা। দেখা গেল, হাত চারেক লম্বা, ইয়া মোটা, কালো রঙের প্রকান্ড এক মৃত সাপ টান হয়ে পড়ে আছে বারান্দায়। সভয়ে মন্তব্য করল এক গ্রামবাসী, 'বাপরে, এ যে গোখরো। সাক্ষাৎ যম।'

সাপটার মাথা এবং দেহের কয়েক জায়গা থেঁতলানো। কাছেই পড়ে আছে একটা শাবল। কিছুদূরে উঠোনে পড়ে আছে কাঁচভাঙা একটা টর্চ। সাপটার সামনের ঘরে খোলা দরজার মুখে মেঝেতে রাখা একটা ভুসো মাখা লণ্ঠন।

দারোগাবাবু হাতের ব্যাটনটা নাচাতে নাচাতে মন্তব্য করলেন—'হুম্। এ কেস অফ স্নেক-বাইট। আমি তাই আন্দাজ করেছিলুম। এ সব বাড়ি তো সাপের আড্ডা।'

ভোলাবাবু ফ্যাকাশে মুখে কাঠ হয়ে দেখেন।

বাইরে চমকানোর ভান করলেও দীপক মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কারণ দৃশ্যটা সে আগেই দেখে গেছে।

এই দুর্ঘটনার পাঁচ দিন বাদে ভোলানাথবাবুর সংগে দীপক সকালবেলা হাজির হলো নন্দপুরে। দীপক নিতাইকাকাকে জানাল, 'ভোলাবাবুর সংগে একবার সরকার বাড়িতে যাব। উনি কয়েকটা জিনিস ফেলে গেছেন ওখানে। একা ঢুকতে ভরসা পাচ্ছেন না তাই আমাকে সংগে আনলেন। তাছাড়া ওই বাড়ির কয়েকখানা ঘরের মেঝে মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো। সেগুলো তুলে নেওয়া যায় কিনা প্ল্যান করবেন। ওখানে বাস করা বোধহয় আর সম্ভব হচ্ছে না।'

'সাবধানে ঘুরো বাবা, অভিশপ্ত বাড়ি', নিতাইকাকা সতর্ক করেন, 'আর সন্ধ্যের পর থেক না ওখানে।'

গ্রামের লোকের চোখ এড়িয়ে দু'জনে ঢুকে পড়ল সরকার বাড়িতে। তারপর সোজা গিয়ে ঢোকে একতলার একটা ঘরে, যে ঘরের সামনে মৃত সাপটা পড়ে ছিল। ঘরের এক কোণে সদ্য খানিক খোঁড়া হয়েছে। কিছু ভাঙা ইঁটের টুকরো পাশে জড়ো করা।

দীপক ব্যাগ থেকে ছেনি হাতুড়ি বের করে চটপট গর্তটা বড় করতে শুরু করল। মেঝের কয়েকখানা ইঁট ভেঙে তুলে দেখল নিচে একখন্ড চেপ্টা আয়তাকার পাথর। সে তুলল পাথরখানা। তার তলায় ইঁট গেঁথে তৈরি এক ছোট চৌকো কুঠুরি।

ফোকরের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে হাত বাড়িয়ে দীপক তুলে আনল ফুটখানেক লম্বা, বিঘত খানেক উঁচু ও ততখানি চওড়া চমৎকার নকশা কাটা একটি কাঠের বাক্স। টান দিতেই খুলে গেল বাক্সর ডালা। দেখা গেল ভিতরে রয়েছে চারটে পুরু হলুদরঙা পাত। একটা পাত হাতে নিয়ে দীপক জানাল, 'এ নির্ঘাৎ সোনা। সোনার বাট। বোধহয় কয়েক লাখ টাকা দাম হবে সব ক'টা মিলিয়ে। যাক ভোলানাথবাবু, আপনার ভাগ্যে তাহলে গুপ্তধন জুটল!'

ভোলাবাবুর মুখে অনেকক্ষণ কথা সরল না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ। চোখ বিস্ফারিত। অতঃপর কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'অ্যাঁ, সত্যি!'

দীপক হেসে ফেলল, 'সত্যি বৈকি। স্বপ্ন নয়। নিজেই দেখুন পরখ করে।'

ভোলাবাবু দীপকের হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনার কিন্তু আধাআধি ভাগ।'

'নাঃ। আমি কিছু চাই না।' দীপক ঘাড় নাড়ে।

'না না, তা বললে হবে না, নিতেই হবে। এ সৌভাগ্য যে আপনারই দান। আমার কি সাধ্যি ছিল?' ভোলাবাবুর কণ্ঠে আন্তরিক অনুনয়।

'উঁহু।' দীপক দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল, 'একটা কারণে বড়ই আপশোস হচ্ছে। কেন জানেন? এমন ইন্টারেস্টিং কাহিনীর আসল ঘটনাটাই কাগজে লিখতে পারব না। অভিশপ্ত সরকার বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা এবং তারাপদবাবুর অপঘাত মৃত্যু নিয়েই স্টোরিটা তৈরি করতে হবে।'

'কেন?' ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'মশাই, আপনারই জন্যে,' বলল দীপক, 'কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হলে সরকার বাড়ির যেখানে যত শরিক আছে সব্বাই গুপ্তধনের ভাগ দাবী করে বসবে। তখন আপনার ভাগে আর মিলবে কতটুকু? তাছাড়া মামলা-মকদ্দমা মহা ঝঞ্ঝাট লেগে যাবে। সুতরাং এই গুপ্তধন প্রাপ্তির খবর আপনি ঘুণাক্ষরেও যেন ফাঁস করবেন না।'

'তা বটে।' চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন ভোলাবাবু।

দীপক বলল, 'আমার শুধু একটি অনুরোধ। হতভাগ্য তারাপদবাবুর পরিবারকে আপনার বিবেচনা মতো সাহায্য করবেন। এই গুপ্তধনের হদিস তো উনিই প্রথম পেয়েছেন। তাতে আমাদের কাজ ঢের সহজ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই পথ-চিহ্ন খুঁজে পেয়ে উনি গোপনে এসে খুঁড়ছিলেন এই জায়গায়। তারপর কি ভাবে যে সাপের ছোবল খেলেন তা অবশ্য আর জানার উপায় নেই।'

ছবি : সরোজ সরকার

সাত্যকি সোম ও মহাকালা

রেবন্ত গোস্বামী

পাহাড়ের কোলে সুন্দর বাংলোটিতে গভীর ঘুমের মধ্যে রাত কাটিয়ে বেশ ভোরেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী সাত্যকি সোমের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে প্রথমেই তিনি সোজা বারান্দায় চলে এলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন দূরের সবুজ বনানী আর প্রভাতের রঙিন আলোয় মাখামাখি তুষারঢাকা পর্বতশৃঙ্গের দিকে। তারপরে প্রাণভরে বাতাস নিলেন বুকে। ভাবতে শিউরে উঠলেন, গত শতাব্দীর শেষ দিকে কিভাবে এইসব গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল স্বার্থান্বেষী অবিবেচক আত্মঘাতী মানুষের হাতে। বায়ুদূষণে ভরে যাচ্ছিল এইসব স্বাস্থ্যকর পার্বত্য অঞ্চলগুলোও। কলকাতারই বা কী অবস্থা হয়েছিল! শহরের শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই ভুগত ফুসফুসের রোগে, রক্তচাপে, আরো কত অসুখে। আজ ঘরে ঘরে বাসে গাড়িতে সোমের পলিউশান অ্যাবজরভার বা এস-পি-এ যন্ত্রের দৌলতে কলকাতার শীতের সন্ধ্যার বাতাসও ভোরের এই পাহাড়ে হাওয়ার মতোই নির্মল। সাত্যকি সোমের মনে হয়ত একটু আত্মপ্রসাদের ভাব এসেছিল, এমন সময় তাঁর প্রিয় ছাত্র ও সহকারী বিক্রমকে একটা ফাইল হাতে বাংলোতে ঢুকতে দেখলেন।

ফাইলে কী আছে সাত্যকি সোম জানেন। এখানে যে গবেষণার কাজে দুজনে এসেছেন, তারই ডাটা ওতে লিপিবদ্ধ। বিক্রম বারান্দায় উঠতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আজ সকালে ও-কাজটা থাক না বিক্রম। এখানে দাঁড়িয়ে একটু সামনে তাকিয়ে দেখ। ঐ সবুজ বন, চূড়ার বরফ আর সূর্যের আলোর খেলা দেখে তোমার কি মনে হবে, ওর পেছনে ক্লোরোফিল, তাপমাত্রা আর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘের ভূমিকা? বলতে কি ইচ্ছে করে না–'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি?'

বিক্রম অবাক-বিস্ময়ে ডক্টর সোমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। তাই দেখে সাত্যকি সোম বললেন, 'অবাক হয়ে যাচ্ছো? বিজ্ঞানী সাত্যকি সোমের কী অধঃপতন–তাই না? তবে বিক্রম, মায়া বা ইল্যুশন সবসময়ে মন্দ নয়। এই মায়াতে বদ্ধ আছি বলেই তো আমরা স্বাভাবিক মানুষ, পাগল হয়ে যাইনি। আমি যখন বলি, সূর্য উঠবে বা সিনেমায় ছবি নড়ছে– কই তখন তো বল না, সাত্যকি সোম ভুল বকছে?'

বিক্রম লজ্জিতভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, তাহলে আজকের সকালটা একটু কাছাকাছি বেড়িয়ে এলে হয় না? কাছেই আছে মহাকালের বিগ্রহ। একবার দেখে এলে কেমন হয়?'

সাত্যকি সোম হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললেন, 'তাই বলে বিজ্ঞানী সাত্যকি সোম শালপাতায় পেঁড়া আর ফুল হাতে মন্দিরের দরজায় দাঁড়াবে, অতটা তুমি ভাবলে কী করে বিক্রম?'

বিক্রম কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না স্যার। বিগ্রহটা সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে, তাই একটু কৌতূহল হচ্ছে। শোনা যায়, মুঘল সেনাপতি মানসিংহ পূর্ব ভারতে যাত্রার সময়ে রাত্রে এখানে ছাউনি ফেলেছিলেন। সেই রাত্রে ঐ পাহাড়ের কোলে একটা উজ্জ্বল আলোর রেখাকে নেমে আসতে দেখা যায়। পরদিন সকালে তিনি আবিষ্কার করেন পাহাড়ের গায়ে এই পাঁচ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গটিকে–যেটা আগের দিনও ওখানে ছিল না। মানসিংহ শিবের পুজো করে যাত্রা করেন আর সেটা তাঁর পক্ষে সফল যাত্রা হয়েছিল। তাই ফেরার পথে আবার এখানে পুজো দেন। মুসলমান মুঘল সেনারাও এই পবিত্র প্রস্তরখণ্ডের কাছে নামাজ পড়েছিল। এখনো হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে এটা পবিত্র। পাছে তাদের মধ্যে এই শিবলিঙ্গ বা পবিত্র পাথর

নিয়ে কোনো মনোমালিন্য দেখা দেয়, তাই রাজা মানসিংহ হুকুম দেন, এটি উন্মুক্ত স্থানেই থাকবে। একে ঘিরে কোনো মন্দির বা মসজিদ গড়ে উঠতে পারবে না। হিন্দু-মুসলমান সবাই এটি স্পর্শ করতে পারবে। আর রাত্রে কেউ এখানে আসতে পারবে না।'

সাত্যকি সোম হেসে উঠে বললেন, 'বাবাঃ, তুমি ইতিহাসের ছাত্র হলে নাম করতে। তবে তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে ওটা একটা উল্কাপিন্ড ছাড়া কিছু নয়। প্রায় পাঁচশো বছর আগে ওটা ওখানে পড়ে মাটিতে গেঁথে যায়। যাই হোক, তোমার যখন অত ইচ্ছে, চলো দেখে আসি। বুড়ো বয়সে কিছু পুণ্যিও তো করা দরকার।' বলে হেসে উঠলেন ডক্টর সোম।

মহাকালের মূর্তির কাছাকাছি এসে তাঁরা দেখলেন, স্থানীয় অধিবাসীরা কাজে যাওয়ার আগে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে যাচ্ছে। মানসিংহের ব্যবস্থামতো এখানে কোনো পূজারী নেই। কেউ কেউ ফুল বেলপাতা ছড়িয়ে দিয়েছে পাশে। এমন মুক্তাঙ্গন সার্বজনীন দেববিগ্রহ সাত্যকি সোম সত্যিই কোথাও দেখেননি।

মহাকাললিঙ্গের কাছে আসতেই ডক্টর সোমের চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের চিহ্ন। বিক্রমের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি বলেছিলে, এটা মুঘল যুগের শিবলিঙ্গ। তুমি কি ভালোভাবে খবর নিয়েছ এ ব্যাপারে? একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? এটি কেমন মসৃণ আর তেলচকচকে। এতকাল ধরে খোলা জায়গায় রোদবৃষ্টি তুষারপাত আর ঝড়ের মধ্যে থেকে তো এটা সম্ভব নয়। দাঁড়াও, বাংলোতে আমার এজ-কাউন্টার আছে। কোটি কোটি বছরের পুরনো ফসিল থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার দলিল—সবকিছুর বয়সই তাতে ধরা পড়বে। সেটা সঙ্গে করে রাত্তিরে আবার আসব। তখন তো কেউ এখানে আসে না। ব্যাপারটাতে কোনো কারচুপি থাকলে তখনই ধরা পড়বে।'

একটা বিগ্রহ নিয়ে ডক্টর সোমের এই আগ্রহ বিক্রমকে একটু অবাক করল। তবে সে নিজেও যে এ-ব্যাপারে কৌতূহলী হয়নি, সেটা সে বলতে পারবে না।

সারাদিন গবেষণার ব্যাপারে কাজ, আলসেমি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করে কাটল। রাত হলে টর্চ, এ-সি যন্ত্র আর বিক্রমকে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর সোম মহাকাল-লিঙ্গের বেদীর কাছে গেলেন। পাথরের গায়ে যন্ত্র লাগাতে যে অঙ্ক ফুটে উঠল তাতে তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। একক দশক শতক সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি ছাড়িয়ে এ যে পরার্ধের দিকে! যন্ত্র তুলে রি-সেট করলেন। আবার ছোঁয়ালেন। সেই একই অঙ্ক। তিনি বিক্রমকে ইঙ্গিতে অঙ্কটা দেখতে বললেন। বিক্রমের চোখে মুখেও ফুটে উঠল অগাধ বিস্ময়। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বলল, এ কী করে সম্ভব স্যর?'

সাত্যকি সোম ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্যিই বিস্ময়কর। যে সংখ্যাটা ফুটে উঠেছে, তত বছর আগে পৃথিবীটা ছিল একটা জ্বলন্ত গ্যাসের পিন্ড। তার কাছে মানসিংহের সময় তো কয়েক সেকেন্ড আগের ব্যাপার মাত্র। আর পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে দেখ। কী বস্তু এটা? মৌলিক পদার্থ হলে পিরিয়ডিক টেব্‌লে এর স্থান আছে কি? আর যদি যৌগিক হয়—'

বিক্রম প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'তবে কি বলছেন স্যর, পৃথিবী সৃষ্টির আগে বাইরে থেকে এসেছিল এই তথাকথিত পাথরটা?'

সাত্যকি সোম হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। তারপরে অস্ফুট বিস্ময়ে সোজা হয়ে উঠলেন। বিক্রম কারণটা বুঝল। টর্চের আলোয় সে দেখল, ক্যালকুলেটরের অঙ্কের মতো ফুটে উঠেছে আলোর অঙ্ক পাথরটার গায়ে—শূন্য থেকে নয়। তার বেশ কিছুটা নিচে আরেকটা সংখ্যা 6547832901; সংখ্যাটার পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরাজিতে লেখা—'উপরের সংখ্যাগুলোর ওপর এই নিয়মে পরপর কাষ্ঠশলাকা দিয়ে চাপ দাও।'

বিক্রম হেসে উঠে বলল, 'দেখেছেন স্যর, খুব সাম্প্রতিককালেই কেউ এটা করেছে। সেই যে পড়েছিলাম, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দোলনায় টাটা কোম্পানীর ছাপ মারা ছিল, সেরকম আর কি। অন্ধকারে টর্চের আলোয় ফ্লোরেসেন্ট লেখাগুলো ফুটে উঠেছে। দিনের বেলায় কারো নজরে পড়েনি।'

সাত্যকি সোমকে হাসতে দেখা গেল না। সেরকমই গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার এজ-কাউন্টার মিথ্যে বলে না। তাছাড়া এইভাবে গুপ্তধনের সংকেতের মতো লেখার মানেই বা কী? দেখাই যাক না।'

পাশে একটা শুকনো সরু বেলের ডাল পড়ে ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ওপরের অঙ্কগুলোর ওপর নির্দেশমতো চাপ দিতে লাগলেন ডক্টর সোম।

শেষ সংখ্যা এক-য়ের ওপর চাপ দিতেই যা ঘটল তাতে দুজনেই সভয়ে পিছিয়ে এলেন। বাঁশির মতন একটা শব্দের সৃষ্টি হলো, আর সেই সঙ্গে শিবলিঙ্গের মাথা থেকে একটা ঢাকনা খুলে গেল। ভেতরের ব্যাপার-স্যাপার দেখে দুজনে আরো অবাক। পরপর ইংরাজিতে লেখা আছে কতগুলো ভাষার নাম—ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, চীনা, জাপানী ইত্যাদি। হিন্দী, এমন কি বাংলার নামও খুঁজে পেলেন ডক্টর সোম। প্রতিটি লেখার তলায় একটি করে বোতাম। নিচে লেখা—প্রেস্ এনিওয়ান। যেখানে 'বেঙ্গলী' লেখা, তার নিচের বোতামটা ডক্টর সোম টিপে দিলেন। আরেক বিস্ময়ের ধাক্কায় এবার তাঁরা বসে পড়লেন। পরিষ্কার বাংলায় কেউ বলে যাচ্ছে—

'পৃথিবী নামক এক গ্রহ থেকে এই কালাধার বা টাইম ক্যাপসুল আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা নক্ষত্রকে ঘিরে

আমাদের পৃথিবী ঘুরছে। সেটাকে আমরা সূর্য বলি। একবার ঘোরার সময়কালকে বলি বৎসর। এই কালাধার আমরা মহাকাশে এমনভাবে ছুঁড়ে দিয়েছি, যাতে এই পৃথিবীর মতন উপযুক্ত গ্রহ পেলে তবেই সেখানে নামবে। হয়ত তার মধ্যে কোটি কোটি বছর কেটে যাবে। আমাদের পৃথিবীর কিছু প্রধান ভাষাতেও এটা প্রোগ্রাম করা আছে। তাছাড়া আছে ইন্টারস্পেস ফিগার ল্যাংগুয়েজ বা মহাজাগতিক অঙ্কের ভাষা। যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এই কালাধার খোলেন এবং আমাদের ভাষা বুঝতে পারেন, তবে তিনি আমাদের গ্রহ, তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এই গ্রহের প্রতিটি দেশের প্রতিটি অঞ্চলের ইতিহাস এতে স্টোর করা আছে। যে ভাষাতে আমি কথা বলছি, সেই ভাষাতে প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন। পেছনে এফ-বি বা ফ্ল্যাশব্যাক বোতাম আছে। সেটা টিপলে এই কালাধারের ভেতরে ভি-ডি-ইউ পর্দায় দেখতে পাবেন ঘটনাপ্রবাহ, যেটা আপনারা দেখতে চান। তবে একটা অনুরোধ, কাজ হয়ে গেলে একসময় এটাকে আবার আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। পেছনের দিকে আর-বি বোতাম টিপলেই সেটা হবে। টেপার দু'মিনিটের মধ্যে এটা ছুটে ফিরে আসবে আমাদের পৃথিবীতে। হয়ত তখন এই পৃথিবী একটা মৃত গ্রহ। তবুও এটাই আমাদের ইচ্ছা।'

কালাধার চুপ করল।

সাত্যকি সোম ফিসফিস করে বিক্রমকে বললেন, 'দেখেছ বিক্রম, কীরকম মিল ? মহাকাল আর কালাধার। প্রশ্ন করো,

সেই সঙ্গে শিবলিঙ্গের মাথা থেকে একটা ঢাকনা খুলে গেল

কী জানতে চাও।'

বিক্রম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার চোখে ভেসে উঠল তার মার মুখ। ক্যানসারে মারা গিয়েছেন তিনি। তাঁর আত্মা থাকলে সেটা কোথায়? এই পৃথিবীতে? না, ঐ কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে আরেক পৃথিবীতে–যেটা এর মধ্যেই হয়ত একটা মৃত গ্রহ?

সে প্রশ্ন করল, 'ক্যানসারের ভালো ওষুধ কি আপনারা আবিষ্কার করেছেন?'

কালাধার হেসে উঠল। বলল, 'এত কঠিন কঠিন রোগ থাকতে একটা সামান্য ব্যাধির ওষুধের কথা জানতে চাচ্ছেন কেন? একটা মামুলি ওষুধেই তো এটা সেরে যায়। ক্রস্টা লাভিয়া টাইকোটিস শতকরা চল্লিশ, ফেরামিন গ্লুকোসাইডিস শতকরা ষাট।'

ডক্টর সোম বিক্রমকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'যা শুনছ, লিখে নাও। পরে ও-ব্যাপারে খোঁজখবর নিও।'

ভাগ্যিস পকেটে নোটবই ছিল। বিক্রম লিখে নিল নামগুলো।

এবার সাত্যকি সোম প্রশ্ন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কালাধার যখন আপনারা উৎক্ষেপণ করেন, তখন আপনাদের নিয়মে কোন সময়? মানে এই গ্রহে যাকে সাল বলি।'

কালাধার উত্তর দিল, 'আমাদের পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্ট নামে এক মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। তাঁর সময় থেকে একটা সাল চালু আছে, আমরা যাকে বলি খ্রীষ্টাব্দ। সেই হিসাবে এখন দু'হাজার নয়শো উনিশ খ্রীষ্টাব্দ।'

ডক্টর সোম জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের পৃথিবীর কি কোনো উপগ্রহ আছে?'

কালাধার উত্তর দিল, 'স্বাভাবিক উপগ্রহ একটিই আছে। আমরা নাম দিয়েছি–চাঁদ। সত্যি বলতে কি, এই কালাধার আমরা চাঁদের পিঠ থেকেই উৎক্ষেপণ করেছি।'

সাত্যকি সোম বিক্রমের দিকে তাকালেন। দেখলেন, বিস্মিত হওয়ার অনুভূতিও বোধহয় সে হারিয়ে ফেলেছে।

তিনি কালাধারের দিকে মুখ করে বললেন, 'আপনাদের গ্রহে যেখানে এই বাংলা ভাষায় কথা বলা হয়, সেখানকার প্রধান কোনো শহরের আজকের–মানে, যখন এই কালাধার পাঠানো হয়েছে–ওখানকার কিছু দৃশ্য কালাধারের পর্দায় দেখতে চাই।'

কালাধার বলল, 'এফ-বি বোতাম টিপুন।'

কৌতূহলের ধাক্কায় বিক্রম এবার প্রায় হুমড়ি খেয়ে পেছনের বোতাম টিপে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেও কোনো ছবি এল না। সাত্যকি সোম কালাধারকে প্রশ্ন করতে উত্তর পেলেন,'এফ-বি বোতামের বদলে আর-বি বোতাম টেপা হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এটা ছুটে যাবে মহাকাশে আমাদের পৃথিবীর দিকে।'

ডক্টর সোম লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ, করেছ কী বিক্রম?' তারপরে কালাধারের দিকে ফিরে বললেন, 'কম্যান্ডটাকে কি কিছুতে ইরেজ–মানে নষ্ট করে দেওয়া যায় না? ভুল করে ওটা হয়ে গিয়েছে। আমাদের আরো অনেক কিছু জানার আছে।'

কালাধার হেসে বলল, 'বুদ্ধিমান জীব বলে নিজেকে দাবী করলে আরো নিখুঁত, আরো ধীরস্থির হওয়া দরকার। এই কম্যান্ড আর ফেরানো যাবে না। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কালাধার এই গ্রহ থেকে ছুটে যাবে। প্রায় হাজার বছর আগে আমাদের এই গ্রহেও অন্য এক জগৎ থেকে পাঠানো একটা কমপিউটারাইজ্‌ড্ কালাধার আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু একজন অর্বাচীন বিজ্ঞানীর হঠকারিতায় আমরা সেটাকে হারিয়েছিলাম। এক বিরাট জ্ঞানের ভান্ডার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম সেদিন।'

সাত্যকি সোম প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম সেই বিজ্ঞানীর?'

'বিক্রম রায়!'

নামটা উচ্চারণ করেই রকেটের মতন মাটি ফুঁড়ে উঠে আকাশের দিকে ছুটে গেল সেই কালাধার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত নীলিমায় সেটা মিলিয়ে গেল।

বিক্রমের দিকে চেয়ে ডক্টর সোম দেখলেন, সে ক্ষোভে লজ্জায় নুয়ে পড়েছে মহাকালের বেদীর ওপর। সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন, 'ঐ মহাদূরের পৃথিবীতে এককালে যা হয়েছিল, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে এই পৃথিবীতে তারই পুনর্ঘটন হচ্ছে। তার ব্যতিক্রম তো হতে পারে না। কাজেই তোমার–তোমার আমার সকলেরই দুঃখের কিছু নেই, বিক্রম। যা আমরা জানতে পারলাম না, তা জানতে আরো এক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে। সেদিন আমাদের উত্তরপুরুষ বিজ্ঞানীরা ঠিক ওরকম একটা মহাকালাধার পাঠাবে মহাকাশে। ওঠো। চলো, বাংলোয় ফিরে যাই। ভবিষ্যৎ তার নিজের নিয়মেই আসবে। তাকে হয়ত আগে জানা যায় না। তোমার নোটবইয়ের ফরমূলাও সময় এলেই মানুষ আবিষ্কার করবে, তার আগে নয়।'

ছবি: দিলীপ দাস

এমন মওকা আমরা কমই পেয়েছি। বেচারা হাবুল হোঁতকার জন্য আমাদের দুঃখই হওয়া উচিত। কিন্তু উল্টে কেবলু কার্তিক চটপটি আর আমার উৎকট আনন্দ হচ্ছে। অথচ কত আনন্দ করেই না এই দু'বছর বাদে আমাদের সক্কলের জন্য নিজের পকেট থেকে ও করকরে দশ-দশটা টাকা খরচ করল। আমাদের ছ'জনের জন্য ছ'টাকা দিয়ে ছ'খানা যাত্রার টিকিট কাটল। আর একটু একটু করে বাকি চার টাকা খরচ করে বাদাম-ভাজা চানাচুর আলু-কাবলি ঝাল-মুড়ি খাইয়ে আমাদের মুখ চালু রেখেও কিনা ওর এই কপাল! যে-ফোটোগ্রাফির স্টুডিওতে ও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত

পিন্ডিদার মগজ ডাকাতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
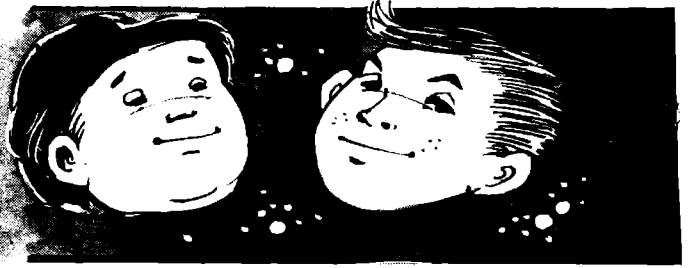
কাজ করে, আজ দু'বছর বাদে সেই কাজে ওর দশ টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট হয়েছে। বাড়িতে না জানিয়ে প্রথম মাসের সেই বাড়তি দশ টাকা মনের আনন্দে আমাদের জন্যেই খরচ করেছে—তার কিনা এই ফল? অবশ্য খরচটা যে ও মনের আনন্দে আমাদের জন্যেই করেছে এটা কবুল করতে আমার কেবলু কার্তিক চটপটির অবশ্য অঘোষিত আপত্তি আছে। হেবো হোঁতকা আসলে তোয়াজ করতে চেয়েছে পিন্ডিদাকে—আমরা গৌরবে বহুবচন হয়েছি।

কিন্তু জিভের রসদ ফুরোতে হাই তুলতে তুলতে যাত্রার আসরে বসে পিন্ডিদা কিনা শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘুমিয়েই পড়ল! অবশ্য ঘুম ঠিক নয়, মাঝে মাঝে চোখ টান করে দেখেছে, হাই তুলেছে, যাত্রার পালায় মন দিতে চেষ্টা করেছে, আবার চোখ বুজেছে।

নানাভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে 'মারীচ বধ' পালা হচ্ছিল। স্বর্ণ-মৃগ হয়ে মারীচ সীতার সামনে নেচে বেড়াচ্ছিল, সীতার আব্দারে রাম ছুটল তাকে ধরতে। মারীচের কি সোনার হরিণ না হয়ে উপায় ছিল? সে জানে সোনার হরিণ হতে না চাইলে ক্রুদ্ধ রাবণের হাতে মরবে, আর হলে শেষ পর্যন্ত রামের হাতে মরবে। রাক্ষস জীবন থেকে ত্রাণ পেতে হলে রামের হাতে মরে পুণ্যি করাই ভালো। তাই নেচে নেচে রামকে ভুলিয়ে সে দূরে

নিয়ে যাচ্ছে, রাক্ষস বুঝতে পেরে রাম শর-সন্ধান করতে সে রামের গলা নকল করে আর্তনাদ করছে। যাতে রাম বিপদে পড়েছে ভেবে লক্ষ্মণ সাহায্য করতে আসে আর সেই ফাঁকে রাবণ সীতা হরণ করতে পারে।

আমি যাত্রায় মন দেব কি, সারাক্ষণ তো আমার একটা চোখ পিন্ডিদার দিকে। এক ফাঁকে হাবুলের কানে কানে বলেছিলাম, তোর কোনো কান্ডজ্ঞান আছে, ফুটবলের সুপার সুপার সুপার স্টার প্রদীপনারায়ণ দত্ত সমস্ত পৃথিবীর ফুটবল পাগলদের কাছে পি.এন্.ডি থেকে পিন্ডি হয়ে গোটা বিশ্ব চষেছে–তাকে কিনা তুই এই অজ্ পাড়াগেঁয়ে যাত্রা দেখাতে নিয়ে এলি–তার এত মূল্যবান সময় নষ্ট করলি? কাল তোর অদৃষ্টে কি যে আছে ভগবান জানে।

হোঁতকা হাবুলের মুখ শুকিয়ে আমসি একেবারে।

আমাদের চারজন মানে আমি কেবল্ কার্তিক আর চটপটির মধ্যে সকালেই একটা পরামর্শ হয়ে গেছল। বিকেলে পিন্ডিদা মাঠে এলেই আমরা গত সন্ধ্যার মারীচ বধের আলোচনা তুলব। আর তারপরে যে পিন্ডিদার বাক্যবাণে ওরই যে মারীচ বধের দশা হবে তাতে আর সন্দেহ কি? ও যেমন
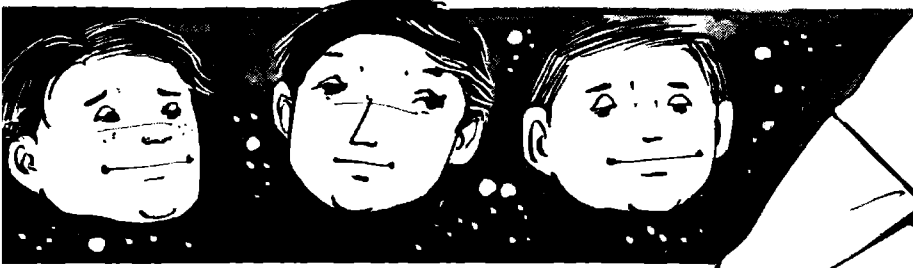
নির্লজ্জ মোসায়েব পিন্ডিদার, ওর গুরুর মানে পিন্ডিদার হাতেই ওর একটু টিট হওয়া দরকার।

মাঠে এসে আমরা যে-যার জায়গায় গোল হয়ে বসেছি। হেবোও হাত পা ছড়িয়ে তার জায়গায় বসে ঘনঘন সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কালকের মারীচ বধ যাত্রার কথা আমরা মোটে তুলছি না বলেই ওর মনে খটকা লেগেছে। অর্বাচীনের মতো ও ও-রকম যাত্রার টিকিট কেটে বসে আমাদের সক্কলের সন্ধ্যে আর রাতটা নষ্ট করেছে বলে আমরা যদি ওকে নিয়ে পড়তাম, তাহলেও ও স্বস্তি বোধ করত। আর কাকুতি মিনতি করে পিন্ডিদাকে একটু ঠান্ডা করার আবেদন জানানোর সুযোগ পেত। কিন্তু মোটে আমরা ওদিকে ঘেঁষছিই না।

পিন্ডিদার উঁচু ঢিপির আসন খালি। সতৃষ্ণ চোখে রাস্তার দিকে নজর রেখে আমরা এটা ওটা বলছি।

আসছে! পিন্ডিদা আসছে! তার ট্রেড-মার্ক লম্বা রোগা পটকা চেহারাখানা যে কত প্রিয় আমাদের, সে-যেন নতুন করে অনুভব করছি। হাবুল শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো বার বার ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

কাছে আসতে গলায় চিনি ঢেলে আমিই বললাম, এসো পিন্ডিদা, আমরা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম....

শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

ধীরে সুস্থে পিন্টুদা নিজের ঢিপির আসনে বসল। আর সেই ফাঁকেই সব্বলের মুখগুলো দেখে নিল। বসে এইটুকু পথ হাঁটার ক্লান্তি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকালো।—আমার শরীর হঠাৎ খারাপ হতে যাবে কেন?

এ-রকম পাল্টা প্রশ্ন আশা করিনি, ভেবেছিলাম এর জবাবে কটমট করে হেবোর দিকে তাকাবে। তবু আমার হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। তারিফের সুরেই বললাম, সব-কিছু সহ্য করার মতো শরীর বটে একখানা তোমার, কাল রাতে হাবুলের যাত্রা দেখে এসে আমি তো মাথাধরার যন্ত্রণায় বাবার ওষুধের আলমারি থেকে তিন-তিনটে ঘুমের ওষুধ চুরি করে বেঁচেছি—কার্তিক আর চটপটি বেচারী সমস্ত রাত ছাদে পায়চারি করে সকালের দিকে ঘুমিয়েছে, আর কেবলু—

আমার আগেই সংস্কৃতনবীশ কেবলু ফরফর করে বলে উঠল, উঃ! শিরঃপীড়া কি ভীষণং পীড়া—যাত্রা দেখে আসার পর সমস্ত রাত ধরে প্রাণ-বিহঙ্গ কেবলং ছটফটান্তি আর দেহস্য খাঁচা ছাড়ো-ছাড়ো করন্তি—

হেবো হোঁতকা করুণ দু'চোখ গোল করে একবার আমাদের দিকে আর একবার পিন্টুদার দিকে তাকাচ্ছে। কেবলুর খিচুড়ি ভাষা শেষ হতে তার দিকে চেয়ে বলল, তুই কি এখন সংস্কৃত ছেড়ে উড়িয়া ভাষা কপচাতে শুরু করলি নাকি? ব্যাপারখানা কি?

কার্তিক তো আমাদের মধ্যে একটু বেশি ধীর স্থির। এবারে সে-ও মুখ খুলল, কালকের মারীচ বধ দেখতে গিয়ে আমরাই কি বধ হচ্ছিলাম না পিন্টুদা, রাক্ষস সোনার হরিণ সেজে নাচবে হাসবে ভোলাবে, তারপর মানুষের ভাষায় আর্তনাদ করবে—বসে বসে এই অ্যাবসার্ড ব্যাপারটা একটা টরচার নয়?

চটপটি চটাং চটাং করে বলে উঠল, আমি তো যাত্রা দেখতে দেখতে হাবুলের মাথাটাই একটা ফুটবল ভাবছিলাম—এক শট্এ ওর ওই মাথা আমার স্টেজে নিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল—

পিন্টুদা এবারে একটু সোজা হয়ে বসে সোজা হাবুলের মুখের দিকে তাকালো। ওই বিরাট শরীর নিয়ে হেবো-হোঁতকা কুঁকড়ে দুমড়ে একাকার। তারপর পিন্টুদার খুদে দু'চোখ আমাদের দিকে ঘুরল।—তার মানে রামায়ণ যুগের সায়েন্সের দিকটা তোরা কেউ মোটে ভাবিসইনি। এ-যুগে তোরা স্পুটনিক বিশ্বাস করিস, রকেটে চেপে মানুষের চাঁদে যাওয়া বিশ্বাস করিস, ফ্লাই-ইং সসারও বিশ্বাসের পর্যায়ে এসে গেছে—কিন্তু এ-সব যে কত পুরনো যুগের সায়েন্স নতুন করে উদ্ধার হচ্ছে এটা তোদের মাথায় আসে না। মারীচ যে সত্যিই রাক্ষস ছিল, আসলে হরিণই ছিল না, এটা তোদের কে বলল?

আমি হতভম্বের মতো বলে উঠলাম, সে কি কথা পিন্টুদা, রামায়ণে তো জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা আছে, রাবণ মারীচ রাক্ষসকে সোনার হরিণ সাজিয়ে সীতার কাছে পাঠিয়েছিল।

—ছাপার অক্ষরগুলোই কেবল পড়লি আর ভাবলি না কিছু? রাবণ কত বড় সায়েনটিস্ট সে কথা একবারও মনে হয়েছে? রামের পুষ্পক রথ মানে আজকের দিনের এরোপ্লেন থাকলে সে তো তাইতেই চেপে সীতা উদ্ধারে যেতে পারত—বাঁদর দিয়ে সেতু-বন্ধনের দরকার ছিল কি? তার মানে রামের পুষ্পক রথ ছিল না, সে-সম্পর্কে তার কোনো ধারণাও ছিল না, কিন্তু সায়েনটিস্ট রাবণের শুধু ধারণা নয়, নিজের হেপাজতেই পুষ্পক রথ ছিল। হেবোর মাথার ঘিলু যদি তোর ঘিলু সরিয়ে তোর মাথায় চালান করা যায় তাহলে তোর বুদ্ধিসুদ্ধি চাল-চলন সব হেবোর মতো হবে না তো কি? সায়েনটিস্ট রাবণ সত্যি সত্যি মারীচকে সোনার হরিণ সাজিয়ে সীতার কাছে পাঠায়নি, স্রেফ একটা হরিণকে ধরে মারীচের মাথার কিছু স্পেশাল সেল তুলে তার মাথায় চালান করেছে—ফলে সেটা মারীচের মতোই আচরণ করেছে.....আর সোনার রং? তোর গায়ে সাপের বিষ ইনজেকশন করে দিলে তোর গায়ের রং দেখতে দেখতে নীল বর্ণ হয়ে যাবে না—তাহলে তেমন কিছু আরক ইন্জেক্ট করে রাবণের মতো সায়েনটিস্টের হরিণের গায়ের রং সোনার মতো করে দিতে অসুবিধে কি?

আমরা, এমন কি হাবুলও হাঁ হয়ে পিন্টুদার দিকে চেয়ে। একটু থেমে পিন্টুদা আবার বলে গেল, কাল হেবো যে ওই নাটকের ভিতর দিয়ে আমাকে কোন রাজ্যে নিয়ে গেছল তোরা ভাবতে পারবি না—দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ডক্টর লেঁবোর মুখখানা ভেসে উঠছিল—আর বার বার আমি তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলাম।

এক হাবুল ছাড়া আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, ডক্টর লেঁবো! সে আবার কে?

—ব্রেজিলের স্যানটসের ঘন-গভীর জঙ্গলে যার ল্যাবরেটারি—সেই বিরাট প্রতিভার এক পাগলা ডাক্তার ডক্টর লেঁবো—প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করতে চাইলে সে কম করে সাত বার নোবেল প্রাইজ পেত—তার খপ্পরে পড়ে আমার জন্মগত ফুটবল-প্রতিভার ব্রেন-সেল ডাকাতি হয়ে যাচ্ছিল প্রায়, নেহাত চৌদ্দ পুরুষের সুকৃতিতে পার পেয়ে গেছি। আর যাত্রার সোনার হরিণের কথা শুনতে শুনতে আমি কি সোনার হরিণ দেখছিলাম না ভাবছিলাম? আমি ভাবছিলাম—ভাবছিলাম কেন—চোখের সামনে দেখছিলাম জিংগারোকে—ঠিক সোনার হরিণের মতো তার হাব-ভাব আর মন-ভোলানোর ছল-চাতুরি!

তারপর ভাবোন্মত্ত গলায় গত রাতের যাত্রার খানিকটা হুবহু আবৃত্তি করে গেল:

'মারীচ সশংক হয়ে যায় ধীরে ধীরে,
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে।
ক্ষণে চায় ক্ষণে চায় মনে বহুদূর,
নানা রঙে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে,
শ্রীরাম গেলে সে পালায় বহুদূরে।

পিন্‌ডিদা গদগদ, চাউনি কোন সুদূরে, বলে উঠল, আমাদের সামনে এসে জিংগারো অবিকল তাই করে আমাকে আর নারলেকারকে জঙ্গলের গভীরে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে টেনে নিয়ে গেছল—কি বাঁচা যে বেঁচেছি মনে পড়লে এখনো হৃৎকম্প হয়।

আমরা হাঁ। এত অবাক যে হাবুলের ওপর রাগও ভুলেছি। কার্তিক বলে উঠল, জিংগারোই বা কে?

পিন্‌ডিদা যেন স্মৃতির পুকুরে এখনো ডুবে আছে, কোনোরকমে একটু গলা তুলে বলল, ডক্টর লেঁবোর মগজ-বদলানো গ্রেট-ডেন কুকুর।—'আগে ধায় পিছে যায় চায় ফিরে ফিরে'—কি-ভাবেই না আমাকে আর নারলেকারকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আধ মাইল জঙ্গলের পথ ভেঙে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে ঢুকিয়ে ছাড়ল! খুব সময়ে নেবুচিকে হাত করতে না পারলে ফুটবলের ব্রেন-সেল ডাকাতি হয়ে আজ মারীচের দশা না হোক, তোদের পিন্‌ডিদাকে আজও ব্রেজিলের কোনো পাগলাগারদে পড়ে থাকতে হত....কি সাংঘাতিক লোক অক্স-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হুটেনটেটের লোকটা! ....বেচারা গোল্ডস্টোন আর ক্যান্‌ডি, কোথায় কি-ভাবে আছে এখন কে জানে! ওরা অক্স-ডনের ক্যাপটেন আর গোল-কীপার।

আমি হাঁ করে পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছি। হাবুল ছাড়া অন্যদেরও একই অবস্থা। হেবো-হোঁতকা বুঝে ফেলেছে ওর ফাঁড়া তো কেটে গেছেই, উল্টে পিন্‌ডিদাকে মারীচ বধ যাত্রা দেখানোর জন্যেই রোমহর্ষক কিছু শোনার সম্ভাবনা এখন।

একটু অপেক্ষা করেও কেবলু দেখল, পিন্‌ডিদা আবার স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। ও বলে উঠল, যাঃ কলা—শব্দ-ব্রহ্মং কেবলম্ মগজে প্রবেশন্তি!

পিন্‌ডিদার কানে গেল না। ফ্যালফেলে চোখে অতীতে তলিয়ে আছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে কার্তিক বলল, নেবুচি অক্স-ডন্ হুটেনটেটের গোল্ডস্টোন ক্যান্‌ডি...এরা সব মানুষ না অন্য গ্রহের কেউ?

ঝিমুনো গলায় পিন্‌ডিদা জবাব দিল, তোরা যে গ্রহের ওরাও সেই গ্রহের।

তাকে একটু তাতানোর জন্য চটপটি চটপট অন্য পন্থা ধরল।—কিন্তু পিন্‌ডিদা তুমি এমন ঝিম মেরে গেলে কেন, তোমার ব্রেন-সেলে তো মারীচের মতো ছুরি পড়েনি....নাকি খানিকটা খোয়া গেছল....মনে পড়তেই কাহিল হয়ে গেলে?

পিন্‌ডিদা টেনে টেনে বলল, তুই একটা গাধার মতো বাঁদর, ক্রিয়েটিভ ব্রেন-সেল অপারেশন করে সরাতে ডক্টর লেঁবোর ছুরি-কাঁচির দরকার হয় না—লেসার বীম্ দিয়েই সে সব কাজ সারে....

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, তার

মানে লেসার বীম্ দিয়ে তোমার ব্রেনের ক্রিয়েটিভ সেল মানে ফুটবল প্রতিভার সেল ডাকাতি হয়েছিল বলছ?

এবারে পিন্ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, ডাকাতি হচ্ছিল বলেছি, না হতে হতে জোর বাঁচা বেঁচে গেছি বলেছি?

আমি শুধরে নিলাম, না না, হতে হতে বেঁচে গেছই বলেছ...তার মানে মারীচ বধ তোমার কাছে খাঁটি সায়েনটিফিক ব্যাপার একটা, আর তুমিও ডক্টর লেঁবো না কে তার হাতে পড়ে মারীচের মতোই ভিকটিম হতে যাচ্ছিলে?

আকাশের দিকে মুখ তুলে পিন্ডিদা মন্তব্য করল, আমাদের ভাবী স্কলার সোনা সব-কিছু বড় তাড়াতাড়ি বোঝে।

সোনা বলতে আমি, আর ভাবী স্কলার বলতে এবারে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপ পাব আশা করছি। কৌতূহল এত বেশি যে টিপ্পনী গায়ে না মেখে জিগ্যেস করলাম, ব্রেন-সেল অপারেশন করে পার্টিকুলার কোনো ক্রিয়েটিভ সেল চেনা যাবে কি করে?

—কি করে চেনা যাবে জানলে তুইও পাঁচবার নোবেল প্রাইজ পেতিস—পৃথিবীতে ডক্টর লেঁবোর মতো পাগল জিনিয়াস একটাই জন্মায়—বুঝলি? আর তার খপ্পর থেকে বাঁচতে হলে চৌদ্দ পুরুষের পুণ্যি চাই—সাত ফুট লম্বা নিগ্রো নেবুচিকে তিন ফুটের বাঁটকুল বানিয়ে রেখেছিল—সেই বিদ্যার জোরেই ডক্টর লেঁবো একটা নোবেল প্রাইজ পেতে পারতো—নাঃ আমি আর ভাবতে পারছি না—হেবো যে কি কুক্ষণেই আমাকে কাল সন্ধ্যায় মারীচ বধ দেখাতে নিয়ে গেছলি—

করুণ গলায় হাবুল বলল, আমি কি জানতাম পিন্ডিদা, মারীচ বধের পিছনে এমন সত্যিকারের বিরাট রহস্য আছে!

কেবলু বলে উঠল, রহস্যস্য ঘনঘটাঃ!

চটপটি আর কার্তিক হাঁ করে পিন্ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কৌতূহলে ওদেরও দম আটকে আসছে। কিন্তু পিন্ডিদা এখনো এই বর্ধমানের আকাশের দিকে চেয়ে আছে না ব্রেজিলের স্যানটসের আকাশে ডানা মেলেছে ঠাওর করা যাচ্ছে না।

এবারে মিনতির সুরে আমিই বললাম, দোহাই পিন্ডিদা, আর আমাদের এমন দম বন্ধ করে রেখো না—তোমার মগজ ডাকাতির ব্যাপারখানা কি একটু খুলে বলো—

কিন্তু এমন আবেদনও পিন্ডিদার কানের পর্দা ভেদ করল বলে মনে হলো না। কিছু মনে পড়তেই বোধহয় একবার শুধু শিউরে উঠল।

অনুনয়ের সুরে চটপটি ডাকল, ও পিন্ডিদা....

নিষ্ফল।

হাত জোড় করে এবারে কেবলু সংস্কৃতের কামড় বসালো।—পিন্ডিদা, কৃপাং কুরু, রহস্যাঘাতে অস্মাকম জঠরঃ ফুল্লিতং!

পিন্ডিদা সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু কেবলুর সংস্কৃত শুনলে মড়া খাট থেকেও জেগে ওঠে। আকাশ থেকে দু'চোখ মাটিতে নেমে এলো। সোজা ওর মুখের ওপর। নড়েচড়ে বসা থেকে ওঠার উপক্রম। গলা দিয়ে দু'শব্দের একটা বাক্য বেরুলো, আমি চলিতং।

সংগে সংগে আমি কেবলু আর কার্তিক একসংগে হাত জোড় করে ফেললাম। আমি বললাম, বোসো পিন্ডিদা, কেবলু ক্যাবলা বলেই ও-ভাবে ওর সংস্কৃত শুনে তুমি খুশি হও। কিন্তু দোহাই পিন্ডিদা, আর আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে রেখো না, তোমার মগজ ডাকাতির কথাটা শোনা পর্যন্ত আমাদের পাল্স রেট দুশ' করে হয়ে গেছে—এরপর তুমি মুখ না খুললে আমরা গণ-হার্টফেল করব।

পিন্ডিদা অপলক চোখে আমার দিকে খানিক চেয়ে রইলো। মনে হলো চোখের এক্স-রে দিয়ে আমার কংকালসুদ্ধ দেখে নিচ্ছে।—আজ বিনোদের দোকানের মেনুর খবর রাখিস?

আমি হতচকিত। মাথা নাড়লাম, রাখি না।

—তা রাখবি কেন, তার থেকে তোদের আনন্দ দেবার জন্য বকে বকে পিন্ডিদা গলা বুক শুকিয়ে মরুক।....জীবনে এত খেয়েছি যে আমারও আর অত খাবার লোভটোভ নেই, তবু গন্ধটা নাকে আসতে ঢুকে পড়লাম। শুনলাম, আজকের স্পেশাল মেনু মেটে চচ্চড়ি আর মোগলাই পরোটা। বিনোদ জিগ্যেস করল, ছ'টা মোগলাই পরোটা আর ছ'ডিশ মেটের চচ্চড়ি টিফিন ক্যারিয়ারে তুলে রেখে দেবে কি না? আমি বললাম, রাখতে পারো কিন্তু পরে বেচে দেবার জন্য প্রস্তুত থেকো—আমাদের সোনার যা মতি-গতি, হয়তো পকেট উল্টে দেখাবে গড়ের মাঠ। বিনোদটাও কি সোজা পাজি, তক্ষুণি বলল, সোনাবাবুর নামে ধার লিখে রাখব তাতে আর কি—ও তো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখারই সামিল।....ওর বজ্জাতির কথা শুনে আমি রাগ করে চলে এলাম।

আমার টনক তক্ষুণি নড়েছে। ছ'টা মোগলাই পরোটার দাম দেড় টাকা করে ন'টাকা, আর ছ'ডিশ মেটের চচ্চড়ি আড়াই টাকা করে পনেরো টাকা। এক বিকেলে চব্বিশ টাকার মামলা।

আমাকে হতবাক দেখে এবারে হেবো হোঁতকাই খেঁকিয়ে উঠল, অত ভাবছিস কি, তোর কি একটু দয়ামায়া নেই—পিন্ডিদার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিস?

ভিতরে ভিতরে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু ঠাণ্ডা মুখে ওকে বললাম, যা, ছুটে গিয়ে পিন্ডিদার জন্য কেবল একটা পরোটা আর এক ডিশ মেটের চচ্চড়ি নিয়ে আয়।

হেবো হোঁতকা এই জবাব আশা করেনি। হয়তো বাকি ক'জনও করেনি। বিমূঢ় মুখে হাবুল পিন্ডিদার দিকে তাকাতেই সে খেঁকিয়ে উঠল। ডক্টর লেঁবোকে হাতের কাছে পেলে তোর মাথায় খানিকটা মানুষের ঘিলু ইন্জেক্ট করার ব্যবস্থা করতাম—সোনা ঠাট্টা করছে এ-ও বুঝতে দেরি হচ্ছে তোর? যা, বিনোদের টিফিন কেরিয়ার রেডিই পাবি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস কেবল একটা আমারই পড়ল। মনে মনে ঠিক করলাম, শোনার মতোই কিছু যদি না শুনি, তাহলে এমন তেরছা কিছুই বলব যাতে পিন্‌টিদার মোগলাই পরোটা আর মেটের চচ্চড়ি উগরে দিতে ইচ্ছে করে।

হেবো হোঁতকা পড়ি মরি করে ছুটেছে। পিন্‌টিদাকে দেখে মনে হলো তার মন আবার ব্রেজিল বা স্যানটস বা ডক্টর লেঁবোর জঙ্গলের ল্যাবরেটোরিতেই উধাও।

একসঙ্গে খাবার এলে ভাগ করার দায়িত্ব কার্তিকের। ডিশ ছ'টাই এসেছে কিন্তু মেটের চচ্চড়ির ভাগটা সাত ডিশের মতোই হলো। পিন্‌টিদার ডিশে এক পীস্ করে মেটে বেশি দিলেই ভাগটা মোটামুটি সাত ডিশই হয়। হাবুলই প্রথম নিজের মোগলাই পরোটা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে পিন্‌টিদার ডিশে রাখল। ফলে দেখাদেখি সবাই তাই করল। অর্থাৎ ছ'খানা মোগলাই পরোটাও সাত ভাগ। কিন্তু পিন্‌টিদার দৃষ্টি এখনো সুদূরে উধাও। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে লক্ষ্য করার সে অনেক ঊর্ধ্বে।

ধীরে সুস্থে খাওয়া শুরু হলো। শেষও হলো। দু'বোতল জলও হাতে হাতে শেষ হয়ে গেল। উচ্ছিষ্ট ডিশগুলো আর টিফিন কেরিয়ার হাবুল গুছিয়ে রেখে, ওটা সরিয়ে রাখার পর সকলে রেডি।

পিন্‌টিদা একটু ঝিম মেরে থেকে বলল, হেবো ভাবতেও পারবে না, কাল মারীচ বধ দেখানোর জন্য ওর কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ। ওটা দেখার পর আমি পুনর্জীবন লাভের স্বাদ পেয়েছি।

কালো কুচকুচে বামন নিজের পরিচয় দিল।—আমি নেবুচি

হাবুল হোঁতকা খুশিতে এমন দুলতে লাগল যে ওর দু'পাশে কার্তিক আর আমি নিরাপত্তার দায়ে একটু সরে সরে বসলাম।

এরপর কিছু ভণিতার পর পিন্‌ডিদা তার মগজ ডাকাতির কাহিনী শুরু করল। যতটা সম্ভব আমি সেই চিত্রই শুকতারার পাঠক পাঠিকার সামনে তুলে ধরছি।

....অক্স-ডন্ ক্লাব হলো পিন্‌ডিদার ব্রেজিল ইলেভেনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল ক্লাব। অক্স-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ধূর্ত হুটেনটেটর কোনো একসময় আর্মির লোক ছিল। সেই সুবাদে সে কিছুকাল ভারতে ছিল। এখানে ষাঁড়ের লড়াই দেখে তার মনে হয়েছিল এমন হিম্মতের লড়াই আর হয় না। অক্স মানে ষাঁড়। আর ডন মানে ডন-বৈঠক আর কি। ভারতে এসে কিছু কিছু বাংলা শব্দও হুটেনটেটর শিখেছে। বেনারসে এসে ষাঁড়ের লড়াই দেখে সে মুগ্ধ। দেখে জোরদার ডন-বৈঠকের লড়াই-ই মনে হয়েছে তার। নিজের মুখের আদলও ষণ্ডের মতোই। দেশে ফিরে খেলোয়াড় বাছাই করে ফুটবল-দল গড়েছে সে। নাম দিয়েছে অক্স-ডন্ ক্লাব। অর্থাৎ তার ক্লাবের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় এক-একটি লড়িয়ে দুর্ধর্ষ ষাঁড়। কিন্তু কোনো প্রতিযোগিতায়ই তার ক্লাব পিন্‌ডিদার ব্রেজিল ইলেভেনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তার চোখের কাঁটা পিন্‌ডিদা। পিন্‌ডিদার তখনো হাঁটুর মালাই-চাকি সরেনি বা নড়েনি। ফুটবল-আকাশের সে তখন এক অনন্য তারকা। ফাইনালে উঠেও শুধু তার জন্যেই অক্স-ডন্ ক্লাব কোনোবার ট্রফি জিততে পারছে না। বার বারই তার ক্লাব রানারস আপ। ফাইনালে তাদের হার বাঁধা।

ব্রেজিল ইলেভেন হঠাৎই অক্স-ডনের হুটেনটেটরের কাছ থেকে একটা বিচিত্র রকমের আমন্ত্রণ পেল। পৃথিবীর দুই সেরা টিম অক্স-ডন্ ক্লাব আর ব্রেজিল ইলেভেন স্যানটসে একটা বিখ্যাত গোল্ড-কাপ টুর্নামেন্ট খেলবে—খেলার ইতিহাসে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই খেলায় ফুটবলের 'কিং অফ কিংস্'(রাজার রাজা) নির্বাচিত হবে। সেই কিং অফ কিংস্ পাবে মস্ত একখানা সোনার কাপ। নগদ পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। জিতিয়ে দলের অন্যেরা পাবে প্রত্যেকে ছোট সোনার কাপ আর দশ হাজার ডলার নগদ। যারা হারবে তারা কেবল প্রত্যেকে পাবে রূপোর কাপ আর আড়াই হাজার ডলার নগদ। কিন্তু সব থেকে উত্তেজনার ব্যাপারখানা হলো কিং অফ কিংস্ নির্বাচন। ব্রেজিল ইংল্যান্ড রাশিয়া ফ্রান্স আর হল্যান্ড থেকে এই নির্বাচনের জন্য পাঁচজন অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ জাজ্ আনা হবে।

খবরটা কাগজে বেরুতে বেশ একটু সোরগোলই পড়ে গেল। ব্রেজিল ইলেভেনের ম্যানেজার বলল, পিন্‌ডি, আর

কেন, কোমর বেঁধে তৈরি হও–সব তো তোমার কপালেই ঝুলছে।

পিন্‌ডিদা একটু ভেবে মাথা নাড়ল।–উঁহু, কেমন একটা গণ্ডগোলের গন্ধ পাচ্ছি....।

ম্যানেজার অবাক, সে আবার কি?

পিন্‌ডিদা বলল, অক্স-ডন্ ক্লাব প্রত্যেক বছরই ফাইনালে আমাদের সঙ্গে হেরে চলেছে, তবু হুটেনটেটের এমন বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে কি করে–কোন সাহসে? খেলাটাই বা এই এখানে না হয়ে স্যানটসে কেন?

ম্যানেজার বলল, দূর পিন্‌ডি, এতবড় একটা স্পোর্টসম্যান হয়ে তুমি বড় বেশি ভাবো। এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট–বুঝলে? চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে কেমন সাড়া পড়ে গেছে দেখছ না–হুটেনটেটের নিশ্চয় চার ভাগের টিকিট সরিয়ে রাখবে, আর দুশ' ডলারের টিকিট শেষে দু'হাজার ডলারে বিক্রি করবে। যা-ই হোক, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট না করলে আমাদের মান থাকবে?

এটা সত্যি কথা। মনের খুঁতখুঁতুনি নিয়েও পিন্‌ডিদা রাজি না হয়ে করে কি?

এরপর এমনই একটা সাড়া পড়ে গেল যে সাত দিন আগে থাকতে দর্শকের ভিড়ে কোনো হোটেলে আর তিলধারণের জায়গা নেই। আগে থাকতেই দুই দলের খেলোয়াড়দের জন্য দুটো সাত-তারা হোটেলের ঘর বুকড্। আর মস্ত চ্যালেঞ্জ হলেও এটা তো উৎসব ধরনের খেলা। তাই বেড়ানো আর আনন্দ করার জন্য দুই দলের সকলকেই খেলার তিন দিন আগে থাকতে এয়ারে স্যানটসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। তা এমন রাজসিক আনন্দে আর ফূর্তিতে থাকতে পেলে কোন দল না তিন দিন ছেড়ে তিরিশ দিন আগে যেতে রাজি হয়?

এ ব্যাপারেও কেবল পিন্‌ডিদারই ভিতরটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। দু'দলের তিন দিনের সাত-তারা হোটেল খরচাও তো এক ইলাহী ব্যাপার!

যা-ই হোক, একটু দুশ্চিন্তা মনে চেপেই পিন্‌ডিদা দলের সঙ্গে তিন দিন আগেই এরোপ্লেনে স্যানটসে রওনা হয়ে গেল।

প্লেনে উঠেই পিন্‌ডিদার সঙ্গে লন্ডন টাইমস-এর স্পোর্টস জার্নালিস্ট বন্ধু মিস্টার নারলেকারের সঙ্গে দেখা। দু'জনকে দেখে দু'জন দারুণ খুশি। এই খেলা কভার করার জন্য সে লন্ডন থেকে উড়ে এসেছে। তাদের এত বন্ধুত্ব দেখে দলের অন্য খেলোয়াড়রা হাসাহাসি করে আড়ালে বলত, দু'জনেরই রোগা-পটকা ঢ্যাঙা হাড়গিলে চেহারা কিনা তাই এত ভাব।

কিন্তু আসলে যে কারণে অন্য খেলোয়াড়রা নারলেকারকে এড়িয়ে চলত, ঠিক সেই কারণেই পিন্‌ডিদার সঙ্গে তার অত ভাব। স্পোর্টস জার্নালিস্ট হলেও লোকটা দিলদরিয়া আধ-পাগলা, আর বেজায় দার্শনিক গোছের। হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কিছু দেখে অকারণে হি-হি করে হাসতে থাকে যার কোনো কারণ কেউ খুঁজে পায় না। আবার হঠাৎ হঠাৎ প্রকৃতির কিছু দেখেও স্থান কাল ভুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। তখন কি করছিল কি বলছিল কিছুই আর খেয়াল থাকে না। পিন্‌ডিদার মনে হত এটা হয়তো এক ধরনের রোগ। কিন্তু বড় মজার রোগ।

দু'জনে প্লেনেই ঠিক করে নিল, পাশাপাশি ঘরে তারা দু'জনে থাকবে, একসঙ্গে ঘুরবে বেড়াবে ফূর্তি করবে, খেলার পরে আবার পিন্‌ডিদার স্পেশাল ইন্টারভিউ নেবার জন্য সে আবার তার সঙ্গে ফিরে আসবে। কারণ, ফুটবলের কিং অফ কিংস্ যে পিন্‌ডিদাই হবে তাতে তো তার একটুও সন্দেহ নেই। এই চ্যালেঞ্জ-কাপ খেলার পর পিন্‌ডিদার ষোল পাতার একটা বিরাট কভারেজ দেবে সে–তাতে পিন্‌ডিদার খাওয়া শোয়া ওঠা বসা আরাম বিরাম পছন্দ অপছন্দ হবি–যাবতীয় কথা থাকবে।

স্যানটসের সাত-তারা হোটেলের ইলাহী ব্যবস্থা। স্বর্গের দেবদূতেরা সব এসে উঠেছে যেন। এমনি আরাম বিলাস আর খাওয়ার ব্যবস্থা। বেড়াবার জন্য সক্কলের এক-একখানা করে ঢাউস এয়ারকনডিশনড্ গাড়ি। আর তেমনি দিলদরিয়া বিপক্ষ অক্স-ডন্ ক্লাবের সর্বাধ্যক্ষ হুটেনটেটের। শত্রুপক্ষের সক্কলে যেন তার পরম আপনার জন।

এ-সব দেখেশুনে পিন্‌ডিদার খুঁতখুঁতুনি বাড়তেই থাকল। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার মানুষ সে নয়।

প্রথম রাতটা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কেটে গেল। পরদিন খেলোয়াড়রা সব যে যার গাড়ি নিয়ে ইচ্ছেমতো বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। পিন্‌ডিদা আর নারলেকারও এক গাড়িতে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত। আর তাদের বেড়িয়ে আনার জন্য প্রস্তুত এক নিগ্রো ড্রাইভারও।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়ি এক নির্জন রাস্তার দিকে চলল। নিগ্রো ড্রাইভারটা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করতে জানালো সে একশ কিলোমিটার দূরের এখানকার এক ফেমাস জাংগল্ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

নারলেকার শুনেই উৎসাহিত।–ফার্স্ট ক্লাস!

কিন্তু খুঁতখুঁতে পিন্‌ডিদা আবার চিন্তিত। কিছু না বলতে লোকটা তাদের জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন!

কিন্তু সাড়ে ছ'ফুট নিগ্রোটাকে দেখে সে আর কিছু বলল না। হতেও পারে, স্যানটসের জঙ্গলও দেখার জিনিস আছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করল, নারলেকার মুগ্ধ চোখে আকাশ দেখছে। পিন্‌ডিদাও উঁকি দিয়ে দেখার মতো কিছু দেখল না। একটু বাদেই নারলেকার হি-হি করে হাসতে লাগল। জিগ্যেস করতে বলল, আকাশের ওই মেঘটাকে সমুদ্রের বুকে ডানা-ছড়ানো অ্যালবেট্রসের মতো লাগছিল, দ্যাখো, হঠাৎ যেন ওটা কেশর-ফোলানো সিংহের মতো হয়ে গেল!

তার মর্যাদার খাতিরে পিন্‌ডিদাও হাসল একটু।

একটু বাদে কি মনে পড়তে নারলেকার হি-হি করে হাসতে

হাসতে বলল, অক্স‌ডনের ওই হুটেনটেটের লোকটা কি বজ্জাত জানো, এই খেলার একটা আগাম ঢাউস ম্যাগাজিন ছেপে রেখেছে, খেলার শেষে সারকুলেট করবে। সে ধরেই নিয়েছে এই খেলায় তোমরা এগারো শূন্য গোলে হারবে। এই নিয়ে খুব মজার মজার সব লেখা ছাপা হয়েছে। আর সকলের থেকে দারুণ ছাপা হয়েছে লম্বা-লম্বি দু'পাতা জোড়া তোমার একখানা রঙিন কার্টুন। একটা নয়, একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো দুটো। একটা হলো তালগাছের মতো মাথা উঁচনো পিন্‌ডিদা। তার নিচে লেখা, পিন্‌ডি বিফোর দ্য চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট। তার পাশে গায়ে লাগা ছোট্ট এক বামন পিন্‌ডিদা। তার নিচে লেখা, পিন্‌ডি আফটার দ্য চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট। অর্থাৎ একটা হলো এই খেলার আগের আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি, আর পাশেই হলো এই খেলার পরের বামন হয়ে যাওয়া পিন্‌ডি।

দেখেই তো পিন্‌ডিদা রাগে ফুলে উঠল। কিন্তু নারলেকারের কথা শুনে সচকিত। হুটেনটেটর নাকি বলেছে এই টুর্নামেন্টে অক্স-ডন ক্লাব কম করে এগারো গোলে জিতবে, সেই জন্যেই আগাম এই ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে আছে, খেলার পর সারকুলেট করা হবে। একখানা ম্যাগাজিন সে নাকি নারলেকারকে দিয়ে বলেছে, এটা তুমি তোমার বন্ধু পিন্‌ডিকে আগাম উপহার দিতে পারো—সে দেখে রাখুক ফুটবলের আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি এই খেলার পর কেমন বামনটি হয়ে গেছে।

অন্য কেউ হলে ভাবত পিন্‌ডিদাকে ঘাবড়ে দেবার জন্য এই ম্যাগাজিন ছাপা হয়েছে। কিন্তু তা তো হতে পারে না—এ ম্যাগাজিন তো এখন পর্যন্ত কারো চোখেই পড়েনি—এটা বিলি হবে 'কিং অফ কিংস্' টুর্নামেন্ট খেলার পরে। বরাবর হেরে এবারে হুটেনটেটর জিতবে বলে এমন শিওর হয়ে বসে থাকে কি করে!

ম্যাগাজিনটা কোলের ওপর ফেলে রেখে পিন্‌ডিদা ভাবতে বসল। সমস্ত ব্যাপারটাই কি-রকম একটা তৈরি গোছের মনে হচ্ছে তার। যত ভাবছে ততো দুশ্চিন্তা। ....এই ড্রাইভার ব্যাটাই বা একশ কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে সব ছেড়ে তাদের জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন!

নারলেকার বকবক করেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু দেখে হি-হি করে হেসে উঠছে। এক একসময় আবার কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলের সামনে গাড়ি থামিয়ে বলল, তোমরা জঙ্গল ঘুরে দেখে এসো, আমি অপেক্ষা করছি।

নারলেকার তক্ষুণি পা বাড়াবার জন্য তৈরি। পিন্‌ডিদা হাত ধরে তাকে থামালো। ড্রাইভারকে বলল, হাতে বন্দুক নেই কিছু নেই, জঙ্গলে ঢুকব কেন, এর ভিতরে গিয়ে দেখার কি আছে?

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে ড্রাইভার জানালো, এখানে ভয় পাবার মতো কোনো জানোয়ার নেই, এটা হলো ডক্টর লেঁবোর জঙ্গল, মাইল দুই এগোলে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারি দেখতে পাবে—পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য জিনিস, সভ্য জগতের কেউ আজও এর খবর রাখে না—মিস্টার হুটেনটেটর তোমাদের এই দুর্লভ জিনিসটি দেখিয়ে আনতে হুকুম করেছে—চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

শুনে খবরের কাগজের নারলেকর যত খুশি পিন্‌ডিদা ততো চিন্তাচ্ছন্ন। ডক্টর লেঁবো কে? জঙ্গলের মধ্যে তার ল্যাবরেটারি এ আবার কি ব্যাপার! হুটেনটেটেরেরই বা এই ল্যাবরেটারি দেখানোর এত আগ্রহ কেন!

এই চিন্তার ফাঁকেই এক বিস্ময়কর কান্ড ঘটল। জঙ্গলের সামনেই দাঁড়িয়ে একটা গ্রেট-ডেন কুকুর। ওটার চোখে চোখ পড়তে পিন্‌ডিদা আর নারলেকার দু'জনেই অবাক। তিন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ডান দিকের সামনের পা কপালে ঠেকিয়ে স্যালিউট জানালো, তারপর ওই পা-টাই নেড়ে নেড়ে কাছে আসার ইশারা করতে লাগল। আর আশ্চর্য! কুকুর কখনো হাসে? হ্যাঁ স্পষ্টই তারা দেখছে কুকুরটা হাসছে। হাসি ছাড়া কি বলবে পিন্‌ডিদা বা নারলেকার! হাসছে আর একটা পা তুলে যেন সাদর অভ্যর্থনায় নেড়ে নেড়ে দু'জনকে কাছে ডাকছে।

বিস্ময়ের পরেই খুশিতে আটখানা হয়ে নারলেকার ওটার দিকে ছুটল। অগত্যা পিন্‌ডিদাও পিছু নিল। ছুটে তার কাছে গিয়ে বলল, নারলেকার, আমি ব্যাপার ভালো বুঝছি না, চলো ফিরি—

নারলেকারের থেকে কুকুরটাই যেন পিন্‌ডিদার মনের ভাব বেশি বুঝল। ঘুরে দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা দিয়ে যেন হাত জোড় করে তার সঙ্গে আসার জন্য মিনতি জানালো, তারপর একটা পা এমন ভাবে দু'দিকে নাড়লো যেন বলছে, তোমরা এসো দয়া করে, কোনো ভয় নেই।

নারলেকার বলে উঠল, আমি জার্নালিস্ট, এমন কুকুর পৃথিবীতে কেউ দেখেছে—দেশে ফিরে আমার কাগজে সাড়া ফেলে দেব—ও আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায় দেখতেই হবে—হোয়াট্ এ ডগ্!

গ্রেট-ডেন কুকুরটা এঁকে বেঁকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে, ঘুরে দেখছে ওরা আসছে কিনা—খুশি হয়ে দাঁত বার করছে, আবার ঢিমেতালে ছুটছে।

আশ্চর্য, স্যানটসের জঙ্গলে তক্ষুণি পিন্‌ডিদার মারীচ বধের পঙ্‌ক্তিগুলো মনে এসে গেল—

'ক্ষণে চায় ক্ষণে যায় ক্ষণে বহুদূর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।'

—এখানে কেবল চলে 'মৃগ' না হয়ে চলে 'কুকুর' হলেই হুবহু মেলে। ভয় সত্ত্বেও ততক্ষণে পিন্‌ডিদারও কৌতূহলের নেশা ধরে গেছে। জঙ্গল বেশ নিবিড়, কিন্তু তার মধ্যে সুন্দর পায়ে চলা রাস্তা। আধ ঘণ্টার ওপর ছুটিয়ে গ্রেট-ডেনটা যেখানে পিন্‌ডিদা আর নারলেকারকে নিয়ে এলো—দেখে দু'জনেই হাঁ।

সামনে মস্ত আঙিনার মধ্যে মস্ত একটা দুধ-সাদা বাংলো বাড়ি। যেন শ্বেতপাথরের তৈরি। কম্পাউন্ডের চারদিকে উঁচু দেয়াল, সামনে প্রকান্ড ইস্পাতের ঝকঝকে গেট। কুকুরটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই ওটা আপনি খুলে গেল। দু'দিকে চমৎকার বাগান, মাঝখানের তকতকে রাস্তা বাংলোর সিঁড়িতে গিয়ে শেষ।

বাংলোর দাওয়ায় বড় জোর সাড়ে তিন ফুট লম্বার গাঁট্টা-গোট্টা কালো কুচকুচে একটা বামন দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট। ওখান থেকেই ব্রেজিল দেশের ভাষায় হাঁক দিল, জিংগারো! গেস্টদের আদর করে নিয়ে এসো!

দু'জনেই বুঝল এই অদ্ভুত শিক্ষিত গ্রেট-ডেন কুকুরটার নাম জিংগারো। হুকুম শুনে সে আবার দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা জোড় করে একটু একটু দাঁত বার করে হেসে মিষ্টি দুটো ঘেউ ঘেউ ডাক দিয়ে যেন মানুষের মতোই অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালো। দারুণ আনন্দে নারলেকার হি-হি হি-হি হি-হি করে হাসতে লাগল। কিন্তু এক অজ্ঞাত আশংকায় পিন্‌ডিদার কপালে ঘাম ছুটেছে। নারলেকারের প্রেজেন্ট করা হাতের ম্যাগাজিনটা নেড়ে নিজেকে বাতাস করছে আর ভাবছে কি করবে। কিন্তু ভাবার অবকাশ পাবে কি করে, নারলেকার তাকে টানতে টানতে গেটের এ-ধারে নিয়ে এলো। এখনো সে ফূর্তিতে হেসেই চলেছে। তারা এ-ধারে আসতেই স্টিলের গেট আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

পিন্‌ডিদার গা ছমছম করছে। ঝকঝকে দিন, দু'দিকের বাগানের ফুল আর গাছপালাও যেন আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। সে-সবও যেন দুলে দুলে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পায়ে পায়ে বাংলোর বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াতেই বামন লোকটা মাথা নিচু করে স্প্যানিশ-ভাষায় যা বলল, তার অর্থ, ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে অতিথিদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি—দয়া করে চলে এসো।

স্প্যানিশ ভাষা নারলেকারও কিছু বোঝে। অভ্যর্থনার জবাবে সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে পিন্‌ডিদার হাত ধরে সে দাওয়ায় উঠল।

কালো কুচকুচে বামন নিজের পরিচয় দিল।—আমি নেবুচি, ডক্টর লেঁবোর একমাত্র সহচর আর কমবাইনড্ হ্যান্ড—তোমরা আসছ ডক্টর লেঁবো আমাকে বলে রেখেছে—সে লাঞ্চের আগেই স্যানটস থেকে ফিরবে, তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যই আমি জিংগারোকে পাঠিয়েছিলাম। দয়া করে ভিতরে এসে বোসো—

পিন্‌ডিদার মন বলছে তারা কোনো ফাঁদে পা দিয়েছে। ....এত বার হেরেও হুটেনটেটেরের এ-রকম একটা চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া, আগে থাকতে ম্যাগাজিনে পিন্‌ডিদার অমন লম্বা আর বেঁটে কার্টুন ছেপে রাখা, তাদের জঙ্গলে পাঠানো, এ-রকম আশ্চর্য কুকুর জিংগারো, ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারি, সে আগে থাকতেই জানে তারা এই ল্যাবরেটারিতে আসছে, নেবুচিকে বলে গেছে আর নেবুচি জিংগারোকে পাঠিয়েছে তাদের আনতে...এর পিছনে ভীষণ কিছু ষড়যন্ত্র আছেই। মনের ভাব গোপন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, হ্যাঁ, জিংগারো আমাদের চমৎকার আনন্দ দিতে দিতে নিয়ে এসেছে, এমন ট্রেন্‌ড্ কুকুর আর দেখিনি—

ভিতরে নিয়ে যেতে পুরু ঠোঁট উল্টে নির্লিপ্ত মুখে নেবুচি বলল, হবে না কেন, ওর মগজ অপারেশন করে ডক্টর লেঁবো তো ওর মাথায় মানুষের মগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে—

শুনে নারলেকার হাঁ, আর পিন্‌ডিদার পিলে চমকে গেল।—কুকুরের মাথায় মানুষের মগজ!

নেবুচি বলল, ডক্টর লেঁবোর কাছে এ তো জল ভাত ব্যাপার—এই ল্যাবরেটারিতে মগজ বদলানোর অনেক নজির দেখতে পাবে। ডক্টর লেঁবোর এই এক্সপেরিমেন্ট পৃথিবীর কম লোকেই জানে—তোমাদের ভাগ্য এত ভালো হলো কি করে জানি না।

কথার ফাঁকে বিশাল এক হল্-এ ঢুকেছে তারা। দু'দুটো টেনিস লনের মতো বিশাল হল্। পিন্‌ডিদা আর নারলেকার বিস্ময়ে হতবাক। হলের দু'মাথায় সারি সারি খাঁচা। কোনোটা ভাঙে না এমন কাচের, কোনোটা জালের, কোনোটা বা ইস্পাতের। তাতে হরেক রকমের জন্তু-জানোয়ার। একটা কাচের খাঁচায় বিশাল একটা সিংহ শুয়ে আছে। আবার পরের ইস্পাতের খাঁচায় একটা ভেড়া—রাগে ভ্যা-ভ্যা নয়তো যেন গোঁ-গোঁ করছে।
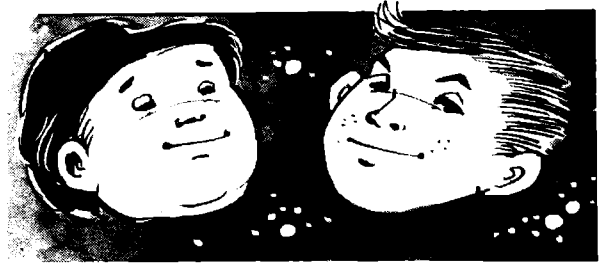
নেবুচি বলল, আগে চা বা কফি খেয়ে ধীরে সুস্থে দেখো, এখানে ঠিক দেড়টায় লাঞ্চ, তোমরা ব্রেক-ফাস্ট করেই বেরিয়েছ নিশ্চয়?....তাহলে চা খাবে না কফি?

চাপা উত্তেজনায় জার্নালিস্ট নারলেকারের মুখ লাল। বলল, কফি—

যেতে গিয়েও বামন নেবুচি ঘুরে দাঁড়ালো।—ভালো কথা, তোমাদের মধ্যে ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডি কে?

চকিতে মাথায় কি খেলে গেল পিন্‌ডিদার। নারলেকারকে দেখিয়ে বলল, ইনি ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডি আর আমি তার সহচর এবং পা-গার্ড।

নেবুচি অবাক একটু।—পা-গার্ড কি?

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা আবার নারলেকারের পায়ের দিকে ইশারা করে জবাব দিল, ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডির পায়ের

দাম আশি লক্ষ ডলার—ইন্‌সিওর করা আছে—ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির তরফ থেকে আমি তাই মিস্টার পিন্‌ডির পা-গার্ড।

নেবুচি খানিক হাঁ করে চেয়ে থেকে কফি আনতে চলে গেল। নারলেকার ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, এটা কি-রকম হলো?

পিন্‌ডিদা বলল, একটা সহজ কথা বুঝতে পারছ না, ডক্টর লেঁবো যদি জানতে পারে একজন জার্নালিস্ট তার গোপন ল্যাবরেটারি দেখে ফেলেছে, তোমাকে সে আর এখান থেকে আস্ত ফিরতে দেবে? তার থেকে তোমাকে পিন্‌ডি ভেবে সে যদি খুব যত্ন করে সব দেখায়, ফিরে গিয়ে তোমার কাগজে লিখে তুমি সমস্ত পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে না?

পিন্‌ডিদার বুদ্ধি দেখে নারলেকার এবারে মুগ্ধ।—আমার তো এটা মাথাতেই আসেনি, আমি জার্নালিস্ট ডক্টর লেঁবো জানতে পারলে তো রক্ষা নেই! কিন্তু আমাকে পিন্‌ডি না বানিয়ে তোমার পা-গার্ড করলে না কেন?

পিন্‌ডিদা গম্ভীর।—এ-ও বুঝতে পারছ না। জার্নালিস্ট চোখ দিয়ে দেখে দরকার মতো তুমি ডক্টর লেঁবোর কাছ থেকে জেনে বুঝে নিতে পারবে, আমি কি তা পারব!

নারলেকার বেজায় খুশি। তারপর বলল, এ তো এক তাজ্জব জগতে এসে গেছি আমরা! ওই কাচের খাঁচায় সিংহ আর ইস্পাতের খাঁচায় ভেড়া!

পিন্‌ডিদা জানে কেন। সিংহের মগজে ভেড়ার মগজ চালান করা হয়েছে, আর ভেড়ার মগজে সিংহের। পিন্‌ডিদা স্পষ্ট বুঝেছে ভয়াবহ কোনো ষড়যন্ত্র করেছে অক্স-ডন্ ক্লাবের হুটেনটেটর—ডক্টর লেঁবোর সঙ্গে যোগসাজসে সে তার সর্বনাশ করার ব্যবস্থা করেছে। পাছে নারলেকারের কোনোরকম সন্দেহ হয় তাই পিন্‌ডিদা আর মগজ বদলের আলোচনার মধ্যে গেলই না।

নেবুচি কফি নিয়ে ফিরে এলো। তার দিকে চেয়ে নারলেকার পিন্‌ডিদাকে ইংরেজিতে বলল, এখানে সবই অবাক ব্যাপার, নিগ্রোরা তালগাছের মতো লম্বা হয় অথচ এই লোকটা দ্যাখো কেমন বেঁটে বামন!

কফির ট্রে রেখে সঙ্গে সঙ্গে নেবুচি ফুঁসে উঠল, মুখ সামলে কথা বোলো, আমার দুঃখের জায়গায় ঘা দিও না!

পিন্‌ডিদা আর নারলেকার দু'জনেই হতবাক। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, তুমি ইংরেজি জানো?

গম্ভীর মুখে নেবুচি বলল, জানি না, কিন্তু ডক্টর লেঁবো আমার মগজে এমন যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে যে তাতে কথার ঘা পড়লেই সেটা আমার নিজের ভাষা হয়ে যায়।....ডক্টর লেঁবো আমাকে ভালবাসে, আমার জন্য অনেক করে, কিন্তু এক ব্যাপারে সে-ই আমার চরম শত্রুতা করেছে, লম্বায় আমি প্রায় সাত ফুট ছিলাম, বার কয়েক মগজ অপারেশন করে করে সে আমাকে সাড়ে তিন ফুট বানিয়ে দিয়েছে—লজ্জায় আমি সে-জন্য আর বাইরে বেরুতে পারি না, নিজের লোককেও আর মুখ দেখাতে পারি না!

নেবুচির দু'চোখ রাগে জ্বলতে লাগল। একটু বাদে ঠাণ্ডা হয়ে বলল, যাক, আমার অদৃষ্ট, ডক্টর লেঁবোকে যেন এ-সব কিছু বোলো না।

ভিতরে ভিতরে বেশি উত্তেজনা হলেই নারলেকার চান করে ফ্রেশ হয়ে নিতে চায়। পিন্‌ডিদাকে বলল, কৌতূহলে আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, বেশ করে স্নান করে আগে মাথা ঠাণ্ডা করে নিই। নেবুচিকে ডেকে বলতে সে তাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা তৎপর। এই ফাঁদ থেকে নিরাপদে বেরুতে হলে নেবুচির সাহায্য দরকার। ওর ব্যথার জায়গা জেনেছে, আর একটা বুদ্ধিও মাথায় এসেছে। তাকে ডেকে বলল, তুমি আবার আগের মতো লম্বা হতে চাও?

নেবুচি হাঁ। আবার একটু সন্দেহও।

পিন্‌ডিদা হাত ধরে টেনে তাকে পাশে বসালো। হুটেনটেটরের দেওয়া জার্নাল খুলে সেই কার্টুনটা বার করল। তালগাছের মতো লম্বা পিন্‌ডি আর পাশে বেঁটে খুদে পিন্‌ডি। কার্টুনের নিচে কি লেখা নেবুচি তো তা আর পড়তে পারে না। পিন্‌ডিদা কার্টুনের খুদে বেঁটে পিন্‌ডিকে দেখিয়ে বলল, এই দ্যাখো আগে আমি কিরকম ছিলাম। তাল-গাছের মতো পিন্‌ডিকে দেখিয়ে বলল, আর এই দ্যাখো এখন আমি কি-রকম হয়েছি! তোমাকে লম্বা করে দেওয়া আমার কাছে জল ভাত ব্যাপার।

উত্তেজনায় নেবুচি থরথর করে কাঁপছে। দুটো কার্টুনের সঙ্গেই পিন্‌ডিদাকে মেলাচ্ছে। কোনো ভুল নেই, একই লোক বেঁটে থেকে তালগাছের মতো লম্বা হয়েছে বটে। নেবুচি পিন্‌ডিদার পা দুটো জড়িয়ে ধরল, কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমাকে তুমি আবার আগের মতো লম্বা করে দিয়ে বাঁচাও মিস্টার পা-গার্ড।

—ঠিক আছে, ডক্টর লেঁবো যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। আজ থেকে তিন দিন বাদে তুমি আমার স্যানটসের ওমুক হোটেলে চলে আসবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব। কোনো চিন্তা নেই, ব্যাপারটা যেন ফাঁস না হয়।

আনন্দে গদগদ নেবুচি বলল, কেউ জানবে না, লম্বা হয়ে আমি আর ডক্টর লেঁবোর মুখও দেখব না।

—ঠিক আছে। ডক্টর লেঁবো কি মিস্টার পিন্‌ডিকে চেনে?

খানিক ভেবে নেবুচি জবাব দিল, চেনে না, ডক্টর লেঁবো তো বারো মাসে বারো দিনও এই জঙ্গল থেকে বেরোয় না, এই ক'দিন ধরে একটা লোকের সঙ্গে তার খাতির দেখছি....আজ সকালে বেরুবার আগে আমাকে বলে গেছে মিস্টার পিন্‌ডি নামে একজন গ্রেট ফুটবলার আসবে, তার সঙ্গে আর একজন লোক থাকবে হয়তো, তুমি তাদের খাতির যত্ন করবে, আর দুপুরে ভালো লাঞ্চের ব্যবস্থা রাখবে।....ডক্টর লেঁবোর

এখানে মাঝে-সাজে লোক আসে, তাই আমি জিগ্যেস করলাম, মিস্টার পিন্ডি দেখতে কি-রকম? তাইতে ডক্টর লেঁবো বলল, আমি জীবনে কখনো ফুটবল খেলা দেখিনি, কেমন দেখতে জানি না, শুনেছি রোগা ঢ্যাঙা—যা-ই হোক, আজ পিন্ডি ছাড়া অন্য গেস্ট আসবে না, তাকে নিয়ে আসার জন্য জিংগারোকে পাঠিয়ে দিও।

পিন্ডিদা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।—এবারে আমাকে দেখাও তো ডক্টর লেঁবো কি-ভাবে মগজ অপারেশন করে?

নেবুচি তাকে একটা ঘরে নিয়ে এলো। বলল, কি করে অপারেশন করে তুমি তো বুঝবে না, অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ বা জানোয়ারকে ওই মস্ত ক্যাপসুলটার মধ্যে ঢুকিয়ে এই অপারেশন টেবিলে রাখে। তারপর যেমন দরকার সে-রকম সুইচগুলো টিপে কাজ সারে—ছুরি-কাঁচি ব্যাণ্ডেজের কোনো ব্যাপার নেই। লেসার বীম দিয়ে খুলি সরিয়ে যা দরকার তা তুলে নেয় আর যা দরকার তা বসিয়ে দেয়। তারপর আবার সুইচ টিপেই খুলি জুড়ে দেয়—যার অপারেশন হয় সে-ও কিছু টের পায় না।

স্তব্ধ হয়ে দেখার পর একটা সেলফে বড় দুটো কাচের শিশিতে ঠিক এক-রকম দেখতে কতগুলো বড়ি দেখতে পেল পিন্ডিদা। একটার গায়ে বড় ছাপার অক্ষরে লেবেল আঁটা, ন্যাচারাল এনারজি স্টিমুলেটার, অন্যটার গায়ে লেখা ডাইভারজেন্ট এনারজি স্টিমুলেটার। অর্থাৎ, ঠিক একরকম শিশির একই রকম দেখতে বড়িগুলোর বিপরীত গুণ। একটা হলো, স্বাভাবিক এনারজি উৎপাদক, অন্যটা অস্বাভাবিক বা উল্টো-পাল্টা এনারজি প্রবর্ধক।

পিন্ডিদা জিগ্যেস করল, এই ট্যাবলেটগুলো কি ব্যাপার?

নেবুচি বলল, এগুলো খুব মজার ব্যাপার—দেখাচ্ছি তোমাকে—তবে একটার বেশি নিতে পারব না, কারণ ডক্টর লেঁবো বলে রেখেছে স্যানটসের খেলার দিনে এই দুই শিশির ট্যাবলেটই অনেক লাগবে, বেশি খরচ কোরো না।

নেবুচি ডাইভারজেন্ট এনারজি স্টিমুলেটরের ফাইল থেকে একটা ট্যাবলেট বার করে পিন্ডিদাকে নিয়ে হলঘরে এলো। ওটা গুঁড়ো করে ছোট খাঁচা খুলে দুটো গিনিপিগকে একটু একটু খাইয়ে দিল। হঠাৎ চাঙা হয়ে ও দুটো পাগলের মতো ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল, বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। খাঁচা খোলা কিন্তু তবু বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভেড়ার মগজ-পোরা সিংহটার মুখে বাকি গুঁড়োটুকু গুঁজে দিতে লাফালাফি ঝাঁপা ঝাঁপি করতে লাগল, আর খোলা দরজা দিয়ে বেরুতে না চেষ্টা করে অভঙ্গুর কাচের দরজা ভেঙে বেরুনোর চেষ্টা।

এরপর ল্যাবরেটারির জন্তু-জানোয়ারগুলো দেখালো নেবুচি। কোন্ জন্তুর ব্রেন-সেল-এ কি বসানো হয়েছে শোনালো। একটা হরিণের মগজে সাপের ব্রেন, সামনে দাঁড়ানোর সংগে সংগে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে তেড়ে আসতে
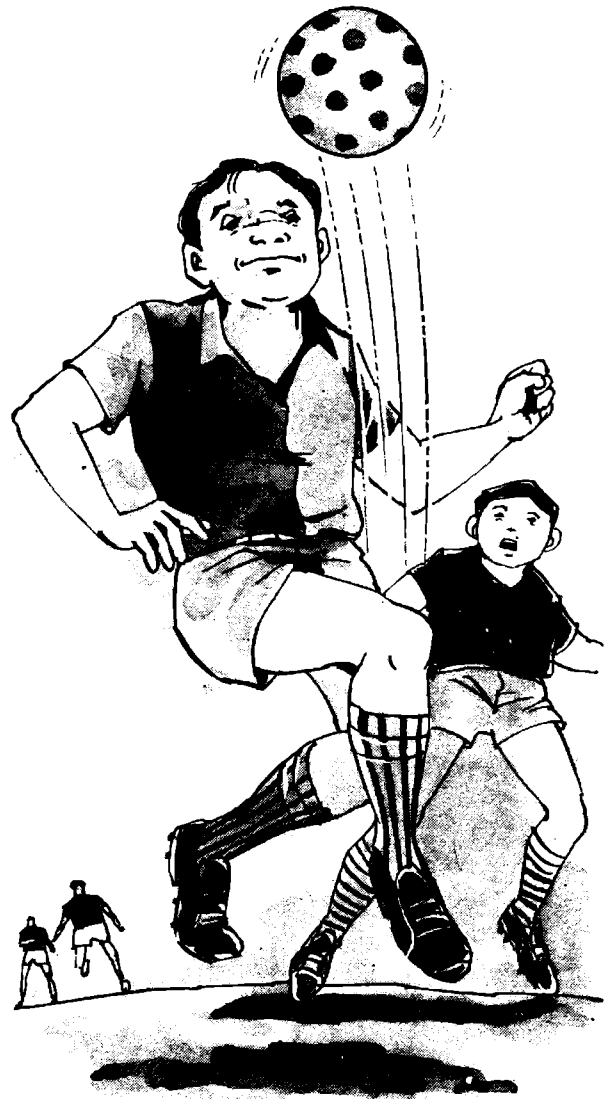
পিন্ডিদা একে একে ছ'গোল দিয়েছে

চাইলো। আবার একটা বিষধর সাপের মাথায় খরগোশের মগজ। সামনে যেতেই ওটা পালাবার পথ খুঁজছে। এমনি হতবাক হবার মতো আরো কত কি দেখালো নেবুচি।

তারপর একটু ক্লান্ত ভাব দেখিয়ে সোফায় বসে পিন্ডিদা বলল, আমাকে আর একটু কফি খাওয়াতে পারো নেবুচি?

—নিশ্চয়। সে কিচেনের দিকে চলে গেল।

পিন্ডিদা উঠে এক ছুটে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে। তাক থেকে ন্যাচারাল এনারজির ফাইল খুলে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে নিজের পকেটে পুরল। তারপর সবগুলো ট্যাবলেট সামনের টেবিলে ঢেলে ডাইভারজেন্ট এনারজি স্টিমুলেটারের

বড়িগুলো ওই খালি ন্যাচারাল স্টিমুলেটারের লেবেল আঁটা শিশিতে ঢালল। আর ডাইভারজেন্ট স্টিমুলেটারের বড়িগুলো সব ন্যাচারাল স্টিমুলেটারের লেবেল আঁটা শিশিতে রেখে দিয়ে ছুটে এসে হল্-এর সোফায় এসে বসল।

তার এক মিনিটের মধ্যে নেবুচি কফি নিয়ে হাজির। পিন্ডিদা জিগ্যেস করল, আচ্ছা নেবুচি, ব্রেনের কোথায় কি 'সেল' ডক্টর লেঁবো চেনেন কি করে?

নেবুচি জবাব দিল, ডক্টর লেঁবোর পক্ষে চেনা খুব সহজ। যে সেলটা সব থেকে বেশি পুষ্ট সেটাই তার স্পেশাল দোষ বা গুণের সেল। যেমন ধরো, মিস্টার পিন্ডি, তার সব থেকে পুষ্ট সেলটা ফুটবলের জিনিয়াসের সেল হবে। ডক্টর লেঁবো কিছুদিন আগে এক ষাঁড়-মুখো ভদ্রলোককে এ-রকমই যেন বোঝাচ্ছিলেন।

ষাঁড়-মুখো ভদ্রলোক! সে তো তাহলে নিশ্চয় অক্স-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হুটেনটেটর। চেহারা দেখে অনেকেই তো তাকে আড়ালে অক্স-ডনের মিস্টার অক্স বলে! পিন্ডিদার বুক দুরুদুরু।

নারলেকারের চান নয় তো স্নান-বিলাস। একঘন্টা বাদে স্নান-পর্ব সেরে সে বেরুলো। পিন্ডিদা সমঝে দিল, ভুলে যেও না, তুমিই কিন্তু ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্ডি—আর আমি তোমার পা-গার্ড নারলেকার।

—তাই কখনো ভুলি, আমার প্রাণের মায়া আছে না! এখানে 'দি জার্নালিস্ট ইজ্ ডেড্'! তারপরেই হি-হি হি-হি হাসি। হাসি আর থামেই না।—হোয়াট এ জোক্, আমি হলাম ফুটবল ওয়ারল্ড স্টার পিন্ডি আর তুমি কিনা আমার পা-গার্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানির নারলেকার! ওয়ান্ডারফুল!

তারপর প্রস্তাব করল, চলো এবার, কি আছে এখানে দেখা যাক্—

পিন্ডিদা গম্ভীর মুখে বলল, ডক্টর লেঁবো আসুক, সে তোমাকে খাতির করে সব দেখাবে। নেবুচি বলল, তার কাউকে কিছু দেখানোর এক্তিয়ার নেই।

অগত্যা নারলেকার ঘুরে ঘুরে নিজেই জন্তুগুলো দেখতে লাগল। যত দেখে ততো অবাক। আর ততো হাসি।

তাদের বিশ্রামের জন্য চমৎকার একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। সেই ঘরে আরামের শয্যায় শুয়ে পিন্ডিদা গভীরভাবে চিন্তিত। পিন্ডি হয়ে নারলেকারকে যদি ডক্টর লেঁবোর পাল্লায় পড়তেই হয় তাহলে তার বড় রকমের ক্ষতি কিছু হবে কিনা। তার সব থেকে পরিপুষ্ট সেল কি?.... আদৌ সে ক্লাস ওয়ান জার্নালিস্ট না নেহাৎ সাদা-মাটা। তার ব্রেনে সেটা খুব একটা বড় প্রতিভার স্বাক্ষর হতেই পারে না। একবার ভাবল, ডক্টর লেঁবো আসার আগে এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলে কি হয়? তার পরেই মনে হলো ওই ব্যাটা

ড্রাইভার কি জঙ্গলের ধারে তাদের ছেড়ে দিয়ে এখনো বসে আছে! শাঠ্ আছে যখন, তাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে। তবু বেড়াবার ছল করে নারলেকারকে ডেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, তারপর ইস্পাতের গেটের কাছে এসে পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই। গায়ের জোরে ঠেলেও গেটটাকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারল না। তক্ষুণি বুঝল ওটা খোলা বা বন্ধ করার কল বাংলোর ভিতরে।

এ-দিকে নারলেকার তখন বাগানের ফুল আর গাছ দেখে মুগ্ধ। একেবারে ভাব-রাজ্যে চলে গেছে সে। এত তন্ময় যে চারবার ডেকেও তার সাড়া পেল না। একটু বাদে দুটো বড় গোলাপ বাতাসে দুলে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে দেখে হি-হি হা-হা করে হেসে সারা। পিন্‌ডিদাকে ডেকে বল, দ্যাখো দ্যাখো পিন্‌ডি, গোলাপেরাও ষাঁড়ের মতো একটা আর একটাকে ঢুঁ মারছে !

পিন্‌ডিদা গম্ভীর। ধমকের সুরে বলল, হচ্ছে কি? এখানে পিন্‌ডি তো তুমি, আর আমি তোমার পা-গার্ড! এরপর ভুল করেও আর আমাকে পিন্‌ডি বলে ডাকবে না—লেঁবোর বাংলোর দেয়ালেরও কান থাকতে পারে!

নারলেকার বলে উঠল, সরি পিন্‌ডি, সরি।

—ফের!

দু'জনে আবার বিশ্রামের ঘরে ফিরে এলো। খুশি মুখে নারলেকার বলল, লন্ডনে ফিরে গিয়ে এবারে আমি পৃথিবীসুদ্ধু লোককে তাক লাগিয়ে দেব—কাগজের হেড জার্নালিস্ট হয়ে বসব আমি—আধ-পাগলা ফিলসফার জার্নালিস্ট বলে ঠাট্টা করা বার করছি আমি। কানের কাছে মুখ এনে বলল, এর মধ্যে সবগুলো জন্তুর ছবি তুলে নিয়ে ফেলেছি আমি, বুঝলে?

পিন্‌ডিদা আতঙ্কিত।—তোমার ক্যামেরা ব্রিফকেসের মধ্যে লুকিয়ে ফ্যালো শীগগির, লেঁবো ক্যামেরা হাতে দেখলে তোমার আর রক্ষা নেই—নেবুচি দেখেনি তো?

ঘাবড়ে গিয়ে নারলেকার মাথা নাড়ল, দেখেনি। তারপর ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি ব্রিফকেসে পুরে কাগজ চাপা দিল।

ঘড়িতে ঠিক একটা কুড়ি হতেই নেবুচি এসে খবর দিল, ডক্টর লেঁবো এসেছে, তোমরা হলঘরে এসো।

সে ফিরে যেতেই পিন্‌ডিদা চাপা গলায় বলল, মনে রেখো তুমি পিন্‌ডি, স্মার্টলি আগে আগে যাও। আমি তোমার পেছনে থাকব।

—হ্যালো হ্যালো হ্যালো! বলতে বলতে বেঁটেখাটো ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি ডক্টর লেঁবো নারলেকারকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।—সো ইউ আর পিন্‌ডি দ্য গ্রেট! কাল বাদে পরশুর খেলায় কিং অফ কিংস্ হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসিটা ব্যাঙের হাসির মতো লাগল ভাজা-মাছ উল্টে-খেতে-না-জানা মুখ পিন্‌ডিদার। নারলেকার পরিচয় করে দিল, এ হলো আমার ফ্রেন্ড—

—শুনেছি, নেবুচির মুখে সব শুনেছি, তোমার ফ্রেন্ড অ্যান্ড পা-গার্ড মিস্টার নারলেকার—দ্য ইনসিওরেন্স ম্যান।

হেলায় তার সঙ্গেও একবার করমর্দন করে নিল।

নারলেকার স্মার্ট মুখ করে বলল, তোমার ল্যাব দারুণ ইনটারেস্টিং ডক্টর লেঁবো, আমাকে একটু দেখাও শোনাও বোঝাও—

—ও শিওর! বাট লাঞ্চ ফার্স্ট, আই অ্যাম হাংরি, সো ইউ শুড্ বি—নেবুচি! লাঞ্চ রেডি?

তিন জনে গিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ডাইনিং টেবিলে খাবারের বউলগুলো দেখেই আর গন্ধ নাকে আসতে পিন্‌ডিদার জিভের জল মাটিতে পড়ে আর কি।

মিক্সড ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে আট রকমের মাংসের প্রিপারেশন, স্যালাড আর পুডিং। এমন স্বাদের খাওয়া পিন্‌ডিদা জন্মে খায়নি। মাংসের টুকরোগুলো যেন মাখনের টুকরো। ভালো করে চিবুতে হয় না, আগেই গলে যায়। তাছাড়া মাটন আর মুর্গির মাংসের এত রকমেরও স্বাদ হয়! পিন্‌ডিদা জিগ্যেস না করে পারল না, মাংসের এমন প্রিপারেশন আর এত রকমের স্বাদ হয় কি করে ডক্টর লেঁবো?

—হুঁ-হুঁ-হুঁ, ডক্টর লেঁবোর মুখে রহস্যের হাসি, মিস্টার পা-গার্ড তুমি আর জগতের কতটুকুই বা জানো—আমার এখানকার সব রান্না সুইচ টিপে সোলার রে দিয়ে হয়—আর একই অ্যানিম্যালকে ভিন্ন-ভিন্ন ইনজেকশন দিয়ে আমি ইচ্ছেমতো তাদের মাংসের আলাদা আলাদা টেস্ট করি—বুঝলে মিস্টার পা-গার্ড?

পিন্‌ডিদা বোকা-বোকা মুখ করে মাথা নাড়ল। খেতে খেতে লক্ষ্য করছে ডক্টর লেঁবো তার ঝকঝকে চোখ দুটো তুলে নারলেকারের মাথাটা থেকে থেকে লক্ষ্য করছে। পিন্‌ডিদার মনে হলো একেই বোধহয় এক্স-রে আই বলে।

সব শেষে জলের স্বাদও এমন যে একটু খেলে আরো খেতে ইচ্ছে করে। অত ভরা পেটেও দেড় গেলাস করে জল খেল পিন্‌ডিদা আর নারলেকার। পেটে জায়গা থাকলে আরো খেত। ডক্টর লেঁবো কিন্তু এক ফোঁটাও জল খেল না।

অমন চমৎকার খাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত আবেশ। শরীরটা যেন বাতাসে ভাসছে। ডক্টর লেঁবো বলল, তোমাদের দেখছি ঘুম পাচ্ছে, ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নাও, পরে কথা হবে।

নারলেকারও বলল, সেই ভালো, একটু বিশ্রাম করে তারপর তোমার ল্যাব্ দেখব।

ঘরে এসেই দু'জনে শুয়ে পড়ল। পিন্‌ডিদার মনে কেমন খটকা লাগছে, কিন্তু আর চোখ তাকাতে পারছে না।

চোখ তুলে পিন্‌ডিদা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একটু অবাক। ঠিক সকালের মতো লাগছে। উঠে বসল। সকালের আলো, গাছের পাতায় পাতায় শিশির! ঘড়ি দেখল, ন'টা।

তার মানে! ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেল? কানে লাগালো। না· ঠিক চলছে। কিন্তু সকাল ন'টা হবে কি করে—আর রাত ন'টা তো হতেই পারে না! নারলেকার এখনো বে-ঘোরে ঘুমোচ্ছে। পিন্ডিদার নিজের শরীরটাও দারুণ অবসন্ন লাগছে। মনে হচ্ছে কত কাল ঘুমোয়নি। নাকি এখনো জেগে স্বপ্ন দেখছে সে!

ঘরের দরজার সামনে নেবুচি এসে দাঁড়ালো। পিন্ডিদা জিগ্যেস করল, ক'টা বেজেছে বলো তো নেবুচি?

—সকাল ন'টা বেজে দু'মিনিট। ডক্টর লেঁবো তোমাদের ঠিক সকাল ন'টায় তুলে দিতে বলে বেরিয়ে গেছে—জঙ্গলের বাইরে তোমাদের ফেরার গাড়ি অপেক্ষা করছে...আজ নাকি স্যানটসে মিস্টার পিন্ডির ক্লাবের কি বড় খেলা আছে—মিস্টার পিন্ডিকে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ডেকে দাও।

নেবুচি জানে নারলেকারই পিন্ডি। পিন্ডিদার দু'চোখ ছানা-বড়া। এতক্ষণে ঘড়িতে ডেট দেখল। এ কি কান্ড! ঘড়িতে যে উনত্রিশ তারিখ। তারা এখানে এসেছে সাতাশ তারিখ সকালে! তার মানে টানা চল্লিশ বিয়াল্লিশ ঘন্টা ঘুমিয়েছে তারা! কি সর্বনাশ!

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার দিকে তাকালো পিন্ডিদা।—নেবুচি, লম্বা হতে চাও তো সত্যি কথা বলো—ডক্টর লেঁবো কি করেছে, আমরা এতক্ষণ ঘুমোলাম কেন।

—পরশু লাঞ্চের পর তোমাদের ক্ষুধা-নিবারক ঘুমের ওষুধ মেশানো জল খাইয়েছে। তারপর মিস্টার পিন্ডিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ব্রেন অপারেশন করেছে।

পিন্ডিদা সভয়ে নিজের মাথায় হাত দিল।

নেবুচি বলল, তোমার না, মিস্টার পিন্ডির বললাম তো!

—ও...। পিন্ডিদা সামলে নিল। ঝুঁকে নারলেকারের মাথাটা দেখল। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আশ্বাসের সুরে নেবুচি বলল, কিছুই না, দেড় মিনিটের অপারেশন, ব্রেনের দুটো পৃষ্ট সেলের খানিকটা করে তুলে নিয়েছে শুধু।

...বেচারা নারলেকার। নেবুচি চলে গেল।

ঠেলে-ঠুলে কোনোরকমে তোলা হলো নারলেকারকে। সে আরো ঘুমোতে চায়। পিন্ডিদা কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করল। তারপর চাপা গলায় বলল, শয়তান ডক্টর লেঁবো ওষুধ খাইয়ে দু'দিন ধরে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, আজই স্যানটসের সেই খেলা, ওঠো শীগগির!

নারলেকার হাঁ।

—তোমার কেমন লাগছে?

—কেন, ফাইন, কেবল আরো ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

—আর ঘুমোয় না, তুমি শীগগির উঠে মুখ-হাত ধোও, এক্ষুণি বেরুতে হবে।

পিনডিদা ছুটে ঘর থেকে বেরুলো। নেবুচিকে সামনে পেয়ে জিগ্যেস করল, ডক্টর লেঁবো কোথায়?

—বোধহয় স্যানটসে, বলে গেছে আজ রাতে আর ফিরবে না। তোমাদের জন্য জঙ্গলের বাইরে গাড়ি থাকবে।

পিন্ডিদা ছুটে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে গিয়ে ঢুকল। তাকের ওপর ন্যাচারাল এনারজি স্টিমুলেন্ট বা ডাইভারজেন্ট এনারজি স্টিমুলেন্টের কোনো ফাইলই নেই। পিন্ডিদা মনে মনে হেসে নিজের বুদ্ধির তারিফ করল। এ-রকম কিছু হবে আঁচ করেই ভিতরের ওষুধ উল্টে-পাল্টে রেখেছিল।

নেবুচি তাদের ব্রেকফাস্ট করে যেতে বলল, কিন্তু পিন্ডিদা আর কিছু স্পর্শ করতেও রাজি নয়। যাবার আগে নেবুচিকে লম্বা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। জিংগারো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ইস্পাতের গেট এবারে আপনি খুলে গেল। জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে জিংগারো তাদের নিয়ে চলল, এখন আর সে হাসছে না বা নাচছে না।

সত্যি একটা দামী লাক্সারি কার দাঁড়িয়ে আছে।' অন্য ড্রাইভার। তারা উঠতে সেটা চলতে শুরু করল। নারলেকার বলল, আমার আবার ঘুম পাচ্ছে আর ভীষণ অবসন্ন লাগছে—ব্যাটা কি খাওয়ালো!

পিন্ডিদারও একই দশা। কি মনে পড়তে পকেটে হাত ঢোকালো। সেই ন্যাচারাল এনারজি স্টিমুলেন্ট ট্যাবলেট দুটো বার করে একটা নিজে খেলো, একটা নারলেকারকে দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'জনেই দারুণ চাঙা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ছোটার মতো এনারজি।

পিন্ডিদা তীক্ষ্ণ চোখে নারলেকারকে লক্ষ্য করছে। যেতে যেতে অনেক হাসির জিনিস আর চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ছে। সে-সব দেখেও নারলেকার আগের মতো হাসছে না তন্ময় হচ্ছে না। নিবিষ্ট মনে ডক্টর লেঁবোর সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

স্যানটসে পৌঁছনোর আগেই পিন্ডিদার স্পষ্ট ধারণা হলো, ব্রেন-সেল অপারেশনের ফলে নারলেকারের ভালো ছাড়া মন্দ হয়নি। তার পাগলাটে হাসি আর দার্শনিক তন্ময়তার পৃষ্ট সেল দুটোই সরানো হয়েছে শুধু। সে এখন সীরিয়াস এবং স্বাভাবিক।

হোটেলে পৌঁছুতে ব্রেজিল ইলেভেনের ম্যানেজারের মেজাজ খাপ্পা। বলল, কোথায় কার অতিথি হয়ে তুমি খেলার দিনে এসে পৌঁছুবে বলে খবর পাঠালে, আমি ভেবে সারা, অন্য প্লেয়াররাও নারভাস, ওদিকে হুটেনটেটর এমন করছে যেন চ্যালেঞ্জ জিতেই বসে আছে—যদি তাই হয় তোমার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন্ নেব বলে দিলাম।

নির্লিপ্ত মুখে পিন্ডিদা বলল, আর যদি ওদের এগারো জনকে এগারোখানা গোল ঢুঁসে দিতে পারি তাহলে?

ম্যানেজার আনন্দে আটখানা।—তাহলে তোমাকে আমি এগারো দিন ধরে নেমন্তন্ন খাওয়াবো।

ম্যানেজারকে কি বলার ছলে এসে হুটেনটেটর পিন্ডিদাকে টেরিয়ে দেখল। জিগ্যেস করল, দু'দিন কোথায় হাওয়া হয়ে

গেছলে শুনলাম?

নিরীহ মুখে পিন্‌ডিদা বলল, হ্যাঁ, আমার মাথাটা এখনো কি রকম হাওয়ায় ভাসছে।

খিকখিক করে হাসতে হাসতে হুটেনটেটর চলে গেল।

বিকেলে খেলা শুরু হবার আধঘন্টা আগে ব্যস্ত-সমস্ত ম্যানেজার এগারোটা ট্যাবলেট হাতে করে পিন্‌ডিদার কাছে এসে বলল, পিন্‌ডি এই দ্যাখো, এগুলো নাকি কোন্ বিরাট সায়েনটিস্টের তৈরি এনারজি ট্যাবলেট, সে তার নিজের প্লেয়ারদের একটা করে দিয়ে মাঠে নামার আগে খেতে বলল, আর এগুলো আমাকে দিয়ে বললে, আমি নিরপেক্ষ স্পোর্টসম্যান, এই এনারজি ট্যাবলেট তোমার প্লেয়ারদেরও একটা করে খাইয়ে দিতে পারো—কি করব?

পিন্‌ডিদা ট্যাবলেটগুলো হাতে নিয়ে দেখল। মনে খুশি ধরে না। ওদের দলের খেলোয়াড়দের নিশ্চয় ন্যাচারাল এনারজি স্টিমুলেন্ট লেবেল-আঁটা শিশি থেকে ডাইভারজেন্ট এনারজি স্টিমুলেন্ট ট্যাবলেট খাইয়েছে, আর এগুলোই আসল ন্যাচারাল এনারজি স্টিমুলেন্ট ট্যাবলেট। শিশির ট্যাবলেট বদলে রাখার জন্য আবার নিজের বুদ্ধির তারিফ করল পিন্‌ডিদা। গম্ভীর মুখে বলল, এগুলো আমার কাছে থাক, ওদের দেওয়া কোনো জিনিস আমাদের প্লেয়ারদের খাবার দরকার নেই।

পিন্‌ডিদা জানে ভুল করে ন্যাচারালের নামে ডাইভারজেন্ট এনারজির ট্যাবলেট খেয়ে অক্স-ডনের খেলোয়াড়রা এমনিতেই মাঠে নিজেদের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধাবে, আর হেরে মরবে। মাঝখান থেকে এমন দুর্লভ ট্যাবলেটগুলো খরচ হয় কেন। তবু সাবধানের মার নেই, চুপিচুপি একটা ট্যাবলেট আগে নারলেকারকে খাওয়ালো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে স্বাভাবিক এনারজিতে টগবগ করতে লাগল। তার হাসির রোগ দার্শনিকতার রোগ তো আগেই সেরেছে, সে বলল, পিন্‌ডি, মনে হচ্ছে মাঠে নামিয়ে দিলে আমিও একটা কিছু করতে পারি।

নিশ্চিন্ত হয়ে পিন্‌ডিদা নিজে একটা ট্যাবলেট খেয়ে বাকিগুলো নিজের কীট-ব্যাগে রেখে দিল।

খেলা শুরু। স্টেডিয়াম ফুল। বাইরেও লাখখানেক লোক।

কিন্তু দু'মিনিট না যেতে এত দর্শকের চোখ ছানা-বড়া। এ কি কান্ড করছে অক্স-ডনের মত্ত খেলোয়াড়রা! ষন্ড বিক্রমে তারা নিজেদের দলের কাছ থেকেই বল কেড়ে নিচ্ছে, বিপক্ষ দলের লোককে পাস্ করছে! বীরবিক্রমে এক-একবার গোলের কাছে বল নিয়ে গিয়ে গোল-পোস্টের উল্টো দিকে বল মেরে বসছে! একবার তাদের ব্যাক তেড়েফুঁড়ে দারুণ শট নিয়ে নিজেদের গোলকীপারকেই গোল খাইয়ে দিলে। ফলে নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতি, মারামারি। এ-দিকে পিন্‌ডিদার পায়ে বল পড়লে পাঁচ ছ'টা প্লেয়ারকে কাটিয়ে একটার পর একটা গোল করে চলেছে। অক্স-ডন্ সতেরো মিনিটের মধ্যে চার গোল খেয়েছে। ম্যানেজার হুটেনটেটর পাগলের মতো নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। কোচ দুটো প্লেয়ার বদল করেছে। মাঠে নেমে তাদেরও একই আচরণ। অক্স-ডন্ একটা পেনালটি পেল। কিন্তু বল সাজিয়ে তাদের স্ট্রাইকার গোল-পোস্টের বিশ গজ দূর দিয়ে বল বাইরে পাঠিয়ে গোল বলে নেচে উঠল!

লোকে খেলা দেখবে কি, হৈ-হুল্লোড় হুলুস্থূল কান্ড। তারা যেন পাগলা-গারদের ব্যাপার দেখছে এক পক্ষের। অন্য দিকে পিন্‌ডিদা একে একে ছ'গোল দিয়েছে। সেম-সাইড গোল নিয়ে হাফ-টাইমের আগে তার ব্রেজিল ইলেভেন সাত গোলে জিতছে। তার পরেই অক্স-ডনের খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি বক্সিং শুরু করে দিল। রেফারি আর খেলা চালাতেই পারলে না। কারণ অক্স-ডনের কারো মাথা ফেটেছে, কারো দাঁত ভেঙেছে, কারো বা নাক। রেফারি সামাল দিতে এলে এক ধাক্কায় তাকেই তারা মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসল। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করল।

খেলা ভন্ডুল। দর্শকরা সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত। ফুটবল খেলার ইতিহাসে এমন কান্ড কেউ দেখেনি বা শোনেনি। পুলিশ লাঠি বেয়নেট রিভলভার নিয়ে নেমে পড়তে পালাবার হিড়িকে দর্শকদের মধ্যেও লন্ডভন্ড কান্ড। কারো হাত ভাঙছে, কারো পা ভাঙছে, কেউ বা পায়ের নিচে চাপা পড়ে চোখ উল্টে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ-কর্ডনে অক্স-ডনের খেলোয়াড়দের টেন্টে নিয়ে আসা হলো। তখনো তারা ওই পুলিশদেরই ফুটবল ভেবে শট্ হাঁকাতে চেষ্টা করছে, আর রুলারের গুঁতো খাচ্ছে। অন্যদিকে পিন্‌ডিদার দলও পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে নিজেদের টেন্টে এসেছে। হাফ-টাইমের মধ্যে সাত গোলে জিতেও তাদের ম্যানেজারের চক্ষু কপালে। ছুটে এসে পিন্‌ডিদাকে জিগ্যেস করল, পিন্‌ডি, এ কি ব্যাপার, তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ?

তার ভয় ধরেছে, দু'দিন অনুপস্থিত থেকে পিন্‌ডিদাই কিছু করে এমন ব্যাপার ঘটালো কিনা যা ধরা পড়লে তার দল বিপন্ন হতে পারে। গম্ভীর মুখে জবাব দিল নারলেকার। এত বড় ঘটনা দেখেও সে আর হি-হি করে হাসছে না। বলল, পিন্‌ডি জানবে কি করে, দু'দিন ধরে সমস্তক্ষণ আমি তো তার সঙ্গেই ছিলাম।

—তাহলে অক্স-ডনের সবগুলো প্লেয়ার মাঠে নেমেই অমন পাগল হয়ে গেল কি করে!

অন্য দিকে তাকিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, হুটেনটেটের অতি চালাক কিনা, তাই তার গলায় দড়ি।

হুটেনটেটের লোকটা এই ব্যাপারের পর আধা পাগলই হয়ে গেছে। সে ঘোষণা করল, এই খেলা বরবাদ—সমস্ত ব্যাপারটার আগে ইনভেস্টিগেশন হবে—কিং অফ কিংস্ গোল্ড-কাপ টুর্নামেন্ট পোস্টপোন্‌ড্ সাইন ডাই!

কিন্তু রাতের মিলিত ডিনার পার্টি তা বলে বাদ গেল না। পিন্‌ডিদাদের সাত-তারা হোটেলেই দু'পক্ষের ডিনারের আসর বসল। দূরে বসে সেই থেকে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বেঁটে-খাটো অনন্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর লেঁবো জুলজুল করে পিন্‌ডিদাকে দেখছে। আর মাঝে মাঝে হুটেনটেটেরের কানে কানে বলছে কিছু। হুটেনটেটের কটমট করে পিন্‌ডিদার দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে অক্স-ডনের খেলোয়াড়দের সম্বিত ফিরেছে। কেউ মাথায় ব্যান্ডেজ করে, কেউ নাকে ঠোঁটে থুতনিতে লিউকোপ্লাস্ট এঁটে মাথা নিচু করে ডিনার খাচ্ছে।

কিন্তু পিন্‌ডিদার চোখ কেবল ডক্টর লেঁবোর দিকে। ফিসফিস করে নারলেকারকে বলল, দ্যাখো, ডক্টর লেঁবোকে দেখে মনে হচ্ছে নিজের মগজ অপারেশন করে বেবুনের মগজ ঢুকিয়েছে।

নারলেকার এখন স্বাভাবিক মানুষ। শুনে হি-হি করে হাসল না। বলল, আমি তো এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না, এ-রকমটা হলো কি করে! দু'দিন নিজের বাংলোয় আমাদের অজ্ঞান করে রেখে সে কি করল?

পিন্‌ডিদা বলল, সবুর বন্ধু সবুর, পরে সব বুঝবে। দু'দিন ওই অজ্ঞান হয়ে থাকার ফলেই অদূর ভবিষ্যতে তুমি বোধহয় তোমাদের কাগজের হেড্ জার্নালিস্ট হয়ে বসবে।

ডিনারের পর পিন্‌ডিদা হাসিমুখে সোজা গিয়ে ডক্টর লেঁবোর কাছে উপস্থিত। বলল, সত্যি ডক্টর লেঁবো, পৃথিবীর তুমি একজন অত্যাশ্চার্য সায়েনটিস্ট, তোমার তুলনা নেই। তবে তোমার সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছল। তোমার যদি আমাদের এপিক রামায়ণের মারীচ বধ চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়া থাকত, তাহলে জঙ্গল থেকে আমাদের তোমার ল্যাবরেটারিতে নিয়ে যাবার জন্য জিংগারোকে পাঠাতে না। জিংগারোর ছলা-কলা দেখা-মাত্র বুঝেছিলাম তুমি ফাঁদ পেতেছ, ওয়েল, আই উইল রিমেম্বার ইউ, গুড-নাইট!

ডক্টর লেঁবো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। নারলেকারকে নিয়ে পিন্‌ডিদা চলে এলো।

পরদিন সকালের প্লেনেই ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করে গোছগাছ করতে লাগল। নারলেকার দু'তিন বার বলল, যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন—খাসা আরামে আরো দুটো দিন কাটিয়ে যাই, সব দেখি শুনি—তোমার এখন জয়-জয়কার, ফিরে আর কি তোমার নাগাল পাব!

শেষে পিন্‌ডিদা বলল, প্রাণে বাঁচতে চাও তো চটপট সকালেই পালাই চলো—লম্বা হবার জন্য আজ রাতেই নেবুচি এসে এই হোটেলে হানা দেবে—

নারলেকার হাঁ।—লম্বা হবার জন্য নেবুচি এখানে হানা দেবে মানে!

—আঃ! তোমরা জার্নালিস্টরা সবেতেই কেবল মানে খুঁজে বেড়াও! যা বলছি তাই শুনেই এখন চটপট তোমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও—আজ সকালের মধ্যেই সটকান দিতে না পারলে খুব বিপদ জেনো।

গল্প শেষ করে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইলো।

আমি কেবলু কার্তিক চটপটি এমন কি হাবুলও হতভম্বের মতো বসে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

পনেরো বিশ সেকেন্ড বাদে আমিই প্রথম বলে উঠলাম, তোমার একটু পায়ের ধুলো নেব পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা একটু ঘোরালো চোখে তাকালো আমার দিকে। ঠোঁটের হাসি গিলে খেঁকিয়ে ওঠার সুরে বলে উঠল, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি, না আমার পায়ের ধুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে?

গম্ভীর মুখে উঁচু ঢিবি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগলো।—চল্‌রে হেবো।

হেবো হোঁতকা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গ নিল। আমরা বাকি চারজন আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

ছবিঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

মুখোশের অন্তরালে
একাডেমি অফ আর্ট এণ্ড কালচার, কলকাতার এক বিখ্যাত শিল্প বিকাশ কেন্দ্র। এখানে কিছুদিন যাবৎ চলছে শিল্পী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর আঁকা ছবির প্রদর্শনী। যজ্ঞেশ্বরবাবু বর্তমানে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর পোর্ট্রেট শিল্পীদের মধ্যে একজন। তাঁর আঁকার ধরনে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যা তাঁর ছবিকে একেবারে জীবন্ত করে তোলে।
একাডেমি হলে সকাল সন্ধ্যে দর্শকের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। তারই নেপথ্যে চলেছে আর এক নাটক।
• পরিবেশনায় •
দিলীপ দাস
সেইদিন রাত্রে প্রদর্শনী কক্ষে প্রহরারত জনৈক প্রহরী
সর্বনাশ! ছবিটার এ দশা কে করলো?
বিপদের গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।
ইস, পুরো ছবিটা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে!
এ নির্ঘাৎ কোন পাগলের কাজ!
ছবিটা একজন বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীর। কিছুদিন লোকসভার সদস্যও ছিলেন। মৃত্যুর আগে এঁর বিশাল সম্পত্তি কোন এক মিশনে দান করে যান
এমন একজন মহান ব্যক্তির প্রতি একি বীভৎস ব্যবহার!

চুরি নয়, ডাকাতি নয়। স্রেফ ছবিটা ড্যামেজ করে দিল! স্ট্রেঞ্জ!
পরের অনিষ্ট করে মজা লুটতেও কেউ এ কাজ করে থাকতে পারে!
তা বলে একটা বিখ্যাত ছবির উপর ছুরি চালিয়ে! ইম্পসিবল্!

এ তো শুধু শিল্পীর ছবি নয়, দেশেরও সম্পদ। পোর্ট্রেট ড্রইং-এর ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অবদান।
কিন্তু এই অনাসৃষ্টিকারী লোকটি এখানে ঢুকলোই বা কি করে গেলই বা কোন পথে!

পর দিন-
হ্যালো- আমি ইনসপেক্টর বলছি-
—হ্যাঁ, আমি সিদ্ধার্থ বসু— কি বললেন আজ আরও একটা ছবি ড্যামেজ!— —এখুনি যাচ্ছি!

এ তো আচ্ছা এক ভঁাহাবাজের পাল্লায় পড়া গেছে! এভাবে ছবি নষ্ট করে কার কি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে?

সেই একই ভাবে কেউ ক্যানভাসের উপর ছুরি চালিয়ে গেছে!
ইনি মোকরাম খাঁ। বিখ্যাত সরোদ বাদক। সম্প্রতি ইউরোপ আমেরিকা সফর করে দেশে ফিরেছেন।
বুঝতে পারছি না আমার ছবির উপর কার এত বিদ্বেষ এবং কেন?
তবে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এর লক্ষ্য আপনিই

মানে?
মানে দুটো – হয় লোকটি আপনার রাইভ্যাল অথবা কোন ব্যক্তিগত ক্রোধের বশে সে এই কাজ করে বেড়াচ্ছে।

শুনলাম, এখানে আপনার দেড়শো পোর্ট্রেট এক্সিবিট হচ্ছে এবং এঁদের সবাই দিকপাল।
হ্যাঁ। এর মধ্যে জনা পনের ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন।

গুড্‌। ঐ পনের জনের নাম আমার চাই।
ঠিক আছে, আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সিদ্ধার্থবাবু, ছবি হত্যাকারীর কোন মোটিভ কিছু বুঝতে পারলেন?
সেটা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ ইনসপেক্টর।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ফ্রিডম ফাইটার, লেখক, অভিনেতা, ম্যাজিশিয়ান বাব্বাঃ, কেউই দেখছি শিল্পীর হাত থেকে রেহাই পাননি! সায়েন্টিস্ট জুডো ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নও দেখছি একজন করে আছে।

যদিও শিল্পীর মাত্র কয়েকটা ছবিই দেখার সুযোগ হয়েছে। তবে শুনেছি, প্রত্যেকটা কাজই নাকি মাস্টারপিস। নাঃ, আজ রাত্রেই এর রহস্য ভেদ করতে হবে।

ক্রমশ রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। শুধু কয়েকটা আলো বিশাল একাডেমি বিল্ডিংটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

দর্শকবিহীন নিস্তব্ধ আর্ট গ্যালারী। হঠাৎ জেগে ওঠে মৃদু পদধ্বনি।

তালা খুলে ঢোকে একজন নৈশ রক্ষী, ছবিগুলির রক্ষণাবেক্ষণই এদের কাজ।

অকস্মাৎ রক্ষীটি একটি ব্যানভাস লক্ষ্য করে দ্রুত ধেয়ে যায়।

থাম!
কিন্তু মাঝপথেই একটি বলিষ্ঠ হাত এসে তাকে রুখে দেয়

আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম বাছাধন!

কিন্তু দেখা গেল আগন্তুক সহজ পাত্র নয়
আমার অপেক্ষায় থেকে তুমি খুব ভুল করেছ!

রীতিমত একজন ওস্তাদ লড়িয়ে।
মুহূর্তের জন্য সিদ্ধার্থ জ্ঞান হারায়।

রক্ষীর ছদ্মবেশ—লোকটা যে একজন সুদক্ষ জুডো চ্যাম্পিয়ন তাতে কোন সন্দেহ নেই!

আর্টিস্টের দেওয়া ছবির লিস্টের মধ্যে এরকম একজনের নাম দেখেছি।

দিব্যেন্দু সেন। ব্ল্যাক বেল্ট চ্যাম্পিয়ন, দেশে বিদেশে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন।

মানুষ নয় ছবি খুন—আশ্চর্য! তা-খুনীর কোন হদিশ করতে পারলে?
যথা পূর্বং তথা পরং। এরপর আমি ভয়ঙ্কর কিছুর আশংকা করছি
অনেক রাত হল। এখন খাওয়াটা সেরে নিলে হত না?

প্লিজ, এক মিনিট। আর্টিস্টের বাড়িতে একটা ফোন করে নিই।
হ্যালো - আমি সিদ্ধার্থ বলছি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীকে একটু—

এইমাত্র একাডেমি থেকে কে একজন ফোন করেছিলেন, অপরাধী নাকি ধরা পড়েছে। শুনেই উনি বেরিয়ে গেলেন

এত রাতে! আমি এর কোন খবর পেলাম না! অচেনা কন্ঠস্বর
হ্যাঁ, তাঁর নাকি এক্ষুনি যাওয়া দরকার, এটা খুবই গোপনীয়

কি হল! কোথায় চললে? খাবারটা যে—
খুনীর সন্ধানে!

গত রাতে খুনী আমার বদলে বাবা পেয়েছিল। এবার সে হয়ত কোন চরম আঘাত হানবে।

আমার ক্যালকুলেশন যদি মিথ্যে না হয় তো – যার ডাকে শিল্পীকে এত রাতে ছুটে যেতে হয়েছে সে এ জুডো চ্যাম্পিয়ন–
লোকটা বেশ দ্রুত একটা নিষ্পত্তি ঘটাতে চাইছে। তা সে যে কোন রকম মূল্যের বিনিময়েই হোক

একাডেমি হলে
দিব্যেন্দুবাবু আপনি! তবে কি আপনিই আমাকে এত রাতে?
হ্যাঁ, মি: চৌধুরী–থুড়ি, শিল্পী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।

আপনার ছবি তো ঠিকই আছে, আগের মতই সুন্দর। তবে কেন আমাকে এভাবে ডেকে–
আপনার সব ছবিই তো উচ্চ প্রশংসিত, এটাও তাই। কিন্তু এটা যার প্রতিকৃতি একবারও ভেবে দেখেছেন কি শিল্পীর স্বার্থে তার আত্মতুষ্টি লোকটির কি হাল করেছে?

আপনার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!
মনে পড়ে আমার এই পোর্ট্রেটটা কি ভাবে ফিনিশ করেছিলেন? সেই দিনই নেতাজী ইন্ডোরে ছিল ইন্টারন্যাশানাল জুডোর ফাইনাল। একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা।

সময় বয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে ক্যানভাসের উপর চলছে তুলি
আর দশ মিনিট। বাইকে যাবেন ঠিক সময়েই স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাবেন।
পরে এসে করলে হত না?

অনুরোধ উপরোধের ঠেলায় দশ মিনিট থেকে কখন যে আধ ঘন্টা হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। ছাড়া পেতেই ফুল স্পীডে গাড়ি হাঁকালাম।

শুধু আপনার খেয়াল মেটাতে গিয়েই আমাকে অনর্থক ঝুঁকি নিতে হল। আর তার জন্য খেসারত দিতে হল বিরাট রকমের। হসপিটালে শয্যা-শায়ী হয়ে থাকতে হল দীর্ঘ আট মাস।

কিন্তু এটা সবাই জানে যে অবশেষে তুমি ভাল হয়ে গেছ। ভারত সরকার তোমার মুখের প্লাসটিক সার্জারির জন্য আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন এবং তা সাকসেসফুল হয়েছে। তুমি পূর্বের মতোই সুন্দর সুস্থভাবে বেঁচে ফিরে এসেছ।

কে বললে আমি বেঁচে আছি? বেঁচে আছে আপনার ঐ ছবি, আমি ঐ দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটুকুই বয়ে বেড়াচ্ছি।
স্মৃতি!

হ্যাঁ মহাশয়, শুধুই স্মৃতি।

আমেরিকায় বেশ বড় বড় ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানেই ছিলাম। প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব দেখে তাঁরা আগের মুখের আদলে এই মুখোশটা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এটাই এখন আমার আমি, হিঃ-হিঃ-হিঃ
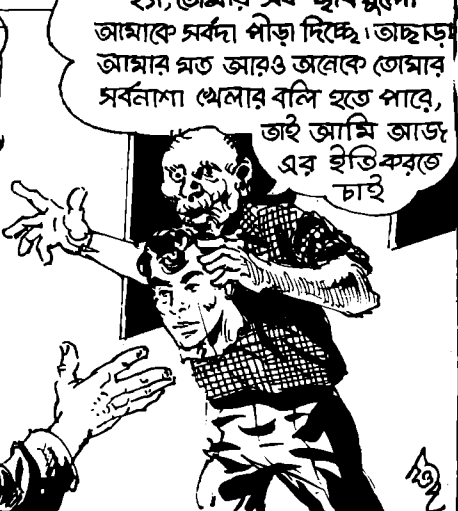
তাহলে তুমিই আমার ছবির হন্তা?
হ্যাঁ, তোমার সব ছবিগুলো আমাকে সর্বদা পীড়া দিচ্ছে। তাছাড়া আমার মত আরও অনেকে তোমার সর্বনাশা খেলার বলি হতে পারে, তাই আমি আজ এর ইতি করতে চাই

আমার মত ধ্বংস হয়ে যাক এ ছবি
থাম, থাম দিব্যেন্দু! আমার কথা শোন।

বলেছি না আজ এর ইতি করবো, সেই সঙ্গে তোমারও!

খবরদার, আর এক পাও এগুবে না!
ওঃ, তুমি!

সিদ্ধার্থকে এ সময়ে দেখে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত দিব্যেন্দুর ক্রোধ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে
আজ তোমারও নিস্তার নেই!

এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না!
এক বিকৃত প্রতিহিংসার বলি!
আফশোস এই যে দেশের একজন প্রতিভাবান এ্যাথলেটকে হারাতে হল!

জবা

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

টালিগঞ্জের নামুবাবুর বাজারের কাছে, ঘোষ পাড়ায়, ন্যাড়ারা যেখানে বাড়িটা করেছে, কয়েক বছর আগেও সেখানে গেলে মনে হত যেন কোনো মফস্বল শহরে এসে গেছি। সামনেই মস্ত বড় রেসের মাঠ। সেখানে কত রকমের পাখি। কাক শালিক চড়ুই তো আছেই, আর আছে বুলবুলি, খঞ্জনা, বেনেবৌ , কাঠঠোকরা, আরও অনেক রকমের পাখি। ন্যাড়াদের বাড়ির ছাদে এক একদিন বিকেল বেলা টিয়ার ঝাঁক এসে বসত, কি সুন্দর যে লাগত!

ওহো-হো, ন্যাড়াদের বাড়ির আসল খবর তো বলাই হয়নি। ন্যাড়াদের অনেকদিন পর একটি বোন হয়েছে,কালীপুজোর দিন হয়েছে বলে ওর নাম রাখা হয়েছে জবা। জবা সবাইয়ের খুব আদরের। ন্যাড়ার দাদা, ভূতো বোন বলতে অজ্ঞান। বোনের যাতে কোনো কিছু কষ্ট বা অনিষ্ট না হয় সেই জন্যে নিজে শুধু শশব্যস্ত নয়, বাড়িসুদ্ধ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ছে। ভূতো আর ন্যাড়ার স্বভাব একেবারে বিপরীত। ভূতো খুব সাবধানী। ন্যাড়া যদিও ট্রাউজার পায়জামা পরে, তবু কাছাখোলা, কোনো কিছুর ঠিক নেই, ঘর থেকে বেরুবার সময় সুইচ তো অন করতে ভুলে যায়। বাইরে যখন যায় দরজাটা হাট করে খুলে যায়। ভূতো বাইরে গেলেই দরজার কাছে চিৎকার করবে, মা, দরজা বন্ধ কর। যতক্ষণ না কেউ বন্ধ করবে, ও যাবে না। রাত্রে ন্যাড়া পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। নিজের মশারি গুঁজতেও ভুলে যায়। মা এসে মশারি গুঁজে আলো নিভিয়ে দেয়। ভূতো আগে নিজের মশারিটা ভালোভাবে গুঁজে, তারপর সারা বাড়ির সমস্ত কপাট জানালার খিল, ছিটকিনি ঠিক ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা, বারবার টিপে টিপে দেখে। ন্যাড়া ও ন্যাড়ার বাবা বলে—ম্যানিয়া। ভূতো বলে—রাত্রে যখন চোর ঢুকবে তখন বুঝবে। এই নিয়ে সকলে হাসাহাসি করে।

কিন্তু চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী, ঠিক তেমনি তস্কর-ভীরু ভূতোও কারু কথায় কান না দিয়ে ঠিক নিয়মিত রাত্রে চোরের ভয়ে প্রতিদিন এমন ভাবে ছিটকিনি খিলগুলো বন্ধ করে যাতে কেউ খুলতে না পারে। খিল লাগিয়ে তার ফাঁকে একটা গজাল, কোনোটার ফাঁকে পাঁউরুটি কাটার ছুরি (এবং এটি করতে গিয়ে প্রায় একটি করে ছুরি ভাঙ্গে) গুঁজে দিয়ে প্রতিটি দরজার সামনে একটি করে জল-ভরতি বালতি রেখে দেয়? চোর বাইরে থেকে ধাক্কা দিলেই বালতিটা হড়াৎ করে উল্টে যাবে, আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে আর ওদিকে চোর দরজার সামনে কেউ বাড়ির লোক ছিল এই ভেবে ভয়ে পালাবে। ন্যাড়া রসিকতা করে মন্তব্য করে—দাদার ধারণা রাত্রিবেলা কোনো অদৃশ্য চোর, তাদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভূতো তার অর্বাচীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মন্তব্যকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

ভূতোর এখন চিন্তা জবাকে নিয়ে। জবার বয়স ছ বছর। তার পাকা পাকা কথা এবং চালচলন দেখলে মনে হবে, সেই যেন বাড়ির বড়দিদি। ভূতো জবাকে একা বাইরে যেতে দেবে না। এমন কি বাবার সঙ্গে বাইরে গেলেও বারবার সাবধান করে বলে দেয়, বাবা, জবার হাত ধরে রেখ, রাস্তা দেখে শুনে পার হবে।

আচ্ছা, আচ্ছা, জবার বাবা হেসে বলে। কিন্তু হাসলে হবে কি, ভূতোর ধারণা যে কোনো মুহূর্তে জবাকে ছেলেধরা নিয়ে যেতে পারে।

ছ বছরের জবার তার মা, বাবার দুটি জিনিস খুব ভালো

লাগে। জবার বাবা রোজ ভোরে অনেকগুলো বাসি রুটি নিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাক শালিক আর চড়াই, আর রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ায়। কাক আর শালিকগুলো বাবার হাত থেকে খেয়ে যায়। একটুকুও ভয় করে না। ন্যাড়ার বাবা নেড়ি কুকুরগুলোরও একটা করে নাম দিয়েছে। একটা হলদে রঙের কুকুরের দাঁত খুব বড় বড়। তার নাম দাঁতড়ি। একটা সাদা কালো রঙের মোটা কুকুরের কান দুটো বড় বড়, লোটানো, তার নাম কানলোটা আর একটার নাম খেঁকি। বাবা রাত্রিবেলাও, তা যত রাত্রিই হোক, এদের ডেকে ডেকে সবার পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত ডাল তরকারি সামনের মাঠে ভাগ করে খেতে দেয়। জবা এটাও বুঝেছে এই রাস্তার কুকুরগুলোও বাবাকে খুব ভালোবাসে। বাবা যখনই কাজ থেকে ফিরে পাড়ায় ঢোকে, কুকুরগুলো ছুটে গিয়ে, ল্যাজ নেড়ে কুঁই কুঁই করে, কেউ বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে, কেউ দু'পা তুলে বাবার পেটে মুখ রাখে। কেউ আবার চারপাশে আনন্দে বনবন করে ঘোরে। বাবা সবার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয়। জবা জিজ্ঞেস করে—বাবা, তুমি এই কুকুরগুলোকে এতো ভালবাস কেন? বাবা বলেন—আহা, এরা সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। তাই আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। এর পর থেকে জবাও কুকুরগুলোকে যা পারে খেতে দেয়। একদিন জবা একটা বিস্কুটের টুকরো দাঁতড়ির মুখে ধরেছে, এমন সময় জবার বড়দা ভুতো তা দেখে চিৎকার করে ওঠে, এই—এই, কুকুরের মুখে হাত দিচ্ছিস—এখুনি কামড়ে দেবে। যা হাত ধো গিয়ে। এই বলে যাঃ যাঃ বলে দাঁতড়িকে মারল এক লাথি। দাঁতড়ি কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল। ওর কান্না দেখে জবারও কান্না পেল। বড়দার উপর খুবই রাগ হলো।

মায়ের যে জিনিসটা ভালো লাগে সেটা হলো ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া। কোনো ভিখারী মায়ের দুয়ার থেকে এমনি ফিরে যায় না। মা কিছু না কিছু দেবেই। জবা লক্ষ্য করেছে, মায়ের একটা বুড়ি ভিখারিণী আছে, যে প্রতি সপ্তাহে বুধবার এসে কোণের লেবুগাছতলায় তার ভাঙ্গা সানকিটি নিয়ে বেলা বারোটা থেকে বসে থাকবে। মা সবাইকে খাইয়ে, নিজে খাবার আগে সেই বুড়ি ভিখারিণীর সানকিতে ভাত ডাল তরকারি একটুকরো মাছ সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। বুড়ির তখন ফোকলা মুখের মিষ্টি হাসিটি জবার টুকটুকে দুটি ঠোঁটেও ছড়িয়ে পড়ে।

রবিবার দুপুরে আর একটা ভিখারী আসে, বুড়ো কিন্তু বেশ লম্বা, পরনে একটা আধময়লা নীল সবজে চেক চেক লুংগী, গায়ে একটা ছাই রঙের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, মাথায় জাল জাল টুপি, কাঁধে ঝোলা। হাতে একটা বড় বাটি। থুতনির কাছে ছাগলের মতন দাড়ি। নাম মকবুল। ও এলেই ভাঙ্গা গলায় হাঁক দেয়—মা—ই—মা—ই অর্থাৎ মা। জবার মা রান্নাঘর থেকে খেতে বলে—দাঁড়াও। খাওয়া হলে মা মকবুলের বাটিতে খানিকটা ডাল, দুটো আলু, দুটো পটল, চার পাঁচটা কাঁচালঙ্কা, কাগজে মুড়ে নুন হলুদ দেয়। তারপর মকবুল ঝোলা থেকে একটা শিশি বার করে। মা তাতে সরষের তেল ঢেলে দিয়ে দশটা কি কুড়িটা পয়সা আলগোছে ওর বাটিতে দিয়ে দেয়। মকবুল সেলাম করে চলে যায়। জবার খুব ভালো লাগে।

এর পর থেকে জবাও বাবার মতো ছোট ছোট দুটো রুটি নিয়ে পাখিদের আর রাস্তার কুকুরদের খাওয়ায়। বুড়ি ভিখারিণীটাকে মা যখন খেতে দেয় জবা তার সামনে বসে তার সংগে কত গল্প করে। তবে জবার খুব ভাব হয়েছে, ঐ বুড়ো মকবুলের সংগে। ও এলেই জবা মায়ের কাছ থেকে এক বাটি চাল নিয়ে নিজেই তরকারির ঝুড়ি থেকে আলু পটল, কোনোদিন বেগুন লঙ্কা তুলে নিয়ে দিয়ে বলে, মা সরষের তেলটা দাও। মা এসে বলে, তুমি দিতে পারবে না, পড়ে যাবে। না—পারব। জবা বায়না করে। তারপর খুব আস্তে আস্তে মকবুলের শিশিতে তেলটা ঢেলে দিয়ে মায়ের কাছ থেকে কোনো দিন দশ পয়সা, কোনো দিন কুড়ি পয়সা নিয়ে মকবুলের হাতে দেয়। মকবুল হেসে সস্নেহে জবার মাথায় হাত বুলিয়ে সেলাম করে চলে যায়। জবাও ছোট্ট হাতটা কপালে তুলে সেলাম করে।

জবা এখন নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলে ভরতি হয়েছে—ক্লাস ওয়ানে পড়ে। রবিবারটা ছুটির চেয়ে বেশি আনন্দ তার মকবুল আসবে বলে।

রবিবার। দুটো বেজে গেছে, মায়ের খাওয়া হয়ে গেল, তবু মকবুল এলো না। মা খাবার পর একটা বাটিতে চাল আর আনাজ ও একটা ভাঙ্গা কাপে তেল রেখে জবাকে বললে—ঐ ভিখারীটি এলে দিয়ে দিস। বলে শুতে গেলেন।

বৈশাখের খাঁ—খাঁ দুপুর। জবাদের পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে, দূরে একটা ঘুঘু পাখির ডাক এই নিস্তব্ধতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

বাড়িতে সবাই দিবানিদ্রা দিচ্ছে। হঠাৎ জবার বড়দা ভূতনাথ ঘুম ভেংগে নিজের খোলা দরজা থেকেই বুঝতে পারে প্যাসেজের দরজাটা খোলা। উঠে বেরিয়ে শুনতে পায়, খিড়কির দরজায় কারা কথা বলছে। তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখে জবা সেই লম্বা মুসলমান ভিখারীটার শিশিতে গম্ভীরভাবে তেল ঢালছে আর ভিখারীটা হাসিমুখে দেখছে। এই কি করছিস? বড়দার ধমকানিতে জবার হাত কেঁপে যায়। খানিকটা তেল মাটিতে পড়ে যায়। জবাও রেগে বলে, তোমার চিৎকারের জন্যে তেলটা মাটিতে পড়ে গেল। —যাই আর একটু নিয়ে আসি। থাক থাক, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না, বড়দা বকতে শুরু করে, খবরদার দুপুরে আর কখনও এই সব ভিখিরী টিকিরীকে একা ভিক্ষা দেবে না। যাও।

জবা গুমরোতে গুমরোতে খালি তেলের ভাঙ্গা কাপটা হাতে নিয়ে ভেতরে যায়। মকবুলও সেলাম করে পালায়। বড়দা খিড়কি দরজাটা বন্ধ করছে এমন সময় জবা ব্যস্ত হয়ে বলে,

খোল শীগ্‌গির, পয়সা দেওয়া হয়নি ওকে।

থাক আর পয়সা দিতে হবে না। বড়দা দরজার ওপরের ছিটকিনিটা ভাল করে বন্ধ করে বলে।

মকবুলকে পয়সা না দেওয়ার জন্যে জবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। ঘুমন্ত মায়ের বুকে মুখ গুজে কাঁদতে থাকে। মেয়ের কান্নায় মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সব শুনে বড় ছেলেকে খুব বকেন। ভূতোও মায়ের ওপর একটু গার্জেনগিরি করে বলে, না না, তোমরা জান না, দুপুরে একা বেরুলে ছেলেধরা নিয়ে যাবে–

ও ছেলেধরা নয় মকবুলদা, মায়ের বুকে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলে জবা। জবার মা মেয়েকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি ও-রোববার মকবুলদাকে চল্লিশ পয়সা দেবে।

এক এক রবিবার জবাদের বাড়িতে কেউ না কেউ আসে, সেদিন বেশ মাংস-টাংস হয়। ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়, খেতেও একটু বেলা হয়ে যায়। জবার বাবা দাদারা খাবার পর খাবার টেবিলে গল্প করছে। এমন সময় খিড়কি দরজার কাছে ডাক শোনা গেল–জোবা বোহিন। জোবা। জবার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে মাকে গিয়ে বলে, মা মকবুলদাকে আজ একটু ফ্রায়েড রাইস দাও।

দেব দেব, তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না, মা ছদ্ম রেগে হেসে ফেললো। জবা বায়না করে–আমি দোব। আচ্ছা আচ্ছা, মা এই বলে একটা ডিশে খানিকটা ফ্রায়েড রাইস ও কয়েক টুকরো আলু ও মাংস বড় চামচে দিয়ে দেয়। জবা ডিশটা নিয়ে তাড়াতাড়ি খিড়কি দরজাটার দিকে যায়। ভূতো চড়া গলায় বলে–দাঁড়া আমি দরজাটা খুলি আগে। জবা সবিস্ময়ে বলে, এখনও খোলনি? আশ্চর্য!

ভূতো রাগত ভাবে দরজাটা খুলতে খুলতে মকবুলকে বলে, তুমি সকাল বেলা আসতে পার না?

মকবুল ম্লান হেসে বলে–অনেক দূর থেকে আসি বাবু। এই বলে ঝোলা থেকে কয়েকটা কনকচাঁপা বার করে জবাকে বলে, লেও জোবা বহিন।

জবা একমুখ হেসে বলে, কোথা থেকে পেলে?

–ওধারে মসজিদের পাশে একটা গাছে হয়েছিল?

–বাঃ, আগে এটা নাও। মা তোমাকে আজ ফ্রায়েড রাইস দিয়েছে।

মকবুলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভূতো নির্বাক হয়ে যায়। জবা পাকা গিন্নির মতন মকবুলের বাটিতে গুছিয়ে ফ্রায়েড রাইস মাংস দিয়ে 'দাঁড়াও হাত ধুয়ে আসি,' বলে ছুটে চলে যায়। তারপর একটা চার আনি ওর হাতে দিয়ে কনকচাঁপাগুলি হাসিমুখে ছোট ছোট দু হাত পেতে নেয়। মকবুল জেনে গেছে এই বাচ্চা মেয়েটি ফুল আর পাখি খুব ভালোবাসে। ভূতো আজকে আর বিশেষ কিছু বলে না কারণ আজ ভালো খাওয়ার জন্যে তার মেজাজটা খুশি খুশি ছিল।

কিন্তু পরের রবিবারের দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যাওয়ার জন্যে ব্যাপারটা বিপরীত হয়ে দাঁড়াল অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। সেদিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেশ বড় করে খবর বেরিয়েছে,–ছেলেধরার মেয়ে চুরি। খবরটা হচ্ছে বাগবাজারের অন্নদা নিয়োগী লেন থেকে ভর দুপুরবেলায় একটি ছেলেধরা ভিখারী সেজে পাঁচ বছরের মেয়েকে অপহরণ করেছে। আজ দুদিন হয়ে গেল মেয়েটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ খুব চেষ্টা করছে। আমি বলেছিলাম, মা, ঐ সব মকবুল-টকবুলের কাছে জবাকে দুপুর বেলা একা ভিক্ষে দিতে পাঠিও না। ভূতো আস্ফালন করে।

মা আস্তে আস্তে বলে, সব ভিখারীই ছেলেধরা হবে নাকি!

–হলে তো কিছু করার থাকবে না। ভূতো আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দেয়।

জবা মায়ের সমর্থন পেয়ে একমুখে হেসে বলে, দূর, মকবুলদা ছেলেধরা হবে নাকি, বড়দাটা যেন কি?

দ্বিতীয় কারণ হলো, সেই রবিবার নীলষষ্ঠী থাকায় মায়ের সারাদিন নির্জলা উপোস, তাই বাড়িতে আজ নিরামিষ। খাবার টেবিলে বসেই ভূতোর মেজাজ গেল খিচড়ে। এমন সময় মকবুলের ডাক–জোবা বহিন–জোবা–

ভূতো এঁটো হাতেই ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দড়াম করে খিড়কি দরজাটা খুলে চিৎকার করে বলে, আমি বলেছি না, কখনও এসময়ে ভিক্ষে করতে আসবে না। মকবুল সভয়ে জবাবদিহি করে–বাবু, বহুত দূরসে আসি।

–সে যেখান থেকে আস আমার জানার দরকার নাই। ভূতো বলে যায়, সকালে এলে ভিক্ষে পাবে, দুপুরে এলে পুলিশে খবর দেব।

–পুলিশ–মকবুল ভীত হয়।

–সরো সরো, জবা ব্যস্ত হয়ে মকবুলের বরাদ্দ চাল তরিতরকারি নিয়ে এসে দেয়। মকবুল আজ ওর জন্যে একটা কৃষ্ণচূড়ার ছোট্ট ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে। জবার লাল লাল কৃষ্ণচূড়ার ফুল দেখে মুখটাও আনন্দ লাল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বড়দার মুখটাও রাগে রক্তিম হওয়ায় ফুলের আনন্দটা শেষ চৈত্রের তপ্ত হাওয়ায় নিমেষের মধ্যে শুকিয়ে গেল।

এরপর ভূতোর বকুনির জন্যেই হোক, অথবা একটা ছোটখাটো দাঙ্গা লাগার জন্যে হোক, পরপর কয়েকটা রবিবার মকবুল এলো না। জবা প্রতি রবিবার দুপুরে ওর জন্যে ডিশে করে চাল, আলু, পটল, লঙ্কা, বাটিতে তেল সাজিয়ে রাখত, কিন্তু মকবুলের সেই 'জোবা বহিন' ডাক আর শোনা গেল না। প্রথম প্রথম জবার মকবুলের জন্যে মন কেমন করত, তারপর আস্তে আস্তে তাকে ভুলে গেল।

কিছুদিন পর জবারা শ্যামবাজারে মোহনবাগান রো-তে বাবার এক বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশনে রাত্রিবেলা নিমন্ত্রণ খেতে গেল। জবার মা দিল খুব সুন্দর বড় একটা স্টেনলেস

স্টিলের বাটি আর ঝিনুক। আর জবা দিল বিরাট একটা পুতুল। খাওয়া সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। খুব ভালো খাইয়েছে। জবার কিনা ফিস ফ্রাইটা খুব ভালো লেগেছে। দেড়খানা খেয়েছে। বেশি রাত্রি হয়ে যাওয়ায় ওরা আর যেতে দিল না। রাত্রিতে ওখানেই থাকতে হলো।

তার পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ ওখান থেকে টালিগঞ্জ যাবার জন্যে একটা ট্যাক্সিতে সবাই উঠল। ভূতো ড্রাইভারকে বলল, একটু ডালহৌসি হয়ে ঘুরে চল। কারণ ভূতোর অফিস ডালহৌসিতে, ও সেখানে নেমে যাবে।

সামনের সিটে বসেছে ভূতো ও ন্যাড়া, পেছনের সিটে বাবা, মা ও জবা। জবা উঠেই ডানদিকের জানলার ধারে বসে। ভূতো ব্যস্ত হয়ে বলে, দরজা লক কর, বলে নিজের সামনের সিট থেকে ঘুরে হাত বাড়িয়ে নিজেই দরজা লক করে দেয়। ট্যাক্সি হু-হু করে চলতে লাগল।

বিবেকানন্দ রোডের কাছে একটু জ্যাম, তারপর আবার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে বৌবাজার স্ট্রীটের কাছে এসে ট্যাক্সি ডান দিকে ঘুরল। চিৎপুরের মোড়ে একটু থামল। তারপর আবার ট্যাক্সি ডালহৌসির দিকে এগুলো। লালবাজার পার হয়েই মার্টিন বার্নের বাড়িটার কাছাকাছি এসেই ট্যাক্সিটা থেমে গেল। ওদিকে কিসের একটা গোলমাল। সামনে সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে। জবাদের ট্যাক্সির পেছনেও সার সার গাড়ি বাস ট্রাম এসে দাঁড়িয়ে গেছে। হঠাৎ ভূতোরা লক্ষ্য করল ডালহৌসির দিক থেকে অনেক লোক ছুটে আসছে। ভূতো তাদের জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে? তারা সভয়ে বলে—আগুন—আগুন। হাজার হাজার লোক ডালহৌসির দিক থেকে চিৎপুরের দিকে ছুটছে। ভূতোরা সবিস্ময়ে দেখে—অদূরে তাদের সামনে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তার ভেতর থেকে আগুনের শিখা বিরাট রাক্ষসের জিবের মতন লকলক করছে! কি ব্যাপার?

একটা তেলের ট্যাংকারের সংগে একটা প্রাইভেট বাসের সংঘর্ষের ফলে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পালান, পালান। আগুনটা এগিয়ে আসছে। সব লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ভূতো, ন্যাড়া, ন্যাড়ার বাবা-মা, জবা, এমন কি ট্যাক্সি ড্রাইভার নেমে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাশের গলির দিকে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলে। নার্ভাস ভূতনাথ চিৎকার করে মা বাবাকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে—ছোট, ছোট। ওরা কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বেন্টিক স্ট্রীটে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ জবার বাবা জিজ্ঞেস করে, জবা কই? জবার মা বলে, তোমার হাত ধরেনি?

—না! ভূতো, তুই তো তাড়াতাড়ি ধরে ধরে নামালি।

ভূতো কাঁপা গলায় এধার ওধার চেয়ে বলে, আমি তো ওর হাত ধরিনি, তোমরাই তো ধরলে। সবাই-এর মনে হলো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

ন্যাড়া বলে, সে নিশ্চয় যেখানে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই আছে।

ওরা সেইদিকে ছুটলো। নদীর স্রোতের বিপক্ষে গুণ টেনে নৌকা বাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু তারা প্রাণ তুচ্ছ করে জবাকে খুঁজতে গেল। জবা তো দূরের কথা, জনারণ্যে সেই ট্যাক্সিটাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। এই ভিড়ে ছোট্ট জবাকে খুঁজে বার করতে যাওয়া যেন খড়ের গাদায় একটা ছোট্ট ছুঁচকে

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে

খুঁজে বার করার মতন হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু এটা হাস্যকর তো নয়, ভয়ানক মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা। অতো গোলমাল চিৎকারের মধ্যে ভূতো, ন্যাড়া, বাবা, মা 'জবা জবারে' বলে ডাকতে থাকে। কিন্তু ওদের এই ডাকটা সমুদ্রের জলে কয়েক চামচ মধুর মতো কোথায় মিলিয়ে গেল। কি করবে ওরা, কোনো দিশাই পাচ্ছে না। জবার মা তো ঐখানেই কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেল। তার ওপর দিয়েই দুতিনটে লোক চলে গেল। ভূতো, ন্যাড়া, তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাকে তুলে ধরে। কপালটা কেটে রক্ত পড়ছে। পুলিশ ডালহৌসির দিকে যেতে দিচ্ছে না। ন্যাড়ার বাবা বললে, এখানে খুঁজে বার করা অসম্ভব। চল লালবাজারে যাওয়া যাক।

লালবাজার পুলিশ স্টেশন, এখানেও সবাই ওই আগুন লাগা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ভূতো তাড়াতাড়ি একটা পুলিশ অফিসারকে দেখে ছুটে গিয়ে বলে, আমার ছোট বোন হারিয়ে গেছে। একবার দয়া করে—

পুলিশ অফিসার ভূতোর কথা শেষ করতে দিল না, তাড়াতাড়ি বলে, মিসিং স্কোয়াডে যান। অফিসার কোনোরকমে কথাটা শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। জবার মা বাবা ফ্যালফ্যাল করে অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকে। চারিদিকে খালি আগুন আগুন নিয়ে আলোচনা। ঢং ঢং করে আরও ফায়ার ব্রিগেডের লাল লাল গাড়ি আগুন নেভাতে আসছে। কিন্তু জবার বাবা মার বুকে যে ব্যথার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সে আগুন নেভাবে সেই ফায়ার ব্রিগেড কোথায়?

মিসিং স্কোয়াডের অফিসারটি খুবই ভদ্রলোক। ভূতো ন্যাড়াদের সব কথা শুনেই, তখুনি যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেও কিন্তু জবার কোনো খবর পাওয়া গেল না। সন্ধ্যে সাতটা

মকবুল ঘুমন্ত জবাকে কোলে করে আস্তে আস্তে নামাচ্ছে

বাজে। ডালহৌসি স্কোয়ার অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে। ভূতো, ন্যাড়া পাগলের মতন বি বা দি বাগের চারদিকটা তন্নতন্ন করে খুঁজে এসে আবার লালবাজারে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা মায়ের কাছে অপরাধীর মতন এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়ায়। পুলিশ অফিসারটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের একটা জিপ গাড়ি দেখিয়ে বললেন, আপনারা এই জিপে করে বাড়ি চলে যান। সঙ্গে একজন অফিসার দিচ্ছি, তার হাতে আপনার মেয়ের লেটেস্ট ছবি পাঠিয়ে দেবেন আর আপনার বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে যান।

জবার মা অধীর হয়ে বলে, বাবা তুমি আমার ছেলের মতন, আমার জবাকে যেখান থেকে পার এনে দাও। পুলিশ অফিসার সান্ত্বনা দিয়ে বলে, নিশ্চয় এনে দেব। এখন আপনারা বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

টালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে জবার মা পুজোর ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তির কাছে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। জবার বাবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ব্যথাটা বুকের ভেতর সাপের মতো এঁকে-বেঁকে ঘুরে ঘুরে মধ্যে মধ্যে ছোবল মারছে। ইতিমধ্যে খবরটা পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই এসে খোঁজ নিচ্ছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, পরামর্শ করছে। রেডিও টিভিতে আগুন লাগার খবর বলল, দুজন মারা গেছে। বিশজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। টিভিতে হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ছবিগুলো দেখে ভূতোর খেয়াল হলো, এখনি জবার একটা ছবি টিভি স্টেশনে দিয়ে আসবে। সবাই বললে, কালকে দিলেও হবে। আজকে তো বেরুবে না। ন্যাড়া এসেই আর একবার লালবাজারে ফোন করল—একই খবর।

রাত্রি যত বাড়ছে, শোকটাও যেন তত বাড়ছে। ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারোটা বাজল। ন্যাড়া আর একবার লালবাজারে টেলিফোন করল। এবারে লালবাজারের অফিসার একটু বিরক্ত হয়েই বলল, এর আগে তো চার-পাঁচবার ফোন করেছেন। বলেছি তো খবর পেলেই ফোন করব ।

রাত অনেক হয়েছে । পাড়ার কুকুরগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে । অন্যদিন তারা ঘেউ ঘেউ করে। আজ তারা চুপ করে যেন জবারই জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে।

ন্যাড়া নিজের ঘরে দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। যে ভূতো বাড়ির প্রত্যেকটা জানালা কপাটের খিল টিপে টিপে দেখে, সে আজ কিছুই দেখেনি। জবার মা নিস্তেজ হয়ে পুজোর ঘরে পড়ে আছে ।

ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। সবার একটু তন্দ্রা এসেছিল। ভূতো একটা হাত দুচোখের ওপর রেখে শুয়েছিল। হঠাৎ মনে হলো, বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ভূতো উঠে বসল। কলিংবেল বাজল। ভূতোর সঙ্গে বাড়ির সবাই উঠে পড়ে দরজার কাছে ছুটে এসেছে। দরজা খুলে দেখে বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। একটা মোটা পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাক্সির ভেতরে কাকে বলছে, এই বাড়ি হ্যায় ? জবার বাবা মা ভূতো ন্যাড়া একসঙ্গে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, কে আপনারা ! এমন সময় সবিস্ময়ে দেখে, ট্যাক্সি থেকে সেই ভিখারী মকবুল ঘুমন্ত জবাকে কোলে করে আস্তে আস্তে নামাচ্ছে। ভূতো ন্যাড়া বাবা মা পাগলের মতন বারান্দা থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মকবুলের কাছ থেকে জবার মা জবাকে কোলে তুলে নেয়। জবার বাবা মকবুলকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি একে কি করে পেলে ? মকবুল সলাজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, বাবু হামি থাকি লোয়ার চিৎপুরে এক গলিমে। ফুটপাতেই থাকি। বিস্তারা (বিছানা) পাতছি, আচানক দেখলাম দূরে একটা লেড়কি কাঁদছে, চার-পাঁচজন আদমী জড়ো হয়েছে। হাম গিয়া। জোবা বহিনকো দেখা। ও হামাকে দেখে কাঁদছে আর বলছে, মার কাছে যাব মকবুলদা।

ওর কথার রেশ ধরে সেই পাঞ্জাবী ড্রাইভার সুন্দর বাংলায় বলল, ওরা আমার গ্যারেজে গিয়ে হাজির। মকবুল আমার পায়ে ধরে বলল, চলুন সিংজী, ছোটা বেটি হারিয়ে গেছে—মার কাছে যাবে। এদের কথার মধ্যেই জবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মা, বাবা, ন্যাড়া, ভূতোকে দেখে হেসেই আবার কেঁদে ফেলে। সকলের চোখে তখন আনন্দের অশ্রু। জবার বাবা মকবুল আর সিংজীকে বললে, তোমরা ভেতরে এসো।

নেই বাবু, বহুত রাত হোগিয়া—সিংজী বলে। ভূতো বলে, ট্যাক্সিভাড়াটা নিতে হবে। তারপর মকবুলকে বুকে জড়িয়ে বলে—আমাকে ক্ষমা কর ভাই।

ছিঃ ছিঃ, একি বলছেন।

ইতিমধ্যে জবার মা জবাকে নিয়ে ভেতরে গেছে । ক্লান্ত জবা ঘুমের ঘোরে বলে, মা, মকবুলদাকে চাল তরকারি তেল দেবে না—বলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। জবার মা তাড়াতাড়ি ফ্রিজ খুলে ফ্রিজে যত ভালো ভালো খাবার ছিল, দু ডিশ ভরে মকবুল আর সিংজীকে দিতে গেল। সিংজী দেখে বলে, এত রাত্রে খাব না, বরং কাগজে মুড়ে দিন। তাই দেওয়া হলো। জবার বাবা মকবুল আর সিংজীর হাতে একটা করে একশো টাকার নোট গুঁজে দিল।

ন্যাড়া বলে, মকবুলদা, এবার থেকে প্রতি রবিবার আগের মতন এসো।

ঠিক আছে। মকবুল বলে, জোবা বহিন কোথায় ? বলে বারান্দায় ওঠে। জবার মা বাবার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়ে দেখে জবা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ভিখারী মকবুল জবার মাথায় হাত দিয়ে সম্রাটের মতন বলল, খোদা হাফিজ।

তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। সিংজীর ট্যাক্সিটা মকবুলকে তুলে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। ন্যাড়া, ভূতো, বাবা-মায়ের সেই দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, যেন কোনো দেবতার দূত এসে তাদের হারানো সাতরাজার ধন মানিককে খুঁজে দিয়ে সোনার রথে চলে গেল।

ছবি : দিলীপ দাস

অনুতোষের অন্তর্ধান

শচীন দাশ

প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসেই ট্রেনটা ধরতে হলো। এমন যে হবে আগে বুঝতে পারিনি। বেরিয়েছি তো কত তাড়াতাড়ি। ট্রেনের সময়েরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে। ভেবেছিলাম, বাড়ির সামনেই বাস স্ট্যান্ড। আস্তে ধীরে বাসে বসে একসময় হাওড়ায় পৌঁছোলেই চলবে। তারপর টিকিট কেটে আর ট্রেনে উঠতে কতক্ষণ!

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোতেই সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল। বাস স্ট্যান্ডে বাস নেই। হাওড়ার দিকে নাকি প্রচন্ড জ্যাম। তাই বাস কখন আসবে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। অগত্যা হাতের পাঁচ ট্যাক্সি। এদিকে ওদিকে দেখতে দেখতে একটা যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু দরজা খুলে উঠতেই ড্রাইভার ভুরু কোঁচকালো।

যাচ্ছেন তো, কিন্তু হাওড়া ব্রিজ ধরে যেতে গেলে আজ আর পৌঁছোতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি বলি বাবুঘাট থেকে লঞ্চ-এ পার হয়ে যান। ঠিক সময়েই ট্রেন ধরতে পারবেন।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। অতএব তাই হলো। অন্তত শেষ সময়ে হলেও ছুটতে ছুটতে এসে তবু ট্রেনটা ধরতে পারলাম।

কিন্তু ট্রেনে উঠতেই অবাক। লোক কোথায়! অত বড় একটা কামরায় চার পাঁচজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে!

অনুতোষ ঠিকই বলেছিল, এ সময়টায় এ ট্রেনে তেমন ভিড় হয় না; দরকার হলে শুয়ে শুয়েও আসতে পারবি। তবে দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না ; ট্রেন কিন্তু ঠিক রাত ন'টায় বাঁকুড়ায় পৌঁছোবে।

তা যে পৌঁছোবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, যেমন কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে ছাড়ল। ভাবলাম, ঘুমিয়ে তো পড়বই না, উপরন্তু শুয়েও যাবো না। নতুন জায়গা, যাইনি কোনোদিন—জানলার পাশের সীট যখন খালি আছে দেখতে দেখতেই যাবো।

বেশ ভালো দেখে একটা জায়গায় বসে পকেটের রুমালটা টেনে আনলাম। অনেকটা ছুটতে হয়েছে, তাই এই শীতেও ঘামছি আমি। ভালো করে চেপে চেপে ঘামটা মুছতেই হঠাৎ কে যেন আমাকে ডেকে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই অবাক হলাম।

অনুতোষ!

এ কীরে! তুই এখানে? কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাসনি!

কর্মক্ষেত্র মানে, অনুতোষের অফিস বাঁকুড়ায়। বছর দুই হলো ওখানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে সে। আর গিয়ে অবধি আমাকে অসংখ্য চিঠি দিয়েছে আর প্রতি চিঠিতেই অনুরোধ জানিয়েছে একবার অন্তত আমি যেন বাঁকুড়া থেকে ঘুরে আসি।

অনুতোষ অনুরোধ জানাত আর আমিও প্রতি চিঠিতে জবাব দেওয়ার সময় জানাতাম, এবারে যাবো....এই যাচ্ছি—কিন্তু যাবো যাচ্ছি করেও যখন যেতে পারিনি এ দু'বছরে তখন অনুতোষের দিক থেকে যেন উৎসাহ কমে গেল। অনুতোষ আসত ; কলকাতায় এসেই আমার সঙ্গে দেখা করত কিন্তু যাবার কথা আর বলত না। শেষে আমিই, এই সেদিন ও কলকাতায় এলে দিন-তারিখ দিয়ে বলেছিলাম, এবার আমি সত্যিই যাচ্ছি। স্টেশনে যেন ও দাঁড়িয়ে থাকে।

আমার কথায় অনুতোষ লাফিয়ে উঠেছিল। আমি যাবো বলাতে ও জানিয়েছিল, ওকে আগে যেতেই হবে। না হলে আমাকে নিয়েই একসঙ্গে যেত সে। যাক্‌গে, তার জন্য কোনো অসুবিধে হবে না। সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিল, বাঁকুড়া স্টেশনে সে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। রাত ন'টায় ট্রেন ঢুকবে। আর ট্রেন থেকে নেমেই আমি ওকে দেখতে পাবো।

তা এই কথাই তো ঠিক হয়েছিল ; হঠাৎ এর ভেতরে আবার কী ঘটল! তবে কি কোনো কারণে অনুতোষের যাওয়াও পিছিয়ে গেছে। আগের তারিখের বদলে সে আজই রওনা হয়েছে! কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো অনুতোষ ওকে একটা খবর দিত। একই সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে তাহলে যাওয়া যেত।

কিছুই বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই অনুতোষ হাসল। আমার সামনের জানলার পাশের সীটটায় বসে পড়ে বলল, খুব অবাক হয়েছিস, তাই না? আসলে বাড়িতে মায়ের অসুখের জন্যই আমার যাওয়াটা পিছিয়ে গেল।

মনে মনে এবারে একটু আহত হলাম। বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই জানালাম, কিন্তু তাই বলে একটা খবরও দিতে পারলি না? দেখা না হলে তো আলাদা আলাদাই যেতাম।

অনুতোষ দেখি মিটিমিটি হাসছে, হ্যাঁ, খবর একটা দিতে পারতাম। তবে ইচ্ছে করেই দিইনি—

ইচ্ছে করে!

হ্যাঁ—অনুতোষ তখনো তেমনি হাসছে, কেন জানিস? কথা দিয়েও তো এ-দু'বছরে তোর যাওয়া হয়নি, তাই ভাবলাম আজ দেখি তুই কেমন সত্যি সত্যিই কথা রাখিস।

এবারে আমি না হেসে পারলাম না। সত্যি, অনুতোষটা এখনো তেমনি আছে। ছেলেবেলা থেকেই ও এরকম। যখন আমরা সবই একদম বোবা হয়ে গেছি, কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না, সেই সময়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে অনুতোষই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

এখনও দিল।

আমি বললাম, যাক্‌ গে এ-একরকম ভালোই হলো। বেশ কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। ....তোর মা কেমন আছেন?

এখন ভালোই। সেজন্যই তো দেরি হয়ে গেল।

অনুতোষ জানলার বাইরে মুখ রাখল।

ডিসেম্বরের বেলা। দিন ছোট। একটু আগে যে সূর্য পশ্চিম আকাশে লাল খুনি রঙ ছড়িয়ে বিদায় নিচ্ছিল এখন সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাইরে গাছপালাও ভালো চোখে পড়ে না।

বেশ ঠান্ডা লাগছিল। আমার দিকের জানলার কাচটা নামিয়ে অনুতোষকে বললাম, তোর দিকেরটাও নামিয়ে দে অনুতোষ। ঠান্ডা আসছে।

ধুস্‌। ঠান্ডা কোথায়! আমার তো ভীষণ গরম লাগছে। গায়ে বোধহয় ফোস্কা পড়ে গেল। এই দেখ—দেখ—

বলতে বলতে জামার হাতার বেশ খানিকটা তুলে আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে ধরল অনুতোষ।

আর তাকাতেই আমি চমকে উঠলাম।

অনুতোষের বাহুতে ছোট ছোট আঙুরের মতো দু'তিনটে ফোস্কা।

এ কীরে, ডাক্তার দেখাসনি!

হুঁ। দেখিয়েছি। ওষুধ খেতে দিয়েছে। লাগাবার মলমও দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কমছে না। এবার ভাবছি—

কী ভাবছে আর জানা গেল না। তার আগেই একজন হকার এসে কাছে দাঁড়াল।

অনুতোষ বলল, মুড়ি খাবি....ঝালমুড়ি—

বলেই হকার-এর দিকে তাকাল, এই যে এখানে দেখি....ঝাল কিন্তু কম করেই দিও।

মুড়িওয়ালা মাথা নেড়েই তার মুড়ি নামাল। ট্রেন ততক্ষণে ফুলেশ্বরে দাঁড়িয়েছে।

জানলা দিয়ে একবার তাকিয়ে, স্টেশনটা দেখে অনুতোষ জানাল, বুঝলি আমার আর ওখানে ভালো লাগছে না; কবে যে আবার কলকাতায় আসতে পারবো—

বিষণ্ণ হয়ে আমার চোখে চোখ রাখল অনুতোষ। আর সেই সময়েই আমি চমকে উঠলাম। অনুতোষের চোখের ভিতরটায় যেন মণি নেই; শুধুই অন্ধকার। কিন্তু তাও এক ঝলক মাত্র; পরেই আবার চোখের সেই বিষণ্ণতা ফিরে এল।

এমন সময় ঝমঝম করে শব্দ উঠলো। অনুতোষ ও আমি—আমরা দু'জনেই বাইরে তাকালাম। আধো অন্ধকার। আধো আলো। তারই ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটছেএখন রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে।

অনুতোষ লাফিয়ে উঠল।

আরে কোলাঘাট! আমরা একবার পিকনিকে এসেছিলাম মনে আছে?

থাকবে না আবার। ইলিশ না পেয়ে তুই তো জেলেদের নৌকায় চলে গিয়েছিলি।

আমি না গেলে তোরা কি সেদিন ইলিশ পেতিস নাকি?

তা অবশ্য ঠিক। শুধু ইলিশ কেন, এমনি যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনো দিকে আমরা কোনো সমস্যায় পড়লেই জানি ঠিক সময়মতোই এসে হাজির হবে অনুতোষ। আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, বন্ধুত্বটা সেজন্য আমার সঙ্গেই প্রবল।

মুড়িওয়ালাকে পয়সা দিতে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে অনুতোষকে বাধা দিতে গিয়েই চমকে উঠলাম। এ কী–! অনুতোষের হাত দুটো এত ঠান্ডা কেন! যেন বরফের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। তাতেই হাত দুটো এত ঠান্ডা আর শক্ত।

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অনু জানাল, কী হলো, অবাক হলি! আসলে ভয়ে আমার হাত-পা এমনি ঠান্ডা মেরে আসছে যে তোকে কী বলব!

কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তবে খুলেই বলি–

বলে অনু আরও আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। আর তখুনি কেমন একটা গন্ধ ভেসে এল আমার নাকে। গন্ধটা ওষুধের।

অনুতোষ বলল, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই হঠাৎ একটা হাঁচির শব্দ কানে এল। ব্যস, তখন থেকেই মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ভাবছিলাম, আজ ভালোয় ভালোয় পৌঁছোতে পারলে হয়। রাস্তায় না দুর্ঘটনায় পড়ি–

ধুর, ওসব তোর কুসংস্কার–

না রে, না–অনুতোষ কাতর গলায় বলে উঠল, রাস্তায়ও বেরোলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস প্রায় ঘাড়ের ওপরে....

ইস্, সে কী–

হ্যাঁরে, একদম গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। তবে হ্যাঁ, মারা যে যাইনি এই রক্ষে–

অনুতোষ খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

ইস্! কী বিচ্ছিরি হাসিটা। এমন তো হাসতো না ও কোনোদিন! কী জানি, হয়তো বাইরে গিয়েই এসব ওর পাল্টেছে। আমি চোখ ফেরালাম।

গাড়ি দাঁড়াল এসে মেদিনীপুরে। জানলার শার্সিটা একটু তুলে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া। কিন্তু অনুতোষ জানলা খুলে তেমনি নির্বিকার।

একসময় আমি একটা সিগেরেট ধরালাম। কিন্তু দেশলাইটা জ্বালাতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এ কী–না-না-না....

কী ব্যাপার! অনুতোষটা গেল কোথায়!

অনুতোষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ-চোখে ভীষণ ভয়। ওর ভয়ার্ত মুখটা দেখে আশেপাশের সীটের দু'চারজনও এগিয়ে এল।

আমি বললাম, কী হয়েছে অনু?

অনুতোষ বসে পড়ল; মুখের ওপরে দু'হাত দিয়ে ঢেকে বলল, একটু আগুন....ব্যস, আগুনটা তারপর–

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না। দেশলাইটা ততক্ষণে পকেটে রেখেছি। সিগেরেটটাও যথাস্থানে। ঠিকঠাক রেখে শুধু অনুতোষকেই লক্ষ্য করছি। ট্রেন এর মধ্যে ফেলে এল আরও কয়েকটা স্টেশন। রাত প্রায় আটটা চল্লিশ।

বিষ্ণুপুর আসতেই অনুতোষ উঠে দাঁড়াল।এবারে দরজার কাছে দাঁড়াই। দেখতে দেখতে তো বাঁকুড়া এসে যাবে–

দেখতে দেখতেই বাঁকুড়া এসে গেল একসময়। দুই বন্ধুতে স্যুটকেস নিয়েই নামলাম। একটু হেঁটে একটা রিকশয়ও তুলল অনুতোষ। রিকশটা লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে এগোল।

যদিও রাত বেশি নয়, সবে ন'টা। কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডায় রাস্তা তাই সুনশান। লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু'একটা দোকান অবশ্য খোলা আছে, কিন্তু লোক সেখানেও নেই।

দু'ধারে ইউক্যালিপ্টাসের সারি। তারই মধ্যে কালো পাথরের মতো রাস্তা। রিকশটা এগোল সেই রাস্তা ধরে। আমি ততক্ষণে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক করে শব্দও হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। কিন্তু অনুতোষের কোনো বিকার নেই।

হঠাৎ গান ধরল অনুতোষ।....ও মন পাখি–কী ফল খেলি বাগানে গিয়া....

আশ্চর্য! চমৎকার গলা। এমন গলা কোথায় পেল ও! যতদূর জানি ও তো কোনোদিন গান গাইত না। ঠিক এমনি সুরের একটা গান আমি আব্বাসউদ্দিনের গলায় শুনেছিলাম। ঠিক তেমনি সুর।

গান থামিয়ে অনুতোষ বলল, ব্যস, এসে গেছি। ঐ স্কুল-ডাঙা। আর ঐ যে আমার বাড়ি। মানে আমি যে বাড়িতে ভাড়া আছি।

রিকশঅলা নির্দেশ পেয়ে, প্রায় ফাঁকা ছোট্ট একটা মাঠের সামনের একটা দোতলা বাড়ির কাছাকাছি এনে রিকশটা দাঁড় করালো।

নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি, অনুতোষ হঠাৎ হাওয়া। আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। ওর গানের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

কী ব্যাপার! অনুতোষটা গেল কোথায়! এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঘুরঘুটে অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে চোখ জোড়া অন্ধকারে মানিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, সামনেই বাড়ির দরজা। পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে জ্বালালাম। দরজার মাথায় কলিং-বেলও আছে।

আশ্চর্য! এখানে নেমে অনুতোষ কোথায় গেল। একটু সময় আবার ভালো করে তাকিয়েই অনুতোষের নাম ধরে ডেকে উঠলাম–

অনু....অনুতোষ–

সাড়া নেই।

একটু পরে আবারও ডাকলাম, অনুতোষ....অনুতোষ....কি ব্যাপার কী!

এবারেও সাড়া এল না। তবে দোতলার ওপরের একটা জানলা খুলে গেল।

আসছি–এখুনি আসছি। আপনি দাঁড়ান–

যত দ্রুত বলেছিল, তার চেয়েও দ্রুত বোধহয় স্বরের মালিক নেমে এল।

ওফ, আপনি এলেন তাহলে! দু'দিন ধরে কী যমে মানুষে টানাটানিই না চলছে ওকে নিয়ে।

কাকে নিয়ে! কি বলছেন আপনি?

আপনা থেকেই গলা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল আমার।

ভদ্রমহিলা বললেন, সে কী! আপনি কলকাতা থেকে আসছেন না?

হ্যাঁ, তাইতো আসছি–

তবে! টেলিগ্রাম পাননি এখান থেকে–

কিসের টেলিগ্রাম?

ভদ্রমহিলা তড়িঘড়ি আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নিচেই একটা চেয়ারে বসিয়ে যা বললেন তাতে আমি চমকে উঠলাম।

মাত্র তিন দিন আগে বাসে পুরুলিয়া যাবার সময় এক ভয়ংকর দুর্ঘটনায় পড়ে অনুতোষ। সারা দেহে আগুন লেগে যায়। মাথায়ও চোট পায়। সব থেকে খারাপ পেটের দিকটা। এখনও বেঁচে আছে। তবে তিন দিন ধরে জ্ঞান নেই। জ্ঞান ফেরাতে পারছেও না ডাক্তাররা। জানি না কী হবে–! আপনি তো ওর দাদা?

মাথা নাড়লাম। প্রকৃত সম্পর্কটা বললাম।

বলবো কী, তখনো যে আমিই নিজে বিশ্বাস করতে পারছি না। পারছি না আরও এই কারণে যে অনুতোষ তো মারা যায়নি!

রাতটা কোনো রকমে কাটল।

কিন্তু পরের দিন বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে যেতেই সব শেষ। শুনলাম, প্রায় তিন দিন 'কোমা' অবস্থায় থাকার পর আজ সকালেই অনুতোষ মারা গেছে।

প্রচন্ড ধাক্কায় মনটা ভেঙে পড়ল। কৌতূহলকে তবু চেপে রাখতে পারলাম না। তিন দিন ধরে হাসপাতালে অনুতোষ। ছিল বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত অবস্থায়। কোমা-র ভেতরে। তাহলে ঐ সময়টাতেই কি সে নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আমার কাছে! আর একটা অনুতোষ হয়ে?

ছবি : দিলীপ দাস

আজব দেশে বুমবাই

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ রাঙ্গাজেঠু ভাবতেই গা সির সির করে উঠল বুমবাইর। মা এল না ঝুপি এল না। বাবা রাগ করে তাকে একা নিয়েই চলে এসেছে। তাও রাঙ্গা জেঠুর স্ট্রোকের খবর না পেলে বাবা এখানে কোনোদিন আসতে পারে বিশ্বাসই হয় না। আসবে কী করে! তার স্কুল ছুটি হলে হয় পুরী, নয় দার্জিলিং। একবার বাবা তাদের নিয়ে দিল্লিতে গেছিল। সেখান থেকে আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে ফিরেছে। বড়দিনের ছুটিতে মামার বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু মাকে কিছুতেই রাজী করানো যায়নি। রাঙ্গাজেঠু বছরে দু'বছরে গেলেই এক কথা, বৌমা, সবাইকে নিয়ে আমার ওখানে ক'দিন থেকে এস। ভাল লাগবে। মার বিশ্বাসই হয়নি, শহর থেকে ক্রোশ দুই দূরে রাঙ্গাজেঠু এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ।

শীতকাল। সামনে জানালা। কোন সকালে তার ঘুম ভেঙে গেছে। কত সব পাখি ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। জেঠু বলেছে, কোনটা কী পাখি চিনিয়ে দেবে। কীট-পতঙ্গের নাম পর্যন্ত।

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

পাশে বাবা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। অত সকালে উঠতে দেখেই বলল, কীরে, উঠে পড়লি যে! রোদ উঠুক।

–আমি পাখি দেখব বাবা।

–ঠান্ডা লেগে যাবে। রোদ উঠুক। পরে উঠিস।

আর এ-সময় দরজায় টোকা। কেউ ডাকছে, আংকল।

বুমবাই আর স্থির থাকতে পারে না। দু'দিন হলো সে এখানে এসেছে বাবার সঙ্গে। এসেই দেখেছে কী সব বিশাল কান্ড-কারখানা! রাঙ্গাজেঠুর বড় ছেলে কোথায় কোন মার্কিন মুলুক থেকে হাজির। জেঠুর স্ট্রোকের খবরে তার ছোট ছেলে থেকে যেখানে যত আত্মীয় সব হাজির। রাঙ্গাজেঠুর বড় ছেলেকে সে বড়দা ডাকে। বড়দার মেয়ে অরু। সুন্দর পরীর মতো সোনালী চুলের মেয়েটার সঙ্গে তার ভারি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বড় ঠান্ডা পড়েছে। শীতে সে বড় কাবু। ফুল সোয়েটার গায়ে গলিয়ে বলল, যাই অরু। দাঁড়া।

তারপরই বুমবাই ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অরুণিমা ঠিক একটা পাতলা লতাপাতা আঁকা ফ্রক গায় দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এত শীতেও সে কোনো সোয়েটার গায়ে দেয় না। ভারি অবাক লাগে তার। অরুণিমার বাংলা কথা শুনলে হাসি পায়। মেমবৌদি 'ভাল আছি' 'কী সোন্দর' এমন দুটো একটা বাংলা বলতে পারে। বুমবাই বলেছে, বড়বৌদি, তুমি কী! সোন্দর বলবে না, সুন্দর বলবে। অরুরও তাই। সারাদিন সে অরুণিমাকে শিখিয়েছে, রাঙ্গাজেঠু আমার বাবার মামাতো ভাই।

অরু বলেছে, মামতা বাই।

–ওহো নো নো। মা...মা...তো ভা...ই। বল।

অরুণিমা বলেছে, মা...

বুমবাই বলেছে, মা...

অরুণিমা বলেছে, তু...

বুমবাই বলেছে, তু হবে না, তো, তো বল।

অরুণিমা বলেছে,... তো...

–তাহলে কী হলো!

–মামতো।

–ধুস। বুমবাই ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম ভর্তি হবার সময় দিদিমণিরা ভেঙে ভেঙে যে-ভাবে ইংরাজি উচ্চারণ শেখাতো ঠিক সে-ভাবে সারাটা দিন অরুণিমাকে 'রাঙ্গাজেঠু বাবার মামাতো ভাই' শিখিয়েছে। কিন্তু একটা জায়গায় সে বড়
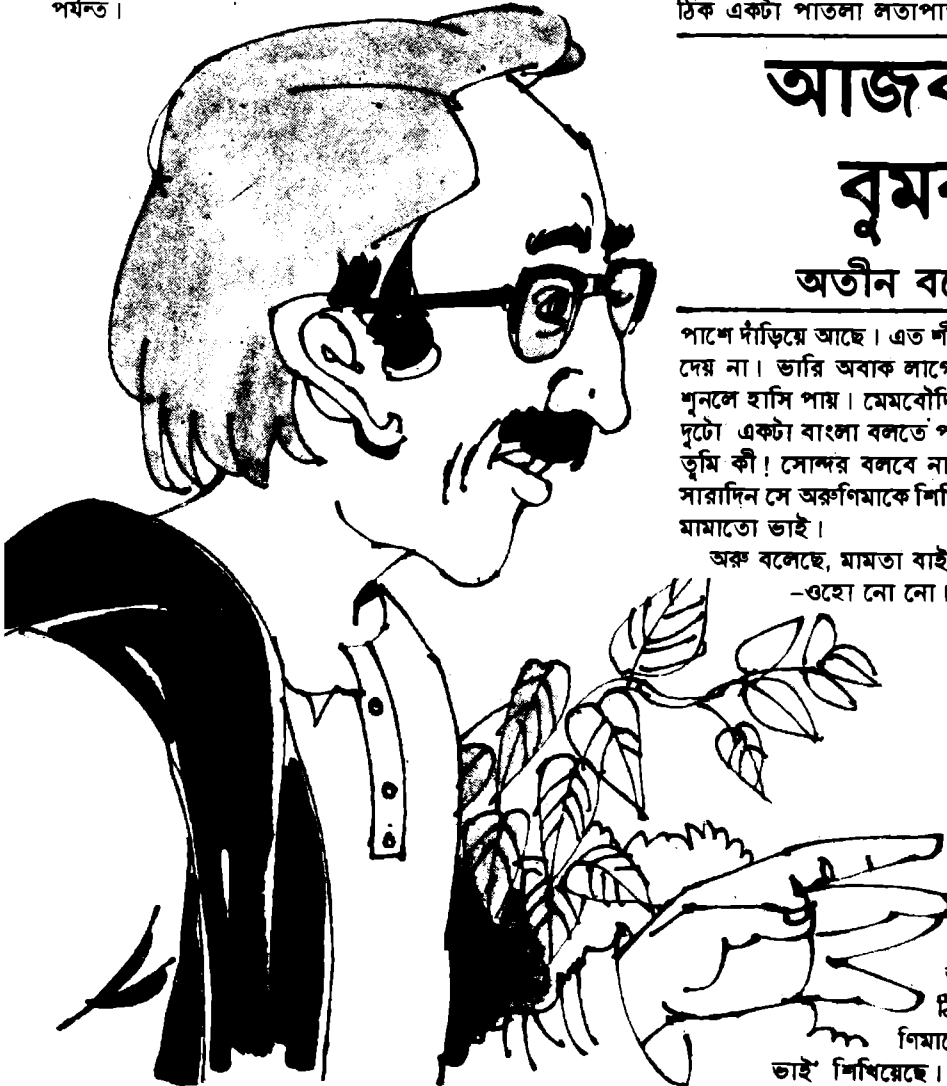
কাবু। শীতে তাকে ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিতে হয়, অরুণিমা কোনো গরম জামাই গায়ে দেয় না।

সে বলেছে, শীত করে না!

–নো সিত।

–নো শীত বল।

–নো ছিত।

–ইস্ তুই কীরে! শী ...ত। কোল্ডকে আমরা শীত বলি। শীত বল।

–সিত।

–তোর বংশে কে সিত বলে জানি না। তুই যে কী! তুই আমার বড়দার মেয়ে, তুই ছিত বলবি! ইস্ সবাই শুনলে কী হাসাহাসি না করবে!

–হাসা হিসি! হাসা হিসি কী!

–তুই একটা বুদ্ধু! হাসাহিসি শুনে বুমবাই ক্ষেপে গেছিল– আমার কাছ থেকে যা তুই! বুমবাই ইংরাজিতেই কথাটা বলেছিল। তোকে দিয়ে কিছ্ছু হবে না! হিসি বলতে কী বোঝায়, সেটা অরুণিমাকে কী করে বোঝাবে! বাংলা ভাষা এত মারাত্মক বুমবাই অরুণিমাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে টের পেয়েছে। রাঙাজেঠু ইজিচেয়ারে শুয়ে না ডাকলে সে এ-কাজের ভারই নিত না! রাঙাজেঠুর একমাত্র বংশধর শীতকে ছিত বললে খারাপ লাগবে না! হাসিকে হিসি বললে খারাপ লাগবে না! সে

কী জানত এমন একটা বিপাকে পড়বে! সকালে সে রাঙগা-জেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কৈ জেঠু, তুমি যে বললে, কোনটাকে কী পাখি বলে চেনাবে; বলতে, আমার বাড়িতে গেলে দেখতে পাবি, কী সব বিশাল আম জামগাছ আমার বাবা কাকারা লাগিয়ে গেছেন, কত সব পাখি উড়ে আসে, কত সব রঙিন প্রজাপতি ...

তখনই রাঙগাজেঠু কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল, অরুটা বাংলা কিছু বোঝে। সব বোঝে না। বাংলা উচ্চারণ ঠিক নেই। তুই ওকে নিয়ে কোনটা কী গাছ, আমরা কে কার কী হই, বাড়িতে যারা আমাকে দেখতে এসেছে, তারা ওর কে হয়, আমরা কে কাকে কি ডাকি, বুঝিয়ে দে। ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলবি। না বুঝতে পারলে ইংরাজীতে কী বলে বলবি। অরু ঠিক তখন সব বুঝতে পারবে। মাটির সঙ্গে বংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে, ও তো একসময় একা হয়ে যাবে। যা, আগে এ-কাজটা কর, তুই ক্লাস সিক্সে পড়িস, ইংরাজি মিডিয়ামে, তোদের সেন্ট জেভিয়ার্সের কত নাম, তাঁর নামে স্কুল। অমন স্কুলের ছাত্র তুই। তুই পারবি।

কাল সারাটা দিন জেঠুর সাম্রাজ্য অরুকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। কোনটা কী গাছ চিনিয়েছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণ শেখাতে গিয়ে এত বড় বিপাকে পড়বে বুঝতেই পারেনি।

সেই অরু কোন সকালে উঠে পড়েছে। তার ঘরের দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সোয়েটার পরে বের হবে—কিন্তু সে জানে সোয়েটার পরলে অরুটা হাসে। ওর হাসি দেখে টের পায়, তুমি আংকল ভেরি ওল্ড ম্যান। অরু ভারি মিষ্টি স্বভাবের। কেবল লাফায়। ছোটে। অরু জ্ঞান হবার পর এখানে এই প্রথম এসেছে। আট দশ বছর আগে একবার বড়দা বৌদিকে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার কাছে শুনেছে, তখন রাঙগাজেঠু কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন। ছোড়দা আর রাঙগাজেঠু। বাড়িতে মহাদেব আর রান্নার লোক ছাড়া কেউ থাকত না। ছোড়দা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবার পরই জেঠু বোধহয় আর কলকাতার বাড়িতে একা থাকতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর বাবা কাকাদের পরিত্যক্ত আবাসে এসে উঠেছিলেন। বাড়ির গৃহদেবতার জন্য মন্দির বানিয়েছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি সব। পতিত পড়েছিল।

সে বাবাকে প্রশ্ন করেছে, দেবোত্তর সম্পত্তি কী বাবা!

বাবা তাকে দেবোত্তর সম্পত্তি কী বুঝিয়ে দিয়েছে।

বুমবাই বলেছিল, পতিত পড়েছিল মানে!

বাবা বলেছিল, দেখার লোকজন ছিল না। আমার সব মামাতো ভাইয়েরা এক একজন এক এক মুল্লুকে। কার সময় আছে এত দেখাশোনা করে। রাঙগাদাই শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে কী ভেবে ফিরে এলেন। বুঝলি বুমবাই, দেশ ভাগের পরই আমার মামারা সব এখানে চলে এসেছিলেন। দেশের জমিজমা বাড়িটা বিক্রি করে এক লপ্তে দেড়শ বিঘা জমি কিনেছিলেন মামারা। সব জমিই ঠাকুরের নামে কেনা হয়েছিল। রাজার পতিত জমি, বনজঙ্গল ছিল জায়গাটা। বড় সস্তায় জমি কিনে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। পাকা বাড়ি না। সব মাটির। উপরে টিনের চাল।

স্ট্রোকের খবর পেয়ে বুমবাই বাবার সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে আসছিল, তখনই বাবা তাকে সব বলেছে। তার মনে হয়েছিল, জেঠুর বাড়িটা হবে মিকি-মাউসের বাড়ির মতো। জেঠুর বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেছিল। আবছা আলো অন্ধকারে সব স্পষ্ট ছিল না। ইঁটের ঘরবাড়িই মনে হয়েছে। সকালে উঠে বুঝেছে, আসলে ঠিক ইঁটের নয়, পাকা মেঝে, দেয়াল মাটির, রং করা। গেরিমাটি রঙের। ছোট ছোট কাঠের জানালা—ঘরের পর ঘর। মাথার উপরে টিনের ছাউনি দেখা যায় না। রঙিন ঘাসের বড় বড় টাইলস বসিয়ে ছাদের মতো করে নেওয়া হয়েছে।

রাঙগাজেঠুর ঘরটা সবচেয়ে বড়। খাট পাতা। সারি সারি কাচের আলমারি। আর রাজ্যের সব বই। তার মনে হয়েছিল, মা এলে এত বই দেখেই ঘাবড়ে যেত! বাপরে বাপ! একটা লোকের, এত বই লাগে! টেবিলের পাশে একেবারে আধুনিক বাতি দান সোফাসেট। বেতের চেয়ার সাদা রঙের। সামনের লম্বা বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলো পড়ে থাকে।

পরের ঘরটা লম্বা। পাশে বাথরুম। লাগোয়া একটা ঘরের দেয়াল ইঁটের। মাথায় জলের ট্যাংক। ঘরে ঘরে বেসিন, হাত-মুখ ধোওয়া যায়। বড় বাথরুম। বাথরুম বাড়ির দু-দিকে দুটো। একটা কাজের লোকদের, একটা রাঙগাজেঠুর নিজস্ব। বড় ফ্রিজটা রাখা হয়েছে, কাঁঠালতলার ঘরের দিকটায়। সেটা সে বোঝে রান্নাবাড়ি। একা মানুষ অথচ বেঁচে থাকার জন্য এমন এলাহী কান্ড। বুমবাইকে কিছুটা বোকা বানিয়ে দিয়েছিল।

সে বাবাকে বলেছিল, এত ঘর দিয়ে কী হয় বাবা! জেঠু একা!

বাবা তাকে বলেছে, একা কোথায়! কত লোক বাড়িতে দেখছিস। তোর পিসিরাই তো এক ডজনের কাছাকাছি—তাও দেখছি, অনেকে আসেনি। সবাই একসঙ্গে বাড়িতে এসে উঠলে, কেউ কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, রাঙগাদা তার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই যে তুই আমি এক ঘরে, তোর দাদারা এক এক ঘরে, পিসিরা এক এক ঘরে, রান্নাবাড়ির দিকটায় লপ্তে লপ্তে খাবার ডাক পড়ছে, বাড়িটা এত বড় না হলে সবাই থাকত কোথায়, উঠত কোথায়!

বুমবাইর তখন কী যে ক্ষোভ মার উপর! মার ধারণা, তার ভাইয়েরাই সব রাজালোক। বাবার আত্মীয়েরা সব প্রজা-লোক। দরজা খোলার আগে সে সাত পাঁচ ভাবছিল। সোয়েটারটা গায়ে দেওয়া ঠিক হবে কী না বুঝতে পারছে না।

উফ্ কী শীত। শহরে এত শীত লাগে না। পাড়াগাঁয়ে শীত বুঝি বেশি। বুমবাই খুব প্যাঁচে পড়ে গেছে। তারপরই মনে হলো, বাইরে বের হয়ে সামনের আমগাছতলায় দৌড়ে গেলে কিংবা মাঠের মধ্যে নেমে গেলে শীত করবে না। সকালটায় সে আজ ভাবল সারাক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করবে, দৌড়ঝাঁপ করলে শরীর গরম থাকে। সোয়েটার না পরেই সে দরজা খুলে দিল।

আর সেই মেয়ে সামনে! সোনালী চুল, ববু করা। পাতলা রেশমের উপর জরির কাজ করা ফ্রক। মুখে সেই সরল হাসি। ওর পাশে জলি মলি, বাবলু অপু দীপুরা। অরু সবার ঘরের দরজায় ডেকে যেন এখানে হাজির। সে বের হয়ে যেতেই বাবার গলা—এই বুমবাই, সোয়েটার গায়ে দিলি না!

–না!
–আরে ঠান্ডা লাগবে।
–না লাগবে না। বলেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে বের হয়ে গেল।
বুমবাই বুঝেছে, ছোটদের মধ্যে সেই সবার বড়। তার কথাই শেষ কথা। অরু পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। অরুই একমাত্র মেয়ে যে সবাইকে আংকল কিংবা আন্টি বলে। আজও তাকে আংকল বলে ডেকেছে। সে ভিতরের লম্বা করিডোর দিয়ে যাবার সময় বলল, অরু, আবার তুই আংকল বলছিস! তুই কীরে! কাকা ডাকবি। বুমবাই কাকা, একশবার বললেও দেখছি তোর কিছু মনে থাকে না। মাথায় কি তোর গোবর পোরা আছে!
অরু বলল, কাকা।
–বল, বুমবাই কাকা।
–বোমবাই কাকা।
–বোমবাই না। বুমবাই।
এই চলে সারাদিন। বারান্দায় এসে দেখল রাঙাজেঠু ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন। গায়ে মোটা সুতির কম্বল জড়ানো। পাশে মেমবৌদি টি-পট থেকে লিকার ঢেলে জেঠুর চা দিচ্ছে। বড়দা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, ডালে পাতায় কী যেন খুঁজছে। ছোড়দা বড়দার কাছ ছাড়া হচ্ছে না। দু-দিন ধরেই দেখেছে যেখানে বড়দা, ঠিক সেখানে ছোড়দা। বড়দাকে না দেখতে পেলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছে।
–এই বুমবাই, বড়দা কোথায় গেল রে!
বড়দারও এক কথা, এই বুমবাই, ছোটন গেল কোথায়!
সে বোঝে, আসলে বড়দা ছোড়দা এখন এখানে রাঙাজেঠুর কাছে চলে এসে, তার আর ঝুপির মতো হয়ে গেছে। ছোট্ট হয়ে গেছে। কথায় কথায় দু ভাইয়ে তুমুল তর্ক–বড়দা বলবে, আমি আর ফিরছি না। বাবা যাই বলুক।
ছোড়দা বলবে, আলবৎ ফিরবে। বিদেশে পড়ে থাকবে! বাবাকে দেখে বুঝছ না, কেমন একা হয়ে গেছেন! ওখানে প্রাচুর্য আছে মানি। কিন্তু প্রাচুর্যই তো সব নয়। মনের দিক থেকে দেউলিয়া হতে হয়। জীবনে কিছুটা অনটন থাকা চাই। হাতের মুঠোয় সব পেয়ে গেলে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মরে যায়।
বড়দা বলবে, মোটেও না। ওটা তোর ভুল ধারণা ছোটন। তোকে এত করে বললাম, আমার সঙ্গে চল–গেলি না। নোংরা রাজনীতি চলছে। শুনেছি একটা এম.এল.এ পর্যন্ত তোদের নাকি আজকাল ধমকধামক দেয়। অশিক্ষিতের রাজত্ব।
বুমবাই অবাক হয়ে যায়। বড়দা ছোড়দা দু'জনই একসময় কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়! একজন বলবে–তুই কিছু জানিস না!
অন্যজন বলবে, তুমি সব জেনে বসে আছ।
তারপর দু-ভায়ে তুমুল তর্ক।
–তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না!
–তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস তো ভাল হবে না!
বুমবাই তখন চুপিচুপি গিয়ে রাঙাজেঠুকে খবর দেয়, জান

জেঠুর এক কথা, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে বুঝি!

জেঠু, বড়দা আর ছোড়দা না বাঁশঝাড়ের ওদিকটায় ঝগড়া করছে।
–যা বলগে, আমি দুটোকেই ডাকছি।

বুমবাইর তখন কাজ ছুটে যাওয়া। বুমবাইর সংগে সংগে সবাই তখন ছুটতে থাকে। কাঁঠালতলা পার হয়ে বড় একটা পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটে বাবা বঁড়শি ফেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে। ফাতনায় চোখ। বুমবাই যে তার দলবল নিয়ে ছুটছে বাবা দেখতেই পায় না। বুমবাইর ভারি মজা লাগে। এখানে এসে সবাই কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। তার বাবা পিসিরা সবাই। পিসিরা কামরাংগা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা কোটা। মগডাল থেকে একটা দুটো পাকা কামরাংগা পাড়ছে, আর কে ওটা নেবে, ধরবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে।

–বড়দা, রাংগাজেঠু তোমাকে ডাকছে।

বড়দা তখন বলবে, এই ছোটন, চল, বাবা ডাকছে।

–আমাকে ডাকছে না। তোমাকে ডাকছে। তুমি যাও।

বুমবাই তখন হেসে ফেলে। জেঠুকে দু'জনই দেখছি যমের মত ভয় পায়।

সে বলল, ছোড়দা, তোমাকেও ডাকছে।

–আমাকে ডাকবে কেন আমি কী করেছি!

–বলল যে দুটোকেই ডাক।

বুমবাইর মনে হয় যেন জেঠু দু'জনেরই কান মলে দেবে। বলবে, আবার ঝগড়া শুরু করলে। তোমাদের নিয়ে দেখছি আমার অশান্তির শেষ নেই।

বড়দা বলবে, যা বলগে, যাচ্ছি।

–যাচ্ছি না! এক্ষুণি যেতে বলেছে।

বড়দার কেমন কাঁচুমাচু মুখ।–এই ছোটন, বাবা ডাকছে। চল।

–তুমি যাও।

–বারে, তোকেও যে ডাকছে!

–আমাকে ডাকেনি!

–এই বুমবাই, দুজনকেই ডেকেছে না!

–হ্যাঁ। বলল, দুটোকেই ডাক। তোমরা ঝগড়া শুরু করেছ শুনে ডাকছে।

–কে বলল, আমরা ঝগড়া করছি!

–বারে তোমরা ঝগড়া করছিলে না!

–কখন ঝগড়া করলাম!

–সে আমি জানি না।। জেঠু তোমাদের ডেকে দিতে বলল। বলেই বুমবাই এক দৌড়। কেউ তাকে শাসন করে না। সকাল বেলায় বাবা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়েছিল। সে সোয়েটার গায়ে দেয়নি বলে বাবা তটস্থ।–বুমবাই, ঠান্ডা লেগে যাবে–দেখছ রাংগাদা কান্ড। তোমার নাতিন পাতলা ফ্রক গায়ে দেয়, শীত করে না, বুমবাইরও নাকি শীত করে না। অরু শীতের দেশের মানুষ, তার ঠান্ডা লাগতে নাই পারে, তাই বলে তুইও!

সে দূর থেকেও শুনতে পায়। রাংগাজেঠু বলছে, সেটা বুমবাই বুঝবে। তোর এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না। ছেলেমানুষ, তোর আমার মতো শীত লাগবে কেন? বাইরে বের হয়ে একদন্ড স্থির থাকছে না, শরীর এমনিতেই গরম হয়ে যায়। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই। বৌমা–দেবুকে চা দাও। একটু থেমে রাংগাজেঠু বলেছিল, মুখ ধুয়েছিস!

বাবা একেবারে তখন বুমবাই। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! বারান্দার পরেই কটা সূর্যমুখী ফুলের গাছ। তাতে বড় বড় ফুল। বুমবাইরা তার নিচে এসে গেছে–শুনতে পাচ্ছিল, রাংগাজেঠুর গলায় ধমকের সুর। এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠিস–শরীর ভাল থাকবে কী করে! বেশি ঘুমোলে জানিস তো রক্ত ঠান্ডা মেরে যায়। তোরা যে কী হলি! সূর্যোদয়ের আগে বিছানা ছাড়তে হয় জানিস না! না ছাড়লে পরমায়ু কমে। যা, হাতমুখ ধুয়ে নে। বৌমা, চা দাও।

এই সব মজা মা তার দেখতে পেল না। বাবা গোমড়া মুখে ঘরে চলে গেছে। বুমবাইকে শাসন করতে না পেরে ক্ষেপে আছে। আর জেঠু এমন ধমক লাগাল যে সত্যি যেন বাবা মহা অপরাধ করে ফেলেছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে গোমড়া মুখেই সামনের বেতের চেয়ারে বসে বলল, দাও বৌমা চা দাও।

যেমন সে বাবা বকলে গুম মেরে টেবিলে খেতে বসে, বাবাও তেমনি গুম মেরে আছে। আসলে বাবা বুঝতে পারে জেঠুর সামনে তাকে শাসন করার অধিকার বাবার নেই।

বাবা তার কেমন একেবারে খোকা হয়ে গেছে। বড়দা ছোড়দাও। কেউ আগে যেতে চাইছে না। এ ওকে ঠেলে দিচ্ছে।

বুমবাই কেমন গম্ভীর গলায় ফের বলল, তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন! যাও। আসলে এরা চলে না গেলে সে অরু এবং তার সাংগোপাংগরা ছুটতে পারবে না। এমন একটা গাছপালা বনজংগল নিয়ে এদিকের জায়গাটা যেন জেঠু তাদের জন্যই বানিয়ে রেখেছে। বাঁশঝাড়, তারপর শ্যাওড়া গাছের জংগল মণীন্দ্রকাঁটার জংগল। এবং এই জংগলে কত সব প্রজাপতি, শীতের অলস রোদে সব মাখামাখি। পরম এক উষ্ণতার ছবি। অরুর কত রকমের প্রশ্ন, বুমবাই কাকা, আমাকে ফড়িং ধরে দাও। আধা ইংরেজি, আধা বাংলায় কথা বলছে। সবটা বলতে পারে না। অরু সবটা বলতে না পারলে নিজেই লজ্জায় পড়ে যায়। বুমবাইর কাছে জেনে নিতে চায় কী ভাবে সে বলবে।

বড়দা ছোড়দা কেমন ভীতু বালকের মতো পুকুরের পাড় ধরে হাঁটছে। এদিকটায় দু দুটো পুকুর। একটাতে সব বড় মাছ। আর একটাতে জিওল মাছ–এই যেমন কই শিঙি মাগুর। জেঠু বলেছে, দেখবি বিকেলে তোকে মাছ কী করে ধরতে হয় শিখিয়ে দেব। তাকে জেঠু একটা ঘরে নিয়ে–কত রকমের বঁড়শি দেখিয়েছে।–এই যে বঁড়শিটা দেখছিস, এটায় কই মাছ, এটায় শিঙি মাগুর। চার পাঁচটা হুইলের ছিপ। জেঠু নাকি বিকেলে মাঝে মাঝে বসে মাছ ধরে। মাছ ধরায় নাকি দারুণ উত্তেজনা।

বিকেলেই সে যখন জেঠুর সংগে ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল তখন বুঝতে পেরেছিল, সত্যি কী মারাত্মক ব্যাপার। মহাদেব দাদু বোলতার চাক ভেঙে এনে রেখেছে। বাড়িতেই সব। পিঁপড়ের ডিম। গাছের মগডালে উঠে মহাদেব দাদু চিৎকার করছিল, সরে যাও ভাইবোনেরা। মহাদেব দাদুটা সবার নাম মনে রাখতে পারে না। পারবে কী করে–তারা সাত আটজন সমবয়সী, একসংগে স্নান, মহাদেব দাদু পুকুরে নিয়ে গিয়ে কী করে ডুব দিতে হয় শিখিয়েছে। ডুব দিতে না জানলে সাঁতার

শেখা যায় না। অরুকে, তাকে, বাবলুকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব মহাদেব দাদুর। দাদু বলেছে পাঁচ-সাত দিনেই সেটা হয়ে যাবে।

শীতের সময় বলে গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। জোর হাওয়া দিলে গাছের পাতা উড়তে থাকে। সারা বাড়িটা ঝরা পাতার খেলা। সকালে মনসা দাদার একটাই কাজ–গাছের নিচে সব পাতা ঝাঁটা দিয়ে ডাঁই করা। যত গাছ তত তার পাতা। একেবারে ঝরা পাতার পাহাড়। গোয়াল বাড়িটা পেছনে। শান-বাঁধানো লম্বা চত্বর। মাথায় টালির ছাউনি। মাঝখানে শান-বাঁধানো গরুর জাবনা দেবার আট দশটা গামলা। মনসা দাদার ঐ একটাই কাজ। সকালে গাছের নিচে, বিকেলে গরুর ঘরে। সন্ধ্যায়, গোবর ডাঁই করা। বিশাল একটা গর্ত, প্রথমে সব ঝরা পাতা ঝুড়িতে করে এনে বিছিয়ে দেয়। যেখানে যত গাছ আছে, তার নিচ থেকে ঝরা পাতা তুলে আনে–জেঠু কিছুই বলে না। যেন যে যার মতো নিজের কাজ করে যাচ্ছে। বুমবাই কোনটার মজা আগে লুটবে ভেবে পায় না। সব কিছুই তার কাছে বিস্ময়। বড় একটা ঢোলের মতো মাদুলি গলায় মনসা দাদার। কেন এটা, সে একবার প্রশ্ন করেছিল–মনসা দাদা বলেছিল, তা তেনারা হাঁটাহাঁটি করেন রাত হলে। গলায় পরে আছি। সাহস হয় না তেনাদের কাছে আসতে।

–তেনারা কারা!

–তেনারা! নিজের বুকে থুথু ছিটিয়ে দেয় মনসা দাদা।

–বল না, তেনারা কারা! তুমি কী মনসা দাদা, কেবল তেনারা তেনারা করছ!

–ঐ হলো গে মানে, বোঝলেন না, বাড়িটায় আমরা একা থাকি! বেটা মহাদেবটা ভূত পোষে!

–একা কোথায়! মহাদেব দাদু ভূত পুষবে কেন?

–ও রাঙ্গা কর্তার কথা কন। তেনার এ-সবে বিশ্বাস কম। মহাদেব যে ভূতের ওঝা বিশ্বাসই করে না।

–ওঝা, ভূত, কী যে বলছ না!

–ভূত প্রেতে খাবে বেটাকে। বেটা মরবে।

–কী বলছ! বাড়িটাতে ভূত-প্রেত থাকে?

–বারে, মানুষ থাকবে, তেনারা থাকবেন না। যাবেন কোথায়! পুকুর পাড়ের বড় শালগাছটা আছে না, ওখানে তেনারা দল বেঁধে থাকেন!

তা পুকুরের পাড়ে শাল, শিমুল, পলাশ এমন সব কত না গাছ। শীতের সময় পুকুরটায় এক ফোঁটা রোদ ঢোকে না। জল যেন বরফ হয়ে থাকে।

বড় পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই। সারাদিন পুকুরের জল রোদ পায়। শান-বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটে জেঠু শানের উপর রোদে বসে তেল মাখেন। জিওল মাছের পুকুরটার কথাই তবে মনসা দাদা বলছে। তার পাড়ের গাছপালাতেই ভূতেরা থাকে। তা ঠিক, সে ভেবে পায় না, একটা পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই, না নেই বললে ভুল হবে, আছে, সারি সারি নারকেল গাছ। অন্য কোনো গাছ নেই। আর ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে এত গাছ কেন! ভূত পুষতেই পারে মহাদেব দাদু।

বিন্দেশ্বর কি আসলে যাদুকর বসন্তনিবাস!

সে জেঠুকে বলেছিল, ও জেঠু, এত গাছ কেন!

জেঠু বলেছিল, জিওল মাছ ঠাণ্ডায় বাড়ে। দেখছিস মাছ কেমন গাবাচ্ছে!

তা দেখার মতো বটে! সারা পুকুরের জলে হঠাৎ হঠাৎ ঝড় বয়ে যায় যেন, এক কোণায় কোথাও একটা মাছ গাবান দিল তো খৈ ফোটার মতো সারা পুকুরটা নড়ে চড়ে বসল। জেঠুর এক কথা, বুঝলি কিছু!

–কী বুঝব!

অরু জেঠুর কোঁচা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অরু বোধ হয় এ-সবের কোনো মর্মই বুঝতে পারে না। অরু যে-দেশটায় থাকে, সেখানে ডিজনিল্যাণ্ডের কত সব বিচিত্র খবর আছে মানুষের–কিন্তু অরুর মুখ চোখ দেখে মনে হয় এমন আজব দেশের খবর সে কোনোদিন পায়নি। দু-দিন ধরেই লক্ষ্য করছে অরু এত সব

দেখতে দেখতে কেমন বোকা বনে গেছে। সব আত্মীয়-স্বজন, তাঁদের পোশাক-আশাক, তার দাদুর আচরণ সবই কেমন অদ্ভুত। তার বাবা পর্যন্ত এখানটায় এসে সব কথায় বলছে, ডাকব তোমার দাদুকে! আর অরু মাঝে মাঝে সাড়া না দিলে, বড়দার হাঁক, বাবা দেখ অরু সাড়া দিচ্ছে না! কোথায় গেল!

তখনই রাঙাজেঠুর গলা পাওয়া যাবে—কোথায় যাবে, কোথাও আছে। এই দিদিভাই, তুই কোথায় রে! দিদিভাই ডাকলে অরু যেখানেই থাক, সাড়া না দিয়ে পারে না।—যাই দাদু!

জেঠুর তখন এক কথা, কী হলো, ঐ তো সাড়া দিচ্ছে। আর দৌড়ে এসে জেঠুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে দু-হাতে জেঠু বুকে তাকে জড়িয়ে ধরেন। আর আদরে আদরে পাগল করে তোলেন। তখন তার যে কী হিংসে হয় না! মাঝে মাঝে বুমবাই দেখতে পায় রাঙাজেঠুর চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। জেঠুর জন্য ওর তখন ভারি কষ্ট হয়।

আর অরু যেই আদর খেয়ে বুমবাইর কাছে ছুটে আসবে তখনই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে।

—এই তোর সঙ্গে আড়ি।

—আড়ি! হোয়াট আড়ি!

—আড়ি মিনস নো টক। নো কথাবার্তা।

অরু হেসে গড়িয়ে পড়ে।—বুমবাই কাকু বোবা।

—আমি বোবা!

—বোবা।

—আবার আমাকে বোবা বলছিস!

—কথা বলতে না পারলে বোবা হয় না!

—কথা বলতে পারি না কে বলল?

—এই যে বললে কথা বলবে না।

আর তখন বুমবাইর রাগ কেমন জল হয়ে যায়। অরু আড়ি কী বোঝেই না! আড়ি না বুঝলে, তার সঙ্গে আড়িও করা যায় না। সে পড়ে যায় মহাফাঁপরে। অরুকে নিয়ে ঘুরতে না পারলে, ছুটতে না পারলে কেমন এক জীবনের মহারহস্যের খবর থেকে বঞ্চিত। সেই পারে না অরুর সঙ্গে আড়ি করতে। এমন একটা সরল সুন্দর হাসিখুশি মেয়ের সঙ্গে আর যাই করা যাক আড়ি করা যায় না।

এখন তারা যাচ্ছে মাছ ধরতে।

বুমবাইর হাতে একটা ছোট ছিপ, অরুর হাতে ছিপ। জেঠু সবার হাতে ছোট ছোট ছিপ দিয়েছেন। সঙ্গে মহাদেব দাদু। সকালে উঠেই সে দেখতে পায় মহাদেব দাদু কোত্থেকে বিশাল একটা তাজা রুই মাছ এনে রান্নাবাড়ির বারান্দায় ফেলে রেখেছে। মাছটা লাফাচ্ছিল। মেমবৌদি অরু মাছ খেতে জানে না। কাঁটা মাছ খায় না। ওদের জন্য কটা পাবদা মাছ। তাও তাজা ঝকঝকে রুপোর পাতের মতো। জেঠু গজগজ করেছে, মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার নাতিনটা সে সুখ টেরই পেল না। জেঠুর এক কথা, বড়টা অমানুষ, ছোটটা গোঁয়ার। মেয়েটাকে কাঁটা বেছে মাছ পর্যন্ত খাওয়াতে শেখায়নি! কী যে হবে! মহাদেবকে বলেছে, মাছ ভেজে রাখবি। কী করে কাঁটা বেছে খেতে হয় শিখিয়ে দেব। আর অরুকে নিয়ে বুমবাই এবং সবাইকে নিয়ে তিনি যখন খেতে বসেন, অরু ঠিক জেঠুর পাশটায় বসে। অরু চামচ দিয়ে খেতে চায়—জেঠু বলবে, না হাত দিয়ে খাও। দেখ নিজের হাতে খাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ।—এই দেখ, মাছের কাঁটা কী করে বাছতে হয়। দেখলে তো, এবারে খাও। ভাত সব পড়ে যাচ্ছে কেন! তোর মা বাবা ভাত খাওয়াটাও পর্যন্ত শেখায় নি! কী যে হবে! যেন জেঠুর জীবনে অরু ভাত মেখে খেতে পারে না বলে মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে। বুমবাইর দিকে তাকিয়ে বলবে, দেখ তো বুমবাই, বাবলু অপুরা কেমন ভাত মেখে খাচ্ছে।

অরু তখন নিজেই জেঠুর হাত সরিয়ে বলবে, আমি পারব। তুমি দেখ না। অরুও চায় না, ভাত মেখে খাবার ব্যাপারে সে খুব আনাড়ি, কারণ অরু জানে, পরে তাকে সবাই ক্ষেপাবে। অরু সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কেমন নিজেই ডাল দিয়ে ভাত মাখে। শুকতোনি দিয়ে ভাত মাখে। অরুটা একদম ঝাল খেতে পারে না।

মহাদেব দাদু, অরু আর মেমবৌদির জন্য শুধু আদাবাটা আর জিরা দিয়ে ঝোল করে দেয়। তারপর টক, তারপর ঘরে পাতা দই। জেঠু নিজে বিশেষ কিছু খায় না। দুপুরে, রাতে জেঠু ছোটদের সবাইকে নিয়ে খেতে বসেন। জেঠুর তেল ঝাল সব বারণ। তার জন্যও এক প্রস্থ আলাদা রান্না। বুমবাইর কেমন তখন আর খেতে ইচ্ছে করে না। জেঠু কিছুই খায় না! অথচ জেঠু তাদের বাড়ি গিয়েছিল, একটা বড় এনামেলের হাঁড়িতে কই মাছ নিয়ে।

কই মাছ কাটা নিয়ে মার কী সে বিড়ম্বনা! তার এখনও দৃশ্যটা ভাবলে হাসি পায়। মাছগুলো হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিতেই টুপটাপ ফুল ফোটার মতো ফুটছিল, ঝরছিল। সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা তুলতে গেলেই আঁচড়।

এদিকে জেঠু তাদের বসার ঘরে বসে পত্রিকা ওল্টাচ্ছিলেন। বাবা অফিসে। হঠাৎ দেখেন একটা কই মাছ তাঁর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ওদিকে যে রান্নাঘরে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে জেঠু টের পাবেন কী করে!

কাজের মেয়েটা মার হাতে রাশি রাশি ডেটল ঢালছে। মার বিরুদ্ধে জেঠুর এমনিতেই অভিযোগের অন্ত নেই—এ কী বৌমা, সকালে উঠেই ছেলেটাকে ডিম সেদ্ধ পাউরুটি দিচ্ছ। ওতে শরীর টেকে! এ কী বৌমা, কী চেহারা হয়েছে বুমবাইর! খেতে চায় না বললেই হলো। রোজ এক খাওয়া কার ভাল লাগে। কই মাছ নিয়ে না আবার কত রকমের অভিযোগ উঠবে—তোমার বাবা মা কই মাছ খায়নি কখনও?

মা মুখ বুঝে জ্বালা সহ্য করছে, মুখ ফুটে একদম উঃ আঃ করছে না। জেঠু ভিতরে ঢুকে হতবাক। সারা ঘরে কই মাছগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে। যেন তাদেরই ফ্ল্যাট। বুমবাইরা

বাড়তি মানুষ।

জেঠু আর কী করেন। ত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়লেন।

একটা করে কই মাছ ধরেন, আর বলেন, এই দেখ, এ-ভাবে। মাথার দিক থেকে হাত দেবে। কানকো চেপে ধর জোরে। ব্যস, সব জারিজুরি শেষ।

জেঠু কাজের মেয়ে ফুলদিকে ডেকে বলেছিলেন, দেখি বঁটি!

বঁটি পাবে কোথায়! ফ্ল্যাটে সব ছুরি কাঁচিতে কাজ। তরকারি কাটা, পেঁয়াজ কাটা সব খচ খচ করে মা রান্নাঘরের বেসিনের পাশে টাইলসের উপর রেখে কাটে। কাটা পোনা ছাড়া খাওয়া হয় না। একটা বঁটি যে ছিল না, তা নয়। তবে তার কোনো কাজ নেই। বঁটিটা রান্নাঘরের একপাশে গোমড়ামুখে পড়ে থাকে।

বঁটিতে ধার নেই।

বালিতে ঘষে ধার তুললেন জেঠু।

কই মাছ কী করে কাটতে হয় শিখিয়ে দিলেন জেঠু। তারপর দুটো কলাপাতার মধ্যে মাছগুলি সরষে বাটা, নুন, কাঁচালংকা আদা বাটায় মেখে সাজিয়ে আবার কলাপাতায় ঢেকে গরম ভাত খানিকটা ঢেলে মাছগুলি চাপা দিলেন। ভাতে সেদ্ধ কই খাওয়ালেন সবাইকে।

আঃ, সে কী স্বাদ!

বাবা অফিস থেকে এসে দেখলেন মা হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে।

বাবা মাকে সেদিন মাছ বেছে খাইয়েও দিয়েছিলেন। জেঠু আবার দেখে না ফেলে সে জন্য শোবার ঘরে বাবা থালায় ভাত বেড়ে মাছের বাটি নিয়ে পালিয়ে যখন খাওয়াচ্ছিলেন, তখন ঝুপির কী হাসি! তারও হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু জেঠুর কাছে বসে থাকার নির্দেশ ছিল। জেঠুর কাছে ছবি আঁকতে বসলে, তিনি ছেলেমানুষের মতো উবু হয়ে বসে তার ছবি আঁকা দেখেন। ছবি আঁকা, জেঠুকে পাহারা দেওয়া দুই কাজ একসংগে।

বাবা বলেছিলেন, তুমিই পার জেঠুকে আটকে রাখতে। যাও, জেঠুর ঘরে। ছবি আঁকতে বসে যাও। না'লে এদিকে এসে পড়তে পারেন।

জেঠুকে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র ছবি আঁকা। সে যতক্ষণ ছবি আঁকবে, জেঠু এক পা নড়বে না।

—হলো না। লেজটা ঠিক হয়নি। দ্যাখ।

দু-টানে পাখির লেজ, গাছ, ফুল, ফল, নদী সব এঁকে বলবেন, কী দেখলি, কেমন হলো!

সে সত্যি অবাক হয়ে যায়।

সেই জেঠু ওদের নিয়ে বিকেলে আজ মাছ ধরতে যাচ্ছে। বড় বড় আমগাছের ছায়া পার হয়ে বাঁশ বাগানের একপাশে পুকুর। কত সব গাছ, আর পাখির কিচির মিচির শব্দ। জেঠু বলে যাচ্ছে—

এরা হলো সাত ভাই চম্পা পাখি।

—ঐ যে দেখছিস ঝুপ করে পুকুরে ডুবে গেল পাখিটা, ওটা মাছরাংগা পাখি।

—ঐ দেখ ঝোপের মধ্যে ক'টা ডাহুক। ওহো ঢিল ছুঁড়বে না।

অরু বলল, কী সোন্দর।

জেঠু বলল, বুমবাই, কী শেখালি? সোন্দর বলছে।

—ওর হবে না জেঠু। হাসাহাসি কে হাসাহিসি বলে!

—হবে। আমার কাছে থাকলে হবে। সব হবে। মাছ ধরায় আনন্দ কী দেখ। বলেই জেঠু তার জায়গায় গেলে মহাদেব দাদু একটা মোড়া পেতে দিল। একটা বালতি ঢাকনা দেওয়া। কলাপাতায় পিঁপড়ের ডিম। জেঠু বললে, দিদিভাই, আমার পাশে এসে বোস।

মহাদেব দাদু অরুর বঁড়শিতে পিঁপড়ের ডিম গেঁথে দিচ্ছে।

বুমবাই বলল, আমারটা।

—সবাইকে দিচ্ছি।

জেঠু ছিপ ফেলতে না ফেলতে ফাতনা কাত করে নিয়ে গেল। আর টেনে তুলতেই লাল বুকমালা বিশাল কই মাছ একটা।

জেঠু বলছে, বুমবাই, টান টান। দেখ ফাতনা টানছে।

সেও টানতে গিয়ে আর তুলতে পারছে না।

অরুটা বঁড়শি ফেলে তখন লাফাচ্ছে।

—ও জেঠু! উঠছে না।

ছিপের ডগা বেঁকে গেছে। জলের নিচে ঘূর্ণি উঠছে। বুমবাইর কেমন ভয় ধরে যাচ্ছে। জেঠু বলে যাচ্ছে, টান টান। আহা পড়ে যাচ্ছিস কেন!

অরু এসে বুমবাইর ছিপ ধরে ফেলল। আসলে বুমবাই টের পায় যেন এই কালো জলের গভীরে কোনো অপদেবতা বাস করে। তাই বঁড়শিটা টেনে রাখতে পারছে না। সে জোর হারিয়ে ফেলেছিল। কী সাংঘাতিক জোর। জেঠু উঠে এসে ছিপটা ধরে ফেলল। বলল, দেখ। দেখলি! এটা ফলি মাছ। কত বড় দেখেছিস!

বুমবাই বলল, কী জোর জেঠু!

—হবে না। প্রাণের দায়। জোরে ছুটছে, তুই টানছিস। মাছটা জলে লেজ বাঁকিয়ে রাখছে। ভারি লাগছে। ভাগ্যিস পড়ে যাসনি।

মাছটা লাফাচ্ছিল।

বুমবাই দেখল, জেঠু আর মাছটার দিকে তাকাচ্ছে না। নিজের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বলছে, জানিস, ফাতনা নড়লেই টের পাই, কী মাছ ভিড়েছে। বুমবাইর অত সব শোনার সময় নেই। সে এত বড় একটা মাছ জলের নিচ থেকে তুলে এনেছে—আহা মা থাকলে বুঝতে পারত, ঝুপিটা এলে কী না লাফাতে পারত এখন—যেমন অরু লাফাচ্ছে। কখনও বসছে। মাছটা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। আর মাছটা লাফ দিলেই ছুটতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছে অরু। জেঠুর বাড়িতে এত মজা! ঝুপি এলে কী না মজা হতো!

জেঠু নির্বিকার। বুমবাইর দিকে না তাকিয়েই বলছে, মাথাটা চেপে ধর। দেখবি নড়তে পারবে না।

অরু কাছে এলে এক ধমক লাগাল বুমবাই। –সর। সুন্দর বলতে পারে না! হিসি বলে! তুই বঁড়শি থেকে মাছ খুলবি! তা হলেই হয়েছে!

অরু সব কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। ফ্রক কোমরে তুলে উবু হয়ে বসে মাছটার লাফঝাঁপ দেখছে। একটু ঠান্ডা হলেই হাত দিতে যাচ্ছে। বিশাল একটা কাজের দায় এখন বুমবাইর কাঁধে। মাছটাকে বঁড়শি ছাড়িয়ে বালতিতে রাখতে হবে। অরু বাবলু অপুরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মাছটার চারপাশে ঘিরে বসেছে। যেন পালাতে না পারে।

জেঠু বলে যাচ্ছে, শিং মাছগুলো তো দেখছি বড় জ্বালাচ্ছে। গিলবেও না, চারপাশে কেবল ঘোরাঘুরি করছে।

কী বলে! বুমবাই মাছটা ফেলে এসে বলল, কোথায় শিং মাছ দেখি!

–দেখবি কী করে! জলের নিচে দেখা যায়?

–তুমি টের পাও কী করে!

–ফাতনা কী ভাবে নড়ছে দেখছিস?

তা সে দেখছে। একটু তলিয়ে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। জেঠু বার বার হেঁচকা মেরেও মাছ আটকাতে পারছে না।

বুমবাই বলল, ভারি পাজি তো।

জেঠু বলল, দুষ্টুমি করছে। চুউপ। কথা বলিস না। মাগুর মাছ। খাবে।

বুমবাই অবাক হয়ে যায়। ফাতনাটা দু-বার ভাসল ডুবল, তারপর তলিয়ে গেল। জেঠু টেনে তুলছে–বুমবাই চিৎকার করছে, ওরে বাবা, অ অরু, দেখ এসে, জেঠু টেনে তুলতে পারছে না। বিশাল একটা মাগুর মাছ ছিপটায় আটকে গেছে। পাড়ে এনে ফেললে, কট কট করতে থাকল।

সে লাফিয়ে ধরতে গেলে বলল, পারবি না। কাঁটা মারবে। আর সে দেখল, কী অনায়াসে জেঠু মাছটার মাথা চেপে বঁড়শিটা বের করে আনল। তারপর মাথাটা মুঠো করে ধরে বালতিতে রেখে ঢাকনা দিয়ে দিল! মাছটা ভেতরে জোর লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছিল বালতি উল্টে দেবে। বুমবাই ঢাকনাটার উপর বসে থেকে বলল, জেঠু আর ফেলতে পারবে না!

–ফলি মাছটা খুলতে পারলি?

–পারছি না।

মহাদেব দাদু এগিয়ে যাচ্ছিল–জেঠুর এক কথা–না, না, বুমবাই, মাছ ধরতে শিখতে হয়, খুলতে শিখতে হয়, রাখতে শিখতে হয়। এ-সব জীবনে দরকার। না জানলে, জীবনে একা হয়ে যেতে হয়। দেখছিস না, আমাকে–বাড়িটা ছেড়ে কোথাও গিয়ে পাঁচ দশ দিনের বেশি থাকতে পারি না!

আর একসময় বুমবাই দেখল, চুপিচুপি বড়দা ছোড়দাও ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেছে। এ কীরে বাবা, সব ছেলেমানুষ হয়ে গেলে! পিসিরা, বৌদিরা সবাই মজা দেখতে পুকুর পাড়ে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হচ্ছে। বড়দা ছোড়দা মাছ ধরায় এত পটু সে কখনও জানত না। জেঠুর স্ট্রোক হয়েছে শুনে হাজির। জেঠু স্ট্রোক মানতে রাজী না। ওরা খবর পেয়েছে, পনের বিশ দিন বাদে। জেঠুর এক কথা, মহাদেবটা মহা শয়তান। তারই কাজ। বয়স হলে মানুষের অসুখ-বিসুখ বাড়বে। সামান্য মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম–বেটা হৈচৈ বাধিয়ে লংকাকান্ড করে ছেড়েছে।

বুমবাইর মনে হলো, মহাদেব দাদু এই লংকাকান্ড না করলে জেঠুর বাড়ি তার আসাই হতো না। এত বড় বাড়ি, সামনের মাঠটায় শ্যালো বসিয়ে জেঠু বিঘের পর বিঘে ধান চাষ করছে। এক এক খন্ড জমি না, যেন সবুজের সমারোহ।

বেগুন ক্ষেতে ঢুকে গেলে তার কেমন আর বের হতে ইচ্ছে হয় না। কত রকমের বেগুন হয় সে জেঠুর বাড়ি না এলে টেরই পেত না। গাছে নীল ফুল, কোনোটা ছোট, বড়, লম্বা, গোল গোল কত রকমের। ঝুড়ি নিয়ে মনসা দাদা বেছে বেছে সব তুলছে। আলুর জমি ধরে দৌড়োলে ছইয়ের ভিতর থেকে হাঁক শুনতে পায়, কারা যায়! সেই লোকটা! যে ঐ ছোট্ট ঘরটায় সারাদিন বসে থাকে। রাতেও। শীতের সকালে সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসে। রোদ পোহায়। কখনও আলে আলে হাঁটে–পোকামাকড় খোঁজে। ঐ কাজই তার। আর জল দেবার সময় মেশিন চালিয়ে বসে থাকে। ভক ভক করে জল ওগলায় মেশিনটা।

বুমবাই কেমন তাজ্জব হয়ে যায়–দূরে বাদশাহী সড়ক, সেখানে উঠে গেলেই বাস, ট্রাক, রিকশা সব শহরমুখী–সেখানে ঠিক সে যেখানে থাকে, তাদের মতো সিনেমা হল, অফিস, কাছারি, কারখানা, ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন সব হরেক রকমের মজা! এখানে এলে সিনেমা থিয়েটার ক্রিকেট সব ভুলে যেতে হয়। এ-বাড়ির মানুষগুলোর মুখে থিয়েটার বাইস্কোপ ক্রিকেটের কোনো কথা নেই। জেঠুকে সে বলেছিল, তুমি রবি শাস্ত্রীর নাম জান জেঠু?

–সে কে? মুচকি হেসে প্রশ্ন করেছিল তাকে।

–এ রাম, জেঠু রবি শাস্ত্রীর নাম জানে না!

জেঠুর এতে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। জেঠুর এক কথা, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে বুঝি!

–ধুস, তুমি না জেঠু!

–আমি কী!

–তুমি কিচ্ছু জান না!

জেঠু বলেছিল, জেনে কী হয়? তোর রবি শাস্ত্রী জানে, এমন নিরিবিলি জায়গায় তোর জেঠু নিজের মতো বেঁচে আছে!

–ওর কী দরকার জানার!

–আমার কী দরকার!

–বা–কত বড় ক্রিকেটার!

–এই অরুণিমা, তুই জানিস রবি শাস্ত্রীর নাম!

অরু কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

জেঠুর মুখে হাসি, অরু যখন জানে না, আমার জেনে লাভ নেই।

অরুণিমা নাই জানতে পারে। মার্কিন মুলুকে থাকলে লোক বোকা হয়। দেশের খবর রাখে না। কত কিছু হচ্ছে, অরু জানেই না। বড়দাকেও দেখেছে, অনেক খবর রাখে না দেশের। কেমন সে এখন নিজেকে ভারি বিজ্ঞ ভাবে। কিন্তু জেঠু তার এত জানে, আর এই খবরটা রাখে না!

বুমবাই মনে মনে রেগে কাঁই। তার এত বড় প্রিয় ক্রিকেটারের নাম জানে না জেঠু! এ কীরে বাবা!

সে বলেছিল, জান, এবারে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান ডে ক্রিকেটে, চ্যাম্পিয়ন অফ দি চ্যাম্পিয়নস হয়েছে। কত দামী গাড়ি উপহার পেয়েছে।

জেঠু বলেছিল, তাই নাকি! আমি তো কোনো খবর রাখি না বুমবাই!

–তুমি খবরের কাগজ পড় না?

–না।

–তবে কী পড়। এত বই বাড়িতে! তুমি কী পড়?

–কোন গাছে কী সার দিলে কত বড় লেবু হতে পারে বইগুলি পড়ে জানি।

বুমবাই হতবাক হয়ে যায়। সে তো ক্রিকেটের সময় সারাদিন টি-ভির সামনে থেকে নড়তেই চায় না। সে তো বিকেল হলেই ক্রিকেট খেলতে যায় পার্কে। তার ব্যাট আছে। তার টিম আছে। তার স্বপ্ন সে বড় হয়ে রবি শাস্ত্রী হবে। কিন্তু জেঠু তার নামই জানে না। জেঠুকে অবাক করে দেবার মধ্যে তার একটা আনন্দ আছে। জেঠু ছবি আঁকা পছন্দ করে। জেঠুর জন্য সে সারা বছর ছবি এঁকে খাতা ভরে রাখে। এই নিয়ে মার সংগে বাবার মন কষাকষি। মা বলে, তোমার দাদাটি বুমবাইর মাথা খাচ্ছে। কিছু বললেই বলবে, জেঠুর জন্য ছবি আঁকছি। ডিসটার্ব করবে না। বোঝ!

আসলে সে জীবনে এমন কিছু হতে চায়, জেঠু শুনে বলবে, হ্যাঁ, বুমবাই আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

অবশ্য সম্প্রতি সে রবি শাস্ত্রী হবে ভেবে ফেলেছে। তার নিজেরও মতি স্থির থাকে না। মৃদুল কাকা এলে যখন মুখে মুখে ছড়া বানায়, তখন মনে হয় সে বড় হয়ে মৃদুল কাকার মতো মুখে মুখে ছড়া বানাবে। আবার যখন টি-ভিতে একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে তখন মনে করে সেও করবে। কখনও নায়ক, কখনও খেলোয়াড়, কখনও শিল্পী হতে চায়। আসলে জানেই না সে কী হতে চায়!

সে বলেছিল, জেঠু, তুমি না কিছু জান না।

জেঠু হেসে বলেছিল, আমি যা জানি, তোর রবি শাস্ত্রী তা জানে?

তাও তো ঠিক। জেঠুর মাছ ধরা থেকে বুঝেছে, জেঠু কত পটু, জেঠুর ক্ষেত বাড়ি বাগান দেখে বুঝেছে, জেঠুর চাষ-আবাদে কত আগ্রহ। জেঠুর বড় বড় জার্সি গরুগুলি দেখে বুঝেছে, একটা গরু একাই কত দুধ যোগাতে পারে। এখানটায় সে কেমন হেরে যায়। জেঠু কী ইচ্ছে করে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন

এ-সব সাত পাঁচ ভাবতেই দেখল, একটা লেজ ঝুলছে।

বেছে নিয়েছে! অথচ সে ভেবে পায় না, জেঠু কেন তার কলকাতার এত বড় বাড়ি ফেলে এমন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে। প্রতিবেশীরা সবাই নাকি মেমবৌদিকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল, আমাদের নুটুর বৌ। দেখি মুখখানা। নুটুর মেয়ে! এ তো ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুণ!

তা ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুণই বটে।

অরুর মহা উল্লাস। সে একবারও যেখানে থাকে তার কোনো খবর বুমবাইকে দেয়নি! দেবে কী, সেই আকাশ সমান উঁচু বাড়ির বিশাল ফ্ল্যাটের খবর কে জানতে চায়। অনেক উপর থেকে নিচের মানুষগুলিকে ডল পুতুলের মতো লাগে দেখতে। গাড়ি করে সকালে স্কুলে, চারটায় ফিরে আবার সেই খাঁচা। শনি রবিবারে বাবা মা সে কোথাও দূরের বনাঞ্চলে চলে যায়। কিংবা কোনো সমুদ্রের ধারে। বাবা মার সংগে জাঙ্গিয়া পরে সমুদ্রে স্নান—তারপর সি-বিচে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা। বড় একঘেয়ে জীবন। এখানে কোনো নিয়ম নেই। যে যার মতো ঘুরছে ফিরছে, খাচ্ছে—অরু ফিসফিস করে বলেছে, ড্যাডি না চুরি করে কামরাংগা খাচ্ছিল!

বুমবাই অবাক!

—চুরি করে!

—হ্যাঁ। নুন দিয়ে গাছতলায় বসে বাবা আর কাকা খাচ্ছিল। আমি যেতেই মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

—উঠে দাঁড়াল কেন?

—বারে, আমি খেতে চাই যদি।

—খেলে কী হবে!

—বাবা যে বারণ করেছে। টক। খেলে অসুখ করবে।

বুমবাই তক্ষুণি অরুর হাত ধরে টানতে টানতে জেঠুর ঘরের দিকে নিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জান জেঠু, বড়দা ছোড়দা কামরাংগা খাচ্ছিল।

—ইস্, মহা জ্বালা হলো দেখছি। এত করে বলি, এসব সহ্য হবে না, তবু খাচ্ছে! স্বভাব পাল্টে গেছে। ডাক দেখি দুটোকে। খেলে জ্বর-ফর না হয়।

বুমবাই আর অরু লাফিয়ে হাজির।

—তোমাদের ডাকছে!

—কে?

—জেঠু।

—কেন? আমরা কী করেছি?

—কী করেছ জানি না! ডাকছে। বলেই অরুর হাত ধরে

বেলগাছের নিচ দিয়ে ছুট লাগাল।

কিন্তু যাবে কোথায়!

জানালায় বসে জেঠু ডাকছেন,বুমবাই,অরু, শোন।

সাঁঝ লেগে গেছে। সারা বাড়িটায় আলো জ্বলতেই কেমন একটা পরীদের দেশ হয়ে গেল। যেখানে যেটুকু অন্ধকার, সব সরে গেল। বিশাল সব আম-জামের গাছের ভিতর জেঠুর বাড়িটা সত্যি মিকি-মাউসের মতো দেখাচ্ছে।

বুমবাই ঘরে ঢুকে বলল, বড়দা ছোড়দা আসছে।

–তোরা বোস। সবাইকে ডাক।

বুমবাই বলল, আমরা ধানের জমিতে যাব জেঠু।

–সেখানে কেন ?

–বুড়ো লোকটা বলেছিল যেতে।

–বুড়ো লোকটা মানে ?

–ঐ যে ছোট্ট ঘরটায় থাকে!

–অ, হরমোহন' ওকে বুড়ো লোকটা বলছিস কেন? মোহন দাদু ডাকবি। বুড়ো লোক বলতে হয়? বুড়ো আবার কে হতে চায়। মনে কষ্ট পাবে না! ওখানে কী আছে?

–বলল, জ্যোৎস্না রাতে সে আমাদের নিয়ে ধানের জমিতে ঘুরবে!

–ঘুরবে কেন ?

–কারা নাকি সব নেমে আসে ?

–কারা!বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন জেঠু।ঐ সব তাঁরা! তা তাঁরা, আমার বাবা কাকা। কেউ তো বেঁচে নেই। মোহন বলেছে, তাঁরা নাকি রাতে এই ঘরবাড়িতে নেমে আসেন। তা আসতেই পারেন। সে না হয় কাল রাতে দেখা যাবে। আমিও না হয় তোদের সঙ্গে থাকব।

তখনই বড়দা ছোড়দার গলা পাওয়া গেল, আমাদের ডেকেছেন!

–হ্যাঁ ডেকেছি। বোস। এই বুমবাই,সবাইকে ডাক।

সবাইকে বলতে বোঝে বুমবাই, তার সব সমবয়সীদের জেঠু ডাকতে বলছে।

সে এক লাফে বের হয়ে গেল। ডাকল সবাইকে। ভিতরে এসে বলল, আসছে।

–তোর রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম কী রে?

সে গড়গড় করে বলে গেল। খেলার কাগজে সে রবি শাস্ত্রীর চোদ্দ পুরুষের খবর জেনেছে।বাবার নাম, দাদুর নাম সব।

সে রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম বলল।

একে একে সবাই এসে ঘরের চারপাশের চেয়ারে বসে পড়ছে। দু একজন পিসি, ছোট বউদি পর্যন্ত।

–রবি শাস্ত্রীর দাদুর নাম ?

বুমবাই তাও বলে দিল। সে যে কত জানে জেঠুকে বলে অবাক করে দিতে চাইছে।

জেঠু বলল, ভাল ভাল! বুমবাই কত জানে।

বুমবাই দেখল তার বাবাও হাজির। তার কৃতিত্বে বাবার মুখ উজ্জ্বল।

সহসা জেঠু কেন যে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, তোমার মাতামহের কী নাম বুমবাই!

বুমবাই ধপাস করে জলে পড়ে গেল! মাতামহ মানে জেঠুর বাবার নাম জানতে চাইছে। তার বাবা জেঠুর পিসতুতো ভাই। মাতামহের নামটা সে জানে না। এমন বে-ইজ্জত হতে হবে সে বুঝতেই পারেনি!

জেঠু বলল, রবি শাস্ত্রীর চোদ্দ গোষ্ঠীর নাম মাথায় রেখেছিস, নিজের মাতামহের নামটা আলগা হয়ে গেল!

বুমবাই এটা কত বড় অপরাধ, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল। বাবা কেমন যেন খুবই বড় সংকটে পড়ে গেছে!

–তুই তোর পিতামহের নাম বল দেখি।

বুমবাই সেটা অবশ্য জানে। তার কারণ, সে বড় হবার মুখে ঠাকুমা তাকে দাদুর কত সব সরস গল্প করেছে।ঠাকুরমার বারো বছর বয়সে বিয়ে। ঠাকুরদার বয়স তখন চল্লিশের উপর। দোজ বর। কুলীন বামুন। বুমবাই পিতামহের নাম বলে কিছুটা হাল্কা বোধ করল।

–নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, বলবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মৃত ব্যক্তির আগে স্বর্গীয় কথাটা ব্যবহার করতে হয়।

অরু জেঠুর পাশে বসে আছে। জড়িয়ে। বুমবাইর খুব হিংসে হচ্ছিল। জেঠু অরুকে কোনো প্রশ্ন করছে না।

এবারে সে দেখল, জেঠু অরুর দিকে তাকাচ্ছে।

অরুকে বলল, তুমি তোমার পিতামহের নাম জান? জেঠুই যে তার পিতামহ!

অরু ঠিক বুঝতে না পারায় জেঠু চমৎকার ইংরেজিতে বলল,

আই মিন ইয়োর গ্রান্ডফাদার।

অরু হাসতে থাকল। আসলে অরু এ-সবের কোনো গুরুত্বই বোঝে না!

জেঠু এবার বড়দার দিকে তাকাল। বলল, অরু দেখছি তার উৎসের খবর রাখে না নুটু।

—না না রাখে। মানে!

—মানে আবার কী! তোমার মেয়ে মার্কিন মুলুকের এত খবর রাখে আর আমার ভাল নামটা সে জানে না। আমার একমাত্র বংশধর।

—না জানে। এই অরু, বল! হাসছিস কেন?

—দাদু নিজের নাম জানতে চায়!

আসলে অরু ভাবতেই পারে না, দাদু বলতে পারে, তার নাম কি!

—বল!

অরু দেখল বাবার মুখ কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

অরুর কেমন কান্না পাচ্ছিল, বাবার মুখ দেখে। দরজার ওপাশে মা দাঁড়িয়ে।

বুমবাই দেখল জেঠু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ পিতামহ পর্যন্ত বলতে পারছে—তারপরই আটকে যাচ্ছে। তার পিসি পিসেমশাইরা সব জাঁদরেল সরকারি অফিসার, অথবা পাবলিক সেক্টরের কেউ ডিরেক্টর, কেউ চিফ অথচ এরা কেউ পিতামহের নামের পর আর বেশিদূর কিছু জানে না। সারাক্ষণ অরুর সঙ্গে বাংলার চেয়ে ইংরাজিতেই কথা বলতে আগ্রহী। কেউ কেউ আবার বাংলাও ভাল বোঝে না। হিন্দি ছাড়া কথা বলতে পারে না। হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। বুমবাইর তখন ভারি হাসি পায়।

জেঠুর প্রশ্ন সবার কাছে এবার—এদের যে দেখছি তোরা শেকড় আলগা করে দিচ্ছিস! জানিস এর পরিণতি কী ভয়াবহ। নিজের রুট কোথায় যদি না জানে তবে এরা কী হয়ে যাবে বুঝতে পারিস! আজকাল যে শুনি স্কুল থেকেই ছেলে-মেয়েরা ড্রাগ এডিকটেড হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কী জানিস?

সবাই চুপচাপ।

মহাদেব দাদু এসে হঠাৎ এক ধমক—তোমার এত দায় কিসের। ডাক্তার কী বলে গেছে! কেবল সারাদিন প্যাচাল। সকাল থেকে দেখছি। এখন তো একটু শুয়ে থাকতে পার চুপচাপ।

বড়দা ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা যাও। কেউ থাকবে না এ-ঘরে। থাকলেই বক বক করবে। বিকেলে এত করে বললাম, মাছ ধরার দরকার নেই—না—তার লাতিন এয়েছেন! বুমবাই এয়েছেন। মাছ ধরার কী মজা না জানলে বুঝবে কী করে, কেন একটা মানুষ এ-ভাবে একা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। গাছের ছায়ায় ঘুরে না বেড়াতে পারলে জানবে কী করে, কেউ না থাকলে, গাছ ফুল ফল পাখি প্রজাপতি থাকে—এদের ভিতর জীবনকে খোঁজো—আমি ছাই এ-সব কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝি না বাপু। গাছগুলি নাকি, তোর বাপ কাকাদের সব আত্মা। গাছগুলি নাকি, বাপ কাকারা যে এখানে বেঁচে ছিলেন তার সাক্ষী!

বুমবাই দেখল জেঠু কেমন এক ধমকে কাবু—বললে, আমি কী প্যাচাল পাড়লাম! তুই বল বেটা তোর পিতামহের নাম কী! এত যে তড়পাচ্ছিস আমায় উত্তর বল! আমি প্যাচাল পাড়ি!

—জানি বলব না!

—বলতে হবে। না বললে বুঝব বেটা তোর শেকড়ও আলগা।

মহাদেব দাদু বোধ হয় সবার সামনে হারতে রাজী না। বলল, ঈশ্বর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হালদার।

—প্রপিতামহের নাম ?

—ঈশ্বর শ্রীযুক্ত নগেনচন্দ্র হালদার।

—বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ?

—ঈশ্বর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু হালদার।

—অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ?

—বলব না। জানি। বকবক বন্ধ করবে কিনা বল।

জেঠু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, মহাদেব জানে। মহাদেব একা হয়ে যায়নি। তার ছেলেরা মেয়েরা সব এক এক জায়গায়। তবু সে জানে, তার উৎস কোথায়। তোরা জানিস না।

বড়দা বলল, আমি জানব না কেন ?

—তুমি জানলেই চলবে! তোমার যেটি থাকছে, তাকে কে শেখাবে! তোমরা সব আমার কৃতী সন্তান ! হ্যাঁ, এই কৃতী সন্তান! যে সে বাপ ঠাকুরদার সম্মান রাখতে জানে না! মহাদেব, এই বেটা, বলে দে, আজ আমি জলগ্রহণ করব না।

মহাদেব দাদু পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। বলল, ওরা শেখাবে। বলল তো, শেখাবে!

—শেখাবে! দেখবি!

এবার জেঠু বড়দাকেই প্রশ্ন করল, দেখি তুমি মনে রেখেছ কিনা!

জেঠু এক এক করে বলে গেল! বড়দা মাথা গোঁজ করে উত্তর দিয়ে গেল।

জেঠু এবার ছোড়দাকে বলল, তোর মনে আছে আমাদের সাত পুরুষের নাম! অরুকে নিয়ে এটা আট পুরুষ চলেছে। বড়দাকে ফের বলল, আমার পূর্বপুরুষ কে ছিলেন, অরুকে আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে, ওখানে গিয়ে ও-পাট তুলে দেবে না। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নেবে মনে রেখেছে কিনা! বড়দাকে সতর্ক করে দিল জেঠু।

বড়দা বলল, তোমার নাতিন যা দুরন্ত।

—দুরন্ত হবে না, মেনিমুখো হবে তোদের মতো। চুরি করে কামরাঙ্গা খাচ্ছিলি! এত করে বলেছি, সহ্য হবে না, ধাত তোদের পাল্টে গেছে, তবু দু-ভাইয়ে চুরি করে টক কামরাঙ্গাগুলি খেলি!

—কখন কামরাঙ্গা খেলাম!

—ফের মিছে কথা!

বুমবাই দেখল বড়দা ওর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তারপর বড়দা তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, একেবারে বিচ্ছু বানিয়েছ কাকা।

—বিচ্ছু হবে কেন! জানিস ও কী সুন্দর ছবি আঁকে। জেঠু তড়পে উঠল।

এরপর বুমবাইর কী যে আনন্দ—সে দৌড়োয়, সে বুঝেছে জেঠুর কথার উপর কথা নেই।

তখন সে আর অরু, সঙ্গে অপু বাবলুরা বাড়িটার চারপাশে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সকাল বেলায় ডেকে দেয় মহাদেব দাদু।

বুমবাই উঠেই অবাক।

কী শীত! আর তার মধ্যে জেঠু নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, খেজুরের রস, খা। শীতের সময় খেলে শরীর গরম থাকে।

বুমবাইর দাঁত কনকন করছিল। এক চুমুক খেয়ে বলল, আর খাব না।

অরু সবটা খেয়ে ফেলল। অরুর কি দাঁত কনকন করছে না! বাবলু অপুরা খাচ্ছে তেতো গেলার মতো।

জেঠুর এক কথা, যে দিনের যা, খেতে হয়। প্রকৃতি মানুষের জন্য যা যা লাগে সব তার ভাঁড়ারে মজুত করে রেখে দেয়। খেতে হয়। খেলে দীর্ঘায়ু হয় মানুষ।

কিন্তু বুমবাই ভেবে পায় না, এই বুড়ো লোকটার এত সকালে কোথা থেকে উদয়। সে ফেলেও দিতে পারে না। অরুর শীত না করলে তার শীত করবে কেন, অরুর দাঁত কন কন না করলে তার করবে কেন! সে আর বলতে পারল না, খাব না। কোনোরকমে সবটা খেতেই মনে হলো, ভারি মিষ্টি সুস্বাদু—সে বলল, আমাকে আর এক গ্লাস।

বড়দা অরুকে বলছে, তোর মাকে ডাক।

মেমবৌদি রাতে খুব ঘুমিয়েছে। এত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। কিন্তু বড়দা আর জেঠুর ভাল লাগার মধ্যে কিছু একটা আনন্দ খুঁজে পায় মেমবৌদি। বুমবাইর মনে হয়, যে কটা দিন এখানে থাকা মানুষটা যা পছন্দ করে করে যাওয়া। মেমবৌদি রস খেয়ে বলল, নাইস।

জেঠুর মুখে সে কী তৃপ্তির হাসি।

বড়দা বলল, খেজুর গাছ চেন ?

মেমবৌদি মিষ্টি হেসে বলল, না!

অরুকে বলল, তুই চিনিস ?

অরু বলল, না।

বুমবাই ক্ষেপে গেল, এই তোকে দেখলাম না, পুকুর পাড়ে দুটো লম্বা কাঁটায়ালা গাছ। বললাম না, খেজুর গাছ।

বড়দা বিকেলেই মেমবৌদিকে বাড়ির খেজুর গাছ দেখাতে নিয়ে গেল। বুমবাই, অরু, ছোট বৌদি, পিসিরা সঙ্গে। বুড়ো লোকটা গাছের নিচে বসে আছে। পরনে ট্যানা কানি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পেট শ্রীঘটের মতো। সরু লিকলিকে হাত-পা।

বড়দা বলল, কী নাম তোমার ?

—বিন্দেশ্বর।

—শীতে কষ্ট পাও দেখছি!

—তা পাই বাবু।

সবাই পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে—লোকটা তরতর করে গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল। কোমরে ঝোলানো পাতলা হেঁসো। ছপ ছপ করে গাছের পাতলা বাখনের টুকরো খসিয়ে ফেলল কিছুটা। তারপর হাঁড়িটা পেতে রাখল। টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে।

মেমবৌদির চোখে অপার বিস্ময়।

মেমবৌদি দৌড়ে বাড়ি চলে গেল। সংগে বুমবাই। বুমবাইকে একটা ওভারকোট দিয়ে বলল, বুড়ো মানুষটাকে দেবে। বুমবাই কোটটা কাঁধে ফেলে ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য ঘ্রাণ কোটে–সে এমন একটা কোট বড় হয়ে বানাবে ভাবল। এই কোট গায়ে দিলে, বুড়ো লোকটাকে কেমন না জানি দেখাবে! কিন্তু আরও আশ্চর্য বুড়ো লোকটা কিছুতেই কোটটা নিল না। বলল, ও গায়ে দিয়ে বের হলে লোকে ক্ষেপাবে। তা ছাড়া ওটা কী করে পরতে হয় জানে না।

বড়দা দেখিয়ে দিল, এভাবে পরতে হয়।

বুড়োর এক কথা, ও হয় না। ও পরা যায় না। বাবু, ও গায়ে দিলে কুটকুট করবে। হাঁটতে গেলে আছাড় খাব। যাও ক'টা দিন পরমায়ু আছে, তাও যাবে।

ছোড়দা পার্স বের করে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলল, চাদর কিনে নিও।

ছোড়দার কাছ থেকে টাকাও নিতে চাইল না।

বুমবাই দৌড়ে এসে জেঠুকে বলল, জান জেঠু সেই লোকটা না, ওভারকোট নিল না! জান জেঠু সেই লোকটা না টাকা নিল না।

জেঠু বলল, ওকে আবার কে টাকা দিতে গেল?

–ছোড়দা।

–কী মুস্কিল। হাতে এত টাকা ও নেবে কেন। নিলেই থানায় নিয়ে যাবে। ওভারকোট পেলে তো কথাই নেই। ওর ভাই দফাদার। দু–শরিকে বনিবনা নেই। টাকার গন্ধ পেলেই, ফণিশ্বর বলবে টাকা! কোথায় পেলে!–দাও। না দিলে থানায় যাব। ব্যস, হয়ে গেল। একবার চোরের দায়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে। থানার নামে বিন্দেশ্বর কাবু।

বুমবাই আরও অবাক, বিন্দেশ্বর নিজেই হাজির। জেঠুকে নালিশ দিচ্ছে, কর্তা, আমারে টাকা দেয় ক্যানে, আমারে পিরান দ্যায় ক্যানে! আমারে ধইরে নেইয়ে গ্যালে কী হব্বে কর্তা!

–না নেবে না। তুই যা। এই মহাদেব, একে দিয়ে দে।

মহাদেব দাদু ওকে একটা কাঠায় করে চাল ডাল নুন তেল দিয়ে বলল, বেগুন ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে যা।

বুমবাই ভেবে পেল না, বুড়ো লোকটা ওগুলো নিয়ে কোথায় যাবে।

জেঠু বলল, মাথায় ছিট আছে। বুড়ো হয়ে গেছে। কেউ নেই। নিজের উঠোনে সাঁঝ লাগলে নাচে একা একা।

–কোথায় থাকে জেঠু?

–কাঁচা রাস্তার ও-পাশে।

বুমবাই অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, যাবি? বুড়োর বাড়িটা দেখে আসব।

কোথা থেকে মহাদেব দাদু যেন লাফিয়ে পড়ল, কোথায় যাবে! বিন্দার কাছে! খবরদার। যাবে না। ও কাগা নেত্য বগা নেত্য দেখালে ঘোর লাগবে চোখে। ছাগল গরু ভেড়া বানিয়ে রাখবে, তখন আমরা তোমাদের খুঁজে পাব না। বেটা পারে না হেন কাজ নেই।

জেঠু কোনো কথা বলছে না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। বুমবাই জেঠুর পরামর্শ চায়। মহাদেব দাদু ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লোকটার লম্বা নাক, ছোট্ট থুতনিতে ক' গাছা সাদা দাড়ি, বকের মতো হেঁটে যাওয়া, সবটাই রহস্য। কাগা নেত্য বগা নেত্য কী ঠিক বুঝল না। ভূতের ওঝা-টোজা হবে। চুল খাড়া, শরীরে খড়ি ওঠা, প্রায় যেন জ্যান্ত ভূতের সামিল–কিন্তু লোকটা তাকে যাবার সময় যে বলে গেল, তারা সবাই গেলে, সে সীতা হরণের পালা গাইবে।

বুমবাই যেই দেখল, মহাদেব দাদু কাছে নেই অমনি জেঠুর কানের কাছে ফিসফিস গলায় বলল, জেঠু, কাগা নেত্য বগা নেত্য কী!

জেঠু হেসেছিল। বলল, বিন্দা নাচে। একা থাকলে নাচে। লোক দেখলে নাচে। যোগা নাচ। ওটা এক ধরনের লোকনৃত্য। লোকনৃত্য বুঝিস!

বুমবাই বলল, নাচে মানে?

–লোকনৃত্য বুঝিস কিনা বল!

বিষয়টা ঠিক তার বোধগম্য হলো না! সে কি ক্রিকেট, ছবি আঁকা ছাড়া কিছু বোঝে না। সে বলল, কাগা নেত্য কী বল না জেঠু!

–কাক সেজে নাচে।

–লোকটা কাক সাজতে পারে?

–মুখোশ আছে। কাকের মুখোশ, বকের মুখোশ পরে নেয়। তারপর আপন মনে নাচে।

–নাচে কেন?

–কী করবে। সারাদিন ওর এখন আমার বাড়িতে ঐ একটা কাজই আছে। লোকজন বাড়ির পাশ দিয়ে বড় কেউ তার যায় না। বাড়িটা ওর ধানের গোলার মতো। ঘুলঘুলি আছে। ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় রাতে। চারপাশে উঠোন। সেই উঠোনে সে নাচে।

–ওর নাচ দেখেছ?

–দেখব না! অতিষ্ঠ করে মারে। মহাদেবের ভয়ে কাক বক সেজে আর আসে না। আসে না ঠিক না, আসে। ফাঁক বুঝে আসে। মহাদেব বাড়ি নেই, কোথাও গেছে শুনলে গুঁড়ি মেরে জংগল থেকে বের হয়ে আসে!

বুমবাইর কী যে হয়! সে আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করল না। দৌড়ে ভেতর বাড়ির দিকে ঢুকে গেল। পা-টা বড় চুলকাচ্ছে। বসে পা চুলকে নিল। আর এদিক ওদিক খুঁজছে। অরুণিমাকে পেয়ে গেল গোয়াল বাড়ির পেছনে। অরুণিমা অপু কোঁচড়ে গাঁদা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। সে ডাকল, শোন অরু।

অরু কাছে গেলে বলল, যাবি?

–কোথায়!

–নাচ দেখতে যাব। সবাই যখন দুপুরে দিবানিদ্রা, বুঝলি না, ভোঁস ভোঁস–বলে নাক টেনে চিৎপাত হয়ে পড়ে বিষয়টা বোঝাতেই অরু হেসে গড়িয়ে পড়ল। আংকল, তুমি একটা জোকার।

–ঠিক আছে, শোন। এদিকে আয় অপু। আমরা একটা জায়গায় যাব। মহাদেব দাদু জানবে না। চুপিচুপি। মনে থাকবে তো! কেউ জানবে না। জানলে যেতে দেবে না।

বুমবাই এই জেঠুর দেশে এসে কত কিছু দেখে গেল, শহরে

গিয়ে মাকে বলতে না পারলে স্বস্তি পাবে না। এমন ভাবে বলবে, যাতে মা নিজেই পুজোর ছুটিতে জেঠুর দেশ-বাড়ি দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এত কাছে একটা লোক মুখোশ পরে নাচে, রাম রাবণের সাজে, অশোক বনে সীতা, মন্দোদরীর মন্দ কপাল, আবাগির বেটি আমার মা সীতা জননী, আরও সব নানা রকমের গান গলায় থাকে। কেউ নাচ দেখতে চায় না। কারণ নাচ দেখিয়ে হাত পাতার অভ্যাস। এক দু-পয়সা। তার বেশি নেয় না। তবে বয়েস হলে যা হয়, বেশিদূর হেঁটে যেতে পারে না—কাছাকাছি তেমন বাড়িঘরও নেই, নিজেই একা নাচে। খাওয়া-পরার দায় জেঠুর। এখন সে নির্ভাবনায় নাচতে পারে। কর্তার বাড়িতে নাচতে পারে না। একবার নাচ শুরু করলে শেষ করতে চায় না। মহাদেব দাদু লাঠি নিয়ে তখন তেড়ে যায়। কোমরে খেজুরের ডাল দিয়ে পুচ্ছ বানায়, যখন দৌড়োয়, পুচ্ছ সব খসে পড়ে।

বুমবাই নিজেই হা হা করে হেসে উঠেছিল—জেঠুর কাছ থেকে সব শোনার পর।

এমন একটা মজার দেশে এসে কাগা বগার নেত্য না দেখে যায় কী করে! অরুটাও তার স্কুলের বন্ধুদের বলতে পারবে, একটা লোক পাখি সেজে নাচছিল। কী সোন্দর নাচ! অরু এখনও সুন্দর বলতে পারে না। কেবল সোন্দর বলে। বুমবাইর এটা বড় একটা আফশোস থেকে গেল।

বুমবাই বলল, আমি বকুলগাছটার নিচে বসে কুক কুক শব্দ করব।

—কখন!

—মহাদেব দাদুর দিবানিদ্রার সময়।

আসলে এখানে আসার পর সবাই খোলামেলা, পিসি বৌদি সবাই। একটা ভয় ছিল, সাপখোপের। শীতের সময় বলে তারও ভয় নেই। জেঠু বলে দিয়েছে, ক'টা দিন ওদের মতো থাকতে দাও। বেশি শাসন ভাল না। এতে শিশুদের আত্মনির্ভরতা কমে যায়। দেখুক সব। নিজের চোখে দেখুক। বাবা কাকারা, বড়দা ছোড়দা বৌদি পিসিরা নিজেরা নানা জায়গায় চলে যাচ্ছে। বড়দার গাড়ি, তায় ড্রাইভার, যখন তখন হুসহাস সবাই বের হয়ে পড়ছে—এ এক আনন্দ যদিও—যেন সবাই স্বাধীন। বুমবাইদের মতো ছোট যারা আছে, তাদের দেখার দায়িত্ব মহাদেব দাদুর। আর কেউ কোনো খোঁজখবর রাখতে সাহস পায় না। অরু কোথায় একবার বলতেই জেঠু বলেছিল, তুমি দেখছি নুটু অরু ছাড়া পৃথিবীতে কিছু বোঝ না। একটু হাত-পা মেলে ঘুরে বেড়াক। সব সময় মেয়েটার তুই পিছু লেগে থাকিস!

জেঠুর ভয়ে কেউ বেশি ডাকাডাকি করতে সাহস পায় না। জেঠুর এক কথা, প্রকৃতিই সব শিখিয়ে দেয়। কখন ঘরে ফিরতে হয় বলে দেয়। কখন কী তার দরকার বুঝিয়ে দেয়। আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেছি বলে, বড় অল্প আঘাতেই হায় হায় করে উঠি।

সুতরাং এই কথা থাকল।—কুক কুক।

মনে থাকবে!

অপু দীপু বাবলু অরু সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। গোয়াল বাড়ির পেছনে গম্ভীর কথাবার্তা বুমবাইর। বুমবাই একবার অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোকে নেব না ভাবছি!

—কেনু কেনু?

—এই কেনু কেনুর জন্য। কেন হবে। বল সুন্দর।

অরু বলল, সুন্দর।

—আবার বল সুন্দর।

অরু বলল, সুন্দর।

দশবার বল। একবার ভুল হলেই নেব না। আর আশ্চর্য অরু ঠিক দশবারই সুন্দর উচ্চারণ করল।

শীতের দুপুরে বুমবাই সহসা দেখল গাছের ডালে কী একটা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করেছে। বিশাল গাব গাছ, গভীর অন্ধকার ডালপালার জঙ্গলে। বাড়ির পেছনে গাছটা। ওর কেমন ভয় ধরে গেল। কিন্তু সে ভয় পেলে অরু ভয় পাবে, অপু ভয় পাবে। সবাই ভয় পাবে। ভয় পেলে তাকে এরা মানবে কেন! জেঠু বলেছে, ভয় পেতে নেই। ভয় পাবার আগে দেখবে ভয়টা কিসের। বুমবাই কাউকে ভয় পায় না। ভূত ছাড়া ভয় পাবার মতো আর কী আছে জানে না। ভূতের সঙ্গে তো আর মারামারি করা যায় না। রাতে সে একা বের হতে ভয় পায়। দিনের বেলাতেও কোনো ফাঁকা জায়গায় একা সে যেতে পারে না। কিন্তু এখানে আসার পর সে ফাঁকা জায়গা পেলেই ছুটতে চায়। কারণ জেঠু বলেছে, ভূত বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। সব মনের বিকার থেকে হয়।

এ-সব সাত পাঁচ ভাবতেই দেখল একটা লেজ ঝুলছে। ভূতের আর যাই থাক, লেজ থাকবে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর দেখল বিশাল একটা বাঁদর গাছ থেকে লাফ মেরে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে গেল। সবাই ভয়ে কাঁটা। এখানে আসা তক কেউ এ জীবটিকে দেখেনি! সে চিৎকার করে ডাকল, জেঠু, হনুমান!

জেঠুর সাড়া পাওয়া গেল না। মহাদেব দাদু ছুটে এসেছে।

—কী হলো!

—হনুমান।

মহাদেব দাদুর এক কথা, তুমি হনুমান। হনুমান না হলে এই দুপুরে কেউ টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

অরু বলল, মাংকি!

মহাদেব দাদু মাংকি শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কী সব বিশ্রী কথা, মাংকি কী আবার।

বুমবাই বুঝতে পারে মহাদেব দাদু রেগে গেলে সারাক্ষণ পিছু নেবে তাদের। মাংকি বুঝতে না পারলে ভাববে ঠাট্টা করা হচ্ছে। সে বলল, হনুমানের ইংরাজি মাংকি!

—ও-সব আমি বুঝি। আমাকে বোঝাতে হবে না। সব বাড়ি চল।

অরু বুমবাইর দিকে তাকাল।

বুমবাই বলল, তবে ঐ কথা থাকল।

মহাদেব দাদু বুঝতে পারল না, কি কথা থাকল তাদের!

শীতের বেলা পড়ে আসে।

কেমন গাছপালা সব নিঝুম। বাড়িটা থেকে তারা বেশ দূরে চলে এসেছে। ও-দিকে জেঠুর ধানের জমি, শ্যালো বন্ধ এখন। একটা সড়ক চলে গেছে পাকা রাস্তার দিকে। বাঁ-দিকে নাবাল জমি। চাষ-আবাদ হয় না। খড়ের বন। বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল। বুমবাইর মনে হলো, এই রাস্তা ধরে গেলেই বিন্দেশ্বরের বাড়ি সোজা উঠে যাওয়া যাবে।

একটা খটকা মনের মধ্যে উঁকি দিল বুমবাইর। কাঁচা রাস্তা তো এটাই। কিন্তু এখানে কোনো বাড়িঘরই নেই। মানুষ জন নেই। শুধু দেখল এক পাল হনুমান কলাইর জমিতে বসে কচি ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে শীতের পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ছাতার পাখি কিচির মিচির করছে। সাদা বকের ঝাঁক উড়ে এসে বসল পাশের জলাটায়। আর মাথার উপর কি বিশাল আকাশ। শীতের এক আশ্চর্য উষ্ণতা থাকে এ-সময়—বুমবাইর ভয় পেলে চলবে না, এদিক ওদিক চেয়ে বলল, কাগা বগার নেত্য দেখতে হলে এ-পথটাতেই ঢুকতে হবে। তোরা ভয় পাবি না তো?

অপু বলল, কী জঙ্গল!

বাবলু বলল, বুমবাইদা, তুমি ঠিক জান তো...

বুমবাই তো আর না জেনে ছোট হতে পারে না! সে বলল, আলবৎ জানি। বুমবাই কত সব দুঃসাহসিক অভিযানের কথা গল্পের বইয়ে পড়েছে। সেই যে এক ম্যাণ্ডেলার গল্প জেঠু তাকে বলেছিলেন, সেই গল্পটার কথাও তার মনে পড়ে গেল। কত রাতে ম্যাণ্ডেলার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই কোন এক পাহাড়ি উপত্যকায় ম্যাণ্ডেলা আর তার মা থাকে। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। উপত্যকা থেকে নেমে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে এসে ম্যাণ্ডেলা দাঁড়িয়ে থাকত, যদি বাবার জাহাজ ফিরে আসে! দিন যায়, আসে না।

জেঠুর গল্পে ঐ এক মজা, দিন যায় আসে না বলেই চুপ মেরে যায়।

—তারপর কী জেঠু!

—তারপর আর কী। মানুষের আশা তো অপূর্ণ থাকে না। ম্যাণ্ডেলা রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, বাবা কেন আসে না। আমাদের বাবা ছাড়া আর কেউ নেই!

বুমবাইর ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। জেঠুর পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে উঠে আসত। প্রশ্ন করত, ম্যাণ্ডেলার বাবা ফিরে এসেছিল? বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, ম্যাণ্ডেলার জন্য ওর ভারি কষ্ট হতো! সে চাইত, ম্যাণ্ডেলার বাবা ফিরে আসুক।

জেঠু তখন বলত, ওর বাবা ফিরে এসেছিল কিনা জানি না। আমাদের জাহাজ তো বন্দরে দু একমাসের বেশি নোঙর ফেলে থাকতে পারত না। কত দেশে যেতে হবে। কত মালপত্র জাহাজে। তবে শুনেছি, ম্যাণ্ডেলাকে একটা পালক দিয়ে গেছিল।

—কে দিল পালকটা?

—এক ভারতীয় যাদুকর। নাম যাদুকর বসন্তনিবাস। একটা পালক আর রুপোর ঘণ্টা।

—রুপোর ঘণ্টা কেন?

—ম্যাণ্ডেলার একটা পোষা বাচ্চা ক্যাঙ্গারু ছিল। নাম হাইতিতি। পালকটা চুলে গুঁজে দিলেই ম্যাণ্ডেলা অদৃশ্য হয়ে

যেতে পারত। যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারত। সঙ্গে থাকত হাইতিতি। ওর গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং। উপত্যকার মানুষেরা আকাশে ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই বুঝতে পারত সেই মেয়েটা আকাশে ভেসে চলে যাচ্ছে। বাবার খোঁজে সে যেখানে যত দ্বীপ আছে উড়ে যেত, যেখানে যত দেশ আছে সে উড়ে যেত।

জেঠুর কাছে এমন গল্প শোনার পর, সে নিজেও কতদিন স্বপ্ন দেখেছে, একটা পালক তার শিয়রে কে রেখে গেছে। পালকটা পরে সেও উড়ে যাচ্ছে ভিন্ন গ্রহে। সঙ্গে ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি।

খড়ের বনে ঢুকে গিয়ে আজ বুমবাইর মনে হলো, সেই ম্যান্ডেলাই তার সঙ্গে আছে। অরুকে দেখার পর বার বারই মনে হয়েছে, উপত্যকার সেই মেয়েটি। যেন বাচ্চা পরী।

খড়ের বনে ওরা সেই সরু পথ ধরে হেঁটে যেতে থাকল। ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওরাও বাইরের কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না। ঘাসের জঙ্গল এত উঁচু যে এক চিলতে আকাশ বাদে আর কিছু তাদের চোখে পড়ছে না। বুমবাই ভয় পেয়ে গেলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তবে সে ভয় পাচ্ছে না। সঙ্গে যে আজ তার সত্যিকারের ম্যান্ডেলা রয়েছে। সে অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই অরু, ভয় করছে না তো!

—না আংকল, একদম ভয় করছে না!

তখনই অপু নাক টেনে বলল, ওফ, কী গন্ধ রে বাবা!

বুমবাইও গন্ধটা পাচ্ছে। বিশ্রী গন্ধ! জন্তুজানোয়ারের গায়ের গন্ধের মতো। সার্কাসে বাঘের খাঁচার কাছে গেলে বুমবাই একবার নাক কুঁচকালে বাবা বলেছিল, বাঘের গায়ের গন্ধ। শিকারীরা এই গন্ধ শুঁকে টের পায় কাছে কোথায় তেনারা আছেন।

বুমবাই জানে, জেঠুর পৃথিবীতে খরগোশ, কাঠবেড়ালী, ভোঁদড়, শেয়াল আছে, আজ হনুমানের পালও দেখতে পেল। বাঘ আছে বলে তো জানে না। বাঘ থাকলে জেঠু ঠিক বলত। তবু কেন যে ভয় করছে।

কোথা থেকে দুটো হনুমান, একটা বেজি উঠে এল।

আফ্রিকার জঙ্গলে এমনি ঘাসের বনে শুনেছে বাঘেরা থাকে—সুন্দরবনের বাঘেরাও ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এখন যে দৌড়ে পালাবে তারও উপায় নেই। ঘাসের জঙ্গলে জন্তুজানোয়ারের চলাফেরার রাস্তা থাকে। মনে হয় মানুষের চলাফেরার রাস্তা—কোনো একটা বইয়ে সে এমনও পড়েছে। এই রাস্তা এখানে সেখানে বেঁকে গেছে—আবার সামনে আর একটা এমন রাস্তা, গোলকধাঁধার মতো, কোনদিকে দৌড়ে গেলে কাঁচা রাস্তায় উঠে যাবে, জেঠুর ধানের জমি দেখতে পাবে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু জেঠু বলেছে বিপদে দিশেহারা হতে নেই। মানুষ সব পারে। বাঘকেও মানুষ আজকাল পোষে। 'বর্ন ফ্রি' বই সিনেমাতে দেখেছে। আফ্রিকার জঙ্গল দেখেছে। ওড়িশার জঙ্গলের খইরিকে নিয়ে কত ছবি বের হয়েছে কাগজে। দিশেহারা সে হবে কেন! বলল, পচা গন্ধ। ও কিছু না। কোথায় কি মরে পড়ে আছে কে জানে। শীগগির পা চালিয়ে হাঁট।

তারপরই হাঁকল, ও বিন্দেশ্বর, তোমার বাড়িটা কোথায়?

আর তখন জঙ্গলের ভেতর কোথা থেকে বের হয়ে এল বিন্দেশ্বর। একেবারে একটা কাকলাসের মতো মাথা বের করে বলল, বাবুসকল, আমি আপনাগ পিছু পিছু হাঁটতাছি।

বুমবাইর দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোথায় কত দূরে চলে এসেছে সবাইকে নিয়ে বুঝতে পারছিল না। সবাই যে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়নি সেটাই রক্ষা। বিন্দেশ্বর নেংটি পরে কখন পিছু নিয়েছে জানে না। উপরে নিচে গোনাগুনতি তিনটে দাঁত মুখে। আর সব দাঁত ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে তার। তাকে ডাকতেই সে হাজির। বিন্দেশ্বর কি আসলে সেই যাদুকর বসন্তনিবাস! জেঠু কি বসন্তনিবাসকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরেছিল। বসন্তনিবাসকে কি জেঠু এই জঙ্গলের মধ্যে বিন্দা বানিয়ে রেখেছে। জেঠু জাহাজে কাজ করত এক সময়। কত দেশ ঘুরেছে, কত বিচিত্র মানুষের গল্প বলেছে। বসন্তনিবাস নাকি জেঠুর জাহাজেই কাজ করত। জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেললে বসন্তনিবাস পরত একটা আলখাল্লা, পায়ে সোনালী নাগরা, মাথায় পরত পালকের টুপি, আলখাল্লার লম্বা পকেটে থাকত হরেক দেশের আজব খেলনা। একটা বেড়ালের ছানা পকেট থেকে সব সময় উঁকি মেরে থাকত। জাহাজ থেকে নামলেই বন্দরে সব শিশুরা জড় হতো তার চারপাশে। সে তাদের হাতে টফি দিত। প্লাস্টিকের খেলনা দিত, যে যা হাত পেতে চাইত সবই পেয়ে যেত।

বিন্দাও যেন তেমনি। কী করে টের পেয়েছে তারা। খড়ের বনে হারিয়ে গেছে, এটা কোনো যাদুবিদ্যা জানা থাকলেই সম্ভব। বিন্দাকে দেখে সে কেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সে যে ভয় পেয়ে গেছিল বলল না। সে যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল বলল না। একেবারে লায়েক ছেলের মতো বলল, তোমার বাড়িটা কোনদিকে। তুমি যে বলে এলে কাগা বগার নেত্য দেখাবে—আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছি।

—বাবুসকল, কী দয়া আপনাগ। বড় ভালবাসেন দেখছি বিন্দাকে। আপনার জেঠার বান্দা আমি। সারাদিন নেত্য দেখাব বলে ঠিক করে রেখেছি। রঙ গুলে রেখেছি, শোলার মুখোশ বানিয়েছি। আপনারা ক'জনা?

বুমবাই গুনে বলল, আমরা সাতজন।

বিন্দা বলল, হয়ে যাবে।

বকের মতো ঠ্যাং ফেলে সে হাঁটছে। আর রাজ্যের সব আজগুবি কথা। সে বলল, আপনার জেঠাবাবু বিশ্বাস করে না বনটায় বাঘ আছে?

—এখানে বাঘ?

—বাঘের কি দোষ বলেন, খেতে না পেলে গাঁয়ে গেরামে উঠে আসবে। তবে কারো অনিষ্ট করে না। পোষা বাঘ। বলেই সে হাতে তালি বাজাল। আর দেখল, একটা বাঘের বাচ্চা ওর পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বলল, সারা দিনরাত এরাই আমার বাবুসকল সঙ্গী।

তারপর বলল, এই পেরনাম কর।

ছোট্ট বাচ্চা বাঘটা দু-পায়ে খাড়া হয়ে গেল। হাত জোড় করল।

বাঘের বাচ্চাটার গা থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। বিন্দার পায়ে পায়ে তবে বাঘটাও আসছিল! জেঠু বলত, বসন্তনিবাসের কাণ্ডই ছিল অদ্ভুত। চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, বন্দরে বসন্তনিবাস ইচ্ছে করলে বেড়ালটাকে বাঘ বানিয়ে ফেলতে পারত। যাদুকররা পারে না হেন নাকি কাজ নেই!

বিন্দাই তবে বসন্তনিবাস! বুমবাই কেমন অবাক চোখে দেখতে থাকল বিন্দাকে।

বিন্দা বলল, কী আনন্দ। কী আনন্দ। কাগাবগার নেত্য-দেখতে এয়েছেন আমার বাবুসকলেরা। পরীদিদি, ডর লাগছে না তো!

অরু বলল, না না। তুমি তো দাদুর খেজুর গাছ কেটে মিষ্টি রস বের কর। এত বড় একটা গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর রস বের করা যাদুকরের পক্ষেই সম্ভব।

একবার যেতে যেতে বুমবাইর ইচ্ছে হলো বলে, বসন্তনিবাস, তুমি কি বলতে পার, ম্যান্ডেলা তার বাবার খোঁজ পেয়েছিল কিনা? তুমি যে তাকে একটা পালক দিয়ে এসেছিলে! হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা।

বিন্দা বলল, কত পালক আছে দেখবেন। সব জড় করে রেইখে দিইছি। বাবুরা আসবেন—কী আনন্দ, কী আনন্দ! গাছের ডালে বইসে আছি, দ্যাখি বাবুসকল খড়ের বনে ঢুইকে গ্যাল। কী আনন্দ, কী আনন্দ!

বিন্দার বাড়িতে পালকও আছে। বুমবাই ভাবল সে একটা পালক চেয়ে নেবে। সে কেন, সবাই। ম্যান্ডেলার মতো সেও যে আকাশে কত রাতে স্বপ্নে উড়ে গেছে। ভেসে গেছে। বাতাসে ভেসে যাওয়ার মজাই আলাদা। পালকের কথা ভাবতেই বিন্দা ঠিক টের পেয়ে গেল একটা পালক চাই তার।

বিন্দা ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে পথ করে দিচ্ছে। গাছের ডাল, কাঁটাঝোপ, ফণি মনসার জঙ্গল পার হয়ে আর একটা জঙ্গলে ঢুকে অবাক। সবুজ ঘাস আর মাঠের মতো। কোনো বাড়িঘর নেই। পাশেই বড় বিল। লাল শালুক ফুলে বিলের জল রঙিন হয়ে আছে। বিলের পাড়ে দু-তিনটে বড় কাঠের বাক্স।

অনেক দূরে শহর থেকে পাকা সড়ক চলে গেছে।

অরু বলল, এটা তোমার বাড়ি? ঘর কই?

বুমবাই বলল, এ তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এলে!

বাঘের বাচ্চাটা লাফাচ্ছে। একলাফে কাঠের বাক্সের উপরে গিয়ে বসে পড়ল। কোথা থেকে দুটো হনুমান, একটা বেজি উঠে এল।—এ কেমন লোক রে বাবা! বুমবাই অপুরা কেমন দিশেহারা!

একদিকে শালগাছের জঙ্গল! বড় বড় শালগাছ। নিরন্তর পাতা ঝরছে। বাক্সতে কী আছে কে জানে। মহাদেব দাদু বলেছে, বেটা সব পারে। মানুষকে গরু ছাগল বানিয়ে রাখতে পারে। বুমবাইর মনটা খচখচ করছে। বিন্দা কী বুঝতে পেরে বলল, আমি নাচি, আমার আর কোনো দোষ নাই বাবুসকল। বলেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। সাঁজ লেগে গেছে। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। কিন্তু এমন একটা অচেনা জায়গা থেকে তারা যাবেই বা কী করে!

আরে এ তো আরও বিস্ময়। সব বুঝতে পারে বিন্দা। বলল, ডর নাই বাবুসকল। আমরা নাচতে নাচতে বাবুর মহল্লায় চলে যাব। আমার বাপ ঠাকুরদার ইজ্জত আছে না! আমি কোনো আকাম কুকাম জানি না বাবুসকল। বলেই সে কাঠের তাপ্পি মারা বাক্স দুটো খুলে ফেলল। বলল, বাড়ি থাকলে মহাদেব বেটা তাড়া করবে, এইখানে চইলে এলাম। দ্যাখেন। বলেই সে একটা মুখোশ বের করে পরীদির মুখে লগিয়ে দিল। লাগাতেই পরীদি মানে অরু ময়না পাখি হয়ে গেল। বের করছে সব টেনে টেনে। একটা জোব্বার মতো কী বের করে পরে ফেলল বিন্দা। চকচকে রাংতা লাগানো। জোনাকি পোকা আঠা দিয়ে গাঁথা। জোনাকি পোকাগুলি ওড়ার জন্য ছটফট করছে। আর আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠছে। সে বাক্স থেকে আবার কী টেনে বের করতেই দেখল—বিশাল একটা ধামসা। গলায় ঝুলিয়ে দুটো কাঠি দিয়ে এমন তালমিলের বাদ্যি শুরু করল যে পরীদি নাচতে শুরু করে দিল। পরীদি ময়না পাখি, বিন্দার মুখে দৈত্যের মুখোশ, দুটো দাঁত বের হয়ে আছে। কেমন মোহের মধ্যে পড়ে গেছে বুমবাই। বুমবাই কেন, সকলেই।

একটা আজব দেশের বাসিন্দা হয়ে গেলে যা হয়—স্বপ্নে এমন আজব দেশ ঘুরে এসেছে সবাই। এটা স্বপ্ন কি না, তাও বুঝতে পারছে না যেন অপু বাবলুরা। ওরা বলল, আমাদের মুখোশ কই। কেবল তুমি আর অরু নাচবে, হবে কেন?

গলায় ঝোলানো ধামসা। হাতে দুটো কাঠি। এই কাঠিতে কী আশ্চর্য যাদু, বিন্দা কত রকমের বোল তুলছে কাঠিতে।

বুমবাই বলল, আমি কি সাজব?

বিন্দা বাদ্য থামিয়ে বলল, সাজেন। সে হাঁটু মুড়ে বসে গেল। বলল, শালপাতা তুলে আনেন। বুমবাই ছুটে গেল শালপাতা কুড়োতে। জড় করে ফেলল গাদা গাদা শালপাতা। শালপাতা দিয়ে বিন্দা কী করবে জানে না। কিন্তু এমন ঘোর লেগে গেছে যে প্রশ্ন করার মতোও বিচারবুদ্ধি নেই কারো।

বিন্দার কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। মুখোশটা খুলে পাশে রেখে দিল। নারকেল পাতার কাঠি বের করল গুচ্ছের। তারপর শালপাতা সেলাই করতে বসল। নিমেষে বুমবাইর মাপের শালপাতার একটা পোশাক বানিয়ে ফেলল। পোশাকটা পরতেই মনে হলো শরীর কেমন খসখস করছে। পাতার ঘষটানির শব্দ। হাত মেলে দিলে ঈগলের মতো পাখনা হয়ে যাচ্ছে। পেছনে ঝুলছে শালপাতার পুচ্ছ। আসলে বিন্দা যে শুধু যাদুকরই নয়, ওস্তাদ কারিগর, বুমবাই এই প্রথম টের পেল। কত সব সুন্দর মুখোশ বাক্সের মধ্যে। খালি শোলার মণ্ড দিয়ে তৈরি। বুমবাই ঈগল পাখির মতো ডানা মেলে দৌড়াচ্ছে। অরুর গায়ে সবুজ রঙের ফ্রক। পায়ে সবুজ মোজা। ময়না পাখির মুখোশ পরে সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাবলু অপুরা বলছে, আমাকে আগে, আমাকে কী সাজতে হবে। একে একে বিন্দা সবাইকে একটা করে মুখোশ দিয়ে দিল। পাতার পোশাক বানিয়ে দিল। সে এবারে চায় সত্যিকারের মোগা নৃত্য কারে বলে মানুষজন দেখুক। বেটা মহাদেব দেখুক। তার ধামসা আবার গলায় ঝুলিয়ে দ্রিম দ্রিম বাজনা শুরু করে দিতেই নাচ শুরু হয়ে গেল। হেলে দুলে নাচছে। কা কা করছে কেউ। কেচর মেচর করছে কেউ। যেন দৈত্যটা একদল প্রকৃতির জীব নিয়ে রাস্তায় উঠে যাবে।

তখন রাত হয়ে গেছে। চনমনে জ্যোৎস্না। মহাদেব এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, কর্তা, বেটা ভেগেছে। এত করে বললাম বদমাসটাকে আশকারা দেবেন না, এখন কী হবে!

বুমবাইর বাবা, বড়দা, ছোড়দা, পিসি জেঠি কাকিরা কান্নাকাটি শুরু করে দেবে আর কি!

মহাদেব বলল, আমি থানায় যাচ্ছি। বেটার মোগা নাচ বের করছি। বেটা পারে না হেন কাজ নেই। তুকতাক জানে। না'লে কখনও হয়, বনবিড়াল, নিশাচর জীব এখন বিন্দার বাড়ি পাহারা দেয়। গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। হনুমান দুটোও নেই। বেজিটাও নেই। গোলার মধ্যে কাঠের বাক্স দুটো ছিল, তাও নেই।

কর্তা কী বলবে বুঝতে পারছেন না। কোথায় গেল! বিন্দা কি একটা আলাদা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত! বাপ পিতামহের ঐতিহ্য রক্ষায় সে কী ওদের নিয়ে দূরের পাহাড়ে চলে যেতে চায়। বুমবাইর জেঠু শুধু বলল, বিন্দা কোনো খারাপ কাজ করতে পারে বিশ্বাস হয় না। সে শিশুদের ভালবাসে। শিশুদের সে কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।

মহাদেব খেঁকিয়ে উঠল, আপনার ঐ এক কথা। ও পারে না হেন কাজ নেই। বেটা ডাকিনী বিদ্যা যোগিনী বিদ্যা সব জানে। নালে একটা বনবেড়াল বাড়ি পাহারা দেয়। কে কবে এমন অনাসৃষ্টি কারবার দেখেছে।

কর্তা বললেন, ওটা তো বন থেকে সে কুড়িয়ে এনেছে। বাচ্চা ছিল। ওর কাছে থাকতে থাকতে পোষ মেনে গেছে।

কিন্তু যা হয়, মহাদেব কারো কথা শোনার পাত্র নয়। ছেলেরা উচাটনে আছে। কিছু বলতেও পারছেন না। খুঁজতে যেতে হয়। বাড়ির সবাই বের হয়ে পড়ল। শ্যালোর ঘর থেকে হরমোহনও উঠে এল। ওরা রাস্তায় নেমে কিছুদূর যেতেই শুনল, দ্রিম দ্রিম বাদ্য বাজছে। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বুমবাইর বড়দা ছুটে এসে বলল, বাবা, শোনা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি। তোরা এত উতলা হস না। ওর কাগা নেত্য বগা নেত্য সবাইকে দেখাতে না পারলে জীবনে তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। যে যেমন ভাবে বাঁচতে চায়। মহাদেবটা কেন যে থানায় গেল!

এদিকেই আসছে।

দূরে খালের ধারে ওদের দেখা গেল। ধামসা বাজাচ্ছে বিন্দা। কাক বকের ডাক। আজব পোশাক পরে বিন্দা সবাইকে নিয়ে সং বের করেছে।

বুমবাইর জেঠু ইজিচেয়ার থেকে উঠলেন। সামনের উঠোনে বেতের চেয়ার পড়ে আছে সব। তিনি তার পুত্রকে ডেকে বললেন, ওগুলো তুলে ফেল। বিন্দা আসছে।

বুমবাইর এক পিসি এসে খবর দিল, দাদা শিগগির এস। কী কান্ড! গা থেকে একটা লোকের আগুন বের হচ্ছে।

বুমবাইর জেঠু সব জানে। বিন্দা আঠা দিয়ে গায়ে জোনাকি পোকা আটকে দেয়। তারাই জ্বলে। তিনি বললেন, জ্বলতে দে। ওরা সব সঙ্গে আছে তো?

—সবাই আছে। অপু কাক সেজেছে। বাবলু বক!

—তোরা বোস বারান্দায়। দেখ কী মজা!

রাস্তায় কিচির মিচির শব্দ। উঠোনের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। বিন্দা এসেই হুপ করে লাফিয়ে পড়ল। আর হেলে দুলে নাচতে থাকল। চারপাশের কাক বক ময়না—বোঝার উপায় নেই কে কি সেজেছে! তবে অরুকে চেনা যায়।

সে ছুটে এসেই জেঠুর কোলে উঠে বসে পড়ল।

বুমবাই ঈগল পাখি। সে লাফাতে লাফাতে এসে ইগ্ ইগ্ করতে থাকল। ঈগল পাখি, কথা বলবে কী করে! অরু, জেঠুর কোলে উঠে বসে থাকলে চলবে কেন। সং সেজে সবাই নাচছে। বুমবাই ক্ষেপে গেছে অরুর আচরণে!

জেঠু বলল, বিন্দা রাগ করবে। যা।

বিন্দার জন্য ভারি কষ্ট হয় বুমবাইর জেঠুর। সংসারে তার কেউ নেই। ছিল ছোট্ট একটা মেয়ে, সেও মরে গেল। সে এখন এ-সব নিয়েই থাকে। এটাই তার জীবন। কোন দেশের মানুষ বিন্দা, কোথায় এসে নিজের সেই শৈশবকে ভুলতে পারেনি। কর্তার বাড়িতে এত ছেলেপুলে—বড় শখ তার শৈশবের মতো সং সেজে কাগা বগার নেত্য দেখায়। কিন্তু মহাদেবটা যে কেন থানায় গেল!

বিন্দা পাগলের মতো ধামসা বাজাচ্ছে আর নাচছে। নাচছে কোমর বাঁকিয়ে। হেলে দুলে, এক পা পেছনে রেখে, সামনে এক পা, ঘুংগুর বাজছে পায়ে। আশ্চর্য এক জীবনের ছবি, ছন্দ তাল অতীব কৌতূহল সৃষ্টি করে। এমন একটা নির্জন পৃথিবীতে মানুষের জন্য হরেক মজার দরকার। বিন্দা এই মুল্লুকের এমনি এক মজা। রাতে কোন বাড়িতে কখন যে সে উঠে যায় একা, এবং নাচতে থাকে, ইদানিং পয়সা নেয় না, ভিক্ষা নেয় না—সে নাচতে পারলেই খুশি!

বুমবাইর জেঠুর মনে হয় আসলে বিন্দা প্রকৃতির বন-জঙ্গলের মতোই সজীব শিল্পী। মাথায় এক একদিন এক একরকমের পালা গজায়। আজ সীতাহরণের পালা সে শুরু করেছে, নাচের মুদ্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল। শেষে জটায়ু বধ। এবং এ-সময়েই কে বলল, মহাদেব দাদু ফিরেছে। থানা থেকে পুলিশ আসছে।

পুলিশের কথা শুনতেই বিন্দার নাচ থেমে গেল। মুখ থেকে খুলে পড়ল মুখোশ। আলখাল্লা খুলে ফেলল। গলা থেকে ধামসা নামিয়ে একেবারে হাল্কা হয়ে গেল—তারপর সে সব ফেলে জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠের মধ্যে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিশকে যমের মতো ভয় পায় বিন্দা।

বিন্দা সেই যে গেল আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিন্দার খোঁজে জেঠুর ক'দিন নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তাকে আর সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল না।

জেঠুর মনমেজাজ খারাপ। বুমবাইর মনে হলো জেঠুর জীবনের সঙ্গে বিন্দেশ্বরের কোথায় যেন মিল আছে। এক জীবনে মানুষের সব থাকে। আর এক জীবনে মানুষ সব হারায়। জেঠুর এখন হারাবার পালা।

জেঠু বিন্দেশ্বরের সব মুখোশ ঘরে তুলে দেয়ালে সাজিয়ে রাখল। এক একটা মুখোশ এক এক রকমের। কত যত্ন নিয়ে বিন্দা নিজের জীবনের কথা ভুলে সোলার মন্ড দিয়ে মুখোশগুলো তৈরি করেছে। এই মুখোশগুলোই ছিল বিন্দার শেষ জীবনের সম্বল। মুখোশের রঙ আশ্চর্য সজীব। পাতার রস, ফুলের রস মধুতে ভিজিয়ে সে রঙ বানাত। নীল সবুজ হলুদ লাল, যেখানে যে রঙ দরকার বিন্দা মুখোশে লাগিয়েছে। কাকের, বকের, দৈত্যের মুখোশ সব।

এক সকালে বুমবাই দেখল জেঠু ময়না পাখির মুখোশের দিকে অপলক তাকিয়ে কাঁদছে। জেঠুকে সে কখনও কাঁদতে দেখেনি। মুখোশটা পরে অরু উঠোনে দুরন্ত নেচেছে। আজই বড়দা, অরু, বৌদি চলে যাবে সে টের পেল। গাড়িতে সব তোলা হচ্ছে। অরুকে নিমেষের জন্য জেঠু চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছেন না। দিদিভাই দিদিভাই বলে কেবল পাগলের মতো আদর করছেন। মুখোশটা এখন স্মৃতি হয়ে জেঠুর দেয়ালে শুধু শোভা পাবে।

বুমবাইরও মন খারাপ। আর কেউ তাকে কোনোদিন যেন আংকল বলে ডাকবে না। মাঠে, গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে আর কোনোদিন সে অরুকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারবে না। লুকোচুরি খেলতে পারবে না। গাড়িটা চলে যাবার সময় অরু হাত নাড়ল। বুমবাই হাত নাড়ল। গাড়িটা যতক্ষণ দেখা গেল বুমবাই জেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। তার আজ কেন এত কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারল না। বুমবাই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আজ প্রথম এক আশ্চর্য কষ্ট অনুভব করল অরুর জন্য। সেও গোপনে আজ জেঠুর মতো সারাক্ষণ কেঁদেছে। অরু বলেছে তাকে চিঠি লিখবে বাংলাতে। সুন্দর চিঠি। অরু আর সোন্দর বলে না।

যাবার দিন বুমবাইও জেঠুকে প্রণাম করতে গিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিল। এখন থেকে জেঠু আবার একা। জেঠু তাঁর আজব দেশে বেঁচে থাকবেন নিজের মতো। পাশে নিজের কেউ থাকবে না। অরুর জন্য তার এখন আর এক কষ্ট। এটা যে কী কষ্ট নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। গাড়ির জানালায় বসে সে শুধু শুনতে পাচ্ছে ঝিকঝিক ঝমঝম—রেলগাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটছে। তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কার জন্য! জেঠু, বিন্দা না অরু ঠিক বুঝতে পারছে না।

ছবি : সরোজ সরকার

পটলদার চালিয়াতী

নিমাই ভট্টাচার্য

শুধু কেন্ট চাটুজ্যে লেন বা বাঁড়ুজ্যে পাড়ায় না, পাঠক পাড়া-চৈতন পাড়া-পঞ্চাননতলা সমেত সমস্ত বালী গ্রামের মানুষ ওকে চেনেন। খুব ভালভাবে চেনেন। এ ছাড়া তারকেশ্বর-ব্যান্ডেল- বর্ধমান লোক্যাল আর চুয়ান্ন-ছাপ্পান্ন নম্বর বাসের বহু নিত্যযাত্রীও ওকে চেনেন। না চিনে উপায় নেই।

পাঁচটা চল্লিশের ঐ ভিড়ে ভর্তি ব্যান্ডেল লোক্যালের কামরায় অসংখ্য জনের মৃদু গুঞ্জনের পরিবর্তে যদি একজনকেই চিৎকার করে কথা বলতে শোনা যায়, তাহলে দরজার কাছ থেকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলবেন, কে.? পটলদা নাকি?

–পটলদা ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী এভাবে স্পষ্ট কথা বলতে পারে?

ঐ ভিড়ের ভিতর থেকেই কে একজন টুক করে মন্তব্য করেন, দাদা, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে পড়ুন!

ঘাড় কাত করে মুখে তুলে পটলদা চিৎকার করেন, ও দাদা, শুনে রাখুন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ আমাকে পার্লামেন্টে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু....

হঠাৎ একজন ফোড়ন কাটেন ওর কথার মাঝখানে–নেহরু তো কৃষ্ণমেননের পর আপনাকেই ডিফেন্স মিনিস্টার করতে চেয়েছিলেন, তাই না?

–ওহে শ্রীমান শুনে রাখুন, নেহরু আমাকে ডিফেন্স মিনিস্টার করতে না চাইলেও আমিই বিধান রায়ের মারফত ওঁকে জানিয়ে দিই, জেনারেল চৌধুরীকে প্রধান সেনাপতি করুন।

হাজার হোক লোক্যাল ট্রেন। কেউ কোনো কারণে একটি কথা বললেই হাজার কথা বলাবলি হয়। হবেই।

–পটলদার কাছে খাপ খোলে কে?

চুয়ান্ন নম্বর বাসে পটলদাকে উঠতে দেখলেই নিত্যযাত্রীরা আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠেন। চৈতন পাড়ার সত্যবাবু সব চাইতে প্রবীণ। ম্যাকলিয়ড কোম্পানীর সমস্ত শ্রীবৃদ্ধির মূলে নাকি উনি। গাম্ভীর্যের মধ্যেও একটু হেসে বলেন, এসো পটল, এসো। কতদিন পর তোমাকে দেখছি।

পাশের বেঞ্চির কোণার সীটে বসে হাতের ফোলিও ব্যাগটা সযত্নে কোলের উপর শুইয়ে রেখে পটলদা একবার এদিক-ওদিক দেখতে দেখতেই বলেন, অনেক দিন এখানে ছিলাম না।

–কোথায় গিয়েছিলে?

–কুম্ভে।

সত্যবাবু প্রায় আঁতকে উঠে বলেন, কুম্ভে!

–হ্যাঁ দাদা, কুম্ভে।

–তোমার কোনোরকম আঘাত-টাঘাত লাগেনি তো?

পটলদা এক গাল হাসি হেসে বলেন, না দাদা, আমার কিছু হয়নি, বরং...

পটলদা একটু থামেন। আবার এদিক-ওদিক দেখেন।

পাঠক পাড়ার হরিহর পাকড়াশী বকের মতো গলা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, বরং কী?

–আমি ডি-আই-জি শ্রীবাস্তবকে বকুনি না দিলে আহিরীটোলার সরকার বাড়ির মেয়েগুলো বাঁচত না।

সামনের দিক থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি?

পটলদা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, লোকে যে পুলিশকে কেন ভয় পায়, তা আমি বুঝি না। হাজার হাজার লোক দেখল, পুলিশ ভুল করছে, হাজার হাজার লোক পড়ে যাচ্ছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় লাখ খানেক লোক তাদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তবু সবাই চুপ।

–তারপর? কে একজন প্রশ্ন করেন।

–ডি-আই-জি শ্রীবাস্তবকে আচ্ছাসে বকুনি দিতেই সমস্ত পুলিশগুলো হকচকিয়ে গেল।

–তারপর? এবার সত্যবাবু জানতে চান।

–ব্যস! পাঁচ মিনিটে সিচুয়েশন বদলে গেল।

জি. টি. রোডের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বালী থেকে হাওড়ার মাঝখানে যে কতগুলো গর্ত আছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। তারই একটির মধ্যে বাস পড়তেই যাত্রীরা প্রায় ছিটকে পড়েন! কে একজন মন্তব্য করেন, জন্ম-জন্ম পাপ না করলে এই পথে বাসে যায়?

অফিস টাইম। বাসে তিলধারণের জায়গা নেই। একজন যাত্রী রসিকতা করে বলেন, এই রাস্তায় যে কত গর্ত আছে তা বোধহয় ক্যালকুলেটরও গুনতে পারবে না।

পটলদার কানে ঐ কথা যেতেই বলেন, বালী খাল বাস-স্ট্যান্ড থেকে হাওড়ার মধ্যে মোট দু'হাজার সাতশ' একুশটি গর্ত আছে।

সত্যবাবুর মতো গুরুগম্ভীর মানুষও ওর কথায় না হেসে পারেন না। জিজ্ঞেস করেন, তাই নাকি পটল?

–হ্যাঁ সত্যদা। পটলদা একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলেন, আমি এই পুরো রাস্তাটা হেঁটে দেখেছি, দু'হাজার সাতশ' একুশটা গর্ত আছে এবং সংগে সংগে চীফ মিনিস্টারকে চিঠি লিখে তা জানিয়েছি।

বাসযাত্রীদের মধ্যে রসিক লোকের অভাব থাকে না। তাই পটলদার কথা শুনে একজন রসিক যাত্রী বলে ওঠেন, ঐ চিঠি পেয়েই তো চীফ মিনিস্টার দৌড়ে আপনার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই না?

পটলদা গম্ভীর হয়ে বললেন, চীফ মিনিস্টার হাওড়ার ডি. এম'কে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

বাস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই যাত্রীরা হুড়মুড় করে নামেন। ঐ সময় কে একজন টিপ্পনী কাটেন, পটলদা চিঠি লেখেন বলেই গর্তগুলো আজও ভরাট করা হলো না।

সবাই হো হো করে ওঠেন। শুধু পটলদা হাঁড়িমুখ করে লঞ্চঘাটের দিকে এগিয়ে যান।

পটলদা সত্যি একটি বিচিত্র চরিত্র। দাওনাগাজীতলায় বাড়ি হলেও কেষ্ট চাটুজ্যে লেন ও বাঁড়ুজ্যে পাড়ার মোড়ের পুটেদাদের ঐ চওড়া বারান্দাই হচ্ছে ওঁর হেড-কোয়ার্টার্স! এখানেই ওঁর নিত্য পার্লামেন্ট বসে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পটলদা, আপনি নিজের পাড়ায় আড্ডা না দিয়ে এখানে রোজ আসেন কেন?

পটলদা সংগে সংগে জবাব দেন, তোরা বোধহয় সিস্টার নিবেদিতাকে সামনে পেলে জিজ্ঞেস করতিস, আপনি কেন নিজের দেশ ছেড়ে কলকাতার বাগবাজারে এসে আস্তানা করলেন?

পাঁচু বলে, তিনি না হয় স্বামী বিবেকানন্দর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে....

পটলদা এক গাল হাসি হেসে বলে, ওরে, জয়প্রকাশ নারায়ণই এই বারান্দাতে বসে আমাকে সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাই তো এই বারান্দা আমার কাছে....

পান্টি বলল, দাওনাগাজীতলার ছেলেরা কী বলে জানেন?

–কী বলে?

–বলে, পটলদা খুব ভালভাবেই জানেন, আমরা ওঁর গুল টলারেট করব না, তাই....

পটলদা ঐ অপ্রিয় প্রসংগ এড়াবার জন্য বেশ খানিকটা দূর দিয়ে দুলালদাকে যেতে দেখেই চিৎকার করেন, দুলালদা, কোথায় চললে?

দুলালদা এগিয়ে এসে বলেন, ওতোর পাড়ায় এক সাহিত্য-সভায় যাচ্ছি।

–সাহিত্যসভায় কি হবে?

–কবিতা পাঠ।

পটলদা একটু মুখ বিকৃতি করে আক্ষেপের সুরে বলেন, জীবনানন্দদা মারা যাবার পর বাংলায় কবিতা লেখা হচ্ছে নাকি?

কবি ও কবিতাই দুলালদার বিচরণভূমি। তাই তিনি ওঁর মুখে জীবনানন্দদা শুনেই চমকে উঠে বলেন, আপনি কি জীবনানন্দ দাশের কথা বলছেন?

–ওরে বাপু, আর কোন জীবনানন্দের কথা বলব?

–আপনি ওঁকে চিনতেন নাকি?

পটলদা হো হো করে হেসে উঠে বলেন, জীবনানন্দদার পাল্লায় পড়েই তো আমি বারো বছর বয়সে যে কবিতা লিখি, তা পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

পটলদা এখানে বসলেই ওঁর কথামৃত শোনার জন্য একদল ছেলের ভিড় হয়। হবেই। ঐ ভিড়ের মধ্য থেকেই কে একজন বলল, এই তো সেদিন আপনি বললেন, গল্প লিখতেন। আজ বলছেন....

–তারাশংকরদা জানতেন, প্রেমেনদা জানেন, আমি গল্প লিখতাম কিনা। পটলদা না থেমেই বলে যান, তারাশংকরদা তো সবার সামনেই বলতেন, পটল, তোমার গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হবে।

কাব্যরসিক দুলালদা অত্যন্ত ধীর স্থির প্রকৃতির মানুষ। আজে-বাজে কথা বলেন না। তিনি পটলদার কথা শুনে বোধহয় মুগ্ধ হন। তাই তো তিনি প্রশ্ন করেন, এখন গল্প লেখেন না কেন?

–দু'চারজন প্রকাশক খুব ধরাধরি করছে। ভাবছি, আবার গল্প লেখা শুরু করব।

–আচ্ছা পটলদা, আপনি ফুটবল খেলতেন না? কে একজন পিছন দিক থেকে প্রশ্ন করে।

পটলদা একটু তাচ্ছিল্যের সংগে বলেন, না রে! ফুটবল খেলতে আমার ভাল লাগে না। এবার উনি একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, তবে আমি যখন ভূপালে কাকার কাছে যেতাম

পটল, তুই এবার সব অ্যানাউন্সমেন্ট ও স্টেজ ম্যানেজারি করবি

আর মনসুর ওর দিদিমার কাছে বেড়াতে আসতো, তখন আমরা দু'জনে খুব ক্রিকেট খেলতাম। মনসুর আমার ব্যাটিং স্টাইলের একজন বড় এ্যাডমায়ারার।....

–কোন মনসুর? সন্টু জানতে চায়।

–তোরা যাকে মনসুর আলি পতৌদী বলে জানিস সেই মনসুর।

–উনি আপনার বন্ধু নাকি? পাঁচু মুখ টিপে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

–তোরাই একবার মনসুরকে জিজ্ঞেস করিস, ডু য়ু নো পটল?

পল্টি বাঁড়ুজ্যে পাড়ার একটা ক্লাবের সেক্রেটারী। তাই সে প্রস্তাব করে, পটলদা, পতৌদীকে একবার আমাদের ক্লাবে এনে দিন না!

পটলদা সংগে সংগে বলেন, এই ক'দিন আগেই মনসুর লন্ডন থেকে আমার অফিসে ফোন করেছিল...

–তাই নাকি?

পটলদা এক গাল হাসি হেসে বলেন, ওঁর চিঠি লেখার অভ্যাস একেবারে নেই। তাই যখন যেখানে যায়, সেখান থেকেই আমাকে ফোন করে।

ওঁর কথা শুনে সবাই লুকিয়ে-চুরিয়ে হাসাহাসি করে কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করেই উনি বলে যান, এই বছরটা মনসুরকে কখনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কখনও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড বা শারজায় এত ঘোরাঘুরি করতে হবে যে কলকাতায় আসার সময় পাবে না। ও যদি কয়েকদিন কলকাতায় থাকে তাহলেই আমি একদিন বালীতে ধরে আনব।

টুবাই বলল, তুমি তো বলেছিলে মান্না দে'কেও একদিন ধরে আনবে কিন্তু....

–ওঁর এমন হঠাৎ জ্বর হলো যে...

এইভাবেই পটলদার দিন কাটে। সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, ওঁর মতো বখাটে, চালিয়াত, মিথ্যাবাদী ও অহংকারী মানুষ আর হয় না কিন্তু উনি নিজে মনে করেন, সবাই ওঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। এই ধাপ্পাবাজীর জন্যই পটলদাকে বছর বছর চাকরি ছাড়তে হয়। লোকটার কথাবার্তা শুনে প্রথমে সবাই মুগ্ধ হন এবং চাকরিও পান কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ওঁর আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন অযথা কিছু সহকর্মীকে দোষারোপ করে চাকরি ছাড়তেই হয়। এই ধাপ্পাবাজীর জন্য একবার পটলদাকে কি বিপদেই পড়তে হয়েছিল!

গর্ডন কোম্পানীতে ঢুকেই পটলদা তাঁর পুরনো দিনের সহপাঠী কল্যাণ সরকারকে দেখে অবাক। খুশিও বটে। কল্যাণ বহুদিন ধরে এই কোম্পানীতে কাজ করছে এবং সবাই তাঁকে খুব ভালবাসেন বলেই তিনি আজ তিন বছর অফিস ক্লাবের সেক্রেটারী। পূজার পর পরই অফিস ক্লাবের বার্ষিক

উৎসব নিয়ে সবাই মেতে উঠলেন। প্রথম দিন জলসা ও দ্বিতীয় দিন নাটক মঞ্চস্থ হবে। নন্দ চৌধুরীর পরিচালনায় নাটকের রিহার্সাল ভালভাবেই চলে। জলসার জন্য শিল্পী নির্বাচন পর্ব শুরু হতেই এরিয়া ম্যানেজার ও অফিস ক্লাবের সভাপতি মিঃ ঘোষ একদিন সবার সামনেই বললেন, এবার পঙ্কজ মল্লিককে আনুন। গতবার তো উনি....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পটলদা একটু হেসে বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার! পঙ্কজদাকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।

—আপনি ওঁকে চেনেন নাকি?

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে পটলদা বলেন, পঙ্কজদা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

মিঃ ঘোষ খুশি হয়ে বলেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ স্যার! আমি তো পঙ্কজদার বাড়িতে থেকেই বি. এ. পড়ি।

মিঃ ঘোষ কালচারাল সাব-কমিটির সেক্রেটারী দিব্যেন্দু সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, পঙ্কজবাবুর দায়িত্ব যখন পটলবাবু নিচ্ছেন, তখন তোমাদের আর চিন্তা কী?

সবাই পটলদাকে নিয়ে এমন হৈচৈ শুরু করলেন যে কল্যাণ সরকার কিছু বলতে পারলেন না কিন্তু মনে মনে তাঁর একটা খটকা থেকেই গেল, পটল কি সত্যি পঙ্কজ মল্লিককে চেনে?

নাকি তার স্বভাবসিদ্ধ ধাপ্পা দিল? হাজার হোক স্কুলের সহপাঠী। তাই তিনি মনের সন্দেহ মনেই চেপে রাখলেন; মুখে কিছু বললেন না। বলতে পারলেন না। তবে কল্যাণ সরকারও কাঁচা ছেলে না। উনি মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলেন!

অনুষ্ঠানের দিন যত এগিয়ে আসে, পটলদার জনপ্রিয়তা ও মাতব্বরী তত বাড়ে। ইতিমধ্যে নন্দীবাবুর ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে বক্তা হিসাবে পটলদার খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং কল্যাণ সরকারই প্রস্তাব করেন, পটল, তুই এবার সব এ্যানাউন্সমেণ্ট ও স্টেজ ম্যানেজমেণ্ট করবি। তোর মতো সুন্দর করে এ্যানউন্সমেণ্ট করতে তো আমরা কেউ পারব না।

অফিস ক্লাবের সব মাতব্বরই ওঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।

পটলদা বললেন, স্টেজ ম্যানেজমেণ্ট আমি একাই সামলে নেব। আপনারা সবাই অন্য সবকিছু সামলাবেন।

দেখতে দেখতে পরের কয়েকদিন নানা কাজকর্ম ও উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

বার্ষিক উৎসবের দু'একদিন আগে পটলদা বললেন, পঙ্কজদা বলেছেন, উনি নিজেই চলে আসবেন। ওঁকে আনতে যেতে হবে না।

মিঃ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন, পঙ্কজবাবু ভুলে যাবেন না তো?

—স্যার, পঙ্কজদার মেমরি আমাদের চিন্তার বাইরে। এইসব সামান্য ব্যাপার তো দূরের ব্যাপার, যে কোনো গান একবার শুনলে জীবনেও ভুলবেন না।

মিঃ ঘোষ সম্মতিতে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করেন, উনি কী নিজের গাড়িতেই আসবেন?
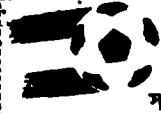
—হ্যাঁ স্যার।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেই বহু প্রতীক্ষিত দশই ডিসেম্বর হাজির। সকালবেলাতেই কয়েকজন স্টার থিয়েটারের সামনে ফেস্টুন ঝুলিয়ে দিলেন—গর্ডন ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ ক্লাব: বার্ষিক উৎসব। দুপুর হতে না হতেই ক্লাবের কর্ণধাররা হাজির হলেন। ফুল-মালা-তোড়া দিয়ে সাজান হলো মঞ্চ।

কালচারাল সেক্রেটারী দিব্যেন্দু আবার মনে করিয়ে দিল, কে কোন গাড়ি নিয়ে কোন শিল্পীকে কখন আনতে যাবে। গেটে তাঁদের কে অভ্যর্থনা করবে এবং গ্রীনরুমে কে কে তাঁদের দেখাশুনা করবে। কল্যাণ সরকারের ব্যস্ততার সীমা নেই। যখনই যার কোন সমস্যা বা দ্বিধা হচ্ছে, তিনি তখনই ওঁর কাছে ছুটে আসছেন। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই মিঃ ঘোষও এসে হাজির। তিনি নিজেও সবকিছু একবার তদারক করে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, পটলবাবু এখনও আসেননি?

—না স্যার।

অনুষ্ঠান শুরু হবার ঠিক মিনিট পনের আগে পটলদা এসে হাজির হয়েই মিঃ ঘোষ আর কল্যাণকে একপাশে ডেকে নিয়ে

ফিসফিস করে বললেন, খুবই জরুরী কাজে পংকজদা আজ সকালের প্লেনে বোম্বে চলে গেছেন।

–সে কি? মিঃ ঘোষ চমকে ওঠেন।

পটলদা বললেন, তবে স্যার, অনেক ভাল ভাল আর্টিস্ট তো আসছেন...

–কিন্তু পংকজবাবুর জন্য যদি অডিয়েন্স চিৎকার....

–আপনি কিছু ভাববেন না স্যার! আমি তো স্টেজ ম্যানেজ করব; কিছু হবে না।

কল্যাণ বলল, স্যার, এখন আর এ বিষয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। কাউকে কিছু বলারও দরকার নেই।

পটলদা সংগে সংগে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাউকে কিছু বলতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত শুরু হলো অনুষ্ঠান। সভাপতি-প্রধান অতিথির ভাষণের পর শুরু হবে গান। ধনঞ্জয়-হেমন্ত-সুপ্রভা সরকার-সন্ধ্যা মুখার্জী। স্টেজে মাইক্রোফোন নিয়ে পটলদার সে কি মাতব্বরী। এরই মাঝখানে হঠাৎ কল্যাণ উধাও। ওঁকে কেউ কোথাও খুঁজে পান না। কয়েকজন রাগারাগিও করলেন। সন্ধ্যা মুখার্জী যখন গাইছেন, তখন পটলদা একবার উইংস এর পিছনে এসে দিব্যেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, সতীনাথ-উৎপলা এসেছেন তো?

–হ্যাঁ।

পটলদা আবার স্টেজে ফিরে যান। 'সেই সাগরবেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে গান গেয়ে পরিচয়' গেয়ে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শেষ হতেই দর্শকদের হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল হল। পরবর্তী শিল্পীর নাম ঘোষণা করবার জন্য পটলদা মাইক্রোফোনের দিকে এগুতেই কল্যাণ সরকার যে পংকজ মল্লিককে নিয়ে স্টেজে ঢুকেছেন, তা তিনি খেয়ালই করেননি। কল্যাণবাবু পংকজবাবুকে নিয়ে মাইক্রোফোনের পাশে গিয়ে বললেন, দাদা, ইনিই পটলবাবু।

পংকজবাবু ওঁকে দেখে একটু মুচকি হেসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাদের এই আনন্দানুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানাননি এবং আপনাদের দুঃখ না দেবার জন্যই কল্যাণবাবুর বিশেষ অনুরোধে আজ আমি এখানে এসেছি। আমি পটলবাবুকে জীবনে কোনোদিন দেখিনি এবং আশা করব, কোনো শিল্পীর নামে তিনি মিথ্যা প্রচার করবেন না।

পঙ্কজ মল্লিকের গান শুরু হতেই পটলদা পালাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ছেলেছোকরারা তাঁকে ছেড়ে দেবে কেন? ধাপ্পাবাজীর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েই তারা ওঁকে হল থেকে বের করে দিয়েছিল।

সত্যবাবু বা-দুলালদার মতো মানুষও বলেন, এই চালিয়াতী করার জন্য পটল এমন বিপদে পড়বে যে, সেদিন আর ফেরার পথ থাকবে না!

ছবিঃ দিলীপ দাস

বেলা তখন তিনটে বাজে

গৌরাংগ ভৌমিক

কেউবা তাঁকে হুতুম বলেন, আমরা বলি, বিরামবাবুর ভাই।
ঘটিয়ে দিলেন সেই মানুষই ব্যাপার যাচ্ছেতাই।
বেলা তখন তিনটে বাজে, বেলা তিনটেয় আজই
গালি দিলেন একটা লোককে, হাড়হাভাতে, পাজি।

সন্দেহ তাঁর ছিল না, যে, লোকটা সিঁধেল চোর,
ছিঁচকে ভীষণ কিংবা গেঁজেল কিংবা গুলিখোর।
চুলগুলো তার খাড়া খাড়া, চেহারাটা হতচ্ছাড়া,
হতচ্ছাড়ার সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি,
দেখামাত্র মালুম হয় যে পাক্কা বদের ধাড়ি।
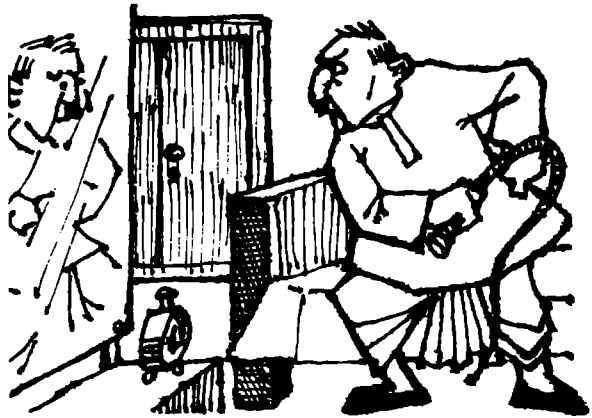
দেখেন তিনি তাকে প্রথম দিবানিদ্রার শেষে,
বসে আছে চোরের মতো পুবের দেয়াল ঘেঁষে।
মারছে উঁকি, রাখছে নজর, টিকটিকোচ্ছে ঘড়ি,
কোন দেরাজে সোনাদানা, কোথায় টাকাকড়ি।

এমন একটা চোরকে তিনি হাতের কাছে পেয়ে
উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন, ওঠেন ঘেমে-নেয়ে।
উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে হাতে নিলেন চাবুক।
এমন সময় ছুটে এসে বাড়ির কাজের লোক
বলল, 'এ কী, বাবুমশাই, করতে যাচ্ছেন কী যে,
আয়নাতে তো দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি এটা, নিজে।'

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

চাঁদ-পাহাড়ের মানুষখেগো

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

অরণ্যের নামে ভয় পায় শহরের মানুষ। হিংস্র শ্বাপদের ভিড় সেখানে। দেখলেই মানুষকে গপ করে গিলে ফেলে তারা, কিংবা মাড়িয়ে দেয় পায়ের তলায়। ওরে বাপ! নাঃ, অরণ্যকে দূর থেকে সেলাম দেওয়াই নিরাপদ।

আসলে কিন্তু অরণ্যকে এতখানি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। শ্বাপদ ওখানে আছে, কেউ তা অস্বীকার করে না। কিন্তু, বললে অনেকে বিশ্বাসই করবে না, অধিকাংশ শ্বাপদই নির্বিরোধী। মানুষকে তারা ঘাঁটাতে চায় না। একটা সহজাত আতঙ্ক ওদের আছে মানুষের সম্বন্ধে। দেখলেই অন্য দিকে সরে যেতে চায়, সম্ভব হলে।

ব্যতিক্রম হলো দুটি মহাজন্তু। হাতি আর ভালুক। সব হাতি নয়, একঘেঁড়ে গুন্ডা হাতি বা সবৎসা হস্তিনী। তবে ভালুকেরা অল্পবিস্তর সবাই রগচটা। একটা মানুষ যদি একা পড়ল ভারতীয় ভালুকের সামনে, সে-ভালুক প্রথম দর্শনেই চটে লাল হয়ে যাবে। অত্যন্ত সামান্য কারণে রেগে যায়। চোখে দেখে ঝাপসা, কানে শোনে কম, গন্ধ শুঁকে শত্রু-মিত্র বিচারের শক্তিও নেই। এ-অবস্থায় সকলের উপরেই ওর বদ্ধমূল সন্দেহ থাকাটা বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। মানুষ দেখলেই ও খাড়া হয়ে ওঠে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে, সমুখের দুই পা-কে প্রসারিত বাহুবৎ বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে আগন্তুককে আলিঙ্গন করতে।

এই দুই জন্তু হলো জাতবৈরী মানুষের। বাঘ এ-পর্যায়ে পড়ে না সাধারণত। বেশির ভাগ বাঘই মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। তার নজর থাকে তৃণভোজী জন্তুদের উপরে, নরমাংস তার স্বাভাবিক খাদ্য নয়। কিন্তু দৈবাৎ মানুষখেগো হয়ে যায় এক একটা বাঘ। তখন সে হয়ে ওঠে একটা দারুণ বিভীষিকা। একটা মাত্র নরখাদক বাঘের উৎপাতে এক একটা জনপদ উজাড় হয়ে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

মহীশূর অঞ্চলের বাবা-বুদান পাহাড়ে এমনি এক নরখাদকের প্রচন্ড অত্যাচার চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে, এই শতাব্দীরই মাঝামাঝি এক সময়ে। স্থানীয় জানোয়ার নয় বাঘটা। বহু দূরে ভদ্রানদীর দুই কূল জুড়ে যে-বিরাট অরণ্য আছে, ওর জন্মভূমি সেখানেই। বাঘটা যখন সবে সাবালক হয়ে উঠেছে, রেল কোম্পানীর হুকুমে নদীতে দেওয়া হলো একটা বাঁধ। নদীর জলে অরণ্য তলিয়ে গেল। কত জন্তুর যে সলিলসমাধি হলো লেখাজোখা নেই তার। পালিয়েও গেল অবশ্য বিস্তর, আর অল্প কিছু বৃহৎ জানোয়ার আটক পড়ে গেল একটা উঁচু ভূখন্ডে, যার চারদিকেই তখন থইথই করছে ভদ্রার জল।

বন্দী বাঘ খায় কী? সেই দ্বীপ-কারাগারে তার সহবন্দী ছিল কিছু হাতি, কিছু বুনো মোষ এবং তারই স্বজাতি আরও কিছু বাঘ। হাতি বা মোষ মারবার মতো তাগদ তার দেহে তখনও আসেনি, সে তাহলে খায় কী? নিরুপায় হয়ে সে মানুষ খেতে শিখল একদিন। রেল কোম্পানীর শ্রমিক তো অহরহই এদিক ওদিক ঘুরছে ফিরছে নিজেদের কাজে! তাদের ধরা এত সোজা! বাঘ দেখলেই তারা টেনে ছুট দেয়, লড়াই দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। তখন পিছনে তাড়া করে ঘাড়ে একটি থাবা

বসিয়ে দিলেই, ব্যস, খতম। অন্য কোনো জন্তুই এত সহজবধ্য নয়।

আবার অন্য কোনো জন্তুর মাংসও নয় এমন সুস্বাদু। যে-বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেয়েছে, মানুষ দুষ্প্রাপ্য না হলে সে আর কখনো চেষ্টা করবে না অন্য জন্তু ধরতে।

ভদ্রাতীরের এই বাঘ পাকাপাকি রকম মানুষখেগো হয়ে উঠল ক্রমে। তার অত্যাচারে কুলিরা পালাতে লাগল বাঁধের কাজ ফেলে রেখে। কাজই বন্ধ হওয়ার যোগাড়। তখন রেল কোম্পানীই চেষ্টা করে শিকারী আনিয়ে ফেললেন ওকে শেষ করবার জন্য, দুই চারবার কানের কাছ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাবার পরে বাঘ বিবেচনা করল—এ-অঞ্চলে বাস করা আর নিরাপদ নয়। সে গা তুলে দক্ষিণ মুখো হাঁটল। বাঁধের জল তখন নেমে গিয়েছে জঙ্গল থেকে, জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সে দক্ষিণমুখোই চলতে থাকল বেশ কিছুদিন। এইভাবে একদিন সে পৌঁছে গেল বাবা-বুদান পাহাড়ে। জায়গাটা তার খুবই পছন্দ হয়ে গেল। পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা। মানুষ আছে, তবে সংখ্যায় কম, বাঘের পক্ষে সেইটেই ভাল। বেশি থাকলে তারা দলবদ্ধ হয়ে বাঘকে তাড়াবার চেষ্টা করতে পারে। খুব কম থাকলে বাঘের ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে। মানুষ আছে, তবে কম, এইরকম জায়গাই পছন্দ মানুষ-খেগোদের।

বাবা-বুদানের মাথায় আর গায়ে কফি-বাগিচা সারি সারি। বাগিচার মজুর মজুরনী ছাড়া অন্য কেউ আনাগোনা করে না তাতে। বিরাট হাতার এক একটা অংশ ভয়াবহ রকম নির্জন। সেইরকম একটা নির্জন অংশে একদিন কাজ করতে গেল এক দল লাম্বানি মজুরনী। লাম্বানিরাই আদিবাসী এই পাহাড়ে-জঙ্গলে ভরা অঞ্চলের।

মজুরনীরা সারাদিন কফিগাছের কচি পাতা তুলে যে-যার ঝুড়ি ভর্তি করল। সন্ধ্যায় ফিরে গেল সবাই। বাগিচার অফিসে পাতা জমা দিয়ে যে-যার বাড়ি চলে গেল আঁধার ঘনিয়ে আসার আগেই। সবাই গেল, গেল না একমাত্র পুত্তাম্মা নামে এক সদ্যোবিবাহিতা যুবতী।

ভোর হতেই পুত্তাম্মার স্বামী রামাইয়া বেরিয়ে পড়ল, প্রথমেই গেল কফি-বাগিচায়। বাগিচায় কর্মচারীরা যা বলল, তাতে তো রামাইয়া হতভম্ব। পুত্তাম্মা কাল সন্ধ্যায় আফিসে আসেনি, কফিপাতা জমা দেয়নি, পয়সাকড়িও নেয়নি। রাত্রে আর খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব হয়নি মেয়েটার সম্বন্ধে। এইবার কর্মচারীরা খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, এমন সময়ে রামাইয়াও এসে গেল। এসেই গেল যখন, ভালই হলো। সবাই মিলেই করা যাক খোঁজ, দেখা যাক মেয়েটা গেল কোথায়।

খোঁজ খোঁজ! আগের দিন সুমিত্তাম্মা নামে একটি মেয়ে ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়েই পাতা তুলেছিল অনেকক্ষণ। কাজ করতে করতে গল্পগুজবও করেছিল ঢের। তারপর সুমিত্তাম্মা চলে গেল একদিকে, পুত্তাম্মা অন্যদিকে। সে প্রায় ছুটির সময়ের কাছাকাছি।

"ঐ! ঐদিক পানে গিয়েছিল গো, পুত্তাম্মা ঐদিক পানে গিয়েছিল"—বাগিচার একটা নিভৃত কোণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সুমিত্তাম্মা।

সেইদিকে গিয়ে দেখা গেল একটা কফিগাছের কিছু ডালপালা ভাঙা, অনেক কচিপাতা থ্যাঁৎলানো এবং শুকনো মাটিতে একটা এমন একটানা দাগ, যা দেখে বোঝা যায় যে কেউ হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে কোনো একটা ভারী জিনিসকে।

সর্বনাশ! সেই দাগের মাঝে মাঝে শুকনো রক্তের ধারাও একটা। এ কী ব্যাপার! এ কী ব্যাপার! রামাইয়া হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। অনেকদূর! অনেকদূর! প্রায় আধ মাইল চ'লে গেল খোঁজারুরা, সেই হ্যাঁচড়ানো-দাগ অনুসরণ করে। তারপরে, যা তারা খুঁজছিল, তার নিশানা পাওয়া গেল পাহাড়ের গায়ে একটা সরু চাতালের নিচে। একটা গর্ত-মতন জায়গায় অনেক রক্ত। তার মধ্যে পড়ে আছে পুত্তাম্মার মাথা, হাত আর পা। টুকরো টুকরো রক্তমাখা হাড়ও। নিকটেই নরম মাটিতে বড় বড় থাবার দাগ। যারা চেনে, তারা বলল, "এ দাগ তো বাঘের থাবার!"

সেই মাথা আর হাত-পা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পুত্তাম্মার সৎকার করল রামাইয়া। বাঘে খেয়েছে পুত্তাম্মাকে। বাঘে!

বাঘ এসেছে বাবা-বুদানে। মানুষখেগো বাঘ। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

আ—র হুঁশিয়ার! ঠিক তিন দিনের দিন অন্য এক বাগিচায়, মারা পড়ল রাতের চৌকিদার একজন। লণ্ঠন আর লাঠি হাতে করে সারা বাগিচায় টহল দিয়ে বেড়ায় একদল চৌকিদার প্রতি রাত্রে। এ-লোকটা সেদিন পাহারা দিচ্ছিল ম্যানেজারের বাংলো সংলগ্ন ফুলবাগানের পিছনে। এ-লোকটা চেঁচিয়েছিল বাঘের মুখে পড়ে। লোকজন ছুটেও গিয়েছিল লাঠিসোটা নিয়ে। কিন্তু অকুস্থানে পৌঁছে খানিকটা রক্ত, আর লাঠি লণ্ঠন ছাড়া তারা আর কিছুই দেখতে পায়নি।

চৌকিদারেরও মাথা আর হাত-পা পরদিন পাওয়া গেল আধমাইলটাক তফাতে। নির্জন গিরিসানুতে।

কী জানি কেন, মানুষ ধরবার পরে তার ঐ অঙ্গগুলো কোনো মানুষখেগো বাঘই খায় না কখনো।

তারপর থেকে ধারাবাহিক চলতেই থাকল বাঘরাজার মনুষ্য মৃগয়া। হেন হপ্তা যায় না, যাতে দু'টো অন্তত মানুষ না যায় ঐ যমের মুখে। সব বাগিচার সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল, কারণ কোনো মজুরই আর বাবা-বুদানে উঠতে সাহস পায় না। ও তো সাক্ষাৎ যমদ্বার হয়ে উঠেছে। যারা যাবে, তাদের মধ্যে কে যে ফিরবে, আর কে যে ফিরবে না, তা কেউই বলতে পারে না!

কাজ বন্ধ হলো। মালিকদের টনক নড়ে উঠল। কুলিরা বাঘের পেটে যাচ্ছে, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু

বাঘের পেটে যাওয়াতে যদি আপত্তি থাকে কুলিদের, তা হলে তো সে-বাঘকে আর সহ্য করা চলে না। সমদর্শিতার একটা সীমা আছে। বাঘ না তাড়ালে যদি কুলি না আসে, তাহলে তো ব্যবসার খাতিরে তাড়াতেই হয় বাঘকে।

মালিকদের আহ্বানে পেশাদার শিকারী এল জনাকতক। বাঘ দেখতে পাক বা না-পাক, তারা গুড়ুম-গাড়াম বন্দুকবাজি করল দিনে রাত্রে কিছুদিন ধরে, বাবা-বুদানের বাঘরাজা এবার বিবেচনা করল– দিনকতকের জন্য স্থান পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। জায়গাটা গরম করে তুলেছে ঐ শিকারীগুলো।

ব্যস, তারপর থেকে কফি-বাগিচাগুলোতে আর আনাগোনা নেই বাঘের। কাজকর্ম আবার আরম্ভ হলো। শিকারীরা বিজয়গর্বে চলে গেল অন্য অঞ্চলে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য।

বাঘ কিন্তু মরেনি।

সে যে ভয়ানক রকম বেঁচে আছে, তার প্রমাণ অচিরেই গেল পাওয়া। হোগরেহালি থেকে খবর এলো, এক বেচারা চাষীকে খেয়ে ফেলেছে বাঘটা। সন্ধ্যার আগে সব চাষী যখন গাঁয়ে ফিরে এলো মাঠ থেকে, সে তখনো তার হারানো গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে। গরুটা নিজে নিজেই ঘরে ফিরল খানিক বাদে, কিন্তু গরুর মালিক আর ফিরল না। তাকে পাওয়া গেল পরের দিন দুপুর নাগাদ মাধক বাঁধের সদর রাস্তা থেকে অল্প দূরে মাঠের ভিতর। ধড়টা নেই, মাথাটা গড়াচ্ছে, চারখানা হাত-পা রক্তমাখা হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এধারে ওধারে, সেই পুরোনো কাহিনী।

শিকারীদের বন্দুকবাজিতে তিতিবিরক্ত হয়ে মানুষখেগো দিনকতক হাওয়া বদল করেছিল বটে, কিন্তু নতুন জায়গাটা, কী-জানি-কেন, তা তত পছন্দ হয়নি। হয়ত সেখানে মানুষ সহজলভ্য ছিল না।

নতুন জায়গা যখন অপছন্দ হলো, বাঘরাজা তখন ভাবল– বাবা-বুদানে একবার চুপিচুপি যাওয়া যাক আবার, দেখে আসা যাক সেখানকার হালচাল। বাবা-বুদানে উঠবার মুখেই পাহাড়তলিতে এই গ্রাম হোগরেহালি। এ-অঞ্চলের গ্রাম সাধারণত যে-আয়তনের হয়, তার চেয়ে কিছু বড়োসড়োই। সরকার-জানিত প্যাটেলও একজন আছে এখানে। নাম তার মুদালিয়ার গিরি।

এখন হোগরেহালি থেকে বাবা-বুদানে ওঠার মুখেই সেই

মানুষখেগো আবার যেন ধরল কাকে

ভাগ্যহীন চাষীকে সে দেখতে পেলো মাঠের এক নিভৃত অংশে—ব্যস, আর তার বাবা-বুদানে ওঠার আবশ্যক কী তক্ষুণি?

অদূরে ঐ বাবা-বুদানের আকাশচুম্বী চূড়া। আধাআধি চড়াই উঠলেই পাওয়া যাচ্ছে বাঁয়ের দিকে একটা শাখা পাহাড়। বুদানের থেকে প্রায় সমকোণ রচনা করে ওটা বেরিয়ে গিয়েছে পশ্চিমপানে, প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত। আকারটা এর অর্ধচন্দ্রের মতো। তারই দরুন গোড়ায় এর নাম হয়েছিল আধচাঁদের পাহাড়। এখন সংক্ষেপীকরণের প্রয়োজনে 'আধ' শব্দটুকু বাদ পড়ে গিয়েছে জনসাধারণের জবান থেকে, নামটা দাঁড়িয়েছে সোজাসুজি চাঁদের পাহাড়।

চাঁদের পাহাড়ের আকার অর্ধচন্দ্রের মতো, তা তো বলেছি। ওর নিচে হোগরেহালি গ্রাম। ওর কোলে এক দুর্গম অরণ্য। দুর্গম, ঝোপঝাড়ের জন্য ততটা নয়, যতটা নদীনালার শুকনো খাত আর পাহাড় থেকে ধসে-পড়া বিরাট বিরাট শিলাস্তূপের জন্য। পায়ে পায়ে বাধা, পায়ে পায়ে বিপত্তির আশংকা। হোগরেহালির কানাচে হলেও এই অরণ্যে প্রাণান্তেও প্রবেশ করে না গ্রামবাসীরা। 'হোগরা' নাম এই নিষিদ্ধ এলেকার।

এই হোগরাতেই এবার স্থায়ী রাজপাট প্রতিষ্ঠা করল আমাদের বাঘরাজ। এখানে তার সন্ধানে আসবে, কে এমন দুঃসাহসী আছে হোগরেহালিতে? পক্ষান্তরে নিজে বাঘরাজ, যখন খুশি, রাত্রিবেলায়, তিন লাফে গিয়ে হানা দিতে পারবে গ্রামের ভিতর, যাকে সমুখে পাবে, মুখে করে নিয়ে আবার তিন লাফে ফিরে আসবে তার গুহায়। ভারী মজায় আছে বাঘ। ওদিকে বাঙ্গালোরে বসে প্রবীণ শিকারী এ্যান্ডারসন একখানা চিঠি পেলেন হঠাৎ। খামখানা হাতে-হাতে ঘুরে ঘুরে একদম নোংরা হয়ে গিয়েছে, তার উপরে ছাপ আছে বিরুর ডাকঘরের। চাঁদের পাহাড় এলেকার ডাকঘর বল, রেল স্টেশন বল, সব ঐ বিরুরে।

চিঠিটা কানাড়ী ভাষায় লেখা। কে তা পড়ে শোনাবে এ্যান্ডারসনকে? অনেক চেষ্টায় থানার এক কনস্টেবলকে পাওয়া গেল, কানাড়ীই না কি মাতৃভাষা তার। সে অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করল চিঠির। অতি জঘন্য হস্তাক্ষর তো!

চিঠি লিখছে হোগরেহালির প্যাটেল মুদালিয়ার। লোকটা পূর্বপরিচিত এ্যান্ডারসনের। শিকারের সূত্রেই অবশ্য। বহু বৎসর আগে হোগরে অরণ্যে একবার গিয়েছিলেন উনি, মুদালিয়ার তখন অনেক খাতির করেছিল ওঁর।

মুদালিয়ার লিখছে, মানুষখেগো এক বিকট বাঘ এসে হোগরেহালি অঞ্চলটাকেই উৎসন্ন করতে বসেছে। ডজনে ডজনে মানুষ চলে গিয়েছে তার পেটে। মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই রোচে না বাঘরাজের মুখে। এখন এ্যান্ডারসনই ভরসা। পত্রপাঠ বাঘটাকে না মেরে দিলে হোগরেহালি শ্মশান হয়ে যাবে।

এখন এ্যান্ডারসন হলেন শিকারী। বাঘের নামে তিনি উসখুস করে উঠলেন। তারপরে তাঁর উপযুক্ত পুত্র ডোনাল্ডেরও অসীম উৎসাহ শিকারে, হাতও তার খুব পাকা, গুলি কখনও ফস্কায় না। খানিকটা আলাপ-আলোচনার পর পরদিন প্রাতরাশের পরই গাড়িখানা বার করে পিতাপুত্র বেরিয়ে পড়লেন হোগরেহালির উদ্দেশে। একশো চল্লিশ মাইল রাস্তা। পৌঁছে গেলেন বেলা দু'টোয়।

দিনটা কাটল বাঘের বিবরণ নানা জনের কাছে শুনতে শুনতে। তার আড্ডা ঐ হোগরে অরণ্যে। ওখানে গিয়ে তাকে পাকড়াতে না পারলে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো আশাই নেই। গ্রামে সে হানা দেবে কবে বা কখন, তা আগে থাকতে জানা যাবে কেমন করে?

ঠিক কথা। দরকার যদি হয়, ঢুকতেই হবে হোগরের অরণ্যে। তবে সেটা কাল দিনের বেলার জন্য মুলতুবি থাকুক, আজ এই জ্যোছনা রাত্রিটা গাড়ি নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসা যাক বিরুর সড়কে। শখের বেড়ানো ছাড়া অন্য কিছু না।

গাড়ি নিয়ে পিতাপুত্র চলে গেলেন বিরুর। হোগরেহালি থেকে ও পর্যন্ত বেশ ভাল রাস্তাই আছে। বিরুরের কাছাকাছি একটা পুলের ধারে গাড়ি থেকে নেমে ওঁরা পায়দলে রওনা দিলেন মাধক হ্রদের দিকে। দক্ষিণ পশ্চিমে যেতে হবে কোণাকুণি। রাস্তা বলে কিছুই নেই। তবে একটা খাল চলে গিয়েছে বিরুর থেকে মাধক হ্রদ পর্যন্ত, সেই খালের কাঁধার উপর দিয়ে কায়ক্লেশে হাঁটাও যেতে পারে। মাইল বারো রাস্তা মোটে। ফুটফুটে জ্যোছনায় পথ চলতে বেশ ভালই লাগছিল এ্যান্ডারসনদের।

মাধক হ্রদটা প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, মানুষের সৃষ্টি। মাধক নামে একটা নদী বরাবরই আছে। তার ভিতরে উঁচু বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য জল ধরে রাখা কৃষিক্ষেত্রে সেচ দেওয়ার জন্য। খালের ধার থেকে চড়াই পথ উঠে গিয়েছে বাঁধের মাথা পর্যন্ত। এ্যান্ডারসনেরা চড়াই বেয়ে উঠে সেই বাঁধের মাথাতেই বসে পড়লেন বিশ্রামের জন্য। রাত তখন প্রায় দুপুর।

কী তীব্র আর্তনাদ!

নিশীথ রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল সেই আর্তনাদে। মানুষেরই কণ্ঠ। মরণেরই আর্তনাদ। মানুষখেগো আবার যেন ধরল কাকে।

কিন্তু এ্যান্ডারসন তো শুনেছিলেন—হ্রদের ধারে কাছে জন মনিষ্যি নেই, থাকে না কোনোদিন। তবে বাঘ কাকে ধরল

পরে জানা গিয়েছিল, লোকটা হোগরেহালিরই লোক ওর কুষ্ঠ হয়েছিল। সংক্রামণের ভয়ে গ্রামের লোক ওকে তাড়িয়ে দেয় গ্রাম থেকে। সে গিয়ে আশ্রয় নেয় মাধক বাঁধের উপরে। ওখানে একটা ঘর আছে সেবা-বিভাগের পরিদর্শকদের সাময়িক অবস্থানের জন্য। ঘরটা সচরাচর বন্ধই থাকে। এ্যান্ডারসনেরা বাঁধের মাথায় ওঠার সময় সেই বন্ধ ঘরের সামনে দিয়েই এসেছিলেন। তার পিছনের খোলা বারান্দায় যে

সে প্রলয় গর্জন করে লাফিয়ে উঠল

একটা কুষ্ঠরোগী ঘুমিয়ে আছে, তা তাঁরা জানবেন কেমন করে ?

একটা কথা মনে হলো এ্যান্ডারসনের। বাঘ অবশ্যই এখানে আসছিল এ্যান্ডারসনদেরই পিছু নিয়ে নিয়ে। দু'জন বন্দুকধারীকে হঠাৎ আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছিল না, প্রতীক্ষায় ছিল সুযোগের।

কিন্তু, অনুসরণ করে আসতে আসতে পথের মাঝে কুষ্ঠরোগীটাকে সে যখন দেখতে পেলো, সে নিবৃত্ত হল অনুসরণ থেকে। তার খেতে-পাওয়া নিয়ে কথা। অন্য একটা মানুষকে যখন থাবা বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে, তখন সশস্ত্র লোকেদের উপর হামলা করতে সে যাবে কেন ? তাতে তো নিজেরও বিপদের ঝুঁকি আছে একটা !

সে কুষ্ঠরোগীটাকে তুলে নিয়ে নেমে গেল বাঁধ থেকে, নানাপথ ঘুরে প্রবেশ করল হোগরে অরণ্যে। খাওয়ার জন্য নিরিবিলি জায়গা চাই তো !

ওদিকে এ্যান্ডারসনেরা তার পিছু নিয়েছেন।

রক্তের ছড়া দিতে দিতে গিয়েছে কুষ্ঠরোগীটা। জোরালো টর্চ দুজনেরই হাতে সেই ছড়া দেখে দেখে ঠিক চলেছেন বাঘের পিছনে। বাঁধ থেকে নেমে আবার সেই খাল। খালের উপরে উপরে চলে গিয়েছে বাঘ। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় রক্তের পাথার একেবারে। ঐখানে শিকারকে মাটিতে রেখে বাঘ হয়ত বিশ্রাম নিয়েছিল একটু। অথবা এক জায়গার কামড় ছেড়ে দিয়ে নতুন কোনো অংগে দাঁত বসিয়েছিল।

খালের বাঁয়ে একটা শুকনো নালা। বর্ষার দিনে অরণ্যের জল এই নালা দিয়ে এসে খালে পড়ে। এখন খরার দিনে এইটেই অরণ্যপুরীতে প্রবেশের সিংহদ্বার। বাঘ নেমে গিয়েছে এই শুকনো নালায়। রক্তের ছড়া রয়েছে এখানেও।

চল এইবার নালার ভিতর দিয়ে। শুকনো খাত এই নালার। তবে হেঁটে আরাম নেই। উপর থেকে গড়িয়ে-পড়া ছোট বড় অসংখ্য পাথরে খাত একেবারে আকীর্ণ, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত চাংগড়ও আছে এক একটা।

এমনি একটা চাংগড় পড়ে আছে একেবারে খাতের মাঝখানটা জুড়ে।

বাঘ ঐ চাংগড়েরই পিছনে নেই তো ? ঐখানেই তো সে শুরু করে দেয়নি তার ভোজ ?

আরও সাবধানে, সন্তর্পণে যেতে হবে এবার। দাঁড়াও ! দেখে নিই চারিধার। নালার খাত বারো ফুটের মতো চওড়া। দু'টো পাড় এত উঁচু যে খাতে দাঁড়িয়ে কোনো পাড়ের উপরেই কিছুই দেখা যায় না। বাঘ যদি ঐ দু'টো পাড়ের কোনো একটাতে উঠে বসে থাকে, তাহলে সেখান থেকে একটি লাফে একজনকে ঘায়েল করতে পারে এক্ষুণি। শিকারীরা তো উপরের অবস্থা কিছুই ঠাহর পাচ্ছে না ! প্রাণ হাতে করে যাওয়া যাকে বলে, এ তাই।

তবু চল। সাবধানে চল। তারপর ভাগ্যে যদি থাকে মরণ—

এ্যান্ডারসনের পায়ে কী যেন বাধল একটা। পায়ে লেগে কী একটা গড়িয়ে গেল। গোলপানা কী যেন। পাথর নয়। পাথর হলে শব্দ হত ঠক করে। এটা হয়েছে ধপ্। নরম কিছু।

টর্চ ফেলে জিনিসটা দেখলেন এ্যান্ডারসন। সংগে সংগে দুই পা পিছিয়ে এলেন। একটা মুন্ড। মানুষের মাথা। তাজা মাথা। গলা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও। শিকারের গলাটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে বাঘ। এমনটা কোনো বাঘ তো করে না কখনো। এ-বাঘ এমনটা করতে গেল কেন ?

আছে কি ? চাংগড়ের ওধারে বাঘ আছে কি এখনো ? অতি সন্তর্পণে, টর্চ এবং রাইফেল উদ্যত রেখে চাংগড়ের একটা কোণ থেকে ওপিঠে উঁকি দিল ডোনাল্ড। নাঃ, নেই বাঘ। ভোজ শেষ করে সে চলে গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু হাত-পাগুলো আর পড়ে আছে বুকের খানিকটা। তবু আছে যখন

কিছু কিঞ্চিৎ মাংস, তারই লোভে লোভে কাল আবার এখানে ফিরে আসতেও পারে বাঘ। কী এখন করবেন শিকারীরা? ফিরে যাবেন গাড়িতে? ফিরে যাবেন হোগরেহালিতে? তারপরে আবার আসবেন কাল সন্ধ্যায়? ওঁরা এসে পৌঁছোবার আগেই যদি বাঘ এসে, খেয়ে দেয়ে চলে যায়? তাহলে কি আর ওর পাত্তা পাওয়া যাবে?

আশা করা যায় না সেটা। তার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা করা ভাল। যতক্ষণ সে না আসে, ততক্ষণই অপেক্ষা করতে হবে। তাতে যদি পুরো একটা দিনও লেগে যায়, কী আর করা যাবে? লাগুক একটা দিন।

একটা দিন পুরোই লাগল। ভোর হলো বিপজ্জনক রাত্রি। সূর্য উঠল। বেলা বাড়তে লাগল। নালার খাতে বালিও গরম হতে লাগল। দুপুর নাগাদ মাথার উপরে আগুন-রোদ ওঁদের, সারা অঙ্গে আগুনের হলকা লাগছে চারিদিক থেকে। না আহার, না তেষ্টার জল। ঘাম ঝরছে দরদর করে। ঠায় বসে আছেন পিতাপুত্র চাঙগড়ের আড়ালে পিঠে পিঠ মিলিয়ে।

শকুন নামল ঝাঁকে ঝাঁকে, পিঁপড়ে এলো লাখে লাখে। বাঘের ভুক্তাবশেষ প্রত্যঙ্গগুলোকে হাড্ডিসার সাদা করে রেখে গেল তারা। তবু শিকারীদের আশা, বাঘ আসবে মাংসের লোভে। বাঘ তো জানে না যে চোরের ধন বাটপাড়ে নিয়েছে!

বাঘ এল, প্রায় সন্ধ্যার সময়। অভিজ্ঞ শিকারী, বাঘ এসে পৌঁছোবার অনেক আগে থেকেই টের পেয়ে গেলেন যে আসছে বনের রাজা, আসছে সে ভয়ঙ্কর। একটা শম্বর ডেকে উঠল আ-ই-উ-উ! একটা কোয়েল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কো-কো-কো-এল। সারা অরণ্যকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে ওরা। এসেছে যম। দেখ, কাকে নিয়ে যায়।

শিকারীরা সব শুনছেন, সব বুঝতে পারছেন। প্রস্তুত আছেন তাঁরা। কিন্তু সাবধান হওয়ার কোনো উপায় নেই। তাঁরা নালার খাতে। বাঘ যদি খাত ধরেই আসে, তবেই বাঁচোয়া। যদি সে নালার পাড় ধরে আসে, উপর থেকে সে দেখবেই শিকারীদের। দেখে যদি, হয় নিঃশব্দে ফিরে যাবে, নয় তো লাফিয়ে পড়ে একজনকে গ্রাস করবে। ভাগ্যের উপর নির্ভর।

ভাগ্য কিন্তু প্রসন্ন ছিল। পাড় দিয়েই এলো বটে বাঘ, কিন্তু ঝোপঝাড়ের আড়ালে ছিল বলে সে শিকারীদের হঠাৎ দেখতে পেলো না। শিকারীরা কিন্তু নিচে থেকে দেখলেন যে পাড়ের উপর একটা ঝোপ নড়ে চড়ে উঠছে এক একবার। তৎক্ষণাৎ গুলি ছুঁড়লেন দু'জনে, বাঘকে না দেখেই। সেই শব্দভেদী গুলিই লেগে গেল বাঘের গায়ে। সে প্রলয় গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল নালার ভিতরে। ছুটে আসার শক্তি ছিল না, তবু এগিয়ে আসতে লাগল আক্রমণ করবার জন্য।

আবার গুলি, দুটো রাইফেল থেকেই। চাঁদ পাহাড়ের মানুষখেগো এবার যে পড়ল, আর উঠল না।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

করিমের কেরামতি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

করিম আলি বাজায় তালি
চোখ-দু'টো লাল করমচা,
দাওয়ায় বসে খাওয়ায় কষে
হাঁসগুলোকেই গরম চা।

আড়াই শো হাঁস করে হাঁসফাঁস
'প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক' ডাক ছাড়ে,
তাদের সাথেই মিলিয়ে গলা
করিম জোরে হাঁক পাড়ে।

সবাই বলেন, করিম তুমি
করছো এসব কাণ্ড কি?
মাথায় তোমার গোবর নাকি
ছিটেফোঁটাও নেই কি ঘি?

একটু কেশে করিম হেসে
বললে, আমার বয়স ষাট!
দেখুন বসে হিসেব কষে
বাঁচবে কত কয়লা-কাঠ?

এখন রাতে এদের সাথে
খাচ্ছি বটে কী হিমসিম,
হাসবো ভোরে আরাম ক'রে
গুনবো যখন সেদ্ধ-ডিম!

ছবিঃ সাইফুল মজুমদার

মড়ার খুলি ও মামা

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—এই তোমার মজার জিনিস?

ও খুব হাসতে লাগল।

—মজার জিনিস নয়? এমন জিনিস ভূভারতে কোথাও আর পাবেন?

তা বটে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা মড়ার খুলি। মড়ার খুলি তো অনেক দেখেছি কিন্তু এত ছোটো খুলি কখনো চোখে পড়েনি। খুলিটা স্বচ্ছন্দে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

—কেমন? মজার জিনিস নয়? বলে বুলু আবার হাসতে লাগল।

—মজার কিনা জানি না, তবে অদ্ভুত।

এমনি সময়ে বুলুর মা চা জলখাবার নিয়ে ঢুকলেন।

—দেখুন দিকি মেয়ের কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! শাড়ি গেল, ইম্‌পোরটেড ছাতা গেল, ক্যামেরা গেল—শেষ পর্যন্ত এই মড়ার খুলিটা ফুটপাথ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে আনল। আর তারপরেই কী বিপদ শুনেছেন তো? কাঠমাণ্ডু থেকে দক্ষিণা কালী দেখতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে একেবারে খাদে পড়ে যাচ্ছিল!

বুলুকে জিজ্ঞেস করলাম—এটা তো তোমার এক নম্বর মজার জিনিস, দু নম্বরটি?

বুলু মুচকে একটু হাসল। বলল, সেটা আজ দেখানো যাবে না, যে কোনো মঙ্গল কি শুক্কুরবারে আসবেন।

বুলুর এই দু নম্বর মজার জিনিসটি যে আরো কত অদ্ভুত হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

মঙ্গল কি শুক্কুরবার মনে নেই। একদিন সন্ধ্যের সময়ে বুলুদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কলিংবেল টিপলাম। কিন্তু তখনই কেউ দরজা খুলে দিল না। এরকম বড়ো একটা হয় না। শেষে বার তিনেক বেল টেপার পর—ওদের বাড়ি যে বুড়িমানুষটি কাজ করে—সে দরজা খুলে দিল।

মানবেন্দ্র পাল

আর একটু হলেই বুলুটা বাস চাপা পড়ত। এমন অসাবধানে রাস্তা পার হয়—

কথাটা বলল আমার ভাইঝি রীণা। বুলু ওর ক্লাসফ্রেন্ড। রীণার কাকু, কাজেই বুলুরও আমি কাকু। সম্প্রতি নেপাল ঘুরে এল। এখানে এসে এতক্ষণ বাড়ির সকলের কাছে নেপালের গল্প করছিল। আমি ছিলাম না। তাই আমার জন্যে একটুকরো স্লিপ রেখে গেছে।

স্লিপটা আমার হাতে দিতে দিতে রীণা গজগজ করল—এত অসাবধান মেয়েটা—এখুনি যে কী সর্বনাশ হত!

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি স্লিপটা পড়তে লাগলাম।

শ্রীচরণেষু কাকু,

নেপালে গিয়ে দুটো মজার জিনিস পেয়েছি। শীগগির একদিন চলে আসুন।...

সেদিনই বিকেলে অফিস-ফেরত বুলুদের বাড়ি গেলাম। বাইরে-ঘরেই ওকে পাওয়া গেল। ও তখন নেপালের ওপর লেখা কয়েকটা বই থেকে কী সব নোট করছিল, আমায় দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

তারপর একটুও দেরি না করে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওর কাচের আলমারির মধ্যে রাখা দুটো মজার জিনিসের একটা দেখালো।

কিন্তু ভেতরে ঢুকেই হতাশ হয়ে গেলাম। বুঝলাম বুলু নেই, বুলুর মাও নেই।

বুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম—কেউ নেই?

ও মাথা দুলিয়ে জানালো আছে। বলে বাইরে-ঘরের পর্দা-ফেলা দরজাটা দেখিয়ে দিল।

যাক, বুলু তা হলে আছে। মনে করে পর্দা সরিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম।

না, বুলু নয়। কেউ একজন কোচে গা এলিয়ে সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর দু পা তুলে বসে আছেন। পরনে
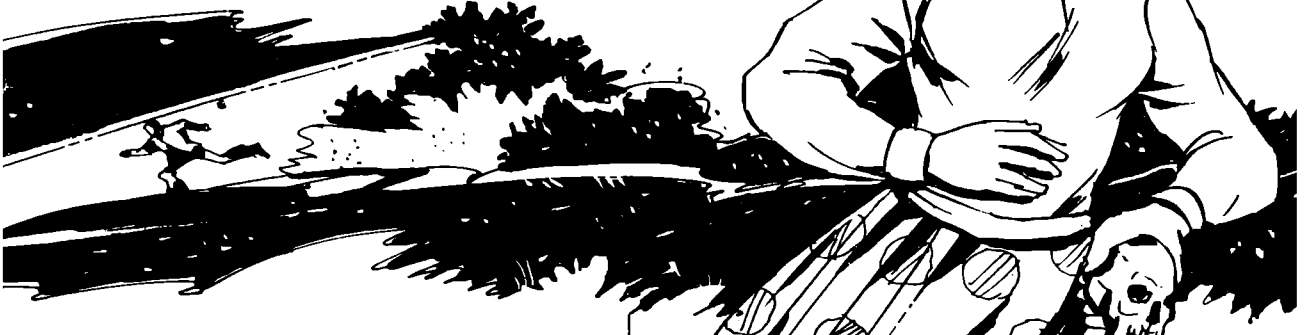
ধবধবে পা-জামা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি।

ইনি যে কে তা বোঝার উপায় নেই। কেননা তিনি একখানা খবরের কাগজ মুখের ওপর আড়াল করে রয়েছেন।

কি করব ভেবে না পেয়ে জুতোর শব্দ করে সামনের কোচটা একটু টেনে নিয়ে বসলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কাগজ সরিয়ে একবার দেখলেনও না। এমনকি শ্রীচরণ দুখানিও আমার মুখের সামনে থেকে নামালেন না।

খুবই বিশ্রী লাগছিল। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই। কিন্তু এই অতি অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব অভদ্র লোকটিকে ভালো করে না জেনেও যেতে ইচ্ছে করছিল না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এমনি কতক্ষণ গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

—আরে! ওটা কি?

ভদ্রলোকের কোচের একপাশে কোনোরকমে একটা ম্যাগাজিন চাপা দেওয়া সেই মড়ার খুলিটা না?

ভালো করে দেখতে গিয়ে সেন্টার টেবিলটা নড়ে গেল। একটা বই পড়ে গেল। আর ঠিক তখনই—আঃ! কী সৌভাগ্য আমার! ভদ্রলোক কাগজখানি মুখের সামনে থেকে সরালেন। অমনি তাঁর শ্রীচরণের মতো শ্রীমুখখানিও দেখতে পেলাম। ছুঁচলো মুখ। মাথাটা মুখের তুলনায় বড়ো। অনেকটা নারকেলের মতো। রুক্ষ্ম চুলগুলো সেই মাথার ওপর ফেঁপে ফুলে উঠেছে। কিন্তু সরু গোঁপ-জোড়ার ভারি বাহার!

এও সহ্য করা যায়—কিন্তু এই রাত্তিরে কেউ যে কালো সানগ্লাস পরে থাকতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

যাই হোক, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গলায় যে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল এটা এতক্ষণ নজরে আসেনি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সামনে যে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করে ম্যাগাজিনের তলা থেকে খুলিটা নিয়ে বুলুর সেই আলমারিতে রেখে এলেন। যেন তিনি খুলিটা ভালো করে দেখতে নিয়েছিলেন, দেখার পর রেখে দিলেন আর কি।

বুলু কি আলমারিতে চাবি লাগিয়ে যায়নি? নাকি ওটা খোলাই থাকে?

জানি না।

ভদ্রলোক আবার নিজের জায়গায় গিয়ে মুখের ওপর কাগজ আড়াল করে বসলেন।

আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—বুলু কখন আসবে বলতে পারেন?

উত্তরে একটা গম্ভীর স্বর গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করে উঠল—মিনিট তেরোর মধ্যে।

ও বাবা! ইনি যে আবার মিনিট সেকেন্ড ধরে কথা বলেন! দশ মিনিটও নয়, পনেরো মিনিটও নয়—একেবারে তেরো মিনিট!

জিজ্ঞেস করলাম—ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

—না।

দেখা হয়নি, বুলু কোথায় গেছে তাও বোধহয় জানেন না। অথচ তিনি বলতে পারেন—তেরো মিনিট পরে আসবে!

কত রকমের স্ক্রু-ঢিলে মানুষই না আছে!

একটু পরে উনিই আবার কথা বললেন—হ্যাঁ, আর আট মিনিটের মধ্যেই ওর এসে পড়া উচিত যদি না কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়।

—অ্যাকসিডেন্ট!

—হ্যাঁ। মানে দুর্ঘটনা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন কেন?

উনি তেমনি করেই উত্তর দিলেন, অ্যাকসিডেন্টকে ও ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে।

কিন্তু বুঝতে না পারলেও রীণার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে নাকি বাস চাপা পড়ছিল।

এমনি সময়ে কলিংবেল বাজল। তারপর আধ মিনিটের মধ্যে বুলু হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।—ও মা, কাকু! কতক্ষণ এসেছেন?

আমি উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎই উঠে পড়লেন।

বুলু বললে, এ কি মামা, এখুনি উঠছেন?

—হ্যাঁ। তুমি একটু শুনে যেও।

বলে সামান্যতম ভদ্রতাটুকুও না দেখিয়ে প্রায় আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন।

বুলু ওকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল। মুখটা থমথম করছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, উনি হঠাৎ অমন করে চলে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার সঙ্গে বোধ হয় ভালো করে কথাও বলেননি?

আমি একটু হাসলাম।

—যাবার সময়ে আমাকে বললেন কি জানেন? বললেন, হয় ঐ খুলিটা এ ঘর থেকে সরাও, নয় যার তার এ ঘরে ঢোকা বন্ধ করো। কথার মানে বুঝেছেন তো কাকু?

আমি আবার শুধু হাসলাম।

এই হচ্ছে নাকি বুলুর দু নম্বর মজার জিনিস—বুলুর নতুন পাতানো মামা!

মামাটির সঙ্গে বুলুর আলাপ হয় নেপালের কাঠমাণ্ডুর একটা হোটেলে। তিনি বাঙালী। কলকাতাতেও যেমন তাঁর একটা আস্তানা আছে তেমনি আছে কাঠমাণ্ডুতেও। কিন্তু কাঠমাণ্ডুতে কোথায় যে পাকাপাকিভাবে থাকেন, কি করেন তা কেউ জানে না। মাঝে মাঝে এই হোটেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। এখানে তাঁর পরিচয় একজন জ্যোতিষী বলে। মুখ দেখেই তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে পারেন।

এই সূত্রেই বুলুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। হোটেলের সবাই ভিড় করে আসে তাঁর ঘরে। শুধু বুলুই যায় না। সে এসব মোটে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বুলু না গেলে কি হবে—ভদ্রলোক নিজেই একদিন ডাকলেন—ও মামণি! শোনো শোনো।

অগত্যা বুলুকে ঢুকতে হয়েছিল ওঁর ঘরে।

—সবাই আসে, শুধু তুমিই আস না।

বুলু হেসে বলেছিল—আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

ভদ্রলোক একটু হেসেছিলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

এরপর একদিন ভদ্রলোক বুলুকে একেবারে তাজ্জব করে দিলেন যখন বললেন, তোমার বাবার জন্যে কিছু ভেব না। তিনি ভালো আছেন। এই মাসের শেষেই তিনি ফিরে আসছেন।

বুলুর বাবা লিবিয়াতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। অবাক কাণ্ড—নেপালে আসার ঠিক আগের দিনই বুলুরা চিঠি পেয়েছিল—তিনি ফিরছেন।

এত বড়ো ভবিষ্যৎ বাণীর পর আর কি ঠিক থাকা যায়? বরফ গলল। বুলু দারুণ বিশ্বাসী হয়ে গেল। ভদ্রলোককে 'মামা' বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু অবাক হবার ব্যাপার তখনো বাকি ছিল।

নেপাল থেকে ফেরার আগের দিন।

সন্ধ্যের পর বুলুরা দক্ষিণাকালী দেখে হোটেলে ফিরল। দক্ষিণাকালী মন্দির কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক পাহাড়, খাদ পেরিয়ে তবে যেতে হয়। মন্দিরটা একটা পাহাড়ের নিচে। নামতে হয় অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে। ঐরকম পরিবেশেই বুঝি কালীকে মানায়। প্রকৃতির কোলে নিস্তব্ধ, নিঝুম পরিবেশটি।

যাই হোক, বুলু ফিরেই তার এই নতুন মামাটির সঙ্গে দেখা করল। হাসতে হাসতে ব্যাগ খুলে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো মামা, জিনিসটা কেমন হলো?

জিনিস দেখে তো মামা হতভম্ব!

—এটা তুমি কোথায় পেলে?

বুলু বলল, একজন পাহাড়ীর কাছ থেকে কিনলাম দক্ষিণাকালীর মন্দিরের কাছে।

মামা অনেকক্ষণ ধরে সেই ছোট্ট খুলিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, এ যে বড়ো ভয়ংকর জিনিস! এ নিয়ে তুমি কি করবে মা?

বুলু তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে খুলিটা নিয়ে বলল, আলমারিতে সাজিয়ে রাখব।

মামা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ বুলুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কাজটা কি ভালো হবে? ও যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমি শীগগিরই ওখানে যাব। ইচ্ছে করলে আমায় দিতে পার। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেব। দামটা না হয় এখুনি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বুলু রাজী হয়নি।

তখন উনি বললেন, আমার কথা তোমার মাকে বোলো। তিনি কী বলেন আমায় জানিও।

বুলু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল—কেন? এটা যদি রাখি তা হলে কি হবে?

—বিপদ অনিবার্য। কেন? আজ ওটা কেনার পর তোমার কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি?

এবার বুলুর মুখ শুকিয়ে গেল। মনে পড়ল দক্ষিণাকালী দেখতে যাবার সময়ে তিনতলা সমান উঁচু সিঁড়ি থেকে পা স্লিপ করে খাদে পড়ে যাচ্ছিল! খুব বেঁচে গেছে।

এই বিচিত্র মাথাটির সম্বন্ধে বুলু আগে কিছু খবর পেয়েছিল কাঠমান্ডু থেকে চলে আসার দিন হোটেলের নেপালী চাকরটির কাছ থেকে। তাকে খাবার সময়ে বখশিস দিতে কথায় কথায় ও হিন্দিতে জানায় যে ঐ লোকটি 'ভয়ংকর দেব্‌তা আছেন'। তিনি নাকি নেপালের জাগ্রত দেবতা কালভৈরবের সাধক। কালভৈরব হচ্ছেন মৃত্যুর দেবতা। বিকট চেহারা। কুচকুচে কালো রঙ। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা—বীভৎস মুখের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর হিংস্র জন্তুর মতো ধারালো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

নেপালীটা জানালো, ঐ দেব্‌তাকে খুশি করে ইনি প্রচন্ড ক্ষমতা পেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোকের ক্ষতি করে দিতে পারেন। ভয়ে হোটেলের ম্যানেজার ওঁর কাছ থেকে একটি টাকাও নেন না। উপরন্তু খাতির করেন।

এই হলো বুলুর মামার পরিচয়। বুলুরা তো কলকাতা চলে এল। তারপর হঠাৎই একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই মামা বুলুদের বাড়ি এসে হাজির।

জিজ্ঞেস করলাম—ঠিকানা দিয়েছিলে?

বুলু একটু ভেবে বলল, ঠিক মনে নেই। নিশ্চয় দিয়েছিলাম। নইলে উনি এলেন কি করে?

তারপর থেকে প্রায় সপ্তাহে দুদিন করে আসেন। গল্প করেন, চলে যান।

—কোথায় যান?

—ঠাকুরপুকুরের কাছে কবরডাঙা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ওঁদের পুরনো বাড়ি। কলকাতায় এলে একাই থাকেন। সবই কেমন রহস্যময়। বলি বটে, এই মামাটি মজার জিনিস। কিন্তু সত্যি বলছি কাকু, মাঝে মাঝে কেমন ভয়ও করে। লোকটার কাছ থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।

—খুলিটার কথা উনি জিজ্ঞেস করেন?

বুলু মাথা নাড়ল।—না। এখানে এসে পর্যন্ত খুলির কথা বলেননি।

এই পর্যন্ত বলে বুলু ভুল শুধরে বলল—হ্যাঁ, একদিনই বলেছিলেন। সেই যে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাঁ, পাছে আমি চুরি করে নিই!

বুলু লজ্জায় জিব কাটল।—ইস্‌!

কেউ একজন কোচে গা এলিয়ে বসে আছেন।

তবু সেদিন যে খুলিটা তিনি আলমারি থেকে বের করে আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিন চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সে কথাটা বুলুকে আর বললাম না।

এই মামা লোকটিকে প্রথম দিন থেকেই আমার ভালো লাগেনি। শুধু অভদ্র বলেই নয়, লোকটি মতলববাজ। নেপালে না গেলেও জানি–এইরকম এক ধরনের তান্ত্রিক আছে যারা নিজের সিদ্ধির জন্যে সবরকম অপকর্ম করতে পারে। এ বাড়িতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য অন্তত আমার কাছে পরিষ্কার! সেই সঙ্গে বুলুও যে কী মারাত্মক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে তাও আমার জানা। শুধু বুলুই নয়, আমিও লোকটির বিষনজরে পড়েছি। তাই বুলুর মনে আমাকে চোর বলে সন্দেহ ধরিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছে। এরপর হয় তো আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

অপরাধ? অপরাধ–খুলি চুরি করার ওঁর চেষ্টা আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

সে যাই হোক, বুলুকে এখন ঐ ভদ্রবেশী তান্ত্রিকের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু–কি করে? আমি যা ভাবছি তা যদি বুলুকে বলি তাহলে সে বিশ্বাস নাও করতে পারে। উল্টে আমার ওপর ধারণা খারাপ হবে।

আর যদি বিশ্বাস করেও, একজন ভদ্রলোককে কি সরাসরি বাড়ি আসতে বারণ করতে পারে?

বারণ করলেই কি উনি শুনবেন? ঐ খুলিটা যে ওঁর চাইই।

দিন পনেরো পর।

অফিস থেকে সবে ফিরেছি। হঠাৎ বুলু এসে হাজির। তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে চমকে উঠলাম।–কী হয়েছে?

–আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। আমরা কেউ ছিলাম না। আর সেই সময়ে–

–কেন? সেই বুড়ি কাজের লোকটি?

–বলছি দাঁড়ান, আগে একটু বসি। ইতিমধ্যে রীণা, রীণার মাও এসে পড়েছেন।

–রীণা, একটু জল দে তো!

রীণা তাড়াতাড়ি জল এনে দিল। জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বুলু বলল, অন্য দিনের মতোই বুড়িটা দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। আজ আবার দুপুরে এদিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই আরামেই ঘুমোচ্ছিল। কখন থেকে যে কলিংবেলটা বেজে যাচ্ছিল তা সে শুনতে পায়নি। যখন শুনল ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তখন বুড়ি আবার গিয়ে শুল। একটু পরে আবার বেল বাজল, বুড়ি আবার উঠে দরজা খুলল। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না। এমনি করে তিন তিন বার। বুড়ি বুঝল এ নিশ্চয় কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। তাই চার বারের বার বুড়ি রেগে রাস্তায় নেমে দুষ্টু ছেলে ধরবার জন্যে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কারো টিকিটুকুও দেখতে পেল না। তখন ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

এই পর্যন্ত বলে বুলু থামল।

বললাম, কিন্তু চোর এসেছিল কি করে বুঝলে? দুষ্টু ছেলের কাজও তো হতে পারে।

–তা হতে পারে। তবু–

বুলু কি ভাবতে লাগল।

তারপর যেন আপন মনেই বলল, আমার কেমন ভালো ঠেকছে না। চোর এসেছিল বলেই আমার সন্দেহ। তা ছাড়া–

বললাম–থামলে কেন?

–না, তেমন কিছু নয়, তবু বলছি, বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে দেখি চৌকাঠে জুতোর কাদা।

আমি চমকে উঠলাম। সে ভাব গোপন করে বললাম, কাদা আগে ছিল না?

বুলু মনে করবার চেষ্টা করে বলল–তা হলে নিশ্চয় আমার চোখে পড়ত। তা ছাড়া কাদা আসবে কোত্থেকে? বৃষ্টি তো হলো দুপুরে।

–রাইট! বলে বুলুর পিঠ চাপড়ালাম।

–যাই হোক, কিছু চুরি যায়নি তো?

–না! এইটুকুই রেহাই।

–ঠিক জান কিছু চুরি যায়নি?

বুলু হেসে বলল, ঘরে ঢুকে এক নজর দেখে কিছু চুরি গেছে বলে তো মনে হলো না।

–চলো, এখনি তোমার বাড়ি যাব।

বলে তখনই গায়ে হাওয়াই শার্টটা চড়িয়ে বুলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওদের বাড়ি ঢুকেই চলে এলাম ওদের বাইরে-ঘরে। বুলুকে বললাম, তোমার আলমারিটা খোলো।

বুলু চাবি বের করে লাগাতে গেল কিন্তু তার দরকার ছিল না। আলমারিটা খোলাই ছিল। ভেতরে সেই খুলিটা নেই।

সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

বুলু ব্যাকুল হয়ে পিছু ডাকল–কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, কবরডাঙ্গায় তোমার ঐ ভন্ড মামার আস্তানায়।

ও প্রায় কেঁদে উঠল–না-না, এই সন্ধ্যেবেলা যাবেন না।

কিন্তু আমার তখন জেদ–ওটা উদ্ধার করে লোকটাকে পুলিশে দিতেই হবে।

ঠাকুরপুকুরের এদিকটায় কখনো আসিনি। দুধারে মাঠ, কোথাও বা রীতিমতো জঙ্গল। কবরডাঙ্গা। জায়গাটা রীতিমতো গ্রাম। তবু রাস্তাটা পিচঢালা। বাস চলে। মাঝে মাঝে লরিও যায়। এখানে পুরনো বাড়ি কি আছে জিজ্ঞেস করতেই একটা লোক মাঠের ওপর বিরাট দোতলা ভাঙা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ভূতের বাড়ি তো?

হ্যাঁ, বলে মাঠে নেমে পড়লাম। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রেতপুরী। ইট খসে পড়ছে। আলসের মধ্যে দিয়ে উঠেছে অশ্বত্থের চারা। ঢুকে পড়লাম সেই বাড়িতে।

অন্ধকার। চারিদিক থমথম করছে। তারই মধ্যে—হঠাৎ মনে হলো যেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ! থমকে গেলাম।

না, একটা কুকুর। কুকুরটা আমায় দেখে পালালো।

সামনেই সিঁড়ি। টর্চও সঙ্গে করে আনিনি। দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে দোতলায় উঠে এলাম। একটা ঘর। বোধ হয় এই একটি মাত্র ঘরেই দরজা জানলা আছে। ঢুকে পড়লাম। দড়িতে ঝুলছে একটা লুঙ্গি, একটা ফর্সা পাজামা, একটা পাঞ্জাবি। সামনে কালো কাপড় ঢাকা—ওটা কি?

ভালো করে দেখলাম। ওটা একটা তে-পায়া। চমকে উঠলাম। এইরকম তে-পায়াতেই তো প্রেতাত্মা নামানো হয়। মামা কি তা হলে—

কিন্তু—আসল জিনিসটি কোথায়? মামাই বা কোথায়?

আবার দেশলাই জ্বাললাম। লক্ষ্য পড়ল কুলুঙ্গিতে। একটি তামার পাত্রে সেই ছোট্ট মড়ার খুলিটি!

আমি মরিয়া হয়ে খুলিটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলাম। তার পর এক ছুটে নিচে। সামনেই সেই মাঠ। মাঠের পরেই পিচঢালা রাস্তা। পাছে দৌড়লে কারো নজরে পড়ি তাই জোরে হাঁটতে লাগলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁটছি। চারিদিকে অন্ধকার—শুধু অন্ধকার!

হঠাৎ আমার মনে হলো, এই নির্জন মাঠে আমি আর একা নই। কেউ যেন পিছনে রয়েছে।

....হ্যাঁ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি পিছনের মানুষটি এসে পড়েছে। ....আমি দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। পিছনের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সে অমনি আমাকে জাপটে ধরল। উঃ, কী কঠিন সে হাত দুটো। সে স্বচ্ছন্দে আমার পকেট থেকে খুলিটা বের করে নিল। তারপর আমার গলা টিপে ধরল। ...মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলাম। এক মুহূর্তের জন্যে ওর হাতটা ঢিলে হয়ে গেল। অমনি কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটলাম রাস্তার দিকে। সেও ছুটে আসছে আমার পিছনে।

রাস্তায় লরির হেডলাইট....তবু আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম রাস্তায়। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল।

লরিটা দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম—নাঃ, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু—রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওটা কি?

কিন্তু সেদিকে মন দেবার মতো অবস্থা তখন ছিল না। হাঁটতে লাগলাম ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে।

পরের দিন সকালে বুলুদের বাড়ি চা খেতে খেতে সমস্ত ঘটনা বললাম। কাগজেও ঐ অঞ্চলে লরিচাপা পড়ে একটি মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে।

বুলু বলল, আপনি খুব বেঁচে গেছেন কাকু! ভাগ্যি খুলিটা তখন আপনার কাছে ছিল না।

কেউ যেন পিছনে আসছে

আমি হেসে বললাম, আর লরির চাকার নিচে খুলিটারও সদ্ব্যবহার হয়ে গেল।

বুলু একটু হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে—লোকটার যে বর্ণনা কাগজে রয়েছে তার সঙ্গে মামার চেহারা মেলে না।

আমি বললাম, তা জানি। ওটি মামার সাকরেদ। মামা কিন্তু রইলেন বহাল তবিয়তে। হয়তো আবার আসবেন।

বুলু শিউরে উঠল।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

পুরনো কেল্লার রহস্য

শিশিরকুমার মজুমদার

ছায়া ছায়া গাছতলায় গাড়ি থামালেন ডাক্তার বুদ্ধদেব রায়। বিমল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বুধুদা, গাড়ি এখানে রাখলে যে?'

দরজা খুলে ডাক্তারবাবু নীচে নামলেন। পিছনের সিটে মাথায় বালিশ দিয়ে এলিয়ে শুয়ে ছিল মালা। ক্লান্ত অবসন্ন সে। মুখে চোখে হতাশার ছায়া। তাকে নিয়েই চলেছেন ডাক্তারবাবু সৃজনখালি। সমুদ্রের খোলামেলা বাতাসে যদি সুস্থ হয়ে ওঠে মেয়েটা। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে মালু, কেমন আছিস বল। কষ্ট হচ্ছে না তো তোর? তাড়াহুড়োর কিছু নেই রে। সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছালেই হবে। কষ্ট হলেই বলবি, থামব। বুঝলি?'

যাকে এত কথা বলা, সেই মালার মনে খুব একটা সাড়া জাগল বলে মনে হলো না ডাক্তারবাবুর। ও শুধু আস্তে মাথা নাড়ল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারবাবু মালার পাশে বসা, তার মাকে বললেন, 'কাকীমা, জায়গাটায় বেশ ছায়া আছে। ঠাণ্ডা বাতাসও দিচ্ছে। আমি বিলুকে শতরঞ্জি পাততে বলছি। আপনি খাবার দিয়ে দিন, আমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুটা বিশ্রাম করে নিই।'

বিমল নিচে নামল। গাড়ির পিছন থেকে শতরঞ্জি বার করে ছায়ায় পাতল। তারপর টিফিন ক্যারিয়ার প্লেট চামচ সব এনে এক পাশে নামিয়ে রেখে, পিছনের দরজা খুলে বলল, 'মা, তাড়াতাড়ি কর। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। বুধুদা, তোমার খিদে পায়নি? এই মালা, অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন? নাম, নাম, তোর খিদে পায়নি?'

মালার মা নামলেন কোনো কথা না বলেই। বিমল অন্য পাশের দরজা খুলে তার বোনকে ধরে নামাল। হেসে বলল, 'বুড়োধাড়ী মেয়ে এখনও আমাকে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করছেন। দেব ছেড়ে, পড়বি ধুপ করে তবে ঠিক হবে। ছাড়ব?'

মুখে কোনও কথা না বলে মালা ওকে ভীষণ ভয়ে জাপটে ধরল। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল বিমলের। কিছু হয়নি মেয়েটার, তবুও ও এমন করে! ভাগ্যিস বুধুদা এসেছিল। তা না হলে যে কি হত ওদের।

মা ওদিক থেকে বললেন, 'বুধু, এসো খাবার দিয়েছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার নয় কাকীমা, আগে মালাকে দিন। ওর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।'

'সবাইকে দিচ্ছি বাবা, তুমি এসো।' বললেন মালার মা।

সবাই এসে বসল শতরঞ্জিতে। হাতে হাতে প্লেট এগিয়ে দিলেন মালার মা। নিজের প্লেট হাতে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কাকীমা, ভিতরের সিটের পিছনে আপনার জন্য

মিষ্টি আছে। হাত মুখ ধুয়ে আপনিও খেয়ে নিন। পথে কোথাও গাড়ি থামিয়ে চা খেয়ে নেবো। মনে হয় তিনটে চারটে নাগাদ সুজনখালি পৌঁছে যাব।'

উদাস ভাবে মালার মা বললেন, 'বাবা, তুমি আমাদের জন্য অনেক করলে। তুমি না থাকলে যে কি হত।' আবেগে গলা বন্ধ হয়ে গেল ওঁর। বাকী কথা বলতে পারলেন না।

মাথা নীচু করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওসব কথা থাক কাকীমা। মালা ভাল হয়ে উঠুক, তাহলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে কি জানেন, মালার কোনও অসুখ নেই। ও কেন যে বুঝছে না সে কথা! পৃথিবীর সবাই খারাপ নয়। দুচারজন বদলোক থাকতে পারে। তা বলে সবার উপরে ও রাগ করে বসে থাকবে কেন? ওর রোগ তো এখন মনের। ও আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। আমাকেও না, আপনাকেও না...কিরে মালা, ঠিক বলিনি?' ওর দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু।

মালা খাওয়ার প্লেটে আঙুল নাড়ছিল যত, খাচ্ছিল তার থেকেও কম। ওর নাম শুনে ও তাকাল মুখ তুলে। কেমন যেন অসহায় চাহুনি ওর মুখে চোখে। হ্যাঁ, এই পৃথিবীর কাউকেই ও বিশ্বাস করে না আর। সারাক্ষণ ওর ভয়, ওকে হয়ত আবার ধরে নিয়ে যাবে পুলিশে এসে। আবার ওকে আটকে দেবে সেই বাড়িটাতে, যেখানে অনেকগুলো মেয়ের কেউ নেই! বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এমনও হয় নাকি! ওর হয়েছিল তাই। স্কুল থেকে ফিরছিল বই খাতা নিয়ে। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। সব দিকে রাস্তায় জল জমেছে। তেমন হলে রাজেন সরকারের গলি দিয়ে ঘুরে বড় রাস্তায় পড়তে হয় ওকে। একটু হাঁটতেই আবার বৃষ্টি নামল। ছুটে একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়াল ও। সেখানে কতকগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে বিশ্রী কথা বলছিল। ও তাই আবার হাঁটা দিল গলির দিকে। একটু এগোতেই পিছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল সেই ছেলেগুলোই আসছে। বেশ ভয় পেয়ে ও জোরে হাঁটা দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেগুলো ওকে ঘিরে ধরেছিল। সামনের ছেলেটা হেসে বলেছিল, 'গলার হারটা দিয়ে দাও বোন। কোনো ভয় নেই।'

তখনি মালার মনে হয়েছিল, ভুল করে ও হারটা পরেই স্কুলে চলে এসেছে। ও পালাতে চেষ্টা করেছিল। সামনের ছেলেটাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল। আর একজনের হাত কামড়ে দিয়েছিল। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে মাথার পিছনে ভীষণ একটা বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিল। রাজেন সরকারের গলি ওদের বাড়ি থেকে অনেক দূর। কেউ ওকে চিনত না সেখানে। ও চোখ খুলে দেখেছিল ও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। কিছুতেই ও মনে করতে পারছিল না ও কে, কোথায় ওর বাড়ি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল যখন, তখনই ওকে নিয়ে গেছিল সেই বাড়িটাতে যেখানে কারও মা-বাবা ভাই-বোন ছিল না। ভীষণ ভয় পেয়েছিল মালা। কিন্তু ও কে তা তো ও কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

হঠাৎ একদিন আফিস ঘরে ওর ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকতেই একজন মহিলা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। চেয়ারে বসে থাকা গোমড়া মুখ, দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিগো, তুমি এঁকে

চিনতে পারছ ?' অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মন খুশিতে ভরে গেছিল ওর। ও বলেছিল, 'মা।' তারপর দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়েছিল। মার সঙ্গেই এসেছিল দাদা। দুজনে ওকে ট্যাক্সি চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছিল। ডাক্তার দেখিয়েছিল। অনেক ওষুধ খাইয়েছিল। শেষে একদিন আবার ও দাদার সঙ্গে স্কুলে গেছিল। স্কুলের সবাই ওকে ঘিরে ধরেছিল। সবাই খুশি। দিদিমণিও বলেছিলেন, 'মালা, তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসাতে আমরা সবাই খুশি।'

কিন্তু মালার মনের ভয় আর যাবার নয়। আকাশে মেঘ ডাকলে ভয় পায় ও। রাস্তায় জল জমলেও ভীষণ ভয়ে বুক কাঁপে ওর। আচমকা কাউকে কোথাও দেখলে আঁৎকে ওঠে ও। আর সারাক্ষণ ওর মনের মধ্যে সেই বাড়িটার ভয়। যেখানে ওর মতো কত মেয়ে থাকে, যাদের কেউ নেই। ওর ছবি কাগজে ছাপা হওয়াতে নাকি ওকে খুঁজে পেয়েছিল ওর দাদা। কিন্তু ওই মেয়েগুলোর কি দাদা মা কেউ নেই! আবার যদি ও সব ভুলে যায়, আবার যদি ওকে ওখানে ওরা ধরে নিয়ে যায়। এই সব চিন্তায় কেমন যেন হয়ে গেল মালা। তখনি একদিন আফিস থেকে ফিরে এসে দাদা বলল, 'মা, খোঁজ নিয়ে ডাক্তার বুদ্ধদেব রায়ের নতুন চেম্বারে গেছিলাম আজ। তিনি চিনলেন আমাকে। কাল রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ আসবেন আমাদের বাড়িতে মালাকে দেখতে। কি কি ওষুধ-পত্র লিখে দেন কে জানে, আমি তাই আফিস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে তিনশ টাকা এনেছি, রেখে দাও।'

পরদিন ঠিক সময়ে একটা বিশাল গাড়ি এসে থেমেছিল ওদের বাড়িতে। সেই গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন ওদের বুধুদা, দারুণ নাম-করা ডাক্তার আর বিরাট বড়লোক। মালা-বিমলের বাবার কি যেন কি সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে উনি। সম্পর্কটা এতই দূরের যে যাওয়া আসা ছিল না। দরজার কাছ থেকেই উনি ডাক দিয়েছিলেন, 'কাকীমা।'

বিমল-মালার বাবা যখন মারা যান, তখন ক'দিন উনি অবশ্য আসা যাওয়া দেখাশুনা করেছিলেন। বিমলই বিপদে পড়ে খোঁজখবর নিয়ে গেছিল ওঁর কাছে। যা করার তখন কিন্তু সবই করেছিলেন উনি। বাবার ক্যানসার হয়েছিল, তাই তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। তারপর ক'দিন এসেও ছিলেন উনি। কিন্তু এমন ব্যস্ত মানুষ, অত প্র্যাকটিস, ক্রমে আবার তেমনি দূরের মানুষ হয়ে গেছিলেন। মালার কান্ড দেখে ভয় পেয়ে বিমল আবার ওঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

কলকাতার বড় বড় অনেক ডাক্তারই দেখেছিল মালাকে। সবার এক কথা, অসুখ কিছু নেই। ও শুধু ওর মনের ভয়, জায়গা বদল করলে ভাল হবে ওর।

হঠাৎ বাবা মারা যাওয়াতে, পড়াশুনা ছেড়ে ব্যাঙ্কের কাজে ঢুকতে হয়েছে বিমলকে। সে কাজে ও যা পায়, তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসারের খরচ যুগিয়ে যা বাঁচে তাতে তিন চার মাস চেঞ্জে যাওয়া সম্ভব নয়। সে কথাই বুধুদাকে বলেছিল বিমল।

শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'মালুর স্কুল ছুটি হবে কবে?'

'আগামী মঙ্গলবার ওর স্কুল ছুটি হবে।'

'তার মানে ছাব্বিশ তারিখ।' বলে একটু ভাবলেন ডাক্তারবাবু। একবার ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন। টেবিলের উপরে রাখা ডাইরিটার পাতা উল্টালেন। বললেন, 'বিলু, ব্যাঙ্ক থেকে ছুটি নে যত দিনের জন্য পারিস। আগামী তিরিশে আমরা রওনা হচ্ছি সুজনখালি। ওখানে আমার একটা ছোট্ট বাগানবাড়ি আছে সমুদ্রের ধারে। সেখানে দুমাস থাকবি তোরা। আমি তোদের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমি দুদিনের বেশি থাকতে পারব না, তোরা থাকবি। যা কাকীমাকে তৈরি হতে বল গিয়ে। জামাকাপড় ছাড়া কিছু নিতে হবে না। বুঝলি?'

সেই চলেছে ওরা সুজনখালি।

প্লেটে আরও দুখানা লুচি আর একটু আলুর দম নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'সুজনখালি চমৎকার জায়গা। কোনো অসুবিধা হবে না আপনাদের কাকীমা। আমার বাড়িটা দেখাশুনা করে হরিহর। আপনি রান্নাঘরে ঢুকবেন না, সে-ই সব করে দেবে। আর সমুদ্রের যা ভাল মাছ পাওয়া যায়। খুব খাওয়াবেন ওদের দুজনকে। মোটা হয়ে যাবে। বুঝলি মালু, মুখ গোমড়া করে কখনও ঘরে বসে থাকবি না। সমুদ্রের ধারে চলে যাবি। দুপুরের রোদের সময় ছাড়া সারাক্ষণ সেখানে থাকবি। আর, আমি হরিকে লিখে দিয়েছি হৈ-হুলুস্থুল দাদুকে খবর দিতে। তিনি কাল কি পরশু নাগাদ এসে যাবেন। তারপর তোর ওই গোমড়া মুখে হাসি আসে কি না দেখব!'

অবাক বিমল বলল, 'হৈ-হুলুস্থুল দাদু মানে?'

'সুজনখালির পাশের গ্রাম বিজনখালিতে থাকেন তিনি। তাঁর নাতিরা সবাই কলকাতায় বড় বড় কাজ করেন। তাঁরা দাদুকে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকতে বলেন। তিনি যাবেন না। ভীষণ আমুদে মানুষ, রোজ সুজনখালি আসেন বেড়াতে। চেঞ্জার বাবুরা কেউ এলো কিনা খোঁজ নেন, তাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে দেখেন। আর বাড়িতে যদি ছোটরা থাকে তো তাদের নিয়েই মেতে ওঠেন। আজ পিকনিক, কাল গানের জলসা। পরদিন নদীর খাড়ির দিকে ভ্রমণ। নয়ত সমুদ্রের তীরে ছোটাছুটির স্পোর্টস। আমরা যারা সুজনখালিতে বাড়ি করেছি, আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই ওঁর নাম দিয়েছে হৈ-হুলুস্থুল দাদু। নতুন যাঁরা ওখানে বেড়াতে যান, তাঁরা অনেকেই ওঁর আসল নাম জানতেই পারেন না। হৈ-হুলুস্থুল দাদু বলেই চেনেন ওঁকে।' বলে থামলেন ডাক্তারবাবু।

বিমল বলল, 'আমরা তাঁকে চিনব কি করে?'

'তাঁকে চিনবি কি করে? দূর বোকা, তাঁকে চিনতে হয় না। তিনি নিজেই জানান দেন।' বলে হাসলেন ডাক্তারবাবু, 'বুঝলেন কাকীমা, ওঁর ভীষণ চায়ের নেশা। আপনি ওঁকে মাঝে মধ্যে একটু চা খাইয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

মালা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে বকবেন না তো, বকলে আমার ভীষণ ভয় করে।'

বিমল বলল, 'হ্যাঁরে ভিতুর ডিম; হৈ-হুলুস্থুল দাদুর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, পাশের গাঁ থেকে ছুটে আসবেন শুধু তোকে বকতেই। অমন গোমড়া মুখ করে বসে থাকলে আমারই বলে বকে তোর ঘাড়ের ভূত নামাতে ইচ্ছা করে।'

কাতর ভাবে মালা বলল, 'না, না, আমাকে বকো না দাদা। তুমি যা বলবে আমি শুনব।'

'ঠিক মনে থাকে যেন।' বেশ জোর দিয়েই বলল বিমল।

সবার খাওয়া-দাওয়া হতে আবার সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ওরা রওনা হলো। কিছুটা পথ ঘন জংগলের মধ্যে দিয়ে গিয়েই পথ খোলা ধানজমির মাঝে এসে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মালা হঠাৎ বলল, 'মাঠের থেকে, জংগলই ভাল বুধুদা, জংগলে কেমন ছাওয়া।'

ওর কথা শুনে ওর মা খুশি মনে তাকালেন মেয়ের দিকে। এমন করে মেয়ে তো ওর ভালমন্দের বিচার বহুদিন করেনি!

ডাক্তারবাবুও মনে মনে বেজায় খুশি হয়েছিলেন। যাক, মেয়েটা তাহলে ওর এই অবস্থা থেকে বার হয়ে আসতে চায়। সব ডাক্তারই তাই বলেছেন। এখন যদি ওর এই বাইরে আসাতে কোনও উপকার হয় তাতেই অনেক কিছু পাওয়া হবে ডাক্তার রায়ের। উনি বললেন, 'সামনে বিরাট ঝাউবন পাবি রে মালু, সে এক মজার বন। গাড়ি থামাব, নামবি। দেখবি কি মজা সেখানে।'

বিমল মহা উৎসাহে জিজ্ঞাসা করল, 'কি মজা সেখানে দাদা? ঝাউবনে তো ছায়া হবে না।'

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ডাক্তার রায় বললেন, 'কিছু বলব না। আর আধঘন্টা বাদে সব নিজেরাই দেখবি।'

ঝাউবনের সাঁ সাঁ শব্দ, তার সংগে গাছের মাথা দোলানি, অনেকক্ষণ শুনল দেখল মালা। ঝাউতলাতে যেতে গিয়ে ঝরা পাতায় পা হড়কে পড়ল। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে ফের আছাড় খেল। ব্যথা পেয়েছে ভেবে ওর মা এসেছিলেন। থমকেও দাঁড়ালেন। মেয়েকে উঠে দাঁড়াতে দেখে, ওর মুখে লজ্জার হাসি মাখা। আস্তে আস্তে ও কাছে এসে বলল, 'বুধুদা, তুমি তো আমাকে যেতে না করলে না, আমি পড়ে গেলাম।'

হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঝাউতলাতে ঝরা পাতার গদি বিছানো থাকে। পড়লে লাগে না জানি। পড়াটাতেই তো মজা। আমি দেখছিলাম. পড়িস কি না তুই? পড়লি তো।'
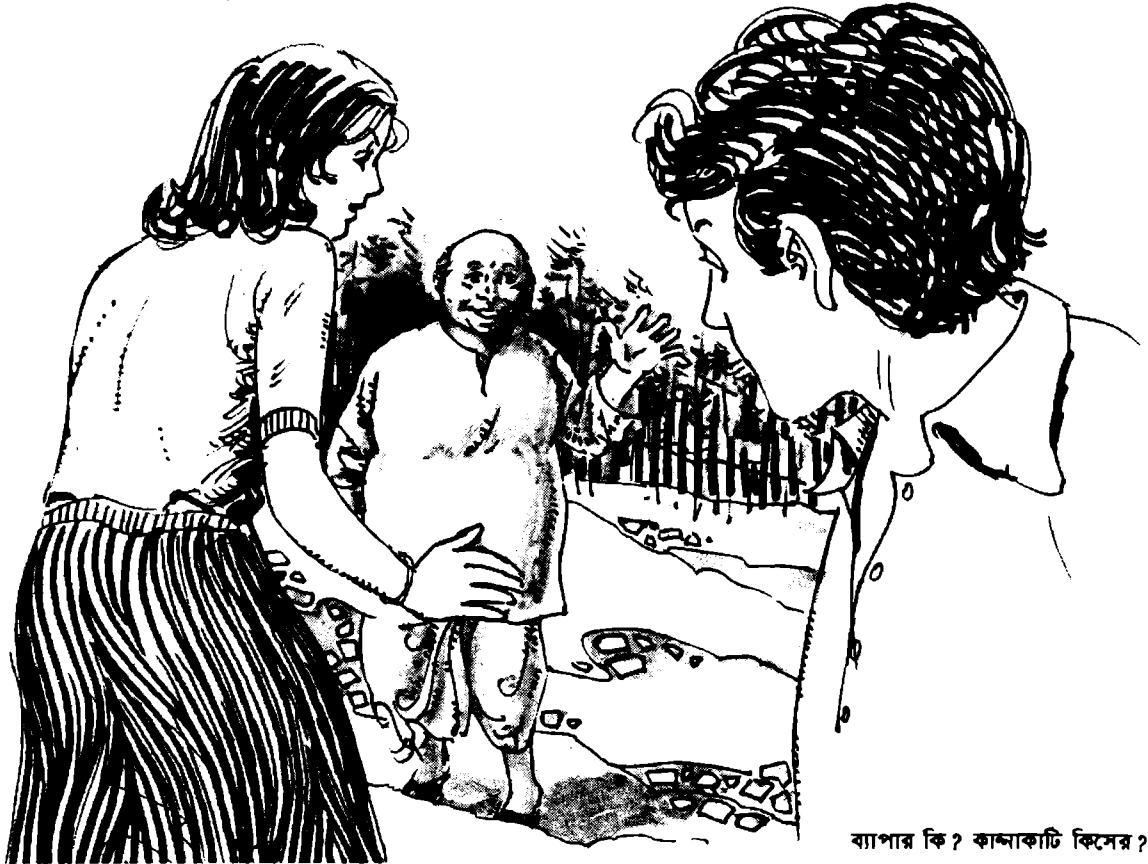
ব্যাপার কি? কান্নাকাটি কিসের?

বিমল বলল, 'ভাগ্যিস আমি যাইনি।'

মালা বলল, 'যা না তুই দাদা। প্লিজ।'

গাড়ি আবার ছুটে চলল। মনে মনে ডাক্তার রায় খুবই খুশি হলেন। মেয়েটার মনের সব জট নিশ্চয়ই খুলে যাবে। সুজনখালির খোলামেলা আকাশ, সমুদ্র ওকে আবার নতুন জীবন দেবে। আর বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গ পেলে তো কথাই নেই। তেমন ভাবে দেখতে গেলে এরা ওঁর তেমন আপন কেউ নয়। সম্পর্ক একটা আছে যা হোক, তার জের টেনেই ছেলেটা এসেছিল ওর বাবার অসুখের সময়। সেই প্রথম আলাপ। কাকাকে উনি বাঁচাতে পারেননি। তবে সেই থেকেই মনের কোণে এই অসহায় পরিবারটার জন্য একটু যেন সহানুভূতি জেগেছে ওঁর। ওরা নিজে থেকে কখনও কিছু চায়নি। সে স্বভাবও ওদের নয়। শুধু অসুখের বিপদ যখন আসে, ছেলেটা ছুটে আসে পরামর্শ নিতে। এবারেও এসেছিল, ছোট্ট মেয়েটার মুখ চেয়ে। একটু একটু করে বেশ জড়িয়েই পড়েছেন উনি এখন। তার জন্য মনে ওঁর কোনও ক্ষোভ নেই। ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনের কোথায় যেন একটু অন্য রকম অনুভূতি জেগেছে ওঁর।

বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁ দিকে ফিরল। স্টিয়ারিং ধরেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'সবাই সামনের দিকে তাকাও। সামনের ওই টিপিটা পার হলেই...কথা ওঁর শেষ হলো না। উঁচু জায়গাতে গাড়ি উঠতেই সামনে দিগন্তজোড়া সমুদ্র নজরে পড়ল ওদের। বিমল মালা কেউই এর আগে সমুদ্র দেখেনি। ওদের দুজনের মুখে কোনও কথা ছিল না। গাড়িটা রাস্তা ধরে ডান দিকে ফিরল। সমুদ্র তখন ওদের বাঁ দিকে। ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওই যে সামনে একতলা এলা রঙের বাড়িটা দেখছ, ওটাই আমার বাড়ি। আশা করি হরিহর গরম চা রেডি করে রেখেছে। চা খেয়ে আমরা ঝাউবনে বেড়াতে যাব।'

বিমল রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এই সমুদ্র! এ তো আমার কল্পনাতেও ছিল না। এই আহ্লাদি, তোর কেমন লাগছে বললি না?'

বোনকে ক্ষেপাবার জন্য বিমল মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু মনগড়া নামে ওকে ডাকে। আহ্লাদি তারই একটা।

হুঁশ ফিরে পেল যেন মালা। বলল, 'শেষ দেখা যায় না জানতাম আকাশের, এরও তো শেষ নেই রে দাদা।'

'দূর বোকা,' বলল বিমল, 'সমুদ্রের শেষ নেই কিরে? জোগ্রাফিতে গোল্লা পেয়েছিস তো তাই ও কথা বললি। সোজা নাক বরাবর ভেসে গেলে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাবি। চল, একটা নৌকো কিনি গিয়ে।'

গাড়ি এসে থামল বাড়ির গেটে। হর্ন বাজাতেই ভিতরের দরজা খুলে বার হয়ে এল একটা অল্পবয়স্ক ছেলে। তাকে দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কি সর্বনাশ, এ তো হরিহর নয়! এ আবার কে ঢুকল আমার বাড়িতে! চল চল, ভিতরে চল!'

ছেলেটা এসে ঝুঁকে পড়ে ডাক্তারবাবুকে জোড়হাতে প্রণাম করল। বলল, 'বড়দাদাবাবু, আমি মদনগোপাল। বাবার ক'দিন খুব জ্বর হয়েছিল। তাই দেশে গেছে। আমি আপনাদের দেখাশুনা করব।'

'তুই মদনগোপাল! ওঃ এত বড় হয়ে গিয়েছিস। তা তোর বাপ ফিরবে কবে? যে ক'দিন না আসে, আমার কাকীমা আর এই দাদাবাবু দিদিমণির দেখাশুনা করতে পারবি তো?'

একগাল হেসে মদন বলল, 'তা পারব বাবু। খালি রান্নাটা বড়মা করে নেবেন। আর বাকী সব কাজ আমি করব।'

'আর কোন কাজ তাহলে তুই করবি রে?' অবাক ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

মালার মা বললেন, 'ওসব কথা থাক বাবা। ওতে কোনও অসুবিধা হবে না। তোমরা মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমি চা করে আনছি। তোমরা তো এখুনি আবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে।'

চটপট ওরা তৈরি হয়ে নিল। যে মালাকে কলকাতায় ঘর থেকে বার করাই যেত না, তাকে বারকতক বলাতেই ও উঠে পড়ল।

বিমল জিজ্ঞাসা করল, 'ঝাউবন এখান থেকে কত দূরে দাদা?'

'দূরে কোথায় রে, কাছেই ঝাউবন।' বললেন ডাক্তারবাবু, 'দূর হলে কি মালা হেঁটে যেতে পারত।'

'বসার জন্য শতরঞ্জিটা নেব?' জিজ্ঞাসা করল বিমল।

'না, না, ওসব কিচ্ছুই লাগবে না। সমুদ্রতীরে ধুলো ময়লা নেই, বালিতেই বসা যাবে।'

আস্তে ছোট বোনের হাত ধরে বিমল বলল, 'চল, আজ ধরে ধরে নিয়ে যাব। কালও নিয়ে যাব, পরশু থেকে পারব না, বলে দিলাম। তোকে নিজেই যেতে হবে।'

মালা করুণ ভাবে বলল, 'যদি পড়ে যাই রে দাদা?'

'হাড় ভাঙবে। ইসকুরুপ দিয়ে পরে ডাক্তারবাবু তা সেঁটে দেবেন। এখন চল তো।'

দরজার কাছ থেকে ডাক্তারবাবু ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে গোপাল, তোর বাবা কি বিশ্বম্ভরবাবুকে খবর দিয়েছে? জানিস কিছু?'

গোপাল একগাল হেসে বলল, 'সে খবর তো আমি জানি না বাবু। বিশ্বম্ভরবাবু কে?'

'তবেই হয়েছে।' বললেন ডাক্তারবাবু, 'ও আমি কাল যখন ফিরব, তখন ওঁকে বলে যাব তোদের কথা।'

বিমলও জিজ্ঞাসা করল, 'বিশ্বম্ভরবাবু কে দাদা?'

'আরে ওঁকেই তো সবাই বলে হৈ-হুলুস্থূল দাদু। খবর না দিলেও কাল পরশু এসে পড়বেন। এসে পড়াই তো ওঁর কাজ।'

সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের চুল উড়ছিল। অবাক মালা শুধু একদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটু চলছিল, একটু থামছিল। এক একবার নীচু হয়ে পায়ের কাছে পড়ে

থাকা ঝিনুক দু একটা কুড়াচ্ছিল। ও একদম ভুলে গেছে ওর সব দুঃখের কথা।

বিমল বলল, 'পাশের বাড়িটা কার দাদা?'

'ওটা রতনবাবুদের বাড়ি। ওরা আর ক'দিন বাদেই এসে পড়বেন।'

'তার পাশের বাড়িটা?'

'চৌধুরী ভিলা। জমিদার বাড়ি। ওঁরা আসেন না। তার পাশের বাড়িতে থাকেন ডাক্তার আনোয়ার হোসেন। ভীষণ মিশুকে মানুষ। তেমনি ভাল। তোমাদের দরকার পড়লে ডেকো তাঁকে। খুবই ভাল মানুষ।'

কথা বলতে বলতে আরও কিছুটা এগোতেই ওরা দেখল, হোসেন সাহেবের বাড়ির দরজা খুলে এক বৃদ্ধ বার হয়ে আসছেন। হাতে তাঁর লাঠি। চোখে চশমা।

ডাক্তারবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'ওই হলো আনোয়ার হোসেন। বোধহয় বিকালে বেড়াতে বার হলেন।'

হোসেন সাহেব কোনও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে উল্টো দিকে চলে গেলেন। তাঁর বাড়ির পরেই বাঁক। সেই বাঁক ঘুরতেই বিমলের চোখে পড়ল, সামনে যত দূর দেখা যায় সমুদ্রের তীর ঘেঁষে ঝাউবন। সাঁ সাঁ করে ঝাউয়ের পাতার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ও একছুটে বনের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডাক্তারবাবু বললেন, 'মালা কই, মালা? সে তো আসেনি সঙ্গে।'

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল বিমল বাঁকের মুখ পর্যন্ত মালা নেই। তা হলে কি হলো ওর! বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল ওর। বোনটার মাঝে মাঝে পায়ের জোর চলে যায়। ও তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে গেছে! কোনো কথা না বলেই ও প্রাণপণে দৌড় লাগাল বাঁকের দিকে। বাঁক পেরিয়েই দেখল, না কিছুই হয়নি মালার। তবে আনোয়ার হোসেন সাহেব ওর পাশে দাঁড়িয়ে খুব হাত নাড়ছেন। সেই সঙ্গে তাঁর পাকা ধপধপে দাড়িও হাওয়ায় উড়ছে। ছুটতে ছুটতে বিমল এসে দাঁড়াল বোনের পাশে। দম ফিরে পাবার আগেই শুনল, দাঁত প্রায় কিড়িমিড়ি করে হোসেন সাহেব বললেন, 'ইরেসপনসিবল ছোকরা, বোনকে এভাবে একলা ফেলে চলে গেছ! ও তো দেখছি হাঁটতে পারে না ভাল করে। পড়ে গেছে।'

বিমল জিজ্ঞেস করল, 'তোর লাগে নি তো রে?'

ধমকে উঠলেন আনোয়ার হোসেন, 'বাঃ, লাগাটাই বড় হলো? না লাগলেও ও তো পড়ে গেছে তোমরা না দেখাতে। সে কথা অস্বীকার করতে পার?'

বিমল বলল, 'না, মানে...আজ্ঞে...'

মালা বলল, 'আমার একটুও লাগেনি দাদু। অমন আমি মাঝে মাঝে পড়ে যাই। কিছু হয়নি আমার।'

'কোন বাড়িতে উঠেছ তোমরা?'

'ডাক্তার বুদ্ধদেব রায় মশাইয়ের বাড়িতে।'

'অ্যাঁ, আমি তো তাঁর বাড়িতেই ছুটে যাচ্ছিলাম, তিনি এসে গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে ঝাউবন দেখতে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি! তা ডাক্তার রায় তোমাদের কে হন?'

'আমাদের দাদা।'

'দাদা? বেশ, বেশ, তা তোমার নাম কি?'

'বিমল বসু মল্লিক।'

'আর তোর নাম কিরে নাতনি, আমাকে দাদু বললি না?'

'মালা।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। আয়, চল আমার বাড়িতে, তোদের বিকালের চায়ের ব্যবস্থা আমি ওখানেই করেছি। হরিহর তো নেই, জ্বর হয়ে বাড়ি চলে গেছে। ওর ছেলেটা সব কাজ করতে পারে, অবশ্য তোরা যদি করে দিস তবেই। ভাল কথা, সঙ্গে আর কে এসেছেন?'

'মা।'

'মা এসেছেন, বাবা আসেননি?'

'তিনি গত বছরের আগের বছর মারা গেছেন।' বলল বিমল।

পিছনে তখনি ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল, 'আরে আপনি না কোথায় যাচ্ছিলেন ব্যস্ত হয়ে? এখানে থামলেন?'

'আসুন ডাক্তার রায়, আপনার ভাই-বোনদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। আপনার বোনের আমি দাদু হয়ে গিয়েছি এরই মধ্যে। তা হ্যাঁ দিদি, জানিস তো রে আমি মুসলমান?'

মালা বলল, 'জানি না দাদু, মুসলমান হলে কি হয়?'

'কি যে হয় তা ঠিক আমিও জানি না রে। তোদের হৈ-হুল্লুহুল দাদু এলে এসব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করিস। তার কাছে সব কথার উত্তর আছে। তা ডাক্তার রায়, আমি তো আপনাদের চায়ের ব্যবস্থাটা আমার ওখানেই করেছি। রাতের খাওয়ারও। কিন্তু এরা যে আসবে তা তো জানতাম না। এরা কি যাবে আমার ওখানে? মায়ের মতটা নেওয়া দরকার।'

'চলুন, আমার ওখানে হোসেন সাহেব। কাকীমার সঙ্গে আলাপ করবেন। আমি কালই ফিরব। এখানে ওরা থাকবে ক'মাস। আপনি একটু দেখাশুনা করবেন এদের।'

কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ি ফিরে এল। বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল মদন। হোসেন সাহেব একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। বললেন, 'কিরে গোপাল, উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়িয়েছিস?'

একগাল হেসে মদন বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কাঠ, কয়লা কেরোসিন সব এনে দিয়েছি। বড়মা ধরিয়েছেন। আমি বাসনপত্র এনে দিয়েছি। বড়মা চা করছেন। আপনাকে এনে দেব একটু?'

ডাক্তার রায় ভিতরে চলে গেছিলেন। ফিরলেন মালার মাকে সঙ্গে নিয়ে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে হোসেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

'বৌমা, তোমাকে বিরক্ত করলাম মা। যদি মত দাও তো আজ রাতে ওরা সবাই আমার ওখানে খাবে। চা তো হয়েই গেছে শুনলাম, যদি আপত্তি না থাকে তো একটু দাও, এখানেই খেয়ে যাই।'

শান্তভাবে মালার মা বললেন, 'মালার দাদু আপনি। আপনি ওদের বাড়ি নিয়ে গেলে আমি না করব কেন। একটু বসুন, চা আনছি।'

আবার জাঁকিয়ে বসে হোসেন সাহেব বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল। বুঝলেন ডাক্তার রায়, বেশ ক'দিন ধরে বিশ্বম্ভরবাবুর প্যাত্তা নেই। কি জানি, এদিকে চেঞ্জার বাবুরা নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা নেই, তাই উনি আসেন না নাকি? তবে এখন তো তাঁর সংগী এসে গেছে। এখন তাঁকে খবর দেওয়া উচিত। দেখি কাউকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি কিনা।'

বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খেলেন হোসেন সাহেব। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন, 'চল চল, আর এক মুহূর্তও ঘরে নয়। এখন সমুদ্রের তীরে গিয়ে বসার সময়। ডাক্তার রায়, আপনার কাকীমাকে ডাকুন। বিমল, যাও মাকেও ধরে নিয়ে এস। নাতনি, চল যাই, আমরা এগোই। এখন দু ঘণ্টা সমুদ্রের তীরে বিশ্রাম।'

চেয়ার ধরে উঠে দাঁড়িয়ে মালা বলল, 'আজ তো আমি অনেক হেঁটেছি। আবার হাঁটতে গিয়ে যদি পড়ে যাই?'

'কেন পড়বি কেন?' অবাক হোসেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার যে অসুখ।' বলল মালা।

'ওঃ, তাই বল। তা নাতনি, সমুদ্রের বালির উপরে পড়লে তেমন লাগে না রে, একবার পড়বি, দুবার পড়বি, তারপর আর
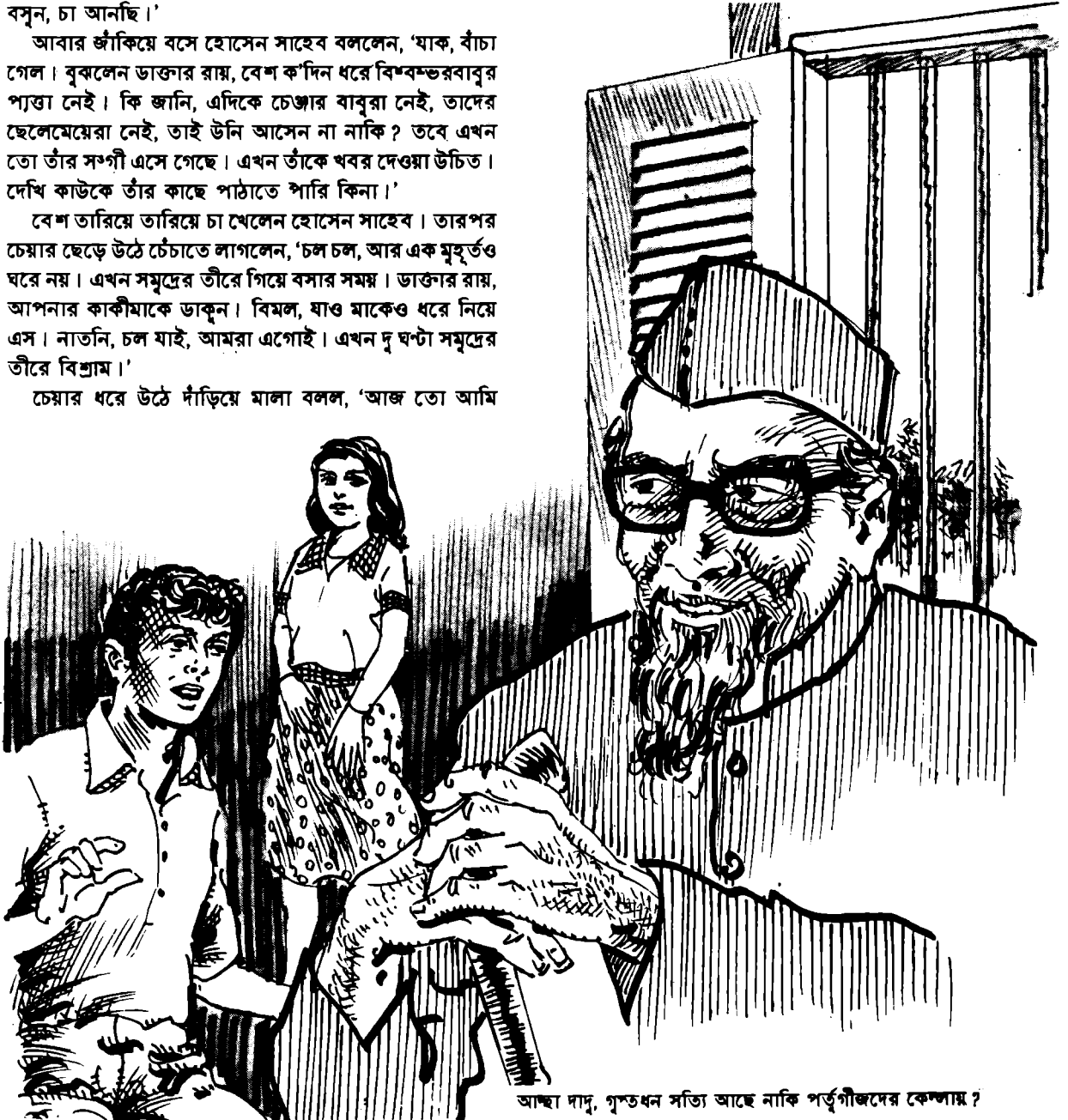
আচ্ছা দাদু, গুপ্তধন সত্যি আছে নাকি পর্তুগীজদের কেল্লায়?

পড়বি না। পেট ভরে খাবি, গায়ে আবার জোর হবে। খুব তাড়াতাড়ি গায়ের জোর করতে হবে রে, তা না হলে ওই হুলুস্থূল বুড়ো এলে বিপদে পড়বি।'

'কেন দাদু?'

'ও বুড়ো সবাইকে ধরে নাচায়। ছাড়ে না, তোকেও নাচাবে, দেখিস।'

'হুলুস্থূল বুড়ো খুব রাগী?'

'দূর বোকা, সব সময় হি হি করে হাসায়। পেটে খিল ধরে যায়।'

'তবে তো খুব ভাল। আমার অসুখ হবার আগে আমি তো ক্লাবে নাচ শিখতাম। আমি খুব নাচতে পারব।'

'এই না বললি তোর অসুখ, পড়ে যাবি।'

'অসুখই তো, পড়েই তো যাই। শুধু পড়ি না স্কুলে গেলে। সেখানে পড়ে গেলে তো দিদিমণিরা বকবেন।'

'এ্যাঁ!' বড় বড় চোখ করে ডাক্তার হোসেন ওর নতুন পাওয়া নাতনির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে বললেন, 'হুলুস্থূল বুড়োই তোর ওষুধ।'

আধঘণ্টা বাদে হোসেন সাহেব বললেন, 'বৌমা, তোমরা এবারে বাড়ি ফিরে যাও মা। প্রথম দিন, বেশিক্ষণ না হয় না-ই বাইরে থাকলে। আমি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দুচারটে কথা বলে ফিরব।'

ওরা সবাই চলে যেতেই মালার সব কথা জেনে নিলেন ডাক্তার হোসেন। দুঃখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আপনি ঠিক করেছেন, ওকে এখানে এনে। এই পরিবেশে ওর মন ভাল হয়ে যাবে। বিশ্বম্ভরবাবুকেও এখন খুব দরকার। তিনি এলে, দুদিনেই সব বদলে দেবেন। দেখি খবর পাঠাতে পারি কিনা ওঁকে।'

পরদিন ভোরেই ডাক্তার রায় ফেরার পথে রওনা দিলেন। বলে গেলেন, 'সম্ভব হলে বিশ্বম্ভরবাবুকেও ওদের খবর জানিয়ে যাবেন।'

সারাদিন ওদের পথ চেয়ে কাটল। মালার মা হেসে বললেন, 'তোদের মাথায় যা ভূত চাপিয়ে গেল, তা এখন নামলে বাঁচি। আরে, উনি ওঁর বাড়ির কাজকর্ম সব শেষ করে তবে তো আসবেন। নাকি খবর পেলেই ছুটে আসবেন তোদের নাচাতে?'

বিমল বলল, 'রোজ নাকি আসেন এখানে, আজ এলেন না কেন?'

মালা বলল, 'ইস, নাচ জানলেই হলো। আসুক তো আমাকে নাচাতে। মজা দেখিয়ে দেব না।'

মা হাসলেন, বললেন, 'তুইও যেমন, বুড়ো মানুষ নাচবেন কিরে? উনি তোকে ক্ষেপিয়েছেন।'

বিমল বলল, 'না মা না, ওই দাদু সবাইকেই নাচাবেন, তোমাকেও।'

ভীষণ রাগে মা বললেন, 'হতভাগা,ছেলের কথা শোন।'

'নাচ তো খুব সোজা মা।' বলল মালা, 'একটু চেষ্টা করলেই পারবে।'

বেলা পড়ে এসেছিল। রোদের তেজ কম। বাইরের দিকে তাকিয়ে মালার মা বললেন, 'যা যা, ঘুরে আয় তোরা একটু বাইরে থেকে। পারলে ও বাড়ির দাদুকে অমনি চা খেতে ডেকে আনবি। আহা, বুড়ো মানুষ, কেউ বোধ হয় এখানে দেখার নেই।'

দাদার হাত ধরে মালা বার হলো। সমুদ্রের তীরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেশ কিছুক্ষণ ওরা ঝিনুক কুড়াল। হাঁটতে হাঁটতে হোসেন সাহেবের বাড়ি অবধি গিয়ে দেখল তাঁর কাজের লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বলল, 'সাহেব, বেড়াতে চলে গেছেন।'

বিমল জিজ্ঞাসা করল, 'কোন দিকে গেছেন?'

ঝাউবনের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে ও বলল,'ওই দিকে।'

বিমল বলল, 'যাবি মালা ওই দিকে?'

মালা বলল, 'দাদু গেছেন তো, চল। আস্তে আস্তে যাবি কিন্তু দাদা, আমি জোরে হাঁটতে পারব না।'

বিমল বলল, 'খুব পারবি, চল–চল তো। দাদু এলে তো নাচতে হবে। পারব না বললে ছাড়বেন থোড়াই।'

'কবে আসবেন রে দাদু?'

'কি করে বলব, আমরা যে এসেছি। তা তো দাদু জানেনই না।'

'দাদা খবর দেবে।'

'তা হলে, আজ নয় কাল, নয় পরশু ঠিক আসবেন।'

'বেশ মজা হবে তবে। না রে?'

'কি জানি, দেখলামই না তাঁকে, মজা হবে কি হবে না তা বলব কি করে? ওসব নাচ-টাচ আমার আসবে না। তুই নাচবি ধেই ধেই করে, আমরা দেখব।'

'আমি বুঝি ধেই ধেই করে নাচি?' গাল ফুলিয়ে বলল মালা।

'সব নাচই অমনি। হয় হাত ঘোরাচ্ছে, নয় ঘাড় বেঁকাচ্ছে। বিচ্ছিরি, দেখলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়।'

'বারে দাদা, তুই না বলতিস আমার নাচ খুব ভাল, এখন কেন এমন করে বলছিস? হুলুস্থূল দাদু এলে আমি তাহলে আর নাচবই না। বললেও নাচব না। তোর সঙ্গে আড়ি।'

'ব্যস্, অমনি ছিঁচ্‌কাঁদুনে হয়ে গেলেন আমাদের আহ্লাদি! নে এখন, ফোৎ ফোৎ করে কাঁদ! উঃ, এখন যদি ওই দাদুটা আসতেন,....

বিমল কথা শেষ করতে পারল না। ডান দিকে বালির ঢিপির পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে বললেন,'এই যে, এই যে আমি এখানে। ব্যাপার কি? কান্নাকাটি কিসের? ও সব আমার একদম ভাল লাগে না।' বলতে বলতে নাদুসনুদুস, একমাথা টাক, ধারে ঝাঁকড়া পাকাচুলওয়ালা এক ভুঁড়িওয়ালা বুড়ো প্রায় থপথপ করতে করতেই এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। বিমল ভেবেছিল বোধ হয় হোসেন দাদু। কিন্তু একেবারে অচেনা অন্য লোক। কাছে এসেই উনি বললেন, 'ওই যাঃ, এ তো দেখছি একেবারে অচেনা, আনকোরা! তা অমন গলা ফেড়ে চেঁচাচ্ছিলে কেন, বাঘে তাড়া করেছে? নাকি খ্যাঁকশেয়ালে খ্যাঁক করে ধরল। হাতের কাজটা আমাকে শেষ করতেও দিলে না।'

দুজনে অবাক। কই ওরা তো চেঁচায়নি। তাছাড়া এই তো উনি নিজেই বলছিলেন, কান্নাকাটি একদম পছন্দ করেন না। তবে!

বুড়ো বললেন, 'বুঝেছি সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে আমার। আসলে কি জান, মাথাটা আমার বেজায় ছোট্ট, অথচ হাজার চিন্তা। সব তাই মাঝে মাঝে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। যাক গে সে সব কথা, নাম?'

'আমার নাম বিমল, ও আমার ছোট বোন...' কথা শেষ করতে পারল না বিমল।

বুড়ো বললেন, 'জানি, জানি। ও নামটা আমার কানে গেছে, ছিঁচকাঁদুনি, না না, ফোৎ ফোৎ। দুটোই বিশ্রী নাম, কি সুন্দর দেখতে তোমাকে, কে তোমার অমন নাম দিল বল তো? কুংফু ক্যারাটে জুজুৎসুর প্যাঁচ ঝাড়ব তার উপুরে। আমার মনে হয়, তোমার নাম হওয়া উচিত...' বলে বুড়ো তার টেকো মাথা চুলকাতে লাগলেন।

মালা নাক ফুলিয়ে বলল, 'আমার নাম ছিচকাঁদুনে নয়, ফোৎ ফোৎও নয়, আমার নাম...'

বুড়ো বললেন, 'বললেই মানব?' স্পষ্ট শুনলাম নিজের কানে। যাক সে কথা। আমি বলি কি তোমার নাম হোক, সমুদ্দুরের ঢেউ, না না, তার থেকে ভাল, ভোরবেলার আলো, সংক্ষেপে ভ-বে-আ। বাঃ, বেশ নাম।'

ভীষণ রাগে মালা বলল, 'কখ্খনো না, আমার নাম মালা। মালা বসু মল্লিক। অমন সব বিচ্ছিরি নাম আমার হবে কেন? তোমার নাম তো আরও বিচ্ছিরি, বুড়ো!'

বুড়ো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'উঁহু, হলো না, হৈ-হুলুস্থূল দাদু। আমি বুড়ো হলাম কোথায়? আমার বলে বয়স মাত্র উল্টো নয় ছয়। নয় থেকে ছয় গেলে থাকে কত? অঙ্কে ফেল নাকি?'

বিমল হেসে বলল, 'আমি ব্যাঙ্কে চাকরি করি, স্কুলে পড়ে মালা। ফেল করলে ও করেছে।'

আরও রেগে গিয়ে মালা বলল, 'এই দাদা, আমি বুঝি ফেল করি? কি মিথ্যুক রে তুই! যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব না।'

বুড়ো বললেন, 'পাশ ফেল ওসব কথা কলকাতার জন্য থাক। কোথায় উঠেছ?'

মালা বলল, 'জানি না যাও।'

'ইস্, বল কি? না জানলে বিপদে পড়বে। সব সময় বাড়ির ঠিকানা গার্জেনের নাম মুখস্থ রাখবে। নইলে তো একদম হারিয়ে যাবে। চটপট ওসব মুখস্থ করে ফেল। আজ আর কাল

দুদিন সময়। তারপর তো আমরা যাব পর্তুগীজদের ভাঙগা কেল্লার রহস্য উদ্ধার করতে। ওই ঝাউবন পেরিয়ে, পাক্কা দুমাইল। ভীষণ রহস্যঘেরা জায়গা। বেশ ক'দিন থেকে আমি যাব যাব ভাবছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তেমন মনের মতো সঙগী পাচ্ছিলাম না। তাগড়া তাজা সাহসী। তোমাদের দেখে এখন মনে হচ্ছে, এমনই খুঁজছিলাম। ব্যস। তাহলেই রওনা দেওয়া যেতে পারে এখন। আর গেলেই রহস্য উদ্ধার।'

বড় বড় চোখ করে বিমল কথাগুলো শুনছিল। বলল, 'রহস্য! তাহলে কি গুপ্তধন-টন লুকানো আছে নাকি? সংকেত-টংকেত পেয়েছেন কিছু?'

'হুঁ-হুঁঃ বাবা, না পেলে কি আর ওকথা তোমাদের বলি। দেখো আবার পাঁচ কান কর না যেন।'

বিমল মহাখুশি হয়ে বলল, 'তা আর কখনও করি। তা, হুলুস্থূল দাদু, ওই পর্তুগীজরা কি জলদস্যু ছিল?'

'ছিল না আবার। এদেশে সে সময়ে যে ক'টা এসেছিল, সব ক'টাই ছিল পাক্কা জলদস্যু। যাক সে সব কথা, আজ কাল, তারপরেই পরশু, ভোর ভোর আমরা বার হয়ে পড়ব। খুব হাঁটতে হবে কিন্তু পাঁই পাঁই করে। গুপ্তধন বলে কথা, দেরী করলে যদি আবার কেউ তা হাতিয়ে নেয়।'

মালা বলল, 'কিন্তু আমি যে হাঁটতে পারি না ভাল করে!'

বুড়ো কান চুলকাচ্ছিলেন। বললেন, 'কে বলল তুমি হাঁটতে পার না। হাঁটতে পার না বলেই কি এই এত দূর চলে এসেছ। না পার তো দুদিন খুব হেঁটে ফের হাঁটা প্র্যাকটিস করে নাও। না যদি কর তো তুমিই বিপদে পড়বে। রওনা আমরা পরশু দিন দেবই। বাত পাক্কা।'

বিমল বলল, 'কিন্তু মার মত নেওয়া হলো না যে?'

'চল, এখুনি তাঁর মত নিয়ে ফেলি। আমি সঙ্গে আছি। শুনলে আর না করবেন না জানি। তবুও মত নিতেই হবে।'

মালা বলল, 'আমার কথাটা বেশি করে বলবেন। তা না হলে মা কিন্তু আমাকে যেতেই দেবে না।'

হি হি করে হেসে বুড়ো বললেন, 'আরে যাওয়া তো তোমার জন্যই, তুমি না গেলে যাওয়ার মানেই থাকবে না। ওসব কথা থাক। কাল ভোর চারটেয় ডেকে তুলে দিচ্ছি, হাঁটা প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে, কচি খুকি তো, ফের হাঁটি হাঁটি পা পা। না না, চারটেয় অন্ধকার থাকবে চারিদিকে, হুক্কা হুয়া শেয়ালগুলো ঘুরবে তখন ঝাউবনে, যা সাহস তোমার দেখেই মুচ্ছো যাবে। ভোর পাঁচটা। ডেকে তুলে দিচ্ছি দুজনকে, তারপর পাঁই পাঁই হাঁটা। বাত পাক্কা। চল এখন তোমাদের মার কাছে।'

মালার মা বললেন, 'অতদূরে যাবে, পারবে কি যেতে? আর ওই যে কোন জায়গার কথা বলছেন, সেখানে কোনও বিপদে পড়বে না তো?'

তেমনি হা হা করে আবার হেসে উঠলেন বুড়ো। বললেন, 'আমি হাঁটতে পারি না, আমি চলতে পারি না, আমার খুব অসুখ, আমি হাসতে পারি না, কাঁদতেও পারি না, আমি পারি না, পারি না, পারি না, পারি শুধু গোমড়া মুখ করে বসে থাকতে। ওসব তো আপনার কন্যার কথা। এতক্ষণ প্যান প্যান করে বলছিল, আমি শুনছিলাম। এখন দেখছি আপনি তার মাও কম যান না, বলছেন, পারবে কি? চলবে কি? ধরবে কি? করবে কি? গেছি, গেছি, এত কি, কি, কি, শুনতে শুনতে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করেছে যে। আমি বলি কি, করতে দিন, চলতে দিন, ধরতে দিন, আর না হয় বার দু চারেক পড়তেও দিন। দেখুন না তারপর কি হয়। ওই গোমড়ামুখো মেয়ে আপনার বত্রিশ পাটি দাঁত হাসিতে বার করে বাড়ি ফিরবে। তা যদি নাই করতে পারলাম তো কিসে হুলুস্থূল দাদু হলাম সবার।'

মালার মা খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না মানে বলছিলাম কি, কোনও দিনও তো কিছু করেনি। অভ্যেস নেই। তাই বলছিলাম পারবে কি!'

তেমনি করেই হেসে বুড়ো বললেন, 'পারবে কি পারবে না, তা তো দেখতে হবে। না পারে করবে না। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। কাল থেকেই তার শুরু, ভোর চারটেয়, না, না, পাঁচটায়। পাঁই পাঁই চক্কর দিয়ে। বাত পাক্কি।'

মালার মা বললেন, 'মালা, ওঁকে বল চা খেয়ে যেতে। আমি এখুনি চা করে আনছি।'

বুড়ো মহাখুশিতে দু হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'চা? তা মন্দ কি, হয়ে যাক। সঙ্গে খানকতক ফুল্কো লুচি আর আলু-ভাজা। আহা, কতদিন যে ওসব খাইনি। তা বলছেন যখন এত করে দিন, খানকত লুচি আর চা না হয় খেয়েই যাই।' বলে বুড়ো তাঁর চেয়ারে বেশ আরাম করেই বসলেন।

মালার মা চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

মালা তখন রাগ করে বলল, 'আমি গোমড়ামুখি?'

'কই কে বলল?'

'তুমি বললে তো মাকে।'

'কি মিথ্যুক রে বাবা!' অবাক বুড়ো তার গালে হাত দিলেন বললেন, 'আমি বলে তখন থেকে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি তোমার নাম ভ-বে-আ, ভোর বেলার আলো, আর আমার নামেই অমন মিথ্যা অপবাদ!'

বিমল ব্যস্ত হয়ে বলল, 'যাগ গে দাদু, আর ঝগড়া নয়। সেদিন সকালে সঙ্গে কি নেব?'

'হ্যাঁ, সেই কাজের কথাটাই আলোচনা করা হয়নি। শক্ত দড়ি দশ মিটার। ছুরি ধারাল, বড় একখানা। টর্চ তোমাদের জন্য, একথলি খাবার দুজনের মতো অনেক। দাবার দুজনের জন্য অনেক। জল দুজনের জন্য দু বোতল। সব, দুটো ভাগে ভাগ করে পুঁটুলি বানাবে। বইবে, তোমরা দুজনে। শুধু ওই দাবারটা যোগাড় করব আমি। আর আমিই তা বয়ে নিয়ে যাব শেষ পর্যন্ত। বুড়ো তো, তাই বেশি ভারীটা নিজের কাছে রাখলাম।'

ফিক করে হেসে মালা বলল, 'খাবার হয়, দাবার হয় নাকি? তুমি ভীষণ দুষ্টু দাদু।'

'ও হো হো, তাই তো! বড় ভুল করে ফেললাম। ওই দেখ, আরও বেশি ভুল করে ফেলেছিলাম এখখুনি। আমার ওই ওদিকে একটা ভীষণ জরুরী কাজ আছে। যাচ্ছি, বুঝলে? গিয়েই কাজটা সেরে ফেলব। ফেলেই ছুটে ফিরে আসব। ততক্ষণ তোমরা লুচিভাজা, আলুভাজা দিয়ে খাও বসে বসে। ভোর চারটেয়, দুত্তরী পাঁচটায় পাক্কা বাত।' বলেই বুড়ো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। খোলা দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে আমি এখানে, আসছি, আসছি, দাঁড়াও।'

বলেই টুক করে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে বার হয়ে গেলেন।

অবাক বিমল বলল, 'বাইরে ভীষণ অন্ধকার রে মালা। দাদু কাকে দেখে অমন করে চিৎকার করে ডাকলেন?'

তখনি বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। জুতো মসমস করতে করতে ঘরে ঢুকলেন আনোয়ার দাদু। ঢুকেই বুক ভরে দম নিয়ে বললেন, 'ও নাতনি, নির্ঘাত আগের জন্মে আমি বামুন ছিলাম, তাই এ জন্মে ঠিক গন্ধে গন্ধে এসে পড়েছি। লুচি ভাজা হচ্ছে না?'

মালা বলল, 'হ্যাঁ দাদু, তুমি এসেছ, খুব ভাল হলো। হৈ-হুল্লুস্থূল দাদুও এসেছেন। তিনিই তো লুচিভাজা খাবেন বললেন। কে যেন ডাকল বাইরে, তাই আসছি বলে চলে গেলেন। এখুনি আসবেন।'

'তাই নাকি, এসে গেছেন তিনি? বাঃ, এ তো খুব ভাল কথা। এইবারে উনি তোমাদের নাচাবেন। দেখো।'

মালা বলল, 'টাক মাথা, পাকা চুল, ইয়া ভুঁড়ি, ওই দাদু আবার নাচতে পারবে নাকি?'

বিমল বলল, 'উনি আমাদের আজ বাদ কাল, পরশু, পর্তুগীজদের ভাংগা কেল্লার রহস্য উদ্ধার করতে নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

ওকথা শেষ করার আগেই মালা বলল, 'ভীষণ রহস্য দাদু, গুপ্তধন টুপ্তধনও থাকতে পারে সেখানে! হ্যাঁ! ওই যাঃ, তোমাকে বলে ফেললাম। তুমি আবার পাঁচ কান কর না কিন্তু। বুঝলে?'

হোসেন সাহেব তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'পাগল, এমন গোপন কথা কেউ কাউকে বলে। পিছনে গুন্ডা লাগতে পারে, ডাকাত হামলা করতে পারে, গুপ্তধন বলে কথা। বেশ জমিয়েছে তো বিশ্বম্ভরবাবু। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?'

মালা বলল, 'আমরা গিয়ে ডেকে আনব দাদু, কোথায় গেল দেখব?'

'যা, যা, তাই দেখ গিয়ে। বুড়ো মানুষ, এদিকে লুচিও ঠান্ডা হবে।' বললেন আনোয়ার হোসেন।

মালা বলল, 'চল দাদা, তাই দেখি গিয়ে। উঃ, কি অন্ধকার বাইরে! চল, চল।' কথার শেষে ও গিয়ে দাঁড়াল দরজায়।

বিমল ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে এল। বলল, 'চল, চল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তুই চেঁচিয়ে ডাকবি। আমি আলো জ্বালব।' দুজনেই বাইরে চলে গেল।

আনোয়ার হোসেন ডাক দিলেন, 'বৌমা, আছ নাকি মা, একবার শোন তো। কথা আছে।'

একথালা খাবার সাজিয়ে মালার মা ঘরে ঢুকে অবাক হলেন, বললেন, 'আপনি! ওদের নতুন দাদু কোথায়?'

'তাঁকে ডেকে আনতে ওদের পাঠিয়েছি।' বললেন হোসেন সাহেব,'বিশ্বম্ভরবাবুকে বিশ্বাস কোরো বৌমা। ও যা করবে তা ভেবে চিন্তেই করবে। ওই পর্তুগীজ জলদস্যুদের কেল্লা এদিকে এলে সবাই দেখতে যায়। উনি আবার তার সঙ্গে ওদের নাকি গুপ্তধনের রহস্য জুড়ে দিয়েছেন। বলেছি না উনি সবাইকে নাচাতে পারেন। তোমার পুত্র-কন্যাকে তো নাচিয়েই দিয়েছে। তা লুচি কি বৌমা ওই বুড়োর জন্য, এ বুড়োর জন্য নয়?'

বেশ লজ্জা পেয়ে মালার মা তাঁর হাতের থালা হোসেন সাহেবের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি খান বাবা, আমি আরও ভেজে আনছি। উনি এলে ওঁকেও দেব।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল, গরম জিনিস ঠান্ডা করতে নেই।' বলে হোসেন সাহেব খাওয়া আরম্ভ করলেন। মালার মা ফের রান্না-ঘরে চলে গেলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে দুজন ফিরল। মালা বলল, 'দুদিকে যত দূর আলো গেল দেখলাম, নতুন দাদু নেই!'

বিমল বলল, 'সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও চলে গেছেন। একদম ভুলে গেছেন আমাদের কথা। পর্তুগীজ কেল্লার রহস্যের কথা মনে থাকবে তো?'

লুচি মুখে পুরতে পুরতে হোসেন সাহেব বললেন, 'দেখ এখন!'

ভোর বেলা ঘুমের মধ্যে মালার মনে হলো কে যেন ঠিক ওর কানের কাছে কি বলে চেঁচাচ্ছে। ওর নাম নয়, অন্য নাম ধরে। মার ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলেই মালা শুনতে পেল বাইরে থেকে সেই কালকের নতুন দাদুই চেঁচাচ্ছেন, 'ভ-বে-আ, ও ভ-বে-আ, ও লেডি কুম্ভকর্ণ, উঠুন উঠুন, হাঁটি হাঁটি পা পা করতে হবে না?'

অবাক মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও আবার কে রে মালা? কাকে ডাকছেন রে?'

চোখ কচলাতে কচলাতে মালা বলল, 'জানি না যাও। আমাকে ডাকছে। ওই তো হুলুস্থূল দাদু। আমাকে রাগাচ্ছেন।'

পাশের ঘর থেকে বিমল রেডি হয়ে এসে বলল, 'চল চল কুম্ভকর্ণী, তাড়াতাড়ি কর, আমি বাইরে যাচ্ছি।'

দরজা খুলে বিমল বাইরে বার হয়ে দেখল দাদু সামনেই দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। পিছনে ওঁর দাঁড়িয়ে এক বার-চোদ্দ বছরের ছেলে। ধপধপে ফর্সা, সুন্দর দেখতে।

নতুন বুড়ো দাদু বললেন, নাও তোমাদের আলাপ করিয়ে দি, ইনি হলেন, শ্রীযুক্ত বাবু ম-সৃ-তে। সদ্য জাপান থেকে এসেছেন, থাকবেন কদিন। আর এই এখানে এই যে ধপধপে গায়ের রং, ইনি হলেন হিজ রয়েল হাইনেস, রাজা অব সুজনখালি। আরে আরে, কি বেয়াদব, বততমীজ বেওকুব, গর্দান যাবে যে! রাজাকে কুর্নিস কর।'

থতমত খেয়ে বিমল হাত তুলতে যাবে যেই অমনি বাচ্চা ছেলেটা ভীষণ লজ্জায় বলল,'দাদুর কথা শুনবেন না, দাদা। আমাকে দাদু আদর করে ডাকেন ওই রাজা বলে। আপনার নাম তো বিমলদা। দিদি কোথায়? আমিও আপনাদের সঙ্গে পর্তুগীজ কেল্লার রহস্য ভেদ করতে যাব।'

বুড়ো দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর একজন গেলেন কোথায়?'

বিমল বলল, 'তিনি আসছেন দাদু। কিন্তু আমি আবার জাপান থেকে কবে এলাম?'

'কাল।' বললেন বুড়ো দাদু।

'তা নয় এলাম, কিন্তু আমার নাম আবার কবে থেকে ম-সৃ-তে হল?'

'সেও কাল।' বললেন বুড়ো দাদু, 'তোমার সাহস আর বুদ্ধি দেখে নাম দিলাম মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজ! দেখো বাপু, আমাকেই আবার জ্বালিও না যেন।'

মালা বার হয়ে এল বাইরে। বুড়ো দাদু বললেন, 'নাও তাহলে আজ আর দেরী নয়। ভোরের হাওয়ায় সমুদ্রতীরে পাঁই পাঁই করে হাঁটলে বুকে দম বাড়ে, খিদে পায়, গায়ে শক্তি হয়। চল, চল।'

রাজা হাঁটতে আরম্ভ করে বলল, 'আমি তোমার সব কথা শুনেছি দিদি। আমি বিশ্বাসই করি না তুমি ছিঁচকাঁদুনে ফোৎ ফোৎ। আমার নাম রাজা...না, না, দাদু আদর করে রাজা বলে ডাকেন।

বুড়ো দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, হিজ রয়েল হাইনেস...

মালা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি মিথ্যুক বুড়ো দাদু, তুমি এক্কেবারে ইয়ে...ভীষণ রাগ হয় তোমার ওপরে।'

'উহুঁ উহুঁ, এখন একদম কথা নয়। শুধু হাঁটা, বড় বড় পা ফেলে। পারলে ছোটা, শেষে পর্তুগীজ জলদস্যুরা খোলা তলোয়ার হাতে তাড়া করলে ছুটে পালাতে হবে তো। যে না পারবে মরবে।'

বিমল বলল, 'ওরা আসবে কোথা থেকে?'

'কেন, সময়ের রাস্তা ধরে উল্টো দিকে ছুটলেই তো ওরা এসে যাবে এখানে।' গম্ভীর ভাবে বললেন দাদু।

মালা তারপর ভীষণ রাগ করে বলল, 'ওঃ দাদু, তোমার সব আজেবাজে কথা। ছাই-ভস্ম কেউ বুঝতেই পারে না। কাল লুচি খাব বলে গেলে কোথায়? আর এলে না তো?'

'ঐ যাঃ, বলতে ভুলে গেছি। কাল বিকালে, না না, তখন সবে অন্ধকার ঘনিয়েছে, হিজ রয়েল হাইনেস আমাকে ডাকলেন, সে ডাক না শুনলে গর্দান যাবে না? তাই ভয়ে ভয়ে লুচির লোভ ছেড়েছিলাম।'

রাজা হেসে বলল, 'সব মিথ্যে কথা। আমি আবার তোমাকে কাল কখন ডাকলাম?'

'ওহো ডাকো নি? তাহলে, তাহলে, ওঃ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, ভীষণ পেট কামড়াচ্ছিল, তাই পালালাম। কিন্তু কালকের কথা আজ কেন? ও তো কালই শেষ হয়ে গেছে। আজ তো পাঁই পাঁই করে হাঁটা, যতক্ষণ না দম ছুটছে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের কেল্লার রহস্য ভেদ করতে যেতে হবে, সোজা কথা নয়। ছুটে পালাবার ও পথটা তো খোলা রাখতে হবে। কি থেকে যে কি হবে কে জানে?'

মালা ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, 'কেন, ছুটে পালাতে হবে কেন? আমরা তো আর চুরি-ডাকাতি করতে যাচ্ছি না।'

হনহন করে বেশ ক'পা এগিয়ে গিয়ে থামলেন বুড়ো দাদু। পিছন ফিরে বললেন, 'পালাতে হবে কিছু তাড়া করলে। তা নইলে নয়। তবে কি জান অত পুরনো কেল্লা। অনেক যুদ্ধটুদ্ধ হয়েছিল। কত প্রহরীই না ওখানে কচুকাটা হয়েছে। তার দু চারটে কি আর তাড়া করবে না? তখন?'

মালা বলল, 'ও দাদু। বাড়ি ফের, আমি আর যাব না। ও তো ভূতের বাড়ি! ভূত আমাকে ধরবে। বাড়ি ফের।'

'ওই দেখ, এখন ধরছে নাকি? তবে এখন বাড়ি ফিরব কেন? না, না, পাঁই পাঁই করে হাঁট। অত আস্তে চললে তো পিছনে পড়বেই, তাহলেই...'

বড় বড় পা ফেলে মুহূর্তে মালা সবার মাঝে এসে বলল, 'দাদু, আমাকে খবরদার ভয় দেখাবে না বলছি। ভাল হবে না।'

'ওই দেখ, আমি আবার কখন তোমাকে ভয় দেখালাম। আমার নিজেরই বলে ভীষণ বিশ্রী লাগে। ভয়-টয় সব গাঁজাখুরি মিথ্যা গল্প। আসলে ভাল ভূত আর মন্দ ভূত, এই দুই ধরনের ভূত। যার ভাগ্যে যা জোটে। জুটুক, সব ঠিক করে দেব। আমি আছি না।'

বিমল বলল, 'সত্যি ভূত বলে কিছু কি আছে দাদু? ও তো সবার মনগড়া কথা।'

'সব কথাই তো মনগড়া বাপু। মন না থাকলে কি কথা গড়া যায়। না, ভয়-টয় পাওয়া যায়? তবে হ্যাঁ মন যদি শক্ত করতে

বিমল বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ভয় করবে না?

পার, তবে আর ভয় কিসের?' বলে মালার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি তো জানতাম ছিঁচকাদুনি ছিলে। ভিতু ছিলে বলে তো জানি না। ও আবার তোমার নতুন রোগ ধরল নাকি? তাহলে বাজার থেকে কড়া দাওয়াই আনতে হয়। তিতো না ঝাল, না কষা, কোনটা পছন্দ?'

মালা বলল, 'তোমার সবতাতেই ঠাট্টা দাদু। যাও।'

রাজা চুপ করে হাঁটছিল পাশে পাশে। বলল, 'চুপ-চুপ দিদি, ওই দেখ সামনে সমুদ্রের ওপারে, কি দেখা যাচ্ছে।'

ওর কথায় সবাই সেদিকে তাকাল। সামনের গোটা আকাশ জুড়ে মেঘে মেঘে তখন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে, লাল, ধূসর লাল, তার মাঝে পাকানো মেঘের নানা ধরন। আকাশ যেখানে সমুদ্রের সংগে মিশেছে, সেখানে হঠাৎ যেন একটা আলোর বিন্দু জাগল। হঠাৎ সেটাই হলেন সূর্যিমামা। তারপর একটু একটু করে মাথা তুলতে লাগলেন। সমুদ্রের জলে তার উল্টো ছায়াও বাড়তে থাকল।

মালা অবাক হয়ে সে দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, কি সুন্দর দাদু! সূর্য উঠছেন। ভোর হলো।'

বুড়ো দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, দিদিভাই, তাকিয়ে দেখো, ভোর বেলার আলো কি সুন্দর। তাই তো তোমার নাম দিয়েছি ভ-বে-আ!'

সামনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেই মালা যেন আপন মনেই বলল, 'দাদুভাই, তুমি না, খুব ভাল।'

রাজা হেসে বলল, 'তুমি না, এতক্ষণে দাদুভাইকে ঠিক চিনতে পেরেছ দিদি।'

মালা বলল, 'তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি যাব দাদুভাই। আর একদম ভয় পাব না।'

বুড়ো দাদু বললেন, 'এ তো আমি জানি। ভয় পায় যত ভিতু কাপুরুষ গংগারামরা। তুমি ভয় পাবে কেন?'

বিমল বলল, 'তাহলে কাল ভোরেই আমরা পর্তুগীজদের কেল্লা দেখতে যাচ্ছি। সংকেতটা পড়ে রহস্য উদ্ধার করব যে, সে সংকেত কই? আমাকে দাও দাদু, আমরা সারা দুপুর মাথা ঘামাব।'

'দূর দূর, ও সংকেত বোঝা অত সহজ নাকি?' বললেন বুড়ো দাদু, 'আমার বলে মাথা ঘামাতে ঘামাতে মাথায় টাকই পড়ে গেল। তোমাকে দি আর অমনি তোমার মাথা জোড়া টাক পড়ুক, আর সবাই আমার নিন্দে করুক। তা হবে না। ও নিয়ে আমি একাই মাথা ঘামাব। এখন দেখ, দেখ, সূয্যি ঠাকুর কেমন কলসী উল্টে সমুদ্দুরে জল বাড়াচ্ছেন। ওই জন্যেই তো সারা দিন ঢেউ ওঠে।'

সবাই তাকিয়ে দেখল, সত্যিই তো সূয্যিমামা যেন উল্টো কলসী হয়ে বসে আছেন সমুদ্রের বুকে। তার পরেই টুক করে লাফিয়ে উঠে গেলেন আকাশের গায়ে। গোটা আকাশের লাল রঙের খেলাও হলো শেষ।

রাজা বলল, 'চল দিদি এবারে ফেরা যাক। রোদে আমার খুব কষ্ট হয়। হাঁটতে পারি না।'

বুড়ো দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও কষ্ট হয়। চল ফেরা যাক।'

ওরা ফিরতে লাগল। বেশ কিছুটা এসে মালা বলল, 'দাদুভাই, মা কিন্তু আজ তোমাদের চা খেয়ে যেতে বলেছেন। আজ কিন্তু পালাবে না। রাজা ভাই, তোমাকেও যেতে হবে।'

রাজা বলল, 'ওই তো, জানি, আজই আমাদের চা খেতে নেমন্তন্ন করবে তুমি দিদি! আজ যে আমরা খেতেই পারব না।'

বিমল অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'আজ সকালেই পাঁচ বন্ধু আসবে আমার বাড়িতে, এসে গেছে এতক্ষণে। তাদের সংগে চা খাব আমরা। দিদি, তোমরা এগোও। আমরা এখানে দাঁড়াই। আমরা তো যাব বাঁ দিকে।'

বুড়ো দাদু যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গেছিলাম, আজ তো আমারও চায়ের নেমন্তন্ন হিজ রয়েল হাইনেসের বাড়িতে। চা, পাকোড়া, ডিম ভাজা, বেগুন ভাজা, আলু নারকেলের ঘুগনী, আরও কত কি খাব। যাও যাও, এগোও তোমরা। মনে থাকে যেন কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। সব রেডি থাকে যেন।'

মনে ভীষণ দুঃখ নিয়ে ওরা দুজনে এগোলো। বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে মালা বলল, 'দাদুভাই আর রাজা খুব ভাল, না রে দাদা?'

বিমল বলল, 'হ্যাঁরে, খুব মজা করতে পারে।' বলে ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা দুজন আর দাঁড়িয়ে নেই। রাজার বাড়ির দিকে চলে গেছে বোধ হয়।

মালা ফিক করে হেসে বলল, 'দাদুভাই না একটু লোভী আছে রে দাদা, চা খাবে, না বলল বেগুন ভাজা, আলু নারকেলের ঘুগনী। একদিন না মাকে বলে অনেক কিছু রান্না করে ওঁকে খাওয়াব। খুব মজা হবে তা হলে।'

বিমল বলল, 'পর্তুগীজদের কেল্লাটা ঘুরে আসি আগে, তারপর নেমন্তন্ন করব। আচ্ছা, রাজা কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করেছিস?'

'বারে, আমি জিজ্ঞাসা করব না তুই করবি? তোর যদি কিচ্ছু মনে থাকে দাদা।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল, মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দেখে বললে, 'কই, ওঁরা এলেন না?'

মালা বলল, 'ওদের নেমন্তন্ন রাজার বাড়িতে।'

সারাদিন তারপর ভীষণ উত্তেজনায় কাটল ওদের দুজনের। বিমল দুতিনবার ছুটে গেল হোসেন দাদুর বাড়িতে। একবার দড়ি নিয়ে এল। তার পরের বার ছুরি। তারপরে হোসেন দাদু নিজেই এলেন একটা পুরনো রুকস্যাক নিয়ে। বললেন, 'এতে সব মাল পুরে পিঠে ঝুলিয়ে নেবে, তাতে হাঁটতে সুবিধে হবে। তুমি যে আর একজন ছেলের নাম বললে, কি নাম তার?'

'রাজা, উপাধি জানি না। দাদু বলেন হিজ রয়েল হাইনেস।'

'কোথায় থাকে?'

মালা বলল, 'দাদাটা এমন বোকা, তা জিজ্ঞেসই করেনি।'

'রাজা!' একটু ভাবতে চেষ্টা করলেন হোসেন সাহেব। না, অমন কোন নামই ওঁর মনে পড়ল না। বললেন, 'হবে হয়ত বিশ্বম্ভরবাবুর গাঁয়ের কেউ। বোঝা কিছুক্ষণ তুমি তার কাঁধে তুলে দিও। বুঝলে ইয়ংম্যান?'

মাথা নাড়ল বিমল। মালা বলল, 'আজ বিকালে নিশ্চয়ই ওঁরা আসবেন দাদু। তুমি এসো না তখন, তাহলেই সবার সংগে দেখা হবে।'

মাথা নেড়ে হোসেন সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তা তো বটে। তাহলে বিকালে আমি এসে বসছি। বিশ্বম্ভরবাবুর সংগে বহুদিন দেখাও হয়নি। রাজার সংগেও আলাপ হবে।'

বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদু, গুপ্তধন সত্যি আছে নাকি পর্তুগীজদের ভাংগা কেল্লায়?'

কথাটা শুনে জোর করে মুখটা বেশ গম্ভীর করলেন হোসেন সাহেব। একটু যেন ভাবার ভানও করলেন। বললেন, 'চারদিকে গুজব তাই। কে যেন কোথায় একটা সাংকেতিক লিপিও খুঁজে পেয়েছেন। সেটা যে এখন কার কাছে আছে তাই কেউ জানে না। গুপ্তধন থাকলেও থাকতে পারে। কথাটা পাঁচ কান কর না।'

ভীষণ উত্তেজনায় মালা চাপা গলায় বলল, 'সাংকেতিক লিপিটা এখন নতুন দাদুর কাছে আছে। দাদু ওটা নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন বলেই মাথায় অত বড় টাক পড়ে গেছে।'

দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে হোসেন সাহেব বললেন, 'তা হতে পারে, হতেও পারে। কালই তো সব রহস্য ভেদ হচ্ছে! দেখ এখন তোমাদের কপালে কি আছে।'

বিকাল বেলা রোদের তেজ কমতেই হোসেন সাহেব আবার এসে বসলেন মালাদের বাড়িতে। চা জলখাবার খেলেন। অনেক গল্প বললেন। বললেন, 'পাশের জমিদার বাড়ির লোকজনরা কেন আর আসেন না এখানে। ক'বছর আগে এক ঝড়ের রাতে ওবাড়ির এক ছেলে সমুদ্রে ভেসে যায়। সেবার সমুদ্রে বান ডেকেছিল। সে ছেলের নাম ছিল সম্রাট। সম্রাটের মতই দেখতে ছিল তাকে। হোসেন সাহেবের এ্যালবামে তার একখানা ছবি আছে। সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই আর জমিদার বাড়ির কেউই আসেন না এখানে।'

মালা বলল, 'খুব দুঃখের কথা তো দাদু। এখানে নুলিয়া নেই?'

'আরে না, না, এখানে সমুদ্রে কেউ স্নানই করে না। খবরদার তোমরা জলে নামবে না। জলের মধ্যে ঘোঘ আছে। পড়লে তলিয়ে যাবে। সম্রাটও ঝড়ের রাতে ঘোঘের মধ্যে পড়ে মারা যায়। বডিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশ্বম্ভরবাবু তোমাদের সাবধান করেননি?'

বিমল বলল, 'না তো, এ নিয়ে উনি কিছুই বলেননি। তবে আমি আর মালা দুজনেই সাঁতার জানি না, আমরা জলে নামবই না।'

কথায় কথায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ আর এল না। অনেক রাতে হোসেন সাহেব উঠলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি, বিশ্বম্ভরবাবু তো কখনও এমন করেন না। হয়ত কোনও কাজে হঠাৎ আটকা পড়ে গেছেন। দেখ কাল, সকালে আসেন কিনা। তোমরা অবশ্য সময়মতো তৈরি থেক।'

পরদিন ভোর রাতে হৈ হৈ পড়ে গেল মালাদের ওখানে। মালপত্র রুকস্যাক ঠেসে কাঁধে তুলে তৈরি হলো বিমল। জলের বোতল আর টুকিটাকি ভরা একটা ছোট্ট ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে মালাও রেডি হলো। সংগে সংগে বাইরে সেই চেনা গলা শোনা গেল, 'রেডি, রেডি তোমরা দুজনে? তাহলে আর দেরি করা কেন? চল বেরিয়ে পড়।'

হুড়মুড় করে দুজনে বাইরে বার হয়ে পড়ল, কোনোমতে মার কাছে বিদায় নিয়ে।

বুড়ো দাদু সমানে বলতে থাকলেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না, কোনও চিন্তা করবেন না। এই বিকাল নাগাদ অন্ধকার ঘনাবার আগেই ফিরব। তখন কব্জি ডুবিয়ে ভোজন করা যাবে। কি বল হে ইয়োর এক্সেলেন্সি?'

রাজা হেসে বলল, 'হাঁটাই আরম্ভ হলো না, এখনই ফিরে কি খাবে তা চিন্তা করছ দাদু। আচ্ছা পেটুক তো তুমি!'

বুড়ো দাদু অবাক হয়ে বললেন, 'এ্যাঁ, তাই তো, এ তো ঠিক নয়। চল-চল, হাঁটতে শুরু কর। অনেক পথ বাকী সামনে।'

মালার মা বললেন, 'দুর্গা দুর্গা।'

ওরা হাঁটতে আরম্ভ করল। তখনও চারদিকে আলোর সাড়া জাগেনি। জোর কদমে হেঁটে ওরা ঝাউবনের মধ্যে ঢুকতেই যেন জোরে বাতাস ছাড়ল। রাজা বলল, 'ও দাদু, আজ যে আকাশ-ভরা মেঘ। পথে বৃষ্টি হতে পারে। সূয্যিমামার মুখ আর দেখা যাবে না।'

বুড়ো দাদু বললেন, 'হোক, তাহলে ভিজব। নুনের পুতুল তো কেউ নই যে গলে যাব।'

মালা বলল, 'বেশ লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে।'

বিমল বলল, 'হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো, সর্দিজ্বর, সাগু বার্লি, নয়তো হরলিক্স।'

ঝাউবন পার হতেই বাতাসের বেগ যেন আরও বাড়ল। আকাশ জুড়ে ঘন মেঘের মেলা। হাওয়ায় সেগুলো যেন শূন্যে তালগোল পাকাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মালা জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন দাদু, বিদ্যুৎ চমকাবে না তো, বাজ পড়বে না তো?'

নতুন দাদু বললেন, 'পড়তে পারে, পড়তে পারে, চল চল, জোর কদমে হাঁট। আকাশের যে হাল, মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঘূর্ণীঝড় আসছে। তা হলে তো সর্বনাশ।'

রাজা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা হলে কি ফিরবে দাদু?'

'হুঁঃ।' বলে দাদু শুধু তাকালেন রাজার দিকে।

রাজা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, আমি আমার জন্য বলছি না দাদু। আমি এখানকার ছেলে, আমার তো সবই জানা আছে, আমি নতুন দিদি আর দাদার জন্য বলছি।'

বিমল মালা প্রায় এক সংগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঃ, আমরা কখন আবার ফিরতে চাইলাম? আমরা যাব।' বলেই মালা জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন দাদু, সংকেত লিপিটা এনেছ তো? কি লেখা আছে তাতে?'

বুড়ো দাদু বললেন, 'লেখা আছে, কেল্লা গড়ে যাও, কাঁচা কলা খাও। দুটো শব্দ পড়তেই পারছি না, তারপরেও লেখা, খাও। কি খাব, কেন খাব, কতটা খাব, কিছুই আর তাতে লেখা নেই। তবে ওই যে কাঁচকলা খেতে বলেছে...ওই কলাতেই আসল রহস্য কিছু থাকতে পারে বলে মনে হয়।'

বিমল বলল, 'লুটের মাল!'

মালা বলল, 'হীরে জহরত! উঃ, আমরা তাহলে বড়লোক হয়ে যাব। না নতুন দাদু?'

বুড়ো দাদু এ কথার উত্তর না দিয়েই বললেন, 'চল চল, হাঁট জোরে জোরে। এখনও কেল্লার দেখা নেই, ওদিকে হীরে জহরতের হিসাব হচ্ছে। শোন কান্ড! চোরাই মাল ঘরে রাখলে পাপ হবে না? পুলিশে কোমরে দড়ি দেবে না? তবে? বড়লোক হলেই হলো?'

অবাক মালা বলল, 'অত গুপ্তধন তাহলে কি হবে?'

'কি আর হবে, দশ ভূতে যেমন লুটে খাচ্ছে আজকাল, আরও দশ বিশ বছর তেমনি করেই এ ও সে, খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে খাবে। শেষে সব ভস্কিকার হয়ে যাবে। অবশ্য তার আগে আজ যদি আমরা পাই কিছু, তো তখন ভেবে দেখা যাবে তা দিয়ে কি করা যাবে।' বলে রাজার দিকে তাকিয়ে বুড়ো দাদু চোখ ঠারলেন।

হেসে রাজা বলল, 'একটা মস্ত বড় জাহাজ কিনে সমুদ্র পাড়ি দিলে হয় না। সমুদ্র পাড়ি দেবার শখ বলে আমার কতদিনের।'

বিমল বলল, 'তা মন্দ বলনি। তবে আমি পেলে আগে একটা বাড়ি করব। যেখানে আমরা সবাই আরাম করে থাকতে পারব। তোমরাও থাকবে। তোমাদেরও নেমন্তন্ন রইল।'

বুড়ো দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হুঁঃ, শুধু কথা আর কথা। বলছি, পাঁই পাঁই করে চল, দেখছ না পিছন দিকের আকাশ কেমন কাল হয়ে গেছে। তার মানে এবারে ঝড় আসছে। সেই সেবারের মতো ঝড়। এসে পড়ল বলে, ছোট, ছোট সবাই।'

সত্যি, তখনি ফের দমকা বাতাস ছাড়ল। সমুদ্রের ঢেউগুলোও যেন হঠাৎ পাহাড়ের মতো বড় হয়ে তীরে আছড়ে পড়তে লাগল। জল হু হু করে তেড়ে এসে ওদের পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিতে লাগল। বড় বড় পা ফেলে ওরা চলতে লাগল। পিঠের বোঝাটাও তখন বেশ ভারী বলে মনে হতে লাগল বিমলের। হাঁপিয়ে পড়ল মালা। কাতর ভাবে বলল, 'ও নতুন দাদু, একটু আস্তে, আর একটু আস্তে চল না। রাজা ভাই আমার থলিটা ধরবে একটু?'

রাজা ভীষণ ভয়ে বলল, 'দিদি, থলি ধরতে হবে না, ছোট, সত্যি ছোট, শুনতে পাচ্ছ না, বাতাসের গোঙানি। ঝড় এসে পড়ল বলে। ছোট, ছোট।' বলে ও আর দাঁড়াল না। ছুটে সামনের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভীষণ ভয়ে মালা ডাকল, 'দাদা, দাদা, তুই কোথায় রে?'

ওর কথা শেষ হবার সংগে সংগে চারদিক কাঁপিয়ে বাতাস গোঙাতে আরম্ভ করল। ঝড়ের দাপটে সমুদ্র যেন ক্ষেপা দৈত্যের চেহারা নিল। আকাশ-ছোঁওয়া এক একটা ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে ওদের দিকে ছুটে আসতে লাগল!

বিমল চেঁচিয়ে উঠল, 'ছোট, ছোট রে মালা ডাঙার দিকে। নইলে ডুবে মরব।' কথার শেষে বোনকে ধরে টেনে হিঁচড়ে ও নিয়ে চলল তীরের দিকে। সমুদ্রের জল যেন ওদের পিছন পিছন তাড়া করে আসতে লাগল। পিঠের বোঝা ফেলে দিল বিমল। বোনের কাঁধ থেকে ঝোলা আর জলের বোতলও টান দিয়ে ফেলল। ঝড়ের হাওয়ার সংগে লড়তে লড়তে ও যখন বোনকে উঁচু জমিতে এনে ফেলল, তখনও ঝড় ওদের চারপাশে গোঙাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে মালা বলল, 'দাদা, দাদা, তুই বড় ভাল রে দাদা। তোর খুব কষ্ট হলো, না রে?'

হাঁপাতে হাঁপাতেই বিমল বলল, 'হলোই তো কষ্ট, তোর জন্য। কেন বলছিস পারব না, পারব না, করব না, করব না, তার জন্যই তো আমার এত কষ্ট হলো। রুকস্যাক, থলি, জলের বোতল সবই ফেলে দিতে হলো। তুই যদি অমন না করতিস তবে তো এমন হত না।'

ঝড়ের গোঙানি যেন একটু কমল। বৃষ্টির ছাঁটও যেন হাল্কা। মালা বলল, 'আর অমন করব না রে দাদা। সত্যি বলছি, আর অমন করব না। আর তোকে কষ্ট দেব না। তুই যা বলবি তাই করব।'

বিমল অন্ধকারেই এদিক ওদিক দেখে বলল, 'এখানে বসে থেকে ভিজে লাভ নেই। চল আমরা সামনের দিকে হাঁটা দি। কোন দিকে দাদু আর রাজা গেল কে জানে। আগে আমাদের কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে হবে। না হলে ভিজে অসুখে পড়ব।'

মালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, আমি ঠিক হেঁটে যেতে পারব। কিন্তু নতুন দাদু আর রাজা, ওদের কি হবে?'

'ওরা এখানের সব জায়গা চেনেন। আমরাই নতুন। আমরা কোথাও গেলে ওরা ঠিক খুঁজে নেবে।'

আর কথা বাড়াল না ওরা। দুজনেই সমুদ্রের উল্টো দিকে হাঁটা দিল। অল্প কিছুটা এগিয়েছে, অমনি বাতাসের বেগ কমতে লাগল, বৃষ্টিও যেন অনেক ধরে এল। ঠান্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরা ঘোর অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

আরও কিছুটা এগোতেই বৃষ্টি একদম থেমে গেল। থেকে থেকে শুধু ঝোড়ো হাওয়া দিতে লাগল। তার সংগে আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝিলিক মারতে লাগল। গুড়গুড় শব্দে চার দিকের অন্ধকার কাঁপাতে লাগল।

মালা বলল, 'ভয় করছে রে দাদা। নতুন দাদু কই? আর কত

দূরে পর্তুগীজদের পুরনো কেল্লা রে?'

'জানি না', বলতে যাচ্ছিল বিমল, ঠিক তখনি দূরের আকাশ চিরে আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে ওরা দুজনেই দেখল, সামনে কিছুদূরে বিশাল পাঁচিল-ঘেরা দুর্গের ফটক দেখা যাচ্ছে। এদিক ওদিক তার ভাংগা। বিমল বলল, 'চল, চল, ওই দিকে চল। গেটের তলায় দাঁড়ালে, অনেক কম বাতাস লাগবে। আবার বৃষ্টি পড়লেও ভিজব না। আর দাদু ও রাজাও এসে পড়বে নিশ্চয়ই।'

বেলা কত, কে জানে। সংগে খাবার নেই। জল নেই। শুকনো জামা-কাপড় নেই, দেশলাইও নেই যে একটু আগুন করবে। বিমল দেখল, ওর বোন ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভীষণ ভয় হলো ওর। আবার যদি কোনও অসুখ করে বোনের।

পিছন দিকে তাকিয়ে মনে মনে আরও ভয় পেল বিমল। কোথাও কোনো জনমানব নেই। এমন নির্জন জায়গায় একা ও বোনকে নিয়ে কি করবে?

নিজের জামাটা খুলে ফেলল বিমল। নিংড়ে গামছার মতো গা মুছে ফেলতে বলল বোনকে। তারপর একটু এগিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাক দিল 'দাদু, দাদু, আপনারা কোথায়, রাজা, রাজা, আমরা কেল্লার ফটকে পৌঁছে গেছি।'

কেউ এ ডাকের সাড়া দিল না। শুধু পেছনের ভাংগাচোরার মাঝে কেমন যেন হুটোপাটির শব্দ হলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার সব নিঝুম হয়ে গেল।

বিমল বলল, 'তোর খুব খিদে পেয়েছে, না রে?'

মালা বলল, 'না রে দাদা, ও নিয়ে ভাবিস না। এখন আমরা যদি ভয় পাই না, তবে খুব বিপদ হবে। কিচ্ছু হয়নি আমাদের। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে একটু আলো হবে। যদি দেখি নতুন দাদু আর রাজা আসছে না, তাহলে তখন ওদের খুঁজতে বার হব। সেটা আমাদের করতেই হবে। আমরা হারিয়ে গেলে ওরাও তাই করত।'

'ঠান্ডায় কাঁপছিস তুই।'

'একটু আগুন জ্বালালে হয় না?'

'দেশলাই কোথায় পাব?'

'পাথর ঠুকে চকমকির মতো আগুন জ্বাললে হয় না। আমি কাঠকুটো ঘাস যোগাড় করছি রে দাদা। তুই দুটো পাথর যোগাড় কর।'

'দূর, ওসব গল্পে লেখে, আসলে হয় না।' বলল বিমল।

'ওই তো দাদা, এখন তুই বলছিস, হবে না, হবে না। না হোক, চেষ্টা করতেই হবে। তুই পাথর দেখ। আমি ঘাসকুটো যোগাড় করছি।'

দুটো মনমতো পাথর অন্ধকারে খুঁজতে লেগে গেল বিমল। একটা যোগাড় হলো, অন্যটা খুঁজছে। হঠাৎ ওদিকের অন্ধকার থেকে মালার চাপা ডাক শুনতে পেল, 'দাদা দাদা, এই দিকে আয় শীগগির।' ও যে ভীষণ উত্তেজিত তা বুঝতে পারল বিমল। বেশ ভয় পেয়ে ও ছুটেই গেল বোনের কাছে।

মালা অন্ধকারে একটা দিক দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখ।'

দেওয়ালের ধারে একটা ঠাসা বোঝাই রুকস্যাক পড়ে আছে। ওটা ওদের নয়, অন্য কারও। তার মানে আরও কেউ নিশ্চয়ই এসেছে এই কেল্লায়। কিন্তু সে গেল কোথায়?

বিমল বলল, 'ওর মধ্যে নিশ্চয়ই টর্চ আছে। বার করব?'

'শুকনো জামা-কাপড়ও থাকতে পারে।' বলল মালা।

বিমল বলল, 'আমরা তো চুরি করছি না। দরকার পড়েছে তাই ব্যবহার করছি। নিশ্চয়ই তার জন্য কেউ কিছু বলবে না।'

চটপট রুকস্যাকটা খুলে ফেলল বিমল। টর্চ বার হলো, ছুরি বার হলো, খাবারের একটা প্যাকেটও পাওয়া গেল। সংগে কিছু শুকনো জামা কাপড়। আলো জ্বেলে দেখল বিমল, রুকস্যাকের গায়ে লেখা এ, আর। ওরা তাড়াতাড়ি ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল। তোয়ালেতে চুল মুছতে মুছতে মালা বলল, 'দাদা, এ.আর-ই বা গেলেন কোথায়? এখানে এসেছিল যে তা তো দেখাই যাচ্ছে।'

টর্চটা ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে আলো ফেলতে ফেলতে একবার নীচের দিকে ফেলে বিমল থমকে গেল। ওরা যে ধরনের জুতো পরেছে তেমন নয়, অন্য আর এক ধরনের জুতোর ছাপ মেঝের ধুলোতে, সে ছাপ সোজা চলে গেছে ভিতরের ভাংগাচোরার দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে সে ছাপ আর ফিরে আসেনি। তার মানে জুতোর মালিক এখনও ভিতরেই আছে। আটকা পড়েছে! মালা বলল, 'এ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো রে দাদা?'

বিমল কোনো উত্তর না দিয়ে ফটকের শেষে গিয়ে ভিতর দিকে তাকিয়ে ফের চেঁচিয়ে উঠল, 'এ. আর মশাই আপনি কোথায়? সাড়া দিন, এ. আর মশাই, সাড়া দিন।' বার বার ডাকল বিমল।

আবার কিন্তু হুটোপাটির আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু কেউ এ ডাকের সাড়া দিল না।

মালা বলল, 'নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন রে দাদা। চল ভিতরে চল। তুই ছুরিটা খুলে হাতে নে, আমি টর্চ ধরি। বৃষ্টির আগে যদি ভিতরে গিয়ে থাকেন তো খুব খারাপ ব্যাপার।'

বিমল বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর ভয় করবে না?'

'দূর, তুই চল তো দাদা। একজন বিপদে পড়েছে, এখন কি ওসব ভাবার সময়?' বলে ও হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে এগিয়ে গেল কেল্লার ভিতর দিকে।

গেটের পরেই লম্বা একটা বারান্দা। সেটা বোধহয় দেওয়াল বরাবর চারদিকে ঘুরে গেছে। মাঝখানে উঠোন। তারপর এদিকে ওদিকে ঘরের সারি, যার প্রায় সবগুলোই ভেংগে পড়েছে। পায়ের ছাপ বারান্দার পাথুরে মেঝেতে এসে শেষ হয়ে গেছে।

তবুও আলো ফেলে ওরা বারান্দা ধরে এগোলো একদিকে। কিছুটা এগিয়ে বিমল আবার ডাক দিল, 'এ. আর মশাই কি এদিকে কোথাও আছেন? এ.আর মশাই।'

ওর ডাকের সাড়া দিতেই যেন বাঁ দিকের ভাংগা ঘরগুলোর সামনে দুজনের ছায়া ভেসে উঠল। ওদিকে মালা আলো ফেলার আগেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বুড়ো দাদু ওখান থেকে বললেন, 'আলো এদিকে ফেল না, এদিকে না, ওই ডান দিকের ভাংগা ঘরটার পাশে ফেল। এগিয়ে এসো শীগগির, সাবধানে। ওখানে মেঝেতে একটা বড় ফাটল আছে। তোমরা যাকে খুঁজছ সে বেচারা ওই ফাটলের মাঝে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তোল তাকে, তোল তাড়াতাড়ি।'

মালা আর বিমল ওঁর কথামতো সাবধানে এগিয়ে গেল ওই ভাংগা ঘরটার পাশে। সত্যি সেখানে পাশের বাঁধানো মেঝের ক'টা পাথর নেই। ফাটলের মাঝে মালা আলো ফেলতেই দেখল, ভিতরে একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সাহস করে গর্তের মধ্যে নেমে পড়ল বিমল। মালা আলো ধরে রইল। অনেক কষ্টে ছেলেটাকে কাঁধে করে উপরে তুলল বিমল। মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আচ্ছা দাদু, এ তোমাদের কেমন ব্যাপার বল তো! তোমরা তো আমাদের আগেই এখানে এসেছ। ছেলেটিকে এমনি ভাবে পড়ে থাকতেও দেখেছ। তোলনি কেন?'

বুড়ো দাদু ধমকে বললেন, 'ওসব বাজে কৈফিয়ত পরে নিও। আমরা এখানে আছি, মালাও থাক। তুমি ছুটে যাও ওর মালের কাছে। দেখ ভিতরে কোনও ওষুধ আছে কিনা। যাও,

অন্ধকারে মালা বলল, 'নিশ্বাস পড়ছে ঠিক ওর। তবে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। দেখেছ নতুন দাদু, একেবারে বাচ্চা ছেলে।'

বুড়ো দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলে বটে একখানা। তোমাদের পাশে রতনবাবুর বাড়ি, সে বাড়ির ছেলে। এসেছে কাল, আজই কাউকে না বলে একা চলে এসেছে। কি সাহস! আর তুমি...'

ভীষণ রাগে মালা বলল, 'আর আমি কি? ভিতু কাপুরুষ গংগারাম? খবরদার বলছি দাদু, আর আমার নামে মিথ্যে কথা বলবে না। এখন আর আমাকে কেউ ভিতু বলতে পারবে না।'

টাক চুলকে বুড়ো দাদু বললেন, 'তাই তো, ওহে রয়েল হাইনেস, একে কি আর ইয়ে, মানে ইয়ে...বলা চলে?'

রাজা মুচকি হেসে বলল, 'না, তবে দাদু এখনও তো শেষ পরীক্ষাটাই বাকী থেকে গেল। সেটা—পাশ করলে তবে আর সন্দেহ থাকবে না।'

মালা বলল, 'কি পরীক্ষা শুনি?'

'সে শুনবে ঠিক সময়েই,' বলল রাজা, 'দেখ দেখ দিদি, তোমাদের এ. আর মশাই যেন একটু নড়ল।'

সত্যিই ছেলেটা আস্তে একটু কাতর আওয়াজ করে জোরে নিশ্বাস ফেলল।

বুড়ো দাদু, মহা উৎসাহে বললেন, 'ব্যস, আর কি, জান বাঁচ গিয়া। বুঝলে নাতনি, এমন একটা কিছু হতে পারে ভেবেই তোমাদের দুজনকে এখানে ধরে এনেছি। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, তোমরা একশয় একশ পেয়েছ। বুঝলে নাতনি, ভয়-টয় কিছুই না। আর গোটা পৃথিবী জুড়ে শুধু যে বদমাশরা বাস করে তাও ঠিক নয়। এই আমরা আছি, না, না, এই তোমরা আছ। তুমি আর বিমল। আর আছে, ওই তোমাদের হোসেন দাদু। আর আছে তোমাদের ডাক্তার দাদা। আর আছে এই রাজা, হিজ রয়েল হাইনেস। না, না, মানে এই যে তোমাদের নতুন বন্ধু সাহসী এ. আর মশাই। এরাই সব। তবে আর মুখ গোমড়া করে বসে থাকা কেন বাপু। যাক গে, অনেক লেকচার দেওয়া হলো। আমাদের ছুটি, যেতে হবে এখন অনেক দূর। মনে থাকবে তো আমাদের কথা? হুজুগ তুলে কেমন নাচিয়ে ছাড়লাম বল?'

মালা বলল, 'বাঃ, তার মানে?'

অন্ধকারে কি যেন কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ বুড়ো দাদু। বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, শুনতে পাচ্ছ?'

রাজা বলল, 'হ্যাঁ, ওরা এসে পড়লেন মনে হচ্ছে। চলুন, যাই।'

অবাক মালা বলল, 'কই, কারা আসছে দাদু? তোমরা কোথায় যাবে?'

ওর কথা শেষ হতেই বাইরের ফটকের কাছে অনেকের গলা শোনা গেল। তাকিয়ে দেখল মালা, আলো নিয়ে অনেকেই আসছে ওর দিকে। সবার আগে ওর দাদা। ভীষণ ব্যস্ত যেন। ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ হোসেন দাদুর গলা শোনা গেল, 'ঐ তো, ঐ তো ওখানে নাতনি।' প্রায় ছুটেই সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল ওকে। ক'জন সংগে সংগে ঝুঁকে পড়ে এ. আর-কে নিয়ে পড়ল। একজন মুখ তুলে বলল, 'না, না, পড়ে গিয়ে, চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনে হয় আঘাত তেমন কিছু নয়।' হোসেন দাদু বললেন, 'যাক। তাহলে চল, ওই গেটেই গিয়ে বসা যাক। এখন কটা বাজে!'

একজন হাতঘড়ি দেখে বলল, 'প্রায় সাতটা।'

'তাহলে আর রাতে রওনা দিয়ে কাজ নেই, বাকী রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিই,কি বল?তিনজনের তাহলে কিছুটা রেস্ট নেওয়া হবে।'

'সেই ভাল দাদু।' বলল আর একজন।

মালা চুপিচুপি বলল,'দাদা,নতুন দাদু আর রাজা কোথায়?

বিমল এ কথার কোনো উত্তর দিল না।

আলোয় চোখ মেলে তাকাল এ. আর। হোসেন দাদু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছ অরুণ? ছিঃ,ছিঃ, এমন না বলে একা আসতে হয়? ভাগ্যিস এরা এসেছিল, তা না হলে কি হত বল তো?'

ওকে ধরাধরি করে সবাই নিয়ে এল বড় ফটকের তলায়। সেখানে তখন গোটাকতক শতরঞ্জি পাতা হয়ে গেছে।

অরুণকে একপাশে শুইয়ে দিয়ে একটা চাদর গায়ে দিয়ে দিলেন হোসেন দাদু। সবাই বসলে, বললেন, 'নাও খাবার-দাবার যা আছে বার কর। উঃ, কি ছোটানটাই না ছুটিয়েছে এরা। তবে হ্যাঁ, বিশ্বম্ভরবাবু শেষ বারের মতো সবাইকেই বেশ নাচিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস তা করেছেন। তা না হলে...'

অরুণ ক্লান্ত ভাবে বলল, 'ঝড় ওঠার আগে ভাবলাম একবার চারদিকটা ঘুরে দেখেইনি। ওখানে যে অমন ফাটল ছিল তা কে জানে। কিছু বোঝার আগেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছি। তোমাদের দুজনকে ধন্যবাদ ভাই। তোমরা না এলে কি হত যে...'

মালা বলল, 'ধন্যবাদ তুমি দিও নতুন দাদুকে, রাজাকে, নতুন দাদু, ওই যে হুলুস্থূল দাদু। আর রাজা, হিজ রয়েল হাইনেস। ওঁরাই তো আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। ওঁরাই তো তুমি কোথায় আছ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা আসার আগে বাঁশবনে শেয়াল তাড়িয়েছেন। তা না হলে অত অন্ধকারে যে কি হত কে জানে।'

অরুণ বলল, 'কোথায় তারা?'

বিমল বলল, 'দাদু আর রাজা আর আসবে নারে।'

'কেন?'

'ওই যে বলেছিলাম না নাচিয়ে দিয়ে যায়। শেষবারের মতো ওরা তোমাদের দুজনকে নাচিয়ে দিয়ে গেছেন।' বললেন হোসেন দাদু।

'মানে!'

'কাল তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরে শুনি, গত ঝড়ের রাতে বাজ পড়ে বিশ্বম্ভরবাবু মারা গেছেন। খবর শুনেই ছুটে যাই তোমাদের বাড়িতে। তখন তোমরা সবাই শুয়ে পড়েছ। আজ ভোর রাতে গিয়ে শুনি তোমরা আধঘণ্টা আগে বার হয়ে পড়েছ। লোকজন ডেকে ছুটতে ছুটতে আসছি পিছন পিছন। বিশ্বম্ভরবাবু ছিলেন মহৎ মানুষ। তুমি গোমড়া মুখে বসে আছ দেখেই এসেছিলেন। তাতে আর যাই হোক, রতনবাবুর বাড়ির অরুণ রায় অন্তত অপঘাত থেকে বাঁচল। বিশ্বম্ভরবাবু গুপ্তধনের কথা বলে নাচিয়ে ছিলেন না? তা বাপু, তার থেকেও অনেক অনেক বেশি তোমরা সবাই পেয়েছ। সেটাই তোমাদের লাভ।'

'আর রাজা ভাই, ও কে?' মালা জিজ্ঞাসা করল।

'ও ছিল জমিদার বাড়ির ছেলে। নাম সম্রাট। ওকেই মজা করে রাজা বলে পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বম্ভরবাবু। যাক গে ওসব কথা। এখন সঙ্গে আনা খাবারগুলো বার কর তো। খাওয়ার পর পাঁচ ফোঁটা করে ব্রান্ডী খাবে সবাই। তাহলে আর ঠান্ডা লাগবে না, তবে অরুণ রায় মশাইকে দেওয়া হবে দশ ফোঁটা। চিৎপটাং হয়ে পড়েছিলেন তো। তাই গায়ের ব্যথা মারতে–' বলে হোসেন দাদু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

ছবি : দিলীপ দাস

পিকলু মামার স্যান্ড্‌উইচ

কমল লাহিড়ী

কাবুল থেকে পিকলু মামা
সাহেব সেজে এসে,
বলল, তোরা জানিস কি কেউ
স্যান্ডউইচ হয় কিসে?
হাবলু-টেঁপি-রুণকি বুবাই
সবাই হলো চুপ,
কারও মুখে নেইকো কথা
জ্বাললো মামা ধূপ।
ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকে
মুখ খুলল মামা,
বলল, এবার যা নিয়ে আয়
বড় একটা ধামা।
ধামার মধ্যে রাখতে হবে
সাতটা হাঁসের ডিম,
পাউরুটি আর গাধার দুধে
তৈরি হবে ক্রীম।
ডিমের সঙ্গে ক্রীম মাখিয়ে
ভাজতে শুরু কর
সাহেবী এই স্যান্ডউইচের
বড়ই এখন দর।
ভালবেসে দিলাম তোদের
অনুপানটা বলে,
লিখে রাখিস অঙ্ক খাতায়
নইলে যাবি ভুলে।

ছবি : কাক্তী

চোবাটোকার গুপ্ত রহস্য

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার চট্টরাজ মশাই যেমন ধনী তেমনি আমুদে। কোম্পানীর আমল থেকে ওঁরা কলকাতার বাসিন্দা। তাঁদেরই কোনো এক পূর্বপুরুষ নাকি সে-যুগে নুন আর সোরার ব্যবসা করে, এত টাকা উপার্জন করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন যে এখনও ওঁদের কয়েক পুরুষ দিব্যি পায়ের ওপর পা রেখে রাজার হালে দিন কাটিয়ে যেতে পারেন।

তাই বলে চট্টরাজ মশাই পায়ের ওপর পা রেখে আলস্যে দিন কাটাবার পক্ষপাতী নন কোনোদিনই। কলকাতার নামী কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন তিনি আর পাঁচটা তুখোড় বুদ্ধি ছেলেদের সঙ্গে, কাজ না করে ঘরের টাকা ভেঙে বাবুয়ানির কথা ভাবতেই পারেন না। তাই আইনের পরীক্ষা-টরীক্ষায় পাশ করে নিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ শুরু করে দিয়েছেন।

অবশ্য কু-লোকে বলে—প্র্যাকটিস্ না ছাই। হাইকোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর স্রেফ আড্ডা দেওয়া। গত কয়েক বছরে কোন জজের এজলাসে তাঁকে ক'বার হাজির হতে দেখা গেছে তা বোধহয় আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে কোর্ট তিনি কোনোদিনই কামাই করেন না। কোর্টে গেলেই দেখা যাবে চট্টরাজ মশাই তাঁর নির্দিষ্ট টেবিলটিতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে সমানে আড্ডা দিয়ে চলেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে চা আসছে, সন্দেশ আসছে, আসছে আরও নানা মুখরোচক খাবার। চট্টরাজ মশাই খেতে খুব ভালবাসেন, ভালবাসেন খাওয়াতেও।

আড্ডা ছাড়া আর একটা নেশা আছে তাঁর। সেটা হলো দেশভ্রমণের নেশা। ভারতবর্ষের হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি কোনো-না-কোনো সময়ে গিয়ে বেড়িয়ে আসেননি। এই দেশভ্রমণের জন্য দেদার খরচ করতেও তিনি মুক্তহস্ত।

কিন্তু দেশের বাইরে, ইচ্ছা থাকলেও, এ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যতবার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্ত্রী-ই বাগড়া দিয়েছেন তাতে। কারণ চট্টরাজ মশাইয়ের একটা দোষ, স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাবেন না। প্রায়ই বলেন, ওগো, ইংরেজিতে কথা বলাটা এবার একটু ভালো করে সড়গড় করে নাও—বিদেশে তো তোমার বাংলা আর ভাঙা হিন্দী কোনো কাজে আসবে না। হিন্দী এখানকার রাষ্ট্রভাষা হতে পারে কিন্তু ও-সব দেশে অচল।

কিন্তু সেবার হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল।

চট্টরাজ মশাইয়ের বড় জামাই ইঞ্জিনীয়ার। একটা মস্ত বড় কোম্পানীতে কাজ করে। হঠাৎ তাকে কোম্পানী থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো জাপানে, কতকগুলি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে আসার ট্রেনিং নেবার জন্য। বছর দুই থাকতে হবে ওখানে। জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর মেয়েও চলে গেল জাপানে।

আদুরে মেয়ে, জাপানে দিনকয়েক কাটিয়েই মাকে চিঠি লিখল—মা, তোমাদের ছেড়ে এসে এখানে মন টিকছে না একদম। দেখছি অনেক কিছুই, জাপানী ভাষাও শিখবার চেষ্টা করছি অল্প-সল্প, কিন্তু মন খুলে কথা না বলতে পারলে ভালো লাগে কি? তোমার জামাই তো অষ্টপ্রহরই টই-টই করে বেড়াচ্ছে। তাই বলি কি, বাবার তো দেশ বেড়াবার শখ চিরকালের, বাবাকে নিয়ে চলে এস না দিনকয়েকের জন্য। ভারি সুন্দর এই দেশ। দেখলে বাবা ভারি খুশি হবে।

চট্টরাজ-গিন্নী আদরের মেয়ের কথা ঠেলতে পারলেন না। স্বামীকে বললেন, তা হলে চল ঘুরেই আসি দিনকয়েক। খুকু এত করে লিখেছে...

যথাসময়ে চট্টরাজ মশাই সস্ত্রীক টোকিওর এয়ারপোর্টে এসে নামলেন। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীটা এখন অনেক

ছোট হয়ে গেছে। চট্টরাজ মশাইয়ের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় মামার বাড়ি পূর্ববংগে যেতে কলকাতা থেকে সময় লাগত পাক্কা দু'দিন অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টা। প্রথমে ট্রেন, তারপর স্টীমার, তারপর নৌকো। কিন্তু জায়গাটার দূরত্ব কলকাতা থেকে দেড়শ' মাইলও হবে না। আর এখন? কলকাতা থেকে সুদূর জাপানে পাড়ি দিতে বারো ঘণ্টাও লাগল না। তাজ্জব ব্যাপার!

এয়ারপোর্টে মেয়ে জামাই দু'জনেই এসেছিল, আর সংগে এসেছিল তাঁর নাতি টুটু—বছর দশেকের টুকটুকে ছেলে।

খুকু অর্থাৎ চট্টরাজ মশাইয়ের মেয়ে সীতা বলল, টোকিও শহরই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহর। শহরের এই হট্টগোলের মধ্যে থাকতে আমাদের ভালো লাগে না, তাই আমরা কাছেই উকুবাসি নামে শহরতলিতে বাসা নিয়েছি। তিরিশ কিলোমিটারের মতো পথ। গাড়িতে আধঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাব।

রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী গাড়িগুলি ছুটছে। কোনো কোনো জায়গায় দোতলা, এমন কি তেতলা রাস্তাও রয়েছে। সেগুলি পার হয়ে ওঁরা ক্রমে শহরের বাইরে এসে পড়লেন। কী সুন্দর ঝকমকে রাস্তা! কোথাও খানাখন্দ নেই, নেই কোনোও আবর্জনা। দু'পাশে এখানে ওখানে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবচেয়ে চোখে পড়ে চেরিফুলের গাছ। চট্টরাজ মশাই অবাক চোখে দেখছেন আর দেখছেন আর দেখছেন।

শ্বশুর-শাশুড়ীর আগমনে জামাতা বাবাজী সুবীর এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছে। মোমো-নো-সোক্কু নাকি ঐ রকম একটা ছোটদের উৎসব উপলক্ষে টুটুরও ইস্কুল ছুটি। তাই ঠিক হলো এ ক'দিন যতটা সম্ভব ঘুরে বেড়িয়ে আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে নেওয়া হবে।

হলোও তাই। চট্টরাজ মশাই যতই দেখেন ততই মুগ্ধ হন আর গিন্নীকে বলেন, দেখেছ? ঠিক তোমাদের ত্যাঁদড়গঞ্জের মতো, তাই না?

ত্যাঁদড়গঞ্জ চট্টরাজ-গিন্নীর বাপের বাড়ি। নামটা মোটেই সুশ্রাব্য নয়, জায়গাটা আরও বিশ্রী। কিন্তু, তা হলেও, বাপের বাড়ি তো বটে! চট্টরাজ-গিন্নী ফোঁস্ করে উঠলেন।—ঐ জন্যেই তো বেছে বেছে গাঁয়ের সংগে নাম মিলিয়ে ত্যাঁদড় জামাই করা হয়েছে।

সীতা মাকে ধমক দিয়ে বলল, আঃ মা, কী হচ্ছে! সামনে তোমাদের জামাই রয়েছে না?

দাদু-দিদার এই কৌতুক-কলহ দেখে টুটুর ভারি মজা লাগে। সে চেঁচিয়ে উঠে সুর করে বলে,—নুকা সিকি নুকা সিকি! ডাড়ু ডিডা পুটাবুকি!—এখানে এসে এরই মধ্যে জাপানী ভাষা গড়গড় করে বলতে শিখেছে ও। অবশ্য একটু আধটু ভুল হয়। তা হলেই বা! এখানে তো আর মহাভারত নেই যে অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

দিন তিনেক পরে সীতাই প্রস্তাব করল, চল, লেক চোবাটোকা দেখে আসি। বাবাকে বলল, পাহাড়ের একেবারে মাথার ওপর চূড়ার কাছে মস্ত হ্রদ। কাকচক্ষুর মতো টলটল করছে জল। আর চারদিকে সে কী অপরূপ দৃশ্য! একবার দেখলে কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

সুবীর তার কথায় সায় দিল। টুটুও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারপরই মাকে বলল, সেবারকার মতো স্যান্ডউইচ নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। চিকেনের নয়, সুচাকির স্যান্ডউইচ।

সুচাকি এখানকার স্থানীয় একরকম পাখি—হাঁস মুরগীরই স্বজাতি, কিন্তু ওর মাংসটা আরও সুস্বাদু।

হ্যাঁ, নেব। সীতা সংক্ষেপে বলল।

আর সেই সংগে স্ট্রবেরী মাখানো ক্রীম।

সীতা সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা-আচ্ছা, ফুরাসিকা ফুরাসিকা। অর্থাৎ তথাস্তু।

সীতা যে একটু একটু জাপানীভাষা শিখেছে এটা বোধহয় তার নমুনা, কিন্তু ভুল হয়ে গেল। টুটু হেসে গড়িয়ে পড়ল।—হলো না, হলো না। ফুরাসিকা নয়, ওটা ফুরাসিকু হবে।

পরের দিনই ওরা রওনা হলো লেক চোবাটোকার উদ্দেশে।

সত্যি, দেখবার মতোই বটে। মাটি থেকে একটা বিরাট পাহাড় খাড়া হাজার দেড়েক ফুট ওপরে উঠে গেছে। নীচের দিকটা গোলাকার। দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো। তারই মাথার ওপর বিরাট এক হ্রদ। চারদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য এক কথায় অপূর্ব।

পাহাড় বেয়ে হ্রদে পৌঁছতে হলে কষ্ট করে পা ভেঙে উঠতে হয় না। পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে উঠবার জন্য মোটরগাড়ি যাবার রাস্তা। সারি সারি মিনিবাসের মতো গাড়ি রাস্তায়ই অপেক্ষা করছে। চড়ে বসলেই ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে নামিয়ে দেবে। চট্টরাজ মশাইয়ের মনে পড়ল, বিশাখাপত্তনম্-এর কাছে সিমাচলম্ পাহাড়ে উঠতেও তাঁরা এইরকম মিনিবাসে চড়েই চূড়ায় উঠেছিলেন। কিন্তু এখানকার এগুলো আরও আরামদায়ক।

গাড়ি একেবারে হ্রদের পাশে নামিয়ে দিল ওঁদেরকে। নেমেই দেখেন, যে-রকম সব বেড়াবার জায়গাতেই দেখা যায় এখানেও তেমনি ট্যুরিস্ট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফটোগ্রাফীর ও আরও হরেকরকম শৌখিন জিনিসের দোকান। একটা দোকানে লাল টুকটুকে চেরীফল বিক্রি হচ্ছে। দেখলেই মুঠো মুঠো তুলে মুখে দিতে ইচ্ছে করে।

হ্রদের ধার ঘিরে রাস্তা। তাই ধরে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় দেখা গেল কতকগুলি সুদৃশ্য বোট বাঁধা আছে। এসব বোট ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকেই রোইং করার উদ্দেশে সেগুলি ভাড়া করে হ্রদের জলে ভেসে পড়ে।

টুটুও আবদার ধরল, নৌকোয় চড়তে হবে।

চট্টরাজ মশাই হেসে বললেন, বেশ, ফুরাসিকা! না, ভুল বললাম বোধ হয়। ফুরাসিকু, তাই না?

দাদুর মুখেও জাপানী ভাষা শুনে টুটু খিলখিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু–দাদু একটু থেমে বললেন, সবাই সাঁতার জান তো? তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি তো বিয়ের আগে ত্যাঁদড়গঞ্জে মেয়েদের সুইমিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে, তাই না?

চট্টরাজ-গিন্নী মুখটা বেঁকিয়ে হেসে বললেন, ঢং!

একটা বড়সড় পাঁচ-ছ'জন বসতে পারে এমনিধারা বোট ভাড়া নেওয়া হলো। না, মাঝি লাগবে না। নিজে না চালালে সেটা আবার রোইং হলো নাকি?

সবাই মিলে নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। সুবীর আর সীতা দু'দিকে দু'টো বৈঠা নিয়ে বসল। টুটুও নিল একটা। চট্টরাজ মশাই বললেন, আমি হালে বসছি।

তরতর করে স্বচ্ছ জলে ভেসে চলল নৌকো।

ফুরফুরে বাতাস বইছে। একটু একটু শীত শীতও করছে যেন। নৌকোর নীচে ঠাণ্ডা টলটলে জল। হাতটা বাড়িয়ে জলে ডোবালে গা-টা সিরসির করে ওঠে। কিন্তু তাইতেই নৌকোবিহার আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ টুটু বলল, দেখ দেখ, ঐখানটায় জলের মধ্যে কেমন বুড়বুড়ি উঠছে না!

সত্যিই তো! একটা জায়গায় জলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত বুদ্বুদের মতো কি একটা উঠে আসছিল, ঠিক যেমনটা ফোয়ারার জলে প্রথমটা ওঠে। কিন্তু সাধারণ বুড়বুড়ি নয়, তা থেকে বেশ একটু বড় বড় এবং দ্রুত উঠে আসছিল সেগুলি জলের ভিতর থেকে।

কী ব্যাপার? সুবীর বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে ভালো করে দেখতে লাগল। সীতা বলল, আরে, এদিকেও যে!

দেখা গেল একটা নয়, দু'টো নয়, অনেকগুলি জায়গায় একসঙ্গে জলের মধ্যে থেকে ঐরকম বুদ্বুদ ভেসে উঠছে এবং তা ক্রমেই আরও দ্রুতবেগে, আরও বড় বড় চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে।

একটু পরেই এদিকে ওদিকে ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে জলের ধারা ছিটকে বেরুতে শুরু করল। সমুদ্রে তিমি যখন জলের ওপর দিকে উঠে নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন নাকি এইরকম হয়–ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে জল উঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই হ্রদেও কি তাহলে তিমি এসে জুটেছে নাকি? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এ তো লোনা জল নয়, মিষ্টি জলের হ্রদ।

দেখতে দেখতে ফোয়ারার সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে ক্রমাগত হুস্ হুস্ করে জল উঠছে আর ভেঙে পড়ছে সাদা ফেনায়। অন্যান্য যে-সব ভ্রমণার্থী বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরাও এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং সকলেই দেখা গেল তীরের দিকে নৌকো ঘুরিয়ে দিয়েছেন। চট্টরাজ মশাইও বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন, বললেন, ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে। ডাঙার দিকে জোরে বৈঠা চালাও। নিজেও একটা বৈঠা তুলে নিলেন।

তাড়াতাড়িতে জোরে বৈঠা জলে ফেলতেই এক ঝলক হ্রদের জল ছিটকে এসে তাঁর গায়ে লাগল। চট্টরাজ মশাই চমকে উঠে বললেন, এ কি, এ যে গরম জল! বেশ গরম। একটু আগেও তো এরকম ছিল না! বেশ ঠাণ্ডাই ছিল।

তাঁর কথা শুনে সুবীর, সীতা দু'জনেই হ্রদের জলে হাত ঢুকিয়ে দিল এবং পরক্ষণে দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,–এ কি, এ যে ভীষণ গরম! মনে হচ্ছে একটু পরেই ফুটতে শুরু করবে।

আতঙ্কে সকলেরই মুখ তখন সাদা হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্রদের পাড়ে গিয়ে উঠতে হবে। চট্টরাজ-গিন্নীও এবার তাঁর অপটু হাতে আর একটা বৈঠা তুলে নিলেন।

পেছনে তখন কেমন একটা ক্ষীণ অথচ গুম্‌গুম্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রথমে সেটা ছিল অস্ফুট, কিন্তু ক্রমেই তার তীক্ষ্ণতা বেড়ে চলেছে।

সহসা টুটু চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, দাদু, ঐ দেখ!

সকলেই টুটুর কথা শুনে মুখ ফেরালেন। হ্রদের ওপর থেকে ঘন বাষ্পের মতো কি যেন ওপরে উঠে আসছে, এদিক ওদিক সব দিকেই। প্রথমে সেটা ছিল সাদা কুয়াশার মতো, কিন্তু ক্রমেই তার রঙ ঘন হয়ে এখন কালো ধোঁয়ার মতো হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন কয়লা চালানো রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া।

চট্টরাজ-গিন্নী অনভ্যস্ত হাতে বৈঠা টানতে টানতে বলে উঠলেন, একটা গন্ধও টের পাচ্ছি যেন! গন্ধক পোড়ালে যেমনটা হয় অনেকটা তেমনি। দেখ শুঁকে।

ভয়ে তখন কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। এ কি বিপদ হলো প্রমোদভবনে এসে! শেষ পর্যন্ত ডাঙায় পৌঁছনো যাবে তো?

যাওয়া সত্যিই কঠিন। হ্রদের জলও এখন ছলাৎ ছলাৎ করে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। কে বলবে শান্ত হ্রদ? এ যে সমুদ্রের মতোই বড় বড় ঢেউ! নৌকো একবার সেই ঢেউ-এর মাথার ওপর গিয়ে উঠছে, পরক্ষণেই নেমে আসছে নীচে।

চট্টরাজ-গিন্নী বৈঠা ফেলে দিয়ে দুর্গাস্তোত্র শুরু করে দিলেন:

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগৎব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগৎবন্দ্য পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।"...

সীতা একালকার কলেজে-পড়া মেয়ে, ও-সব মন্ত্র তার জানা নেই। কিন্তু বিপদকালে দুর্গানাম করার কথা সে ভোলেনি। প্রাণপণে বৈঠা টানছে–আর মুখে বলে চলেছে–

দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা
দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা...

শুধু টুটু চোখ বুজে রয়েছে, মুখে কোনো কথা নেই তার।

টুটু চেঁচিয়ে উঠলো, বাবা, দাদু ঐ দেখ

যাই হোক, চট্টরাজ-গিন্নীর আওড়ানো মন্ত্রের জোরেই হোক কিংবা কলেজে-পড়া মেয়ের অস্বাভাবিক কিন্তু আন্তরিক ডাকেই হোক, মা দুর্গার মন হয়তো সামান্য একটু টলল। তিনি তো সর্বত্র আছেন, জাপানের এই হ্রদের ধারেই বা থাকবেন না কেন? হয়তো তাঁরই সেই আশীর্বাদে ওঁরা একসময়ে ডাঙায় গিয়ে উঠলেন—অক্ষত শরীরেই।

সারি সারি মিনিবাস দাঁড়িয়ে। একটা একটা করে নৌকো এসে তীরে ভিড়ছে আর বাসগুলো তাদের তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে নীচে নেমে যাচ্ছে। ওঁরাও একটা মিনিবাস পেয়ে তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়লেন। ঝড়ের মতো বেগে মিনিবাস ঘুরে ঘুরে পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে এল।

বাস থেকে নেমে ওঁরা একবার হ্রদের দিকে তাকালেন। সেখানে তখন ভীষণ অবস্থা, জলের ওপরেই দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, ওপর দিকে ছিটকে ছিটকে পড়ছে কাদার চাপটি, পাথরের টুকরো, আরও কি সব। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে গেছে মেঘের রাজ্যে। সেদিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

ততক্ষণে ওপরকার হোটেল, রেস্তোরাঁ, আর অন্যান্য দোকানের লোকেরাও দলে দলে নীচে নেমে আসছে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে। যারা মিনিবাসে উঠতে পারেনি তারা দুরন্ত বেগে ছুটে ছুটেই নামছে। সেও এক ভয়াবহ দৃশ্য।

যাই হোক, চট্টরাজ মশাই সবাইকে নিয়ে কোনোরকমে ফিরে এলেন উকুবাসিতে সুবীরের কোয়ার্টারে।

এরপর বেশ কিছুদিন কাটল। চোবাটোকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পর আর নতুন করে বাইরে বেরুবার ভরসা হচ্ছিল না যেন। কিন্তু জাপানে তো এখনও কত কি দেখবার আছে। দেখা হয় নি কুমাকুরার বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি, দেখা হয়নি ফুজিয়ামা, দেখা হয়নি কিয়োটো, নাগাসাকি ইত্যাদি আরও কত জায়গা!

হ্যাঁ, দেখবেন, সেদিনকার সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হলে তবেই। চট্টরাজ মশাই ততদিন না হয় গ্যাঁট হয়েই বসে থাকবেন মেয়ে-জামাই-এর বাড়িতে। জলে পড়েননি তো আর!

রহস্য কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিই উদ্ঘাটিত হলো। উদ্ঘাটন করলেন জাপানী বিজ্ঞানীরা—বিশেষ করে ওখানকার জিওলজিক্যাল সার্ভে অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক সংস্থার বিজ্ঞানীরা।

চট্টরাজ মশাই চলে আসবার পর চোবাটোকা হ্রদে আর কি ঘটেছিল তা তাঁরা চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও কাগজে পড়েছিলেন, ছবিও দেখেছিলেন তার।

হ্রদের জল প্রথমে টগবগ করে ফুটতে থাকে, তারপর একসময় ঐ অত বড় হ্রদটার সমস্ত জল বাষ্প হয়ে উবে যায় আকাশে। আকাশে উঠে ভাসতে থাকে মাইলের পর মাইল পুরু মেঘের স্তরের মতো। সেই নিবিড় মেঘে সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা যায়নি। কেন না ঐ হ্রদের সমস্ত জল চলে যাবার পরও সেখান থেকে বেরুতে থাকে ঝলকে ঝলকে আগুন।

প্রায় সাত দিন ধরে চলে এই কাণ্ড। তারপর সে আগুন স্তিমিত হতে হতে একসময়ে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এরপরই বিজ্ঞানীরা শুরু করে দেন তাঁদের কাজ। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন চোবাটোকা সাধারণ পাহাড় নয়—আসলে ওটা একটা বিরাট আগ্নেয়গিরি। কোন আদ্যিকালে ওটা সজীব ছিল কেউ জানে না, কেন না পৃথিবীতে হয়তো তখন প্রাণেরই আবির্ভাব হয়নি। ঐ অঞ্চলটি তো এখনও আগ্নেয়গিরির 'বেল্ট' বলে পরিচিত, সে যুগে হয়তো ওরকম আরও ছিল। খোদ ফুজিয়ামাই তো একসময়ে ছিল আগ্নেয়গিরি।

যাই হোক, চোবাটোকার অগ্নি উদ্গীরণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তারপর একদিন সে আগুন চিরকালের জন্য নিবে যায়। চাঁদের পাহাড়গুলির মতো এও হয়ে দাঁড়ায় একটি মৃত আগ্নেয়গিরি। সেও কতকাল আগেকার কথা কে জানে!

চোবাটোকা নিবে যায় আর তার ওপরকার ক্রেটার অর্থাৎ জ্বালামুখটা একটা যোজন-জোড়া গহ্বরের মতো পড়ে থাকে। তারপর তার মধ্যে জমতে থাকে বৃষ্টির জল। সেও কত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কে জানে! একটু একটু করে জমতে জমতে এক সময়ে গহ্বরটিকে কানায় কানায় ভর্তি করে ফেলে সেই জল, ওটি হয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল স্বাদু জলের হ্রদ। লোকে তার নাম রাখে চোবাটোকা।

কিন্তু চোবাটোকা হ্রদটি যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছিল তা কি সত্যি নিবে গিয়েছিল? না, একেবারে নিবে যায় নি। ঘুমন্ত অবস্থায় পড়েছিল বলা চলে। এক-আধদিনের ঘুম নয়, লক্ষ লক্ষ বছরের ঘুম।

কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা তো কোনোদিনই শান্ত নেই। দিনরাত কত কাণ্ড-কারখানা চলছে সেখানে, ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে কত জায়গা! চোবাটোকা পাহাড়ের নীচেও যে এই রকম ভীষণ কাণ্ড চলছিল তা কে জানত? আর কতদিন আগে থেকে তাও তো জানা সম্ভব ছিল না।

তারপর হঠাৎ যেন তার ঘুম ভাঙে। তার ভিতরকার আগুন নতুন উদ্যমে একটু একটু করে আবার বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে নেয়, তারপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে যায় তার অগ্নি-উদ্গীরণ। আর, এমনি মজা, ঠিক যেদিন সে আগুন হ্রদের জল ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সেই দিনই কিনা চট্টরাজ মশাইরা গেলেন হ্রদে নৌবিহারে!

অগ্নি-উদ্গীরণের ফলে কি ঘটল সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে আশপাশের সমস্ত অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে আবার তার আগুন নিবে গেছে। চোবাটোকা এবার আবার ঘুমিয়ে পড়বে। কে জানে এটিই তার শেষ ঘুম কিনা, নাকি কুম্ভকর্ণের মতো আবার একদিন তার ঘুম ভাঙবে?

বিজ্ঞানীরা নানা হিসেবপত্র করে মনে করছেন যদি কোনোদিন সে আবার জাগেও তা হলেও দু'লক্ষ বছরের আগে আর নয়। ততদিনে হয়তো বৃষ্টির জল জমে ওর জ্বালামুখের গহ্বরে তৈরি হবে আর একটি হ্রদ। অবশ্য সেই দূর ভবিষ্যতে সেই হ্রদে নৌকো নিয়ে ভাসবার মতো কোনো মানুষ টিকে থাকবে কি না কে জানে?

ছবি: সুবোধ দাশগুপ্ত

মুখবাহারি

সুধীন্দ্র সরকার

এই ছিল গোঁফ, গোঁফ দেখি নেই
গোঁফ কোথা খোয়ালে?
কাল রাতে ছিল তাগড়াই গোঁফ
গোঁফ নেই রাত পোহালে?

হিটলারি গোঁফ, আশুতোষ গোঁফ
কভু গোঁফে চার্লি,
মুখ জুড়ে ফের শেখের দাড়ি
চিনতে না কেউ পারলি?

পেল্লাই চুল দাড়ির জটাতে
সন্ন্যাসী বলে সব,
কখনও আবার মুণ্ডিত কেশ
পুরোপুরি বৈষ্ণব!

"উদ্ভুটে শখ দেখছি দাদার?"
শুধোই কপাল ঠুকে
"পিত্থিবী রোজ পাল্টে যাচ্ছে
পাল্টাবেনা মুখে?

ছিরিছাঁদ আর আকৃতি, তাই
বদলে মুখের ছাঁচ-ই,
চুল দাড়িতে মুখবাহারি
আচমকা ফের চাচ্ছি!"

ছবি: রাহুল মজুমদার

বিজ্ঞানীর বিবেক

অমিয়কুমার হাটি

১৯২৩ সাল।

খবর এসে পৌঁছুলো ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং ও জন ম্যাকলীয়ড এ বছরে শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন। ডায়াবেটিস (মধুমেহ) রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন আবিষ্কারের জন্যে তাঁরা যুগ্মভাবে এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যান্টিং-এর একী হলো? কোথায় খুশি হবেন, আনন্দিত হবেন, তা' নয়, ভয়ানক রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সাংঘাতিক রেগে গেলেন, মাথার চুল ছিঁড়তে যা বাকী! কী এক দারুণ অশান্তিতে ছেয়ে গেল তাঁর সারাটা মন! ভীষণ অস্বস্তি তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না! কেন? কেন তাঁর এ মানসিক যন্ত্রণা? কেন এই অস্বাভাবিক ক্রোধ? বিশেষতঃ যখন কানাডাবাসী দুজন বিজ্ঞানী এই প্রথম নোবেল পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন! কানাডিয়ানদের পক্ষে এবার তো এ একটা জাতীয় উৎসব! এবং গবেষণায় অভাবনীয় সফলতা এসেছে খুবই কম সময়ে, কাজ শুরু করার বছর দুয়েকের মধ্যেই।

বিজ্ঞানীর এ মানসিক কষ্ট বুঝতে গেলে ইনসুলিন আবিষ্কারের যুগান্তকারী ইতিহাসটা একটু জানতে হয়।

ব্যান্টিং ছিলেন শারীরবৃত্তবিদ। ডায়াবেটিস রোগটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই কঠিন রোগটার কোনো ওষুধ তখন বার হয়নি, সারানোও যেতো না, নিয়ন্ত্রণে আনাও যেতো না। সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক তখন ডায়াবেটিস-এ ভুগে অকালে মারা পড়ত। শরীরে চিনি বেড়ে যেতো অস্বাভাবিক ভাবে, কিছুতেই কমানো যেতো না, অকেজো করে দিত মানুষকে, ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতো সে।

এই জটিল সমস্যা সমাধানের, ডায়াবেটিস-এর কার্যকর ওষুধ বের করার একটা চিন্তা হঠাৎই এলো তাঁর মাথায়। তবে তাঁর নিজের সাজসরঞ্জাম কিছুই তেমন ছিল না। তাই ১৯২১-এর গ্রীষ্মে এলেন তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবৃত্তের অধ্যাপক ম্যাকলীয়ডের কাছে, বললেন ডায়াবেটিস রোগ সারাবার ব্যাপারে তাঁর ধারণার কথা। অধ্যাপক ম্যাকলীয়ডের সময় ছিল কম। তবে ব্যান্টিংকে তিনি সাহায্য করতে চাইলেন। অধ্যাপক ম্যাকলীয়ড তাঁর ছাত্রদের বললেন যে তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবক চান, যিনি ডাঃ ব্যান্টিং-এর সংগে থেকে তাঁর গবেষণায় সহায়তা করতে পারবেন। বাইশ বছরের এক তরুণ যুবক সোৎসাহে এগিয়ে এলেন, তাঁর নাম চার্লস বেস্ট।

আশ্চর্য হবারই কথা। অল্পদিনের মধ্যেই অভাবনীয় সফলতা এলো হাতের মুঠোয়। খুলে গেল যেন সমস্যার জট। বাঁচার আশার আলো জ্বলে উঠল লক্ষ লক্ষ ডায়াবেটিস রোগীর চোখে।

ডায়াবেটিস হয়েছে, এমন কুকুরের উপর গবেষণা চালাচ্ছিলেন ব্যান্টিং ও বেস্ট। ১৯২২-এর জানুয়ারীতেই ব্যান্টিং ঘোষণা করলেন তিনি এবং বেস্ট ডায়াবেটিস সারাবার উপায় বের করেছেন। তাঁরা জিনিসটার নাম দিলেন ইনসুলিন। রাসায়নিক এ পদার্থটা বেরোয় পেটের ভেতরে শরীরের একটা যন্ত্র অগ্ন্যাশয়(প্যানক্রিয়াস)থেকে। ইনসুলিন যদি ঠিকমত পরিমাণে বেরিয়ে রক্তে মেশে, তাহলেই শরীর চিনির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—স্বাভাবিক যেটা দরকার, তার থেকে বাড়তে দেয় না। অগ্ন্যাশয়ের কিছু কোষ নষ্ট হয়ে গেলে পর্যাপ্ত ইনসুলিন পাওয়া যায় না, তাই শরীরে চিনির নিয়ন্ত্রণও নাগালের বাইরে চলে যায়।

ব্যান্টিং ও বেস্ট পশুর অগ্ন্যাশয় থেকে সেই ইনসুলিন বের করলেন। বললেন, এই ইনসুলিন যদি ডায়াবেটিস রোগীকে ইঞ্জেকসন দেওয়া যায়, তাহলে রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, রক্তের চিনি আর বাড়বে না—স্বাভাবিক থাকবে।

শহরের হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছিল স্কুলের ছেলে লিওনার্ড থমসন। ভুগছে ডায়াবেটিসে। উঠতেও পারে না

বিছানা থেকে, নিজে খেতেও পারে না হাত তুলে, চলাফেরা তো দূরের কথা! মরণ ঘনিয়ে আসছে যেন। চিকিৎসকরা তার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছেন একেবারে।

ব্যান্টিং ও বেস্ট মরণাপন্ন এই ছেলেটিকেই বেছে নিলেন। যে ইনসুলিন পশুর অগ্ন্যাশয় থেকে তাঁরা বের করেছেন, তাই দেওয়া হবে ছেলেটিকে, দেখা যাবে সে বাঁচে কিনা!

কী হয় কী হয় ভাব চিকিৎসক মহলে। কিন্তু ফল পেতে এতটুকুও দেরি হলো না। ম্যাজিকের মতো কাজ দিল ইনসুলিন। পৃথিবীতে প্রথম যে অথর্ব হয়ে যাওয়া মৃত্যুপথগামী ছেলেটিকে ইনসুলিন দেওয়া হলো, সে সবার চোখের সামনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে উঠে বসল তার বিছানায়, রক্তের চিনির পরিমাণ রোজকার চিকিৎসার সংগে সংগে কমতে লাগল।

ইনসুলিন নিয়ে এলো আশা, লক্ষ কোটি ডায়াবেটিস রোগীর মনে। অকালে আর ঝরে যেতে হবে না পৃথিবী থেকে।

যুগান্তকারী এ আবিষ্কারের জন্যেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া। শূকর বা গোরুর অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বের করে তাই দিয়ে আজও চিকিৎসা চলছে ডায়াবেটিস রোগীর। এখন আরও এগিয়েছে—জীন প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিনের মতো ইনসুলিনও সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, যা আরও বেশি কার্যকর এবং কম ক্ষতিকর।

কিন্তু—কিন্তু—নোবেল পুরস্কার ঘোষণার লগ্নে এর আবিষ্কারক প্রকৃত বিজ্ঞানী, সৎ বিজ্ঞানী ব্যান্টিং কী করে ভুলবেন বেস্ট-এর কথা? তরুণ সেই ডাক্তার ছাত্রটির কথা? তাঁরা দুজনেই তো গবেষণা করেছিলেন! তাহলে বেস্ট-এর নাম নেই কেন তাঁদের সহকর্মী হিসাবে—নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে? কেন তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে? ছাত্র বলেই কি? তাই ব্যান্টিং-এর এই অস্বাভাবিক ক্রোধ—তাই তাঁর মানসিক যন্ত্রণা, অশান্তি—কিছুতেই শান্তি পেতে পারছেন না। কেন অবজ্ঞা করা হয়েছে বেস্টকে? কেন? কেন? কেন?

কিছু তো একটা করতেই হবে—নইলে স্বস্তি পাবেন তিনি কী ভাবে? কী করে নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করবেন? তাঁর পুরস্কার বাবদ যে টাকা তিনি পেলেন, তার অর্ধেক দিলেন বেস্টকে। আর যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ গবেষণা চলেছিল, সেই টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি নতুন বিভাগ, তাঁদের দুজনের নাম যোগ করে যার নাম রাখা হলো "ব্যান্টিং-বেস্ট চিকিৎসা গবেষণা বিভাগ"।

ছবি : সুফি

একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আধুনিক কালে চিকিৎসাশাস্ত্রের আশ্চর্য রকমের আবিষ্কার প্রস্টাগ্লান্ডিন। প্রস্টাগ্লান্ডিন আশ্চর্য রকমের হরমোন, যা আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে এবং যার প্রভাবে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের প্রস্টাগ্লান্ডিন আমাদের শরীরে তৈরি হয়। কোনো প্রস্টাগ্লান্ডিন শ্বাসনালীকে সংকুচিত করছে, পরমুহূর্তে বিপরীত ধরনের প্রস্টাগ্লান্ডিন শ্বাসনালীকে স্ফীত করছে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি একবার সংকুচিত হচ্ছে, একবার স্ফীত হচ্ছে, একবার কর্মক্ষম হয়ে উঠছে, পরক্ষণেই বিশ্রাম নিচ্ছে, সবই বিভিন্ন রকমের প্রস্টাগ্লান্ডিনের প্রভাবে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন শরীরের কোনো অংশে যন্ত্রণা হয়, প্রস্টাগ্লান্ডিনের আধিক্যে।

9-11-15 - Trihydroxy - Cis 6 - Trans 13 Prosta - di - enoic Acid

অ্যাসপিরিন বা কোনো যন্ত্রণানাশক ওষুধ দিলে সেই অংশের প্রস্টাগ্লান্ডিনের সৃষ্টি ব্যাহত করে, ফলে ব্যথা কমে যায়। কোনো প্রস্টাগ্লান্ডিনে শরীরে ঘা হয় আবার কোনো প্রস্টাগ্লান্ডিন সেই ঘা সারিয়ে দেয়। আমাদের নানারকম অসুখ করে এবং আপনা থেকেই সেই অসুখ সেরে যায়, তার অন্তর্নিহিত কারণ হলো শরীরের মধ্যে বিভিন্ন প্রস্টাগ্লান্ডিনের কার্যকারিতা।

প্রস্টাগ্লান্ডিনের মাধ্যমে যে নিরাময় হয়, তা শারীরতাত্ত্বিক নিরাময়, যাকে সহজ ভাষায় বলা যায়, শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতায় ভাল হয়ে যাওয়া।

আমাদের শরীরের মধ্যে যে প্রস্টাগ্লান্ডিন তৈরি হয়, তা কি শরীরের বাইরে তৈরি করা সম্ভব? বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণায় মগ্ন হলেন। ডাঃ ভলডইম অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার প্রস্টেট গ্রন্থির নির্যাস নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে দেখলেন শরীরে প্রস্টাগ্লান্ডিন প্রক্রিয়ার অনুরূপ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে এই ওষুধ তৈরি করেছিলেন বলে এই ওষুধের নাম দিলেন প্রস্টাগ্লান্ডিন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল, ভলডইমএর পরীক্ষার ফল ঠিক নয়। যদিও তিনি আবিষ্কারে ভুল করেছিলেন তবুও তাঁর দেওয়া ভুল নামটিই স্বীকার করে নিয়ে এ ওষুধের নাম প্রস্টাগ্লান্ডিন রাখা হয়েছে।

আফ্রিকার চিকিৎসক ডাঃ এস. এস. করিম একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। আফ্রিকায় অধিকাংশ শিশুর জন্মের পর নাড়ী কেটে দেওয়া হয়, কিন্তু কাটা নাড়ী কোনো কিছু দিয়ে বাঁধা হয় না। দেখা গেছে আপনা থেকেই নাড়ীর কাটা মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ডাঃ করিম সেই কথা আমেরিকার আপজন কোম্পানীকে জানান এবং আপজন কোম্পানী অনুসন্ধান করে দেখেন নবজাতকের
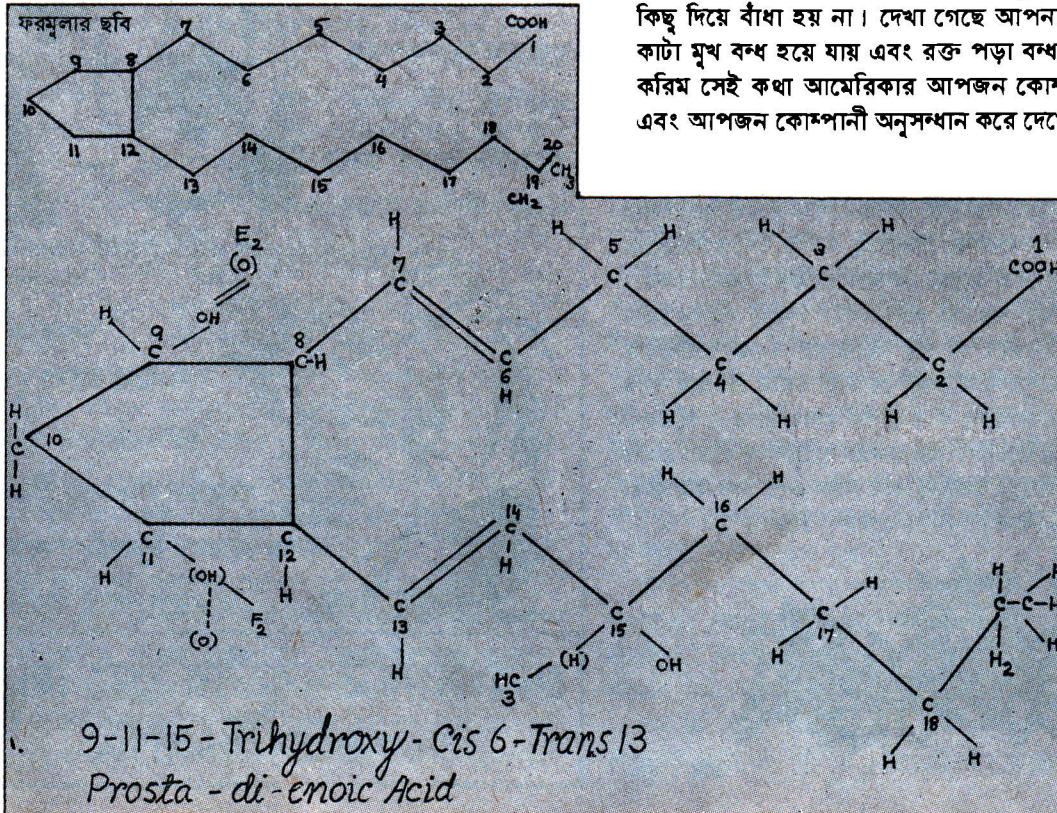
Umbilical cord-এ প্রচুর প্রস্টাগ্লান্ডিন আছে। সেই প্রস্টাগ্লান্ডিনের প্রভাবে কাটা নাড়ী বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কী ভাবে প্রস্টাগ্লান্ডিন তৈরি করা যায়? বহু টাকা খরচ করে বহু অন্বেষণের পর দেখা গেল ক্যারিবিয়ান সাগরের তলদেশে একরকমের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়, সেই উদ্ভিদের মধ্যে প্রচুর প্রস্টাগ্লান্ডিন আছে। আপজন কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্যারিবিয়ান দ্বীপের কাছে সমুদ্রের তলদেশে ডুবুরী নামালেন। ডুবুরীরা দিনের পর দিন সমুদ্রের গভীর তলদেশে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলে নিয়ে এলেন জলজ উদ্ভিদ। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন সেই উদ্ভিদ হলো প্লেক্সোরা হোমোমালিস হোমোমালা (Plexora Homomalis Homomala)। এই উদ্ভিদের নির্যাস থেকে তৈরি হলো বিভিন্ন রকমের প্রস্টাগ্লান্ডিন।

কিন্তু ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের তলদেশ থেকে জলজ উদ্ভিদ তুলে এনে প্রস্টাগ্লান্ডিন তৈরি করতে এত প্রচণ্ড খরচ যে এই পদ্ধতিতে প্রস্টাগ্লান্ডিন ওষুধ তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন এই নির্যাসের মধ্যে কী পদার্থ আছে।

সুইডেনের বৈজ্ঞানিক ডক্টর সুনি বার্গস্ট্রং বছরের পর বছর ল্যাবোরেটারিতে গবেষণা করে দেখলেন এই নির্যাসে বিভিন্ন রকমের কার্বন অ্যাটম আছে এবং তার সঙ্গে আছে প্রস্টা ডাই এনোইক অ্যাসিড। কার্বন অ্যাটমের চেন বিরাট, অত বড় চেন তোমরা এখন বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ, তবু স্ট্রাকচারাল ফরমূলার ছবি সঙ্গে এঁকে দেওয়া হলো। এই স্ট্রাকচারের পনেরো পজিসনের কার্বন সরিয়ে অন্য র‍্যাডিকেল বসিয়ে দিলেই প্রস্টাগ্লান্ডিনের রূপ বদলে যায়, যেমন প্রস্টাগ্লান্ডিন এফ, প্রস্টাগ্লান্ডিন ই, প্রস্টাগ্লান্ডিন এ প্রভৃতি। এক এক রকমের প্রস্টাগ্লান্ডিনের এক এক রকমের কাজ। কোনো প্রস্টাগ্লান্ডিন পেশীসমষ্টিকে সংকুচিত করে আবার পরক্ষণেই অন্য প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন শিথিল করে। কোনো প্রস্টাগ্লান্ডিন শরীরে ঘা তৈরি করে আবার কোন প্রস্টাগ্লান্ডিন সেই ঘা সারিয়ে দেয়।

১৯৮২ সালে সুনি বার্গস্ট্রং প্রস্টাগ্লান্ডিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়ে সম্মানিত হন। তোমাদের বোঝার জন্যে সহজভাবে প্রস্টাগ্লান্ডিনের ফরমূলা এঁকে দিয়েছেন ডাঃ সুরপ্রিয় মুখার্জি।

এই আবিষ্কার থেকে একটা শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। জলজ উদ্ভিদের নির্যাস থেকে যেমন যুগান্তকারী ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে, তেমনি আমাদের দেশের হাজার হাজার উদ্ভিদ থেকে বহু জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করা যেতে পারে। তোমাদের মন সেইদিকেই দিতে হবে।

~

লম্বা বেঁটে

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ল্যাঙলেঙে ঢ্যাঙা তার বামন দোসর
মিলেমিশে থাকে তারা জঙ্গলে ঘর।
ভোরবেলা হ্যাটকোট আর বন্দুকে
সেজেগুজে লম্বুটি বের হয় সুখে।
কোনদিন বেঁটেটিও মহা আহ্লাদে
বন্দুক নিয়ে চড়ে লম্বুর কাঁধে।
যেই দেখে দূরে এক মোরগ নধর
অমনি তো বেঁটেটির সইল না তর।
দুড়ুম শব্দ ওঠে মহা শোরগোল
বড় সাধ খাবে বুনো মোরগের ঝোল।
তারপর কাঁধ থেকে নেমে এসে বেঁটে
কাঠকুটো নিয়ে লাগে মালকোচা এঁটে।
উনুনের নিচে ঢুকে খোঁচায় আগুন
লম্বু কড়াই নাড়ে ঢেলে ঘৃত নুন।
রান্নার শেষে চড়ে টেবিলের পর
ধড়মুড়ো দিয়ে বেঁটে ভরায় উদর
নিচে তার ঘাড় গুঁজে ঠ্যাংমুড়ে বসে
লম্বু কুড়িয়ে শুধু হাড়গুলো চোষে।

ছবি: রাহুল মজুমদার

হাঙরের মুখ থেকে

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

হাঙরের মতো পেটুক দুনিয়ায় নেই। খাবার দেখতে পেলেই হলো। যতক্ষণ না সেটা পেটে পুরতে পারে ততক্ষণই ছটফট করে যাবে। খাবার বলতে মাছ-মাংস-চর্বি হলে তো খুবই ভালো, না হলে ইঁট-কাঠ-টিন কোনো কিছুতেই তাদের আপত্তি নেই।

নাবিকদের পক্ষে তাই হাঙর ধরা খুবই সোজা। শুধু মোটা নাইলন দড়িতে বঁড়শির কায়দায় বাঁকানো একটা লোহার হুক বেঁধে, সেই হুকে কিছু মাংস আর চর্বি গেঁথে জলে ফেলে দিলেই হলো। যত দূরেই থাক হাঙর, ঠিক খাবারের গন্ধ পাবে, আর গন্ধ পেলেই হুমড়ি খেয়ে সেই হুকটা মুখে পুরে দেবে। তখন নাবিক মশাই করবেন কী হেঁই মারো, মারো টান বলে হুকের সংগে বাঁধা দড়িটা ধরে হাঙর-সুদ্ধ টেনে তুলে ফেলবেন জাহাজের ডেকের ওপর।

যা বলছিলাম, হাঙর একটু মাছ মাংস খেতে ভালোবাসে। হাঙরের জ্বালায় তাই মাছেরা তটস্থ। হাঙর দেখলে ইয়া বড়ো বড়ো রাক্ষুসে মাছেরা অবধি পালাতে পথ পায় না। তবে, একটা ব্যাপার আছে। হাঙরের মাথা আর পিঠের ওপর পাইলট মাছ নামে এক ধরনের ছোট-ছোট মাছ সব সময়েই থাকে। ঝাঁক বেঁধে থাকে। হাঙর শিকারের ওপর ঝাঁপ দিতে গেলেই, এরা যেন কেমন করে টের পায় আর হাঙর ঝাঁপ দেওয়ার সংগে সংগে চাক বেঁধে বসে যায় তার চোখের ওপর। ব্যস, শিকার যায় ফসকে!

তাই বলে সব হাঙরই কিন্তু এমন গোবর-গণেশ নয়। এক ধরনের 'খুনে হাঙর' আছে, যাদের সামনে পড়লে, বেঁচে পালানো শক্ত। কমপক্ষে বারো থেকে চোদ্দ ফুট লম্বায়, এই সব খুনে হাঙর এক একটা আস্ত রাক্ষসের মতো। এদের গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। তামাটে কিংবা ধূসর রঙ হাঙরেরা মানুষ-টানুষকে বড়ো একটা ঘাঁটায় না। ওদের যতো দৌরাত্ম্য মাছেদের ওপর। কিন্তু খুনে হাঙর হলে মাছ তো বটেই, তার চেয়ে বেশি নজর দেয় মানুষের ওপর। যাকে বলে, নেকনজর।

এই রকমই এক খুনে হাঙরের পাল্লায় পড়েছিল রডনি ফকস। বাড়ি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেডে। বয়েস তেইশ। রডনির বেজায় নেশা স্কিন ডাইভিং-এ। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া স্কিন ডাইভিং প্রতিযোগিতায় একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরের বছরে রানার্স আপ। ১৯৬৩-৬৪'র প্রতিযোগিতার জন্যে রডনি দারুণভাবে প্র্যাকটিস করে গেছে।

এই প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে, প্রতিযোগীরা ডুবুরীর পোশাক পরে জলের নিচে নেমে যাবে। কিন্তু, অকসিজেন ছাড়াই তাদের জলে নামতে হবে। এবং এই ভাবেই যে যতো মাছ ধরতে পারবে, তারই ওপর চ্যামপিয়ন খেতাব পাওয়া
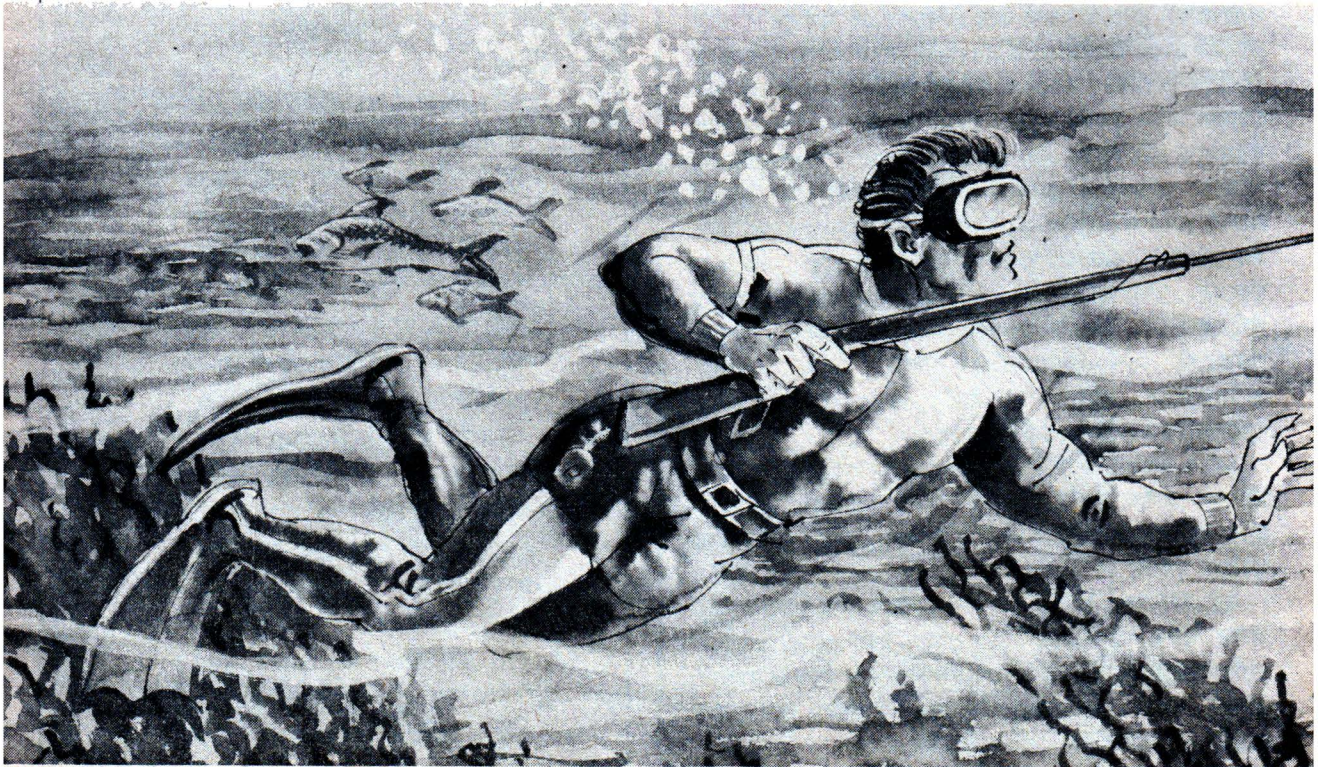
যাবে। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে দম ও ক্ষমতার ওপর। রডনি ৩০ মিটার অথবা ১০০ ফিট নিচে ডুব দিয়ে, দু এক মিনিট থেকে যাতে উঠে আসতে পারে, এইরকম ভাবেই প্র্যাকটিস করেছিল।

হাঙর যাতে সাঁতারুদের ওপর হামলা না করে– তার জন্যে জলের ওপর একটা বিরাট জায়গা ঘিরে মোটর লঞ্চগুলো ঘোরাফেরা করে। লঞ্চগুলোতে থাকে বাঘা-বাঘা হাঙর শিকারী। আগেই বলেছি, ছোটখাটো হাঙর, অথবা তামাটে কিংবা ধূসর হাঙর মানুষদের বড়ো একটা ঘাঁটায় না। স্রেফ মাছের পেছনে ধাওয়া করে। আর, খুনে হাঙরগুলো মানুষ-জনের কাছে চট করে ভেড়ে না। তবুও, ওদের মেজাজ-মর্জি তো বোঝা ভার। যার জন্যে, অন্তত চল্লিশজন জেলে জলের নিচে ও ওপরে শালতি ভাসিয়ে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা করে লম্বা সড়কি কিংবা বল্লম– আর লম্বা একটা দড়ি ঝোলানো থাকে তাদের শালতি থেকে। শালতির দড়ির শেষের দিকটা আবার জেলেদের কোমরে বাঁধা থাকে। যাতে জলের নিচে গেলেও তাদের টেনে তোলা যায়। বড়ো কোনো মাছ সড়কি দিয়ে গাঁথলেই তারা দড়ি দিয়ে মাছটাকে শালতিতে টেনে নেয়। কেননা, মাছের রক্ত জলে পড়লেই হাঙর ঝাঁক বেঁধে চলে আসতে পারে। শুধু জেলে নয়, প্রতিযোগীদেরও একটা করে শালতি থাকে। শালতির দড়ি কোমরে বাঁধা থাকে, যথারীতি।

যাক, সেদিন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে সকাল নটার সময়। জায়গাটা হলো আলডিংগা রিফ। সমুদ্রে নীল জল টলটল করছে। দুপুরের দিকে, প্রতিযোগিতা শেষ হতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি, রডনি জল থেকে উঠে, তার শালতিটা ঠেলতে ঠেলতে কিনারার দিকে এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য, মাছগুলো বালির ওপর রেখে আসবে। সকাল থেকে সে অন্তত ২৭ কিলোগ্রাম মাছ ধরেছে। নানা ধরনের, নানা মাপের মাছ। প্যারট,স্নোরেক,স্ন্যাপার,ম্যাগপাই। এতো মাছ বোধ হয় আর কেউ ধরতে পারেনি।

বালির ওপর মাছের ডাঁই রেখে, সে আবার সমুদ্রে ফিরে এলো। আরও বড়ো মাছের খোঁজে ঘুরতে লাগল। মাইল খানেক সাঁতরাবার পর তার হঠাৎ মনে পড়ল, সকালের দিকে মাছ রাখতে এসে, বিদঘুটে ধাঁচের একটা শিলাখন্ড চোখে পড়েছিল। শিলাটার কাছে বেশ কিছু মোরং মাছ ছিল। একটু খুঁজতেই, শিলাটা দেখতে পেল সে। একটা মোরং মাছ তখনও আছে!

মাছটাকে দেখার সংগে সংগে রডনি ঝুপ করে জলে ডুব দিল। মতলব, শিলাটার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে মাছটাকে কায়দা করবে। অতএব, খুব সন্তর্পণে, একটুও আওয়াজ না করে সে শিলাটার একপাশ দিয়ে এগোতে লাগল। মাছটা তখনও টের পায়নি। দিব্যি আরামে সে সবুজ শ্যাওলা ঠুকরে যাচ্ছিল। এই মাছটা ধরতে পারলে রডনির চ্যামপিয়নশিপ আর কে আটকায়!

এই ভেবে সে স্পিয়ার গান (যা থেকে সড়কির ফলা বুলেটের মতো ছুটে যায়) মাছটার ওপর তাগ করে ছুঁড়তে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় জল তোলপাড় করে একটা কিছু তার দিকে ছুটে
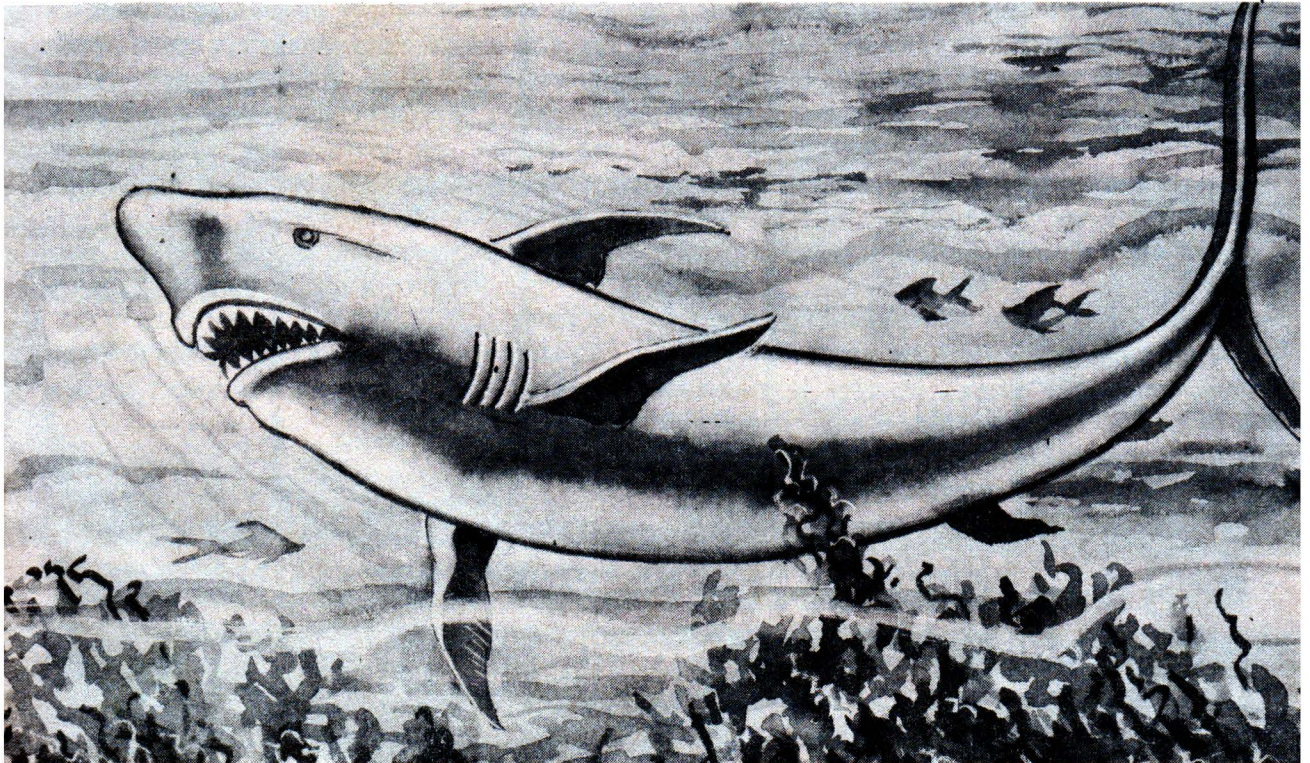
এলো। বাঁ কাঁধে একটা প্রচন্ড ঝাপটা, মনে হলো কাঁধটা বুঝি এখুনই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে—তারপরই প্রচন্ড গতিতে রডনিকে সেটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের গভীরে।

ঝাপটার ধাক্কায় মুখের মাস্কটা আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। হাত থেকে স্পিয়ার গান কোথায় ছিটকে পড়েছিল, কে জানে। রডনির মনে হলো তার শরীরটা কেউ যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ক্রমশ চেপে ধরছে শক্ত করে, যেন তাকে পিষে মেরে ফেলতে চাইছে। ভয়ে রডনির গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র, সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী সাদা হাঙর তাকে ধরেছে!

হাঙরটা নিশ্চয়ই তাকে এতোক্ষণ অনুসরণ করে করে এসেছে সমুদ্রের নিচ থেকে। তারপর, সময় বুঝে আচমকা আক্রমণ করেছে। এখন উপায়?

রডনির বাঁ কাঁধটা হাঙরের গলার মধ্যে। জোরালো এক-জোড়া চোয়ালের ফাঁকে হাঙর তার বুক পিঠ শক্ত করে চেপে ধরেছে। রডনি ফকস এবার মরিয়া হয়ে প্রাণপ্রাণ শক্তিতে হাঙরটাকে পাল্টা আক্রমণ করার চেষ্টা করল। ডান হাত দিয়ে সে এক প্রচন্ড ঘুষি মারল হাঙরটার মাথায়, তারপর আঙুল দিয়ে তার চোখ উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আচমকা ঘা খেয়ে হাঙরটার চোয়াল একটু শিথিল হতেই, রডনি হাতের জোরে চট করে বেরিয়ে এলো তার চোয়াল থেকে, তারপর দ্রুত ওপরে ওঠার চেষ্টা করল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, হাঙরটা এবার ব্লেডের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে রডনির ডান হাতটা চেপে ধরল। রডনি তখন পাগলের মতো হাত ছুঁড়ে, লাথি মেরে, কোনোক্রমে হাতটা ছাড়িয়ে আবার বেরিয়ে এলো তার নাগাল থেকে। জলের ওপর দিকে যেতে যেতে সে টের পেল তার কাঁধ আর হাত থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত। রক্তের সেই দাগ ধরে হাঙরটা এগিয়ে আসছে। যাতে, তার চোয়ালের মধ্যে না পড়তে হয় আবার, এই ভেবে রডনি আঁকাবাঁকা কায়দায় সাঁতরাতে লাগল ওপরের দিকে।

জলের ওপর উঠে এসে রডনি বুক ভরে নিশ্বাস নিল। তারপরই সে দেখতে পেল হাঙরটার ডানা জল কেটে তার দিকে আবার এগিয়ে আসছে। আক্রমণের জন্যে হাঙরটা এবার ডুব দিল। তার শক্ত শরীরটা রডনির শরীরের সঙ্গে ঘষে গেল। বোঝা যাচ্ছে, সহজে ছেড়ে দেবে না। হাঙরটা ঘুরে গিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টা করতেই রডনি সাঁ করে ডুব দিল হাঙরটাকে এড়াবার জন্য,, কিন্তু পারল না। তবে, হাঙরটা কিছু করার আগেই রডনি তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাত ও পা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

জলের গভীরে নেমে যেতে যেতে, হাঙরটা বার কয়েক প্রচন্ড জোরে ঝাপটা মারল যাতে রডনি পড়ে যায়। এদিকে তেষ্টায় রডনির ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। সে হাঙরটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ওপর দিকে সাঁতরে উঠতে লাগল। জলের ওপর উঠে আসতে সে দেখতে পেল আশপাশের জল লাল হয়ে গেছে তারই গায়ের রক্তে। খুনে হাঙরটা এবার যেন রাগে অন্ধ হয়ে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। রডনি কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। রক্তক্ষয়ে শরীরটা এমনিই দুর্বল হয়ে গেছে। এই খুনেটার সঙ্গে আর পেরে উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

হাঙরটা রডনির শালতি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিতেই, শালতিটা গেল উলটে, আর দড়িতে জড়িয়ে গিয়ে হাঙরটা শালতিসুদ্ধই ক্রমশ নিচের দিকে চলে যেতে লাগল দ্রুত। রডনির কোমরে বেল্টের সঙ্গে শালতির দড়িটা বাঁধা। শালতি আর হাঙরের সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যেতে যেতে রডনি প্রাণপণে চেষ্টা করল বেল্ট খুলে ফেলতে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারল না। সর্বনাশ, শেষ অবধি কি ডুবে মরতে হবে?

তারপর, প্রায় আচমকা হাঙরের ল্যাজ ঝাপটানির চোটে দড়িটা ছিঁড়ে গেল। রডনি পড়ি-মরি করে উঠে এলো জলের ওপর। চেঁচিয়ে উঠল: হাঙর! হাঙর!

রডনির চিৎকার শুনেই পাহারায় থাকা লঞ্চগুলো ছুটে আসতে লাগল। রডনি মনে মনে প্রার্থনা করল, হে ভগবান—হাঙরটা যেন এখন আর না আসে, আগে আমাকে লঞ্চে তুলে দাও—

লঞ্চগুলো ততক্ষণে রডনির কাছে এসে তাকে জল থেকে তুলে ফেলেছে। হাঙরের দাঁত লেগে ওর ডান হাত আর কাঁধের অনেক জায়গার মাংস এমনভাবে উঠে গেছে যে, হাড় দেখা যাচ্ছে। পাঁজরের হাড় অবধি বেরিয়ে পড়েছে। ডুবুরীর পোশাকটাই ওর ছিন্ন শরীরটাকে আটকে রেখেছে কোনোক্রমে। সঙ্গে সঙ্গে, একটা এ্যামবুলেনসের ব্যবস্থা করে রডনিকে ওরা আলডিংগা থেকে ৩৪ মাইল দূরে এ্যাডিলেড হাসপাতালে নিয়ে গেল।

রডনি এখনও বেঁচে আছে। তবে, শরীর থেকে খুনে হাঙরের আক্রমণের চিহ্ন মিলিয়ে যায়নি। দাগগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট। পাঁচ মাস হাসপাতালে থাকার পর সে সুস্থ হয়ে ফিরেছিল।

ডুবুরীর পোশাক পরে এখনও সে জলের নিচে সাঁতরে যায় ডুব-সাঁতার দিয়ে, কিন্তু হাঙর দেখলে সে-তল্লাটে আর থাকে না।
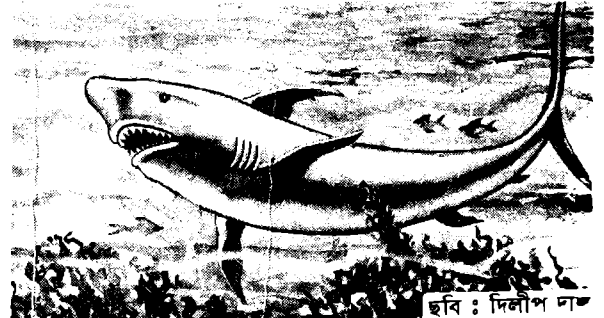
ছবি: দিলীপ দাস

ছবিতে রূপকথার গল্প
রামপলসটিলটসকিন
অনেক, অনেক দিন আগের কথা। এক শহরে একজন বণিক ছিলেন। এক মেয়ে ছাড়া বণিকের আর কেউ ছিলো না। মেয়েটি যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তার গুণেরও শেষ ছিলো না। তাকে নিয়ে বণিকের ভীষণ গর্ব। তা গর্ব করার মতোই মেয়ে বটে। হেন কাজ ছিলো না যা সে করতে পারে না। আর বণিকও মনের আনন্দে সক্কলকে সেই কথা বলে বেড়ান।
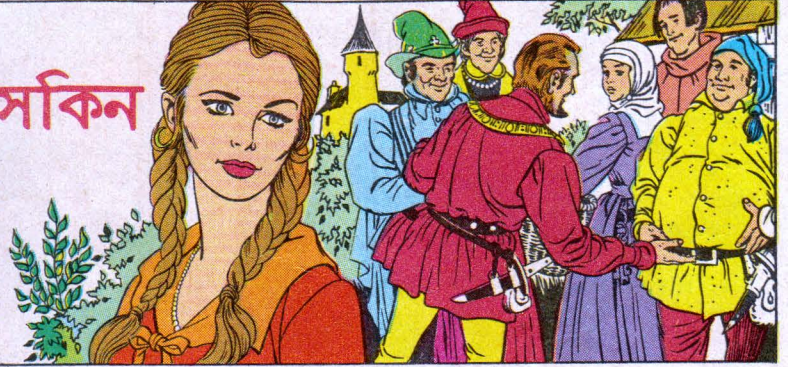
একদিন হলো কি, তিনি সোজা গিয়ে হাজির হলেন রাজার কাছে। বললেন, তাঁর মেয়ে খড় পিঁজে সোনার সুতো তৈরি করতে পারে।
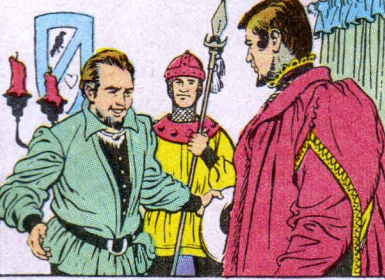
আর যাবে কোথায়! রাজা সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন বণিকের মেয়েকে।
মেয়েটি আসতেই রাজা তাকে নিয়ে গেলেন একটা ঘরে। সেই ঘরে একগাদা খড় আর একটা চরকা রাখা ছিলো। রাজা বললেন, কাল সকালের মধ্যে সব খড় পিঁজে সোনার সুতো কেটে দিতে হবে। না পারলে মৃত্যুদণ্ড!
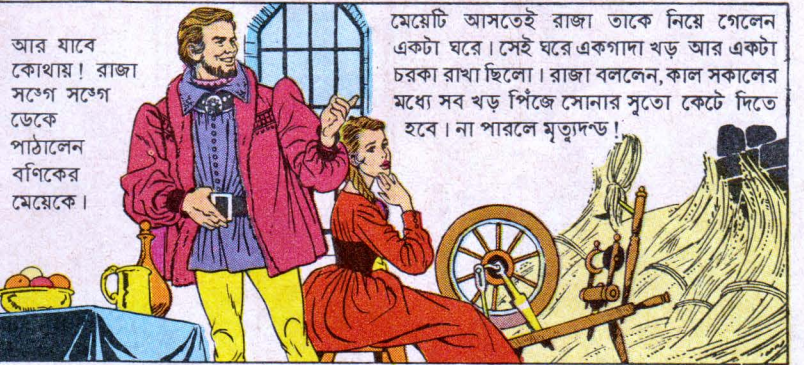
রাজার কথা শুনে মেয়েটি থ। সত্যিই তো সে খড় থেকে সোনার সুতো করতে পারে না। রাজা কিন্তু কোনো কথা শুনলেন না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।
এবার কি করবে সে? ভেবেই পায় না। রাজা তো বলেই গেছেন খড় থেকে সোনার সুতো তৈরি করতে না পারলে তার মৃত্যুদণ্ড দেবেন। মনের দুঃখে মেয়েটি তখন ঘরের কোণে বসে কাঁদতে লাগলো।

হঠাৎ সেই ঘরের দরজা খুলে গেলো। ভারি মজার দেখতে ছোট্ট একটি মানুষ
এসে ঘরে ঢুকলো।

কি হয়েছে তোমার? বসে বসে কাঁদছো কেন? মেয়েটি বললো, কাঁদবো না? এই সব খড় থেকে এক রাত্তিরের মধ্যে আমায় সোনার সুতো তৈরি করে দিতে হবে। না পারলে মৃত্যুদণ্ড। তাই কাঁদছি।

মেয়েটির কথা শুনে ছোট্ট সেই মানুষটির চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। বললো, আমি যদি করে দিই–কি দেবে?

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকালো। তারপর বললো, তুমি যদি সত্যিই সব খড় থেকে সোনার সুতো তৈরি করে দিতে পারো তাহলে তোমাকে আমার গলার এই সুন্দর হারটা দিয়ে দেবো।
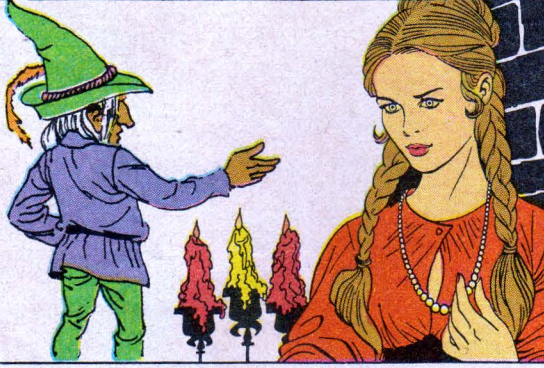
তাই না শুনে ছোট্ট মানুষটি তক্ষুণি চরকায় গিয়ে বসলো। আর সত্যি সত্যিই সব খড় পিঁজে সোনার সুতো তৈরি করে দিলো।
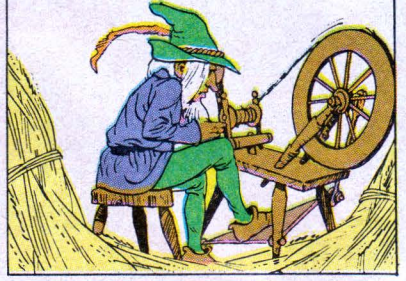
পরদিন সকালে রাজা এসে তো অবাক। সত্যিই যে সব খড় সোনার সুতো হয়ে গেছে!
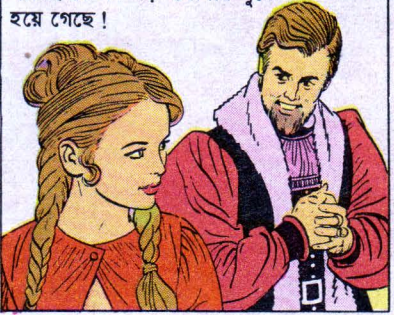
তাঁর আরও সোনা পেতে ইচ্ছে হলো। মেয়েটিকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা আরও বড়। খড়ও অনেক। সব সোনার সুতো করে দিতে হবে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাজা চলে গেলেন। মেয়েটি এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলো। ঠিক তখনই ছোট্ট মানুষটি এসে হাজির। বললো, আমি যদি তোমার কাজটা করে দিই তাহ'লে আমায় কি দেবে?

আমার এই হীরের আংটিটা দেবো। ছোট্ট মানুষটি আংটিটি নিলো। তারপর চরকায় বসে সব খড় পিঁজে সোনার সুতো করে দিয়ে চলে গেলো।
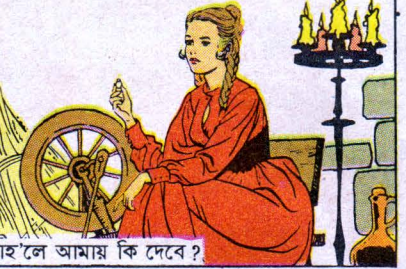
পরদিন সকালে রাজা এসে দারুণ খুশি। কিন্তু তাঁর আরও সোনা চাই। মেয়েটিকে নিয়ে তিনি গেলেন বিশাল একটি ঘরে। বললেন,এই সব খড় যদি সোনা করে দিতে পারো তাহলে তোমায় আমার রানী করবো।

একটু পরেই ছোট্ট মানুষটি এসে হাজির। বললো, আমি যদি সব সোনা করে দিই আমায় কি দেবে? আমার যে আর কিছু নেই। মেয়েটি বললো। তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করো,তোমার প্রথম সন্তানটি
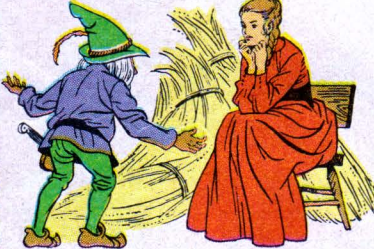
আমায় দেবে। তুমি তো দেশের রানী হচ্ছো! মেয়েটি ভাবলো,সে তো আর সত্যিই রানী হচ্ছে না। সব খড় সোনা না হলে কাল সকালেই তাকে মরতে হবে। সে রাজী হয়ে গেলো। আর ছোট্ট মানুষটি সব খড় সোনার সুতো করে দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন সকালে রাজা তো মহাখুশি। তিনি যতোটা সোনা চেয়েছিলেন– পেয়ে গেছেন। তাই খুশি মনে মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। রাজার বিয়ে! সারা রাজ্যে আনন্দ-উৎসব,খাওয়া-দাওয়া, হৈচৈ। তারপর একদিন রানীর ছেলে হলো। রাজা খুশি। রানী খুশি। রানীর কিন্তু মনেই রইলো না তাঁর সেই প্রতিজ্ঞার কথা।
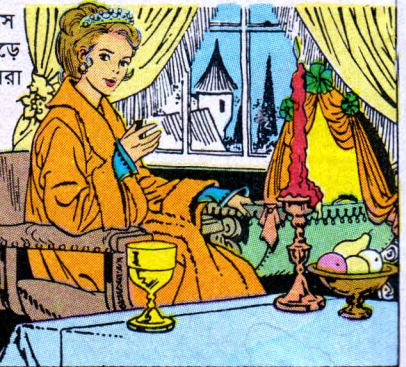
কেটে গেলো একটি দিন। পরদিন সকালে আবার লোকটা এলো। রানী সেদিন যতো রাজ্যের মজার মজার সব নাম বললেন। হাঞ্চব্যাক, ব্যান্ডিলেগস, ক্রুক শ্যাংকস, আরও কতো নাম। কিন্তু ছোট্ট সেই মানুষটির নাম বলতে পারলেন না।
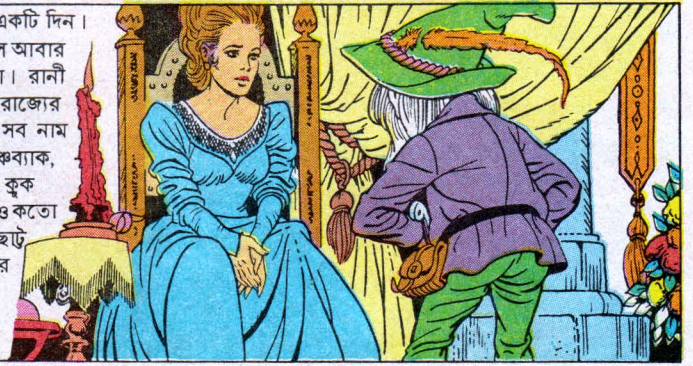
তাই বলে রানী কিন্তু চুপ করে বসে নেই। একজন বিশ্বস্ত আর সাহসী লোককে পাঠিয়েছেন ছোট্ট সেই মানুষটির পেছনে। ছোট্ট মানুষটা জানতেও পারলো না যে তার পেছনে পেছনে একজন এসেছে। গভীর জংগলে গাছের তলায় ছোট্ট একটা বাড়ি। রানীর লোকটা গাছের ফাঁক দিয়ে সব দেখছে। বাড়ির বাইরে আগুন জ্বালিয়ে ছোট্ট মানুষটা নেচে নেচে গান গাইছে,

আজ বানাবো মণ্ডা মিঠাই, নাচবো তা ধিন তা ধিন,
রাজপুত্তুর আসবে ঘরে—কাল যে শুভদিন।
ভাঙবো সবার জারিজুরি, নাচবো তাধিন তাধিন,
কেউ জানে না নামটি আমার রামপলসটিলিটসকিন।

ছোট্ট মানুষটির বাড়ি কোথায় জেনে, তার গান শুনে লোকটা রানীকে সব বললো। শুনে রানী খুব খুশি। মানুষটার নাম তাহ'লে জানা গেলো। পরদিন সকালে ছোট্ট মানুষটা এসে হাজির। বললো, এবার বলো দেখি নামটা আমার কি?

ডাকোয়ানিতে এক রাত

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকোয়ানি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল প্রায় তিনটে, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যা হতে সামান্য বাকি আছে। একে অক্টোবর মাসের শেষ, তায় হিমালয়ের প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচুতে এই জায়গাটা, ফলে এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা কুয়ারি গিরিপথ পার হওয়ার জন্য বেরিয়েছি, আমাদের কাছে কিবা দিন, কিবা রাত।

ডাকোয়ানি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের চারপাশে গভীর জঙ্গল। বিশাল বিশাল চীর পাইন আর দেবদারু গাছ। সামনের দিকে খাড়াই দেয়ালের মতো পাহাড়। এই পাহাড়ের গা বেয়ে কোনোক্রমে একবার উপরে উঠতে পারলেই আমরা কুয়ারি পৌঁছে যাব। কুয়ারিকে ঘিরে থাকা বরফে ঢাকা অসংখ্য গিরিচূড়া আমাদের চোখে ভেসে উঠবে। কেদারনাথ, চৌখাম্বা, নীলকন্ঠ, মানাপাস, নীলগিরি, ঘোড়ী বা গৌরী পর্বত, দুনাগিরি বা দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী এরকম আরো কত বরফ ঢাকা ঝলমলে চূড়ো। হিমালয়ের এই অপরূপ ধ্যানমগ্ন শোভা দেখার ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়।

আমরা হাঁটা শুরু করেছিলাম গোয়ালদাম থেকে। সঙ্গে গাইড বীর সিং। আর মালপত্র বইবার জন্য তিনটে খচ্চর সহ গোপাল সিং আর লাল সিং। গোয়ালদাম থেকে হাঁটা শুরু করে সাতটি রাত বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাটাতে হয়েছে। আজ অষ্টম রাত কাটবে ডাকোয়ানিতে। তবে আজ আর গ্রামের কারো বাড়ি বা বাংলো-টাংলো জুটবে না। থাকতে হবে তাঁবুতে। এর আগের রাতটাও আমাদের থাকতে হয়েছিল তাঁবুতে। জায়গাটার নাম ছিল সারতলী। সেখানে সারা রাত তাঁবুর ভেতর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেও ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। রাতে ঘুমুবো কি, অত ঠান্ডায় কেউ ঘুমুতে পারে! ভোরে, অন্ধকার না কাটতেই উঠে তাঁবুর পাশে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকতে হয়েছিল। তারপর আর দেরি না করে ডাকোয়ানির দিকে হাঁটা শুরু করেছিলাম। যেন যত তাড়াতাড়ি কুয়ারির কাছাকাছি এগিয়ে থাকা যায় ততই ভাল।

সারতলীর মতো ডাকোয়ানিতেও ধারে কাছে কোনো লোকালয় নেই। চারপাশের জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ঘাসী জমি। শ' পাঁচেক হাত নেমে গেলে তিরতির করে বয়ে যাওয়া একটা জলস্রোত চোখে পড়ে। এই জল আছে বলেই টুরিস্টরা ডাকোয়ানিকে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করেন।

সারতলীর উচ্চতা ছিল ৮০০০ ফুট। আর ডাকোয়ানির ৯৫০০ ফুট। অর্থাৎ মাত্র দেড় হাজার ফুট ওঠা। দূরত্বের দিক থেকেও এমন কিছু বেশি নয়। মাত্র ১০ কিলোমিটার। কিন্তু ১০ কিলোমিটার হলে কি হবে, রাস্তা বলতে প্রায় কিছুই নেই। সারতলী ছাড়াবার পরই গভীর স্যাঁতসেতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে নামতে হয়। বীর সিং সাবধান করে দিয়েছিল প্রথমেই, দলছাড়া হয়ে হাঁটবেন না বাবুজী। ভাল্লু (ভালুক) আছে, বড় খতরনক। কখনো বা দেখবেন ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ ছুটে আসছে। তা ছাড়া বুনো শুয়োর আর শেয়াল তো আছেই।

খানিকটা নামার পর টের পাওয়া গেল, একে তো পথ বলতে কিছুই নেই, গাছগাছালির নিচ দিয়ে পথ করে করে হাঁটতে হচ্ছে। তা সে পথ যে এত পেছল, কে ভাবতে পেরেছিল। যে কোনো মুহূর্তে পিছলে পড়ে হাত পা ভেঙে বসা অসম্ভব নয়।

সারতলী থেকে কুয়ারিকে যেমন দেখা যায়

কি আর করা যাবে, কষ্ট সইবার জন্যই তো এদিকে আসা। আমরা সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব পাখি চোখে পড়তে লাগল। এদের মধ্যে এক মাত্র মুনিয়াল পাখিই আমার চেনা। আকারে বেশ বড়। ওদের পুরুষ গুলি ভারী সুন্দর রংচংয়ে, কিন্তু মেয়েগুলো কেমন ছাই ছাই রংয়ের। আকারেও পুরুষগুলির চেয়ে অনেক ছোট ছোট।

ডাকোয়ানি। এই তাঁবুতেই আমাদের রাত কাটাতে হয়েছিল

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমরা একটা জল স্রোতের সামনে এসে দাঁড়ালাম,বীর সিং বলল, পাহাড়ী ছোট্ট নালাটার নাম কুইগাধেরা। নালাটা হাত পঁচিশেক চওড়া। ওপরে বড় বড় বোল্ডার বিছানো। ওগুলোর ওপর দিয়ে সাবধানে ব্যালেন্স কষতে কষতে ওপারে যেতে হবে। ওপার থেকে তারপর টানা চড়াই, একেবারে ডাকোয়ানি পর্যন্ত।

বোল্ডারের ওপর পা রেখে রেখে সবে আমরা ওপারে এসেছি, এমন সময় বীর সিং হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বাবুজী, এদিকে দেখুন, এই যে এখানে।

আমরা কৌতূহলে এগিয়ে এলাম, কি ব্যাপার ?

—জী, বাঘের টাট্টি। এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। হয়তো কিছুক্ষণ আগেই এখান দিয়ে কোনো বাঘ পার হয়েছে।

বাঘের কথা শুনে তো বুক শুকিয়ে ওঠে। আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। বীর সিং বলে, ডর নেই বাবুজী। এখানে বাঘ ম্যান-ইটার নয়। বরং মানুষের সাড়া পেলে ভয়ে পালিয়ে যায়। তা ছাড়া বাবুজী, আপনারা রয়েল বেংগল টাইগারের দেশের মানুষ। আপনারা বাঘের ভয় পাবেন কেন !

আমরা আবার হাঁটা শুরু করেছিলাম। কুইগাধেরা বা কুয়ারি নালার পর থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পুরোটাই চড়াই। হাঁটতে হাঁটতে দম ফুরিয়ে আসে। তবে রক্ষে, কুইগাধেরার ওদিকে রাস্তা যত খারাপ ছিল, এদিকে ততটা নয়। চড়াই ভাঙার জন্য হাঁটতে যা কষ্ট, তা ছাড়া আর কোনো অসুবিধা নেই। ফলে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ডাকোয়ানি ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছলাম।

সারাদিন আজ সূর্য চোখে পড়েনি। গাছগাছালির ফাঁকে বা পাহাড়ের আড়ালে কোথায় যে সূর্যটা লুকিয়ে ছিল কে জানে। ডাকোয়ানি এসে মনে হলো, আর বড় জোর পঁচিশ তিরিশ মিনিট পরেই সমস্ত এলাকাটা অন্ধকারে ডুবে যাবে। এরই মধ্যে সবচেয়ে আগে আমাদের তাঁবুটা খাটিয়ে নেওয়া দরকার। ফলে, তাড়া লাগালাম বীর সিংকে,ও বীর সিং ভাই, রাত হওয়ার আগেই তাঁবুটা খাটিয়ে ফেল না। বাইরে এই খোলা মাঠে থাকলে এরপর কিন্তু জমে বরফ হয়ে যাব।

বীর সিং হাসে। বরফের দেশে কষ্ট করার জন্য এসে এখন ভয় পেলে চলবে কেন বাবুজী। বলল, আপনারা বিশ্রাম করুন। লাল সিং চা বানাচ্ছে, চা খেয়ে নিন।

হাত পঞ্চাশেক জায়গা জুড়ে চমৎকার ঘাস। সত্যি এ ঘাসে শুয়েও গড়িয়ে নেওয়া যায়। আমরা সারাদিনের হাঁটার ক্লান্তিটা মুছবার জন্য ঘাসের ওপরই বসে পড়েছিলাম। দেখলাম, ওদিকে পাহাড়ের দেয়ালের দিকে খচ্চর তিনটের পিঠ থেকে মালপত্র নামাচ্ছে গোপাল সিং, আর লাল সিং।

বীর সিং বলল, বাবুজী, তাঁবুটা তাহলে এখানে এই খোলা জায়গাতেই খাটাই। আমরা তিনজন ওখানে পাহাড়ের গায়ে যে গুহা আছে, ওখানে থাকব।

—গুহা আছে নাকি ! অবাক হয়ে তাকাই। চলো তো দেখি, কেমন গুহা ? এগিয়ে গেলাম বীর সিংয়ের সংগে। গুহা না বলে রক সেল্টার বলাই ভালো। পাহাড়ের গা থেকে বিরাট

আকারের একটা পাথর গাড়ি-বারান্দার মতো সামনে এসে ঝুলে রয়েছে। ওর নিচে একটা খোঁদলের মতো। অনায়াসে ওখানে রাত কাটান যায়। অনেকেই যে এর আগে রাত কাটিয়েছে তার চিহ্নও রয়ে গেছে। পোড়া কাঠ আর ছাই জমে আছে দেখতে পেলাম।

বীর সিং বলল, বাবুজী, যারা তাঁবু নিয়ে আসে না, তারা এই গুহাতেই রাত কাটায়। একটা রাত তো, কোনো রকমে কেটে যায়। ভেতরে কাঠ জ্বালিয়ে রাখলে বেশ গরম থাকে জায়গাটা।

ওদিকে খচ্চরের পিঠ থেকে তখন সব মালপত্র নামানো হয়ে গিয়েছিল। লাল সিং প্রত্যেক দিন রাতে আমাদের খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়ায়। খিচুড়ি বলতে চাল ডাল আলু সব একসঙ্গে হাঁড়িতে চাপিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া। সঙ্গে ঘি আর জেলির কৌটো আছে, তাই একটু খিচুড়ির ওপর ছড়িয়ে নিয়ে খাওয়া। ক্ষিধের মুখে ওই যেন অমৃত মনে হয়।

দেখলাম, গুহার কাছেই লাল সিং পাথর দিয়ে উনুনের মতো করে নিয়েছে। সেখানে কাঠের আগুনে কেটলিতে জল চাপান হয়েছে।

বীর সিং বলল, চলুন বাবুজী, তাঁবুটা আমরা খাটিয়ে ফেলি। চা হলে ও নিয়ে আসবে।

আবার ফিরে এলাম। তাঁবু খাটাতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না বীর সিংয়ের। এসব করে করে ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চারটে খুঁটির ওপর তাঁবুর কাপড়টা বিছিয়ে এমন ভাবে চারপাশ থেকে টানা লাগাল যে দিব্যি একটা ঘরের মতো হয়ে গেল। ঘর বলতে অবশ্য ভেতরে দাঁড়াবার উপায় নেই। কোনো রকমে কুঁজো হয়ে ভিতরে শুয়ে পড়া।

আমরা তাঁবুর ভেতরে পলিথিন সিট বিছিয়ে তার উপর যে যার স্লিপিং ব্যাগ পেতে ফেললাম। বাইরে ততক্ষণে বেশ অন্ধকার ঘিরে ধরেছিল আমাদের। অন্ধকার আর ঠান্ডা। যেন তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে এখুনি।

চা এসে গেল। যে যার প্লাস্টিকের গ্লাস বার করে ফেললাম। কেটলি থেকে চা ঢেলে দিতে শুরু করল লাল সিং। কিন্তু চায়ে ঠোঁট ছোঁয়াতেই বুঝলাম, চিনি বিহীন। কি ব্যাপার, চিনি নেই বুঝি?

লাল সিং হাসে, চিনি তো খতম বাবুজী, কৌটোর দুধও শেষ হয়ে এসেছে। কাল ভোরে যে চা পাবেন, তাতে চিনিও থাকবে না, দুধও থাকবে না।

কি আর করা যায়, পাহাড়ের রাস্তায় হাঁটাপথে এসব হতেই পারে। এর পর চাল ডাল ফুরিয়ে গেলে কেবল আলুসেদ্ধ খেয়েই কাটাতে হতে পারে। তবে রক্ষে, কালই আমরা ডাকোয়ানি থেকে হাঁটা শুরু করে কুয়ারি গিরিপথ পার হয়ে তপোবন পৌঁছব। যদি সম্ভব হয় কালই আমরা যোশীমঠেও পৌঁছে যেতে পারি। একটা রাত শুধু কষ্ট করা।

রাতে লাল সিংয়ের খিচুড়ি খেলাম। হোক না কেবল চাল ডাল সেদ্ধ কিন্তু এর ওপর ঘি ছড়িয়ে গরম গরম খেতে যে কি ভাল, তা বলে বোঝান যাবে না। কলকাতায় যতোটা ভাত খাই, তার চেয়ে যেন দু-তিন গুণ বেশিই খেয়ে ফেললাম।

খাওয়া-দাওয়ার পাট যখন চুকল তখন ঘড়িতে সবে সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু চারপাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন গভীর রাত। কেমন নিস্তব্ধতা ঘিরে ধরেছিল আমাদের। আর তেমনি ঠান্ডা। আকাশটা কি মেঘে ঢেকে গিয়েছিল, কে জানে। বীর সিংরা আমাদের বিদায় জানিয়ে পাহাড়ের সেই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

আগামীকাল আমাদের ভোর চারটেয় উঠে হাঁটা শুরু করতে হবে। কুয়ারি

বরফে ঢাকা কুয়ারি গিরিপথ

অপরূপা হিমালয়। রহস্য আর সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার

পাসের ওপরে উঠে সূর্যোদয় না দেখা নাকি বোকামি। সূর্য ওঠার সংগে সংগে পাহাড়ের বরফ-ঢাকা চূড়োয় কত সব রংয়ের খেলা শুরু হয়, সে যে না দেখেছে সে কি করে বুঝবে।

ফলে আজ আর রাত জাগা উচিত নয়। তাঁবুর ভেতর শুয়ে শুয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্প করে কাটিয়ে আমরা একে একে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে হলো ঠিক তাঁবুর বাইরে কে যেন ঘোরাঘুরি করছে।

চমকে উঠলাম। সেই বাঘটা না তো! ভয়ে একরকম কাঠই হয়ে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ পরই বুঝলাম, কোনো জন্তু- জানোয়ার নয়। মানুষই। কিন্তু এই নির্জন জায়গায় আবার কে এল রে বাবা! একটু গলা তুলে জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে ওখানে?

হ্যাঁ, মানুষই! ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, আমি বাবুজী।

–কে রে বাবা! আমি কে!

গলার স্বর শুনে মনে হলো কোনো নারীরকণ্ঠ। ফলে কৌতূক দমিয়ে রাখা মুশকিল। তাঁবুর কাপড় একটু ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। কে তুমি? কি চাই এখানে?

দেখলাম, সারা গায় কম্বল জড়ানো বুড়ি মতো এক পাহাড়ী। ঠক ঠক করে কাঁপছে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম, কি হয়েছে?

–বাবুজী, আমার ছেলের ভীষণ ব্যামো। থোড়া দাওয়াই দিজিয়ে বাবুজী।

–দাওয়াই। আমরা কি ডাক্তার নাকি! ডাক্তারের কাছে যাও।

বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আমরা গরিব মানুষ বাবুজী। ডাক্তার কোথায় পাব! এ পাহাড়ের দেশে ডাক্তার আছে নাকি যে যাব। ডাক্তার দেখাতে হলে শহরে যেতে হয়।

পাহাড়ের এই সব নির্জন দেশে যে ওষুধপত্র, ডাক্তার কিছুই নেই, তা আমরা ভালই জানতাম। পাহাড়ী লোকেরা জড়িবুটি, ওঝা-বদ্যি দিয়েই কাজ চালায়। কিন্তু এই বুড়ির ছেলের হয়তো এমন কিছু অসুখ হয়েছে যা ওঝা-বদ্যি দিয়ে আর হচ্ছে না। বললাম, কি অসুখ?

বুড়ি বলল, বহুৎ বুখার বাবুজী। বুক মে বহুৎ দরদ।

আমরা পাহাড়ের রাস্তায় হাঁটার সময় নিজের বিপদের আপদের কথা ভেবে কিছু ওষুধ সংগে নিয়েই বেরুই। জানতাম বুড়িকে যতক্ষণ না ওষুধ দেব ও ছাড়বে না। তাই ডাক্তার না হয়েও অনুমানে আমাদের ওষুধের ব্যাগ থেকে কিছু ওষুধ বার করে বুড়ির হাতে দিলাম। কি ভাবে খেতে হবে তাও বলে দিলাম।

বুড়ি আমাদের আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিয়ে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আবার এসে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকলাম। নিস্তব্ধ রাত। নিস্তব্ধ ডাকোয়ানি।

পরদিন সব শুনে লাল সিং বলেছিল, বাবুজী, যারা এখানে আসে ঐ বুড়িমা তাদের কাছে এসে ওষুধ মাঙে। বুড়িমার ছেলে কিন্তু বেঁচে নেই। অনেকদিন আগে এইরকমই এক রাতে বুখার আর বুকের দরদে বুড়িমার ছেলে মারা গেছে। তারপর থেকে বুড়িমা প্রত্যেক রাতে ওষুধ চেয়ে বেড়ায়।

শুনে দুঃখে ভরে উঠল মন। ডাকোয়ানির ঐ রাতটির কথা কখনও কি আর ভুলতে পারবো?

ছবিগুলো লেখকের তোলা

বাহাদুর বেড়াল

খাওয়ার মাছ নেই! কাছাকাছি কোন পুকুরে মাছ ধরতে দেবে না তাহলে এই পুজোর দিনে কি না খেয়ে থাকতে হবে?

না- কি করে খাবার সংগ্রহ করতে হবে আমি জানি!

আমার তৈরি এই রকেট কেমন লাগছে?

মাছ ধরা নিষেধ
এই আলিশান রকেট শুধু লোকালয়ের বাইরে ব্যবহার করতে হবে!

মাছ ধরার জন্যে আজ আর কাউকে তাড়া করতে হবে না।
মাছ ধরা নিষেধ
সবাই পুজো উৎসবে মেতে আছে। কে আর মাছ চুরি করতে আসবে!

এমন কি বাহাদুরও বিরাট এক রকেট বাজি নিয়ে মেতেছে!

হেঃ হেঃ! এটা সে রকেট নয় রে, বুদ্ধুরা! দ্যাখ্ এর পকেট থেকে কি জিনিস বেরোচ্ছে মাছ ধরার ছিপ আর **মাছ**!

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে! এখন তো ভালো থাকারই সময়। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে চারদিক ম ম করছে। কাশ ফুলের ঝাড়ে যেন সাদা আলোর হিল্লোল। চারদিকে এখন শুধু আনন্দ, হাসি, গান।

এই সময় আমার ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মন কেমন করে ছোটবেলার জন্যে। আমাদের ছোটবেলায়—পুজোর একমাস আগেই ঘট বসে যেতো। আমরা ছুটতাম নদীর ধার দিয়ে। একবার বাড়ি, একবার পুজোর দালান। ঘট বসে যেতেই ননী পালের কাজও বেড়ে যেতো। তখন তার ঠাকুর শেষ করার তাড়া। দোমেটের পর বসাতো মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর অসুরের মুখ। তারপরই সাদা রং। তারপর চড়তো ঠাকুরদের গায়ের রং। বোধনের আগের দিন চোখ আঁকার কাজ শেষ। তারপর ঠাকুরের মুখে লাগানো হতো গর্জন তেল। আর বোধনের আগেই ঠাকুরদের হাতে তুলে দেওয়া হতো অস্ত্র। আমরাও নতুন জামা, প্যান্ট, জুতো পরে বোধনতলায় হাজির। অন্য সময় আমরা দিনের বেলাতেও ঐ বেলগাছের কাছে যেতাম না। শুনতাম ঐ বেলগাছে নাকি ব্রহ্মদৈত্য থাকেন। রাত্তির বেলায় গাছ বেয়ে উঠে পুজোর দালানে চলে যান। প্রায়ই রাত্তিরে পুজোর দালানে ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের খড়মের শব্দ শোনা যায়। অনেকেই নাকি খটখট শব্দ শুনেছে। তাই বেলতলাটা আমাদের কাছে ছিলো ভয়ের জায়গা। কিন্তু বোধনের দিন আমাদের একটুও ভয় করতো না। বুক ফুলিয়ে বসে থাকতাম বেলগাছটার তলায়। পুজোর সময় আবার ভয় কী!

গ্রামের সঙ্গে শহরের পুজোর অনেক তফাৎ। তোমরা যারা কলকাতায় থাকো তারা তো ষষ্ঠীর দিন বেলগাছতলায় বোধনের কথা প্রায় জানোই না। কলকাতায় বোধন তো নমো-নম করে সারা হয়। আর মাইকের ঠেলায় পুজো—টুজো কিছু বোঝাই যায় না।

তবে পুজোর সব থেকে বড় আকর্ষণ পূজা সংখ্যা। আমাদের ছোটবেলায় এই মজাটা তেমন ছিলো না। তখন শুধু হাতে পেতাম দেব সাহিত্য কুটীরের পূজা-বার্ষিকী। বই তো নয় যেন সোনার খনি। এখনও সেগুলো পাওয়া যায়। না পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই পড়ে নিও।

এবার বলো শুকতারার পুজো সংখ্যা কেমন লাগলো। তোমরা যেমন চাও ঠিক সেই রকমই হয়েছে তো? কার কার লেখা ভালো লাগলো, নতুন কি কি চাও সব জানিও কিন্তু। শুকতারা তো তোমাদেরই পত্রিকা। তোমরা যেমন চাইবে সেই রকমই হবে।

সাবধানে থেকো সকলে। আসল মজাই তো পুজোর সময়। মাথার ওপর নীল আকাশে সাদা মেঘ ডানা মেলে উড়ে চলেছে আর নিচে রংবেরংয়ের ফুলের সমারোহ। মাতৃপূজার জন্যে প্রকৃতিও তৈরি। সব কিছুই তাই এই সময় ভালো লাগে। সব কিছুতেই তাই এই সময় পুজো পুজো গন্ধ। মা আসছেন যে! শারদীয়া শুকতারা মাতৃপূজায় দেব সাহিত্য কুটীরের অর্ঘ্য। শারদীয়া শুকতারা তোমাদের খুশি করতে পারলেই আমাদের আরাধনাও সার্থক হবে।

আজ তাহ'লে এই পর্যন্ত।

আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ!

—তোমাদের দাদুমণি।

তোমাদের পাতা

শারদীয়া

শরৎকালে ভোরের বেলা,
শিউলি তলায় ফুলের মেলা।
পুকুরেতে পদ্ম ফোটে,
সোনা রোদের ঝিলিক ওঠে।
আকাশেতে মেঘের ভেলা,
ভেসে বেড়ায় সারা বেলা।
ঐ দেখ কে আকাশ পথে,
আসছে নেমে সোনার রথে।
পুজোর বাজনা উঠলো বেজে,
মা এসেছেন সোনার সাজে।

মৈত্রী রায়মৌলিক
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
হোলি চাইল্ড স্কুল, কলিকাতা
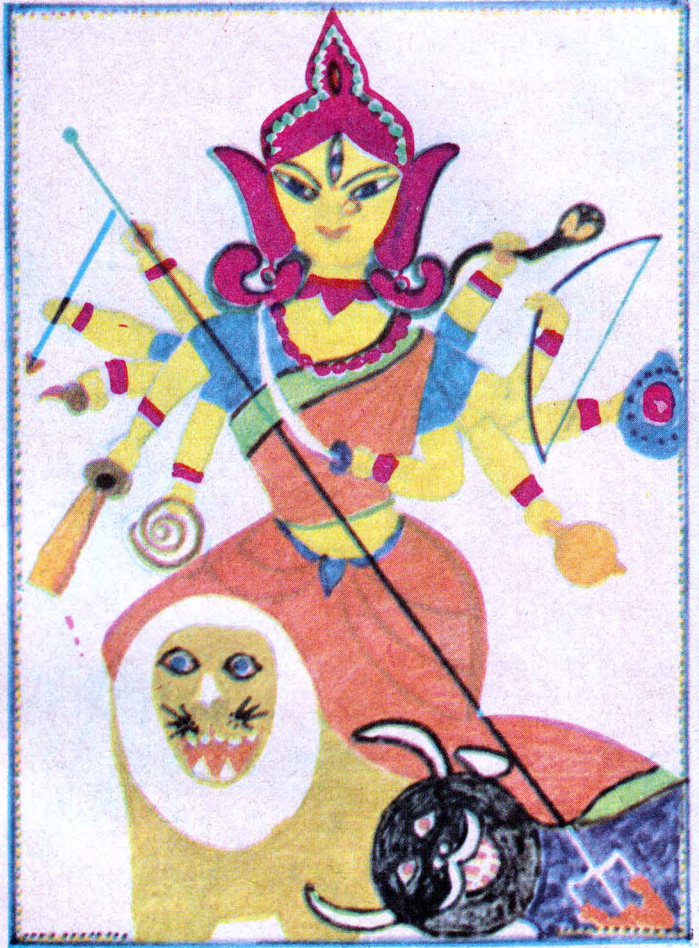
সম্রাট দেব
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী, করিমগঞ্জ, আসাম

শুভজিৎ দত্ত
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী, চিনাকুড়ি কোলিয়ারি, বর্ধমান

পুজো

পুজো, পুজো, পুজো
হবে জামা জুতো।
পুজো থাকবে পাঁচদিন
তারপরে পড়তে হবে সারাদিন।
আসবে পরীক্ষাটা
কাঁপে শুধু গা-টা।
মনে হবে তখন
পরীক্ষা শেষ হবে কখন?

মৌমিতা ভট্টাচার্য
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল কলিকাতা

তোমাদের পাতা

কানু রায়
বয়স বারো, অষ্টম শ্রেণী কেমব্রিজ স্কুল, কটক

পাখি

কাকাতুয়া হবে কাকা
ময়না কি পিসিমা ?
চন্দনা দিদি হবে
কে যে হবে মাসিমা ?

শকুনি তো মামা ছিল
সে কি এই শকুনি ?
মাছরাঙা জেঠু হলে
বাবা দেবে বকুনি।

ফিঙে পাখি ভাগ্নে কি
টুনটুনি ভাইঝি ?
কোন পাখি হবে দিদা
কোন পাখি মাইজি ?

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী
বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজিয়েট স্কুল, বাঁকুড়া

সোমপ্রকাশ ভট্টাচার্য
বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণী
জিতেন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়
নবদ্বীপ

আনন্দ দাশগুপ্ত
বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
শিবতলা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় বিরাটী
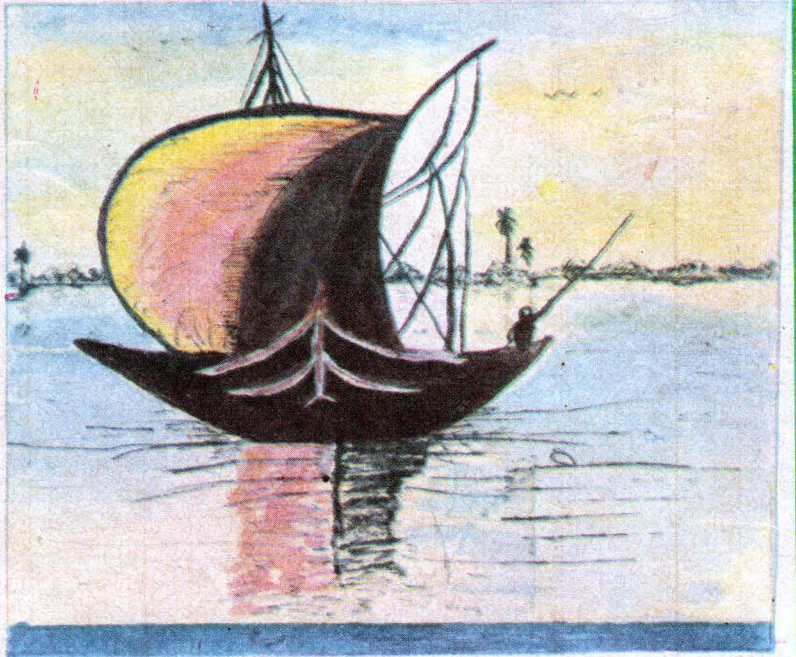
সুদীপ্ত ঘোষ
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী সোনাউল্লা উচ্চ বিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি
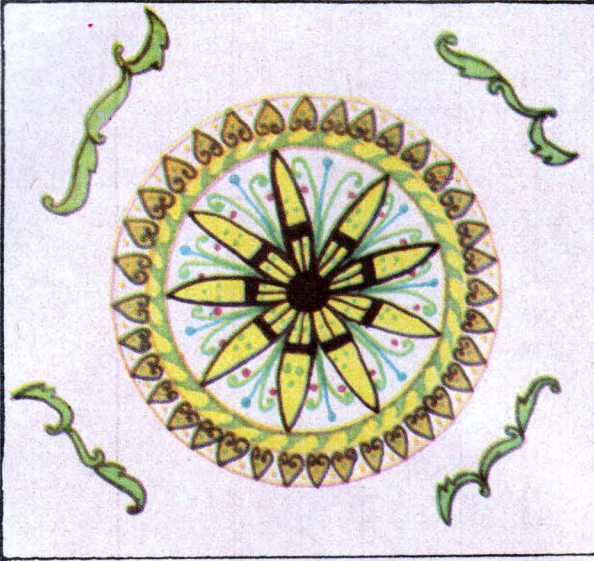
কিংশুক মুখার্জী

বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী , নামোপাড়া, আসানসোল

রাজর্ষি ভট্টাচার্য

বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, বারাকপুর, চব্বিশ পরগনা

পশুরাজ

পশুর রাজা সিংহ মশাই
গভীর বনে বাসা,
ধূসর তোমার কেশরগুলি
দেখতে বড়ই খাসা।
লেজ ফুলিয়ে দাঁড়াও যখন
পালায় বনের প্রাণী,
তাই তো মোরা পশুর রাজা
বলেই তোমায় জানি।

দাঁতগুলিতে বড়ই যে ধার,
ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাঙবে যে ঘাড়।
বস যখন সিংহাসনে
দেখতে লাগে বড়ই মজা,
সবাই তোমায় মান্যি করে
তাই তো তুমি পশুর রাজা।

অনিন্দ্য মিত্র

বয়স এগার, ষষ্ঠ শ্রেণী

ডি.টি.পি.এস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুর্গাপুর

রাজিকা মজুমদার • বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী ,লরেটো ... বাজার) ,কলিকাতা

স্বপন

বলছি শোন কালকে রাতে
একটি মজার দেশে,
রকেট চড়ে গিয়েছিলাম
শূন্যলোকে ভেসে।
মা আমাকে বললে ডেকে
জলদি নেমে এস,
দুষ্টুমি নয় চুপটি করে
পড়তে এখন বস।

আমি বলি ডাকবে না মা
যাচ্ছি অনেক দূরে,
ভেবো না মা একটু পরেই
আসছি বিদেশ ঘুরে।

চন্দ্রলোকে পৌঁছে গিয়ে
বিজ্ঞানীদের মত,
আবিষ্কার করব আমি
রহস্য যে কত।
এমন সময় দিদির ডাকে
স্বপ্ন ভেঙে যায়,
রকেট এবং চন্দ্রলোক
গেল যে কোথায়!

সৌমেন সরকার

সৈদাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

বয়স পনেরো, নবম শ্রেণী

মুর্শিদাবাদ

বেলুনে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি

পরাশর রায়

কদিন ধরে নাওয়া খাওয়ার অবধি সময় ছিল না বেন আব্রুজো আর ম্যাক্সি এন্ডার্সনের। আবার ওঁরা বেলুনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিতে তৈরি হচ্ছেন। ১৯৭৭-এও বেরিয়েছিলেন একবার 'ডাবল ঈগল' নামে বেলুনে চড়ে। সেবার বেলুন ওড়াতে সামান্য একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সাফল্য পাননি। প্রচন্ড ঠান্ডায় বেলুন আইসল্যান্ডের তীরের কাছে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল। এবার তাই ওঁরা তৈরি হচ্ছেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। একটা সেকেন্ডও যেন দেরি না হয়। বেলুনের আগের নামই রাখা হয়েছে। যোগ করা হয়েছে শুধু 'টু' শব্দটা—'ডাবল ঈগল টু'। সংগীও একজন বেড়েছে ওঁদের— তাঁর নাম ল্যারি নিউম্যান। ঠিক হয়েছে, উত্তর আমেরিকার মেইন থেকে 'ডাবল ঈগল টু'-এর যাত্রা শুরু হবে।

বেলুনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার চেষ্টা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এ চেষ্টা শুরু হয়েছিল সেই ১৮৭৩ সাল থেকে। সেই থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মোট তেরটা অভিযান, একের পর এক ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ বেলুনই সমুদ্রে পড়ে যায়। দুটো একেবারে নিখোঁজ হয়। আর একটা আকাশেই ফেটে যায়। এই সব অভিযানে মোট পাঁচজনের মৃত্যুও হয়।

সন্ধ্যে ৮টা ৪৩ মিনিটে একটা আলুর ক্ষেত থেকে 'ডাবল ঈগল টু' আকাশে উড়ল। পরিষ্কার আকাশ, বাতাস নেই, যাত্রা শুরুর পক্ষে চমৎকার আবহাওয়া। হিসাব মতোই উড়ে চলল 'ডাবল ঈগল টু' তার লক্ষ্যের দিকে। যাত্রীরা আরাম করে বসলেন ঝুলন্ত গন্ডোলায়। খানিক পরে অবাক হয়ে দেখলেন, দলে দলে মানুষ ছুটে চলেছে তাঁদের বেলুনের সংগে নিচে। তাঁরা সবাই এসেছেন ওঁদের উৎসাহ দিতে।

ব্রান্সউইকের কাছে যখন পৌছালেন তাঁরা, প্রথম দিনের আলো নিভে রাত এল। সামনে ওঁদের অনেক দূরের পথ। আর পিছনে, অতীতের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা এবারে ওঁরা কাজে লাগিয়ে সফল হবেন।

শুধু আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া ওঁদের লক্ষ্য নয়। ওঁদের লক্ষ্য এবারে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। এত দূরের পথ পাড়ি দেবার চেষ্টায় এবারে ওঁরা আরও অনেকের সাহায্য নিয়েছেন। সাহায্য নিয়েছেন আবহাওয়া-বিশারদদের, বৈজ্ঞানিকদের।

বেলুন উড়ে চলল। চলার সংগে সংগে নানান সমস্যাও দেখা দিল। প্রথমেই বেতার যন্ত্রটা খারাপ হলো। পৃথিবীর আকাশেই উড়ছে ওঁরা, অথচ পৃথিবীর সংগে আর ওঁদের যোগাযোগ রইল না।

আগে যাঁরা বেলুনে যাত্রা করতেন, তাঁরা বেলুন বেশি উঁচুতে ওড়াতেন না। এঁরা তার উল্টো কাজ করলেন। প্রথমেই বেলুন তুলে নিলেন অনেক উঁচুতে। উঁচুতে বাতাসের বেগ অনেক বেশি। তাছাড়া বসন্ত আর শরৎকালের মাঝামাঝি, উত্তর আটলান্টিকের অনেক ওপর দিয়ে একটা বাতাসের স্রোত বয়ে যায়। সেই বাতাসেই ভেসে ওঁরা ওঁদের লক্ষ্যে পৌছাবেন ঠিক করলেন। অত উঁচুতে বাতাসে অক্সিজেন কম। যাত্রীদের তাই অক্সিজেন মুখোশ পরতে হলো।

যাত্রা শুরুর আগে

গাছের ওপরে আটকে গেছে বেলুন

হিসাব মতো ঠিক পথেই, ঠিক গতিতে উড়ে চলল বেলুন। চল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল নিরুপদ্রবে। তারপর হঠাৎই বেলুনটা পড়ল গিয়ে একটা এয়ার পকেটে। সেখানে বাতাসের গতি নিচের দিকে। হু হু করে বেলুন নেমে চলল নিচের দিকে। বিপদজনক ব্যাপার। বেন আর ম্যাক্সি গন্ডোলা থেকে ভারী ব্যালাস্টিংয়ের জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি নিচে ফেলতে লাগল। দেখতে দেখতে বেলুন প্রায় ৩৫০০ ফিট নিচে নেমে এল। ভার কমাতে বেলুন আবার ওপরে উঠতে লাগল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যাত্রীরা। কিন্তু বেলুনের গায়ে কোথায় ফুটোও হয়নি তো? ম্যাক্সির কাঁধে চড়ে বেন বেলুনের সমস্ত গা-টা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। না, কোথাও কোনো ফুটো নেই। হিলিয়াম গ্যাস বার হয়ে যাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হলেন যাত্রীরা।

যাত্রীদের এই বেলুনটা তৈরি করে দিয়েছেন এড ইয়েস্ট। নিজেও তিনি একবার বেলুনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। তাঁর লেখা পড়েই ম্যাক্সি বন্ধু বেনকে দলে নিয়ে নতুন অভিযানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম যাত্রার বেলুন 'ডাবল ঈগল' এড ইয়েস্টেরই তৈরি। ডাবল ঈগল টুও তিনিই তৈরি করে দিয়েছেন। নিখুঁতভাবে তৈরি করা এই বেলুন।

দ্বিতীয় দিন ভোরে বাতাসের চাপ মাপা হলো, ঠিক আছে। বেলুনের উচ্চতাও ঠিক আছে। বেলুন উড়ে চলেছে নিউফাউন্ডল্যান্ডের ওপর দিয়ে। বিকেল নাগাদ বেলুন পেরিয়ে গেল সেন্ট জনস্। মার্কনি তাঁর বেতার যন্ত্র এখানেই পরীক্ষা করেছিলেন শব্দ-তরঙ্গ আটলান্টিকের ওপারে পাঠিয়ে। কিন্তু যাত্রীদের বেলুনের বেতার যন্ত্র তখনও অচল। বেন আর ম্যাক্সি ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে মহা বিরক্তিতে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় দিন ল্যারি লাগলেন ওটার পিছনে। আসল যন্ত্রটা খুলে ফেললেন। একটা শখের বেতার চালু করলেন তার বদলে। সেটা চালিয়ে ইংলন্ডের এক শৌখিন বেতার যন্ত্রের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আর তার সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত বোস্টনের বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেন। খুশিতে ল্যারি চেঁচিয়ে উঠলেন, হারানো ছেলেটা দেখছি শেষ পর্যন্ত তার মাকে খুঁজে পেল।

বেলুনের সব যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক কাজ দিচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই কারও। তবুও তাঁরা বাইরের অপরূপ দৃশ্য দেখার মতো সময় পান না। সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায় নিচের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টায়। তাছাড়া বেলুনকে ঠিক পথে রাখার ব্যাপারেও অনেক কিছু করতে হয় ওঁদের।

সারাক্ষণ অক্সিজেন মুখোশ পরে থাকাতে তার ঘষায় মুখে ব্যথা বাড়ছিল। খিদে কমে যাচ্ছিল ওঁদের সবার। কিন্তু তৃষ্ণা বাড়ছিল। না খেলে তো চলবে না, তাই ম্যাক্সি নিয়ম করলেন, সুপ স্যালামি সবাইকেই খেতে হবে। তাছাড়া আর যে যা খেতে চাও। ফলের রসও প্রচুর খেতে লাগলেন ওঁরা।

আগের বারে পোশাক ভিজে গিয়ে ওঁদের কষ্ট দিয়েছিল। এবারে তাই উল আর সিনথেটিক সুতোর বোনা পোশাক পরেছেন ওঁরা। পায়ের মোজা, ব্যাটারী চালিয়ে গরম করার ব্যবস্থা আছে। তা না হলে অত উঁচুতে হিমশীতল রাতে পায়ে তুষারক্ষত হয়ে যাবে।

আইসল্যান্ডের কাছে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। গতবার এখানেই উপকূলের কাছে তাঁদের বেলুন নিচে পড়ে গেছিল। সেবারে ৫৫০০ ফিট ওপরেও বেলুনের গায়ে প্রায় ৯০০ পাউন্ডের মত বরফ জমে ছিল। সেই ভারেই বেলুন নিচে পড়ে গেছিল।

এবারে বেলুন উড়ে চলেছে ১৬,৫০০ ফিট ওপর দিয়ে। এত উঁচুতে বরফ তেমন জমল না। যতটুকু জমল, তাও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গলে গিয়ে গন্ডোলার চারপাশ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল। বরফের সমস্যা মিটল। কিন্তু ম্যাক্সি হিসাব কষে দেখলেন, অল্প চাপের একটা তুষার-ঝড় ধেয়ে আসছে ওদের দিকে, সে ঝড়ের গতিমুখ উত্তরে। তার মাঝে পড়লে বেলুন

তিন সফল অভিযাত্রী আব্রুজো, ম্যাক্সি এন্ডার্সন ও ল্যারি নিউম্যান

তো অন্য দিকে চলে যাবে। ষাট মাইল দূরে ঝড়, এসে পড়ল বলে। প্রাণপণে দড়িদড়া টেনে যাত্রীরা সবাই মিলে কোনও মতে বেলুনটাকে সরাল ঝড়ের গতিপথ থেকে। একটা ভীষণ বিপদ কাটল ওদের।

হিলিয়াম গ্যাসেই বেলুন ভরা থাকে। বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্কা হিলিয়াম গ্যাস, তাই বেলুন ভাসে। তবে রাতের ঠাণ্ডায় হিলিয়ামের আয়তন কমে। ফলে বেলুন নিচে নামতে থাকে। রোদের আলোয় গরম হয়ে আবার গ্যাসের আয়তন বাড়ে, বেলুনও সংগে সংগে ফের ওপরে উঠতে থাকে। এমনি ভাবে গ্যাসের খেয়াল খুশিতে বেলুন ওঠা-নামা করলে তো চলবে না। তাই ব্যালাস্টিং-এর ভার কমিয়ে বাড়িয়ে, বাড়তি হিলিয়াম গ্যাস যোগ করে বেলুনকে তার সঠিক উচ্চতায় রাখা হয়। এসব কাজ প্রায় সারাক্ষণই এক সংগে করতে হয়।

ঝড়ের ভয় কাটল। আকাশ পরিষ্কার, যতদূর দেখা যায় নীল। সূর্য মাথার ওপরে। সূর্যের তাপ ফিরিয়ে দেবার জন্য বেলুনের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া থাকে। ভিতরের গ্যাস তাই তত গরম হতে পারে না। ক্রমে সূর্য মেঘে ঢেকে গেল। ঠাণ্ডা হলো চারদিক। ঠাণ্ডা হলো বেলুনের গা। নিচে নামতে লাগল বেলুনটা। ২৬,৫০০ ফিট উঁচুতে ছিলেন ওরা। ৪০০০ ফিট নিচে নামতেই ওঁরা ঘন মেঘের রাজ্যে পৌঁছে গেলেন। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কোনও দিকে। খালি অক্সিজেন সিলিণ্ডারগুলো বা ব্যালাস্ট যে নিচে ফেলে ভার কমিয়ে বেলুনকে ফের ওপরে তুলবেন সে উপায় আর ওঁদের ছিল না। নিচে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। অমনি আতংকজনক অবস্থাতেই ওঁরা উড়ে চললেন। আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেল। ইউরোপের দিক আঁধার করে আস্তে আস্তে রাত এগিয়ে এল। আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ছেঁড়া ছেঁড়া ভেসে যাওয়া মেঘের কোলে আলোর খেলা অপরূপ হয়ে উঠল।

তখনি শ্যাননের বেতার থেকে অভিযাত্রীদের জানানো হলো, ওঁরা আয়ারল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছেন। ক্লান্ত শ্রান্ত ওঁরা! গন্তব্যস্থল প্যারিস এখনও অনেক দূরে।

খানিক পরেই ডাবলিন শহর দেখা গেল। শহরের বুকে আলোর ঝিলিক উঠছে। নিরুপায় ওঁরা তখন ওঁদের বাড়তি পোশাকগুলোই ফেলতে শুরু করলেন। হাওয়ায় ফুলে সেগুলোকে শূন্যে ভাসা মানুষ বলে মনে হতে লাগল।

ডাবলিন ছাড়তেই পুবের আকাশে আলোর সাড়া জাগল। দূরে ওঁরা ওয়েলশ-এর তীর দেখতে পেলেন। নিচের দৃশ্য অপূর্ব। নীল সমুদ্র, নীল আকাশ, তাতে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের সংগে ভেসে চলেছে 'ডাবল ঈগল টু'।

ইংলণ্ডের ওপরে পৌছলেন যখন ওঁরা, হাল্কা বেলুন তখন আবার অনেক উঁচুতে উঠেছে। নিচের মানুষজন ঘরবাড়ি কিছুই তাই তাঁরা দেখতে পেলেন না। তবে নিচের মানুষরা রোদের আলো আয়নায় ফেলে ঝিলিক তুলছিল। তা ওঁরা বারবারই দেখতে পাচ্ছিলেন। ওঁরাও ঠিক তেমনি ভাবেই আয়নায় ঝিলিক তুলে তাদের সংগে যোগাযোগ রাখছিলেন।

সামনে ইংলিশ চ্যানেল। সেখানকার আবহাওয়ার যথেষ্ট দুর্নাম। কোনাকুনি ১২০ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে ওঁদের। তবে ও-পথে আর কোনও বিপদে পড়তে হল না।

আগের দিন দুপুরে বেলুনটা হঠাৎ অনেকটা নেমে গিয়ে ওঁদের বিপদে ফেলেছিল। বেলুনে আর ফেলার মতো কিছুই নেই। সারা দুপুর ওঁরা তাই আতংকে কাটালেন। সূর্য যখন অস্ত গেল, চ্যানেল পার হয়ে ওঁরা ফ্রান্সের লে হ্যাভর শহরের ওপরে পৌঁছালেন। তখন ওঁদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে। যাত্রা প্রায় শেষ হতে চলল। ওঁরা পেরেছেন আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিতে। ওঁরাই প্রথম!

কিন্তু একি! বেলুনটা যে আবার হঠাৎ হু হু করে নিচে নামতে আরম্ভ করেছে। মিনিটে ১০০/২০০ ফিটের মতো গতি। নিচের মেঘ সরে গেল। মাঠঘাট ঘর বাড়ি সবই স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। বেতারে ওঁদের জানান হলো, সামনের লে বর্গের বিমানঘাঁটিতে বিমান ওঠা-নামা বন্ধ করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তাঁরা সেখানে নামতে পারেন। ওঁরা রাজী হলেন না, কারণ তাহলে ওঁদের প্যারিস শহরের শহরতলির ওপর দিয়েই উড়ে যেতে হবে। বেলুনের যা অবস্থা তাতে অতটা ঝুঁকি তাঁরা নিতে রাজী হলেন না।

বেলুন আরও নিচে নামতে লাগল। দেখে বুঝে জিনিস ফেলে ওঁরা বেলুনটাকে শূন্যে রাখলেন। এভরু শহর পেরিয়ে চষা ক্ষেতের ওপরে এসে পড়লেন ওঁরা। সংগে সংগে একটা খালি ট্যাংক আর ব্যাটারি নিচে ফেলে দিলেন ওঁরা। লাফিয়ে বেলুনটা আবার কিছুটা শূন্যে উঠে গেল। এভরু পার হয়ে ওঁরা চলে এলেন মিসারি গ্রামের কাছাকাছি জায়গায়। আবার বেলুন নিচে নামতে লাগল হু-হু করে। এবারে মাটিতে নামার পালা।

নিচে ততক্ষণে সব রাস্তায় গাড়ির সারি। বেলুনের সংগে সংগে চলেছে গাড়িগুলো। ওঁরা যেখানে নামবেন সেখানেই যাচ্ছে গাড়িগুলো।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছিল অভিযাত্রীদের। আর যেন পারছেন না। আস্তে আস্তে গ্যাস বার করে দেওয়া হলো বেলুন থেকে। আস্তে আস্তেই নিচে নামতে লাগল বেলুন। এক সময় হঠাৎ গণ্ডোলাটা মাটিতে ধাক্কা খেল। হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসে ঘিরে ফেলল বেলুন। অভিযাত্রীদের প্রাণখোলা অভ্যর্থনা জানাল তারা।

ছ'দিনের বেলুন যাত্রা শেষ করে ফ্রান্সের মিসারি গ্রামের বার্লি ক্ষেতের মাটিতে পা রাখলেন যাত্রীরা।

গণেশদাদার গল্প

নন্দলাল ভট্টাচার্য

চারিদিকে আনন্দ আর উল্লাস। কৈলাসপুরীতে তো কথাই নেই। মহানন্দে নাচছে সবাই। নাচবে না! মা দুর্গার ছেলে হয়েছে যে। আর ছেলেও যেন দেখার মতো। ছেলের মুখ দেখে আনন্দে মহাদেব নাচতে নাচতে চলে গেছেন শ্মশানে।

আর মা দুর্গা!

তাঁর যেন ছেলের মুখ দেখে আর আশই মেটে না। ঠায় তাকিয়ে আছেন ছেলের মুখের দিকে। কী সুন্দরই না হয়েছে ছেলেকে দেখতে। নাদুসনুদুস—পেটটি একটু নাদা—কিন্তু একমাথা কোঁকড়ানো চুল, এই টানা টানা চোখ, টিকলো নাক—সব মিলিয়ে ছেলের যা রূপ তা এখনই হার মানাচ্ছে আর সব দেবতাকে। বড় হলে তো কথাই নেই। এ ছেলেই হবে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। ছেলের লাল টকটকে রঙ।

মা দুর্গা ছেলেকে দেখেন আর গর্বে তাঁর বুকটা ফুলে ওঠে। বারবারই মনে হয়, ছেলে হবে তাঁর দেবলোকের রাজা। ছেলের নাম রাখলেন—গণেশ।

মা দুর্গাকে একদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একসময় বিজয়া বলেন, কি সখি, ছেলের থেকে দেখছি চোখই সরাচ্ছ না। বলি মা হয়ে অমন করে কি ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে আছে? নজর লাগবে যে। তার ওপর ছেলের তোমার মঙ্গলবারে জন্ম—ওর দিকে অমনভাবে তাকিয়ে থেক না।

বিজয়ার কথায় যেন সম্বিত ফিরে পান মা দুর্গা। তিনি বলেন, কই না তো, আমি তো ছেলের দিকে তাকিয়ে নেই। তাকিয়ে নেই, কথাটা বলেই মা দুর্গা কিন্তু আবার ছেলেকেই দেখেন। তাঁর ভাবসাব দেখে এবার হেসে ফেলেন জয়া এবং বিজয়া। হাসতে হাসতেই তাঁরা বলেন, শীগগির নজরপোড়া দাও তো। শেষে ছেলে যে তোমার বিষনজরে পড়বে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন মা দুর্গা। ওদিকে কৈলাসপুরীতে দেবতারা আসছেন তো আসছেনই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু অনেক আগেই এসে ছেলে দেখে গেছেন। এসেছেন ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এবং অসংখ্য দেবতা। বাব্বা! দেবতাদের সে কি ভিড়। তাঁদের আদর-যত্ন করতে একবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন জয়া আর বিজয়া।

ওঁরা দুজন ছাড়া এসব আর করবে কে? গৃহকর্তা মহাদেব তো শ্মশানে গিয়ে বসেছেন। ওই সঙ্গে নন্দী আর ভৃঙ্গিও

পালিয়েছে প্রভুর ভাং কোটার নাম করে। ঘরের গিন্নি দুর্গা— তিনি তো ছেলে কোলেই বসে আছেন। তাই জয়া বিজয়া ছাড়া আর কে করবে এসব কাজ!

শুধু দেবতা নয়, নারদ, অগস্ত্যের মতো ঋষিরাও এসে দেখে যাচ্ছেন ছেলেকে, সবাই এলেও একজন কিন্তু আসার নামও করেন না। মা দুর্গাও অনেকবার খোঁজ করেছেন—সবাই তো এল—কিন্তু আমার ভাই শনির তো দেখা নেই। ও ছেলের মামা—অথচ একবার এসে ভাগ্নেকে দেখেও যেতে পারল না।

দেবতারাও শনিকে বলে, কি ব্যাপার, তোমার ভাগ্নে হয়েছে আর তুমি এখানে গুম হয়ে বসে আছ? যাও একবার গিয়ে দেখে এস।

শনি বেজার মুখে বলে, না আমি যাব না।

কেন, যাবে না কেন?

না, আমার দৃষ্টি বড় খারাপ। শেষে কোথা থেকে কি হয়ে যাবে আর সবাই মিলে দুষবে আমাকে।

শনির কথা শুনে দেবতারা বলেন, ও, এই কথা। তুমি হলে মামা। মামার নজর কখনও ভাগ্নেকে লাগে? যাও যাও, একবার কৈলাসে গিয়ে ভাগ্নেকে দেখে এসো। মা দুর্গাও শুধু তোমার কথাই বলছেন।

একথা শুনেও শনি কিন্তু তেমন উৎসাহ পান না। বলেন, তা বলুক, গিয়ে শেষে একটা বিপত্তি ঘটাব, তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

তবু দেবতারা যাওয়ার জন্য শনিকে জেদাজেদি করেন। বাধ্য হয়েই শনি রওনা হন। যাওয়ার আগে কিন্তু আবার বলেন, দেখো, শেষে কোনো কেলেংকারি হলে আমায় দোষ দিও না কিন্তু।

না, না, তোমার দোষ কি? যাও ভাগ্নে দেখে পেট পুরে খেয়ে এসো।

শনি কৈলাসে ঢোকার আগে একটা কালো কাপড়ে বেশ করে চোখটা বেঁধে নেয়। চোখ বেঁধে সে হাজির হয় কৈলাসপুরীতে। জয়া বিজয়া ছুটে এসে খবর দেন, শনি এসেছেন চোখ বেঁধে।

সে কি?

হ্যাঁ। ওই তো এসে গেছেন শনিরাজ।

ততক্ষণে শনি সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি দুর্গাকে বলেন, হ্যাঁ, এলুম তোর ছেলেকে দেখতে। বাঃ বেশ সুন্দর ছেলে হয়েছে তোর।

ওই রকম চোখ বাঁধা অবস্থায় না ছেলে দেখেই বলছ, বেশ ছেলে হয়েছে আমার। দুর্গা ঠোঁটটা একটু ফুলিয়ে বলেন কথাটা।

গণেশও তাঁর গদাটি নিয়ে বসে আছেন দরজায়।

শনি তাড়াতাড়ি বলেন, না, না, দেখেছি তোর ছেলে, এবার আমি যাই।

সে কি কথা। তুমি তো আসই না। এসেছ যখন তখন থাকো খানিকক্ষণ। আর চোঁখের বাঁধনটা খুলে দুচোখ মেলে ছেলেকে দেখে একটু আশীর্বাদ করে যাও।

ও আশীর্বাদ আমি এমনিই করছি।

না, তোমার চোখের বাঁধন খুলে আমার ছেলেকে দেখ।

বলছি না, ওসব বাঁধন খুলতে বলিস না। আমার চোখ ভাল নয়। তাই কাপড় বেঁধে রেখেছি।

বাদ দাও তো তোমার কথা। এসো আমি খুলে দিচ্ছি তোমার চোখের কাপড়–তুমি ভাল করে আমার ছেলেকে দেখ।

দুর্গার জেদ দেখে শনি অসহায়ের মতো বলে, ওরে আমার দৃষ্টিটা ভাল নয়, শেষে কেলেংকারি হবে একটা।

দুর্গা কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চান না। নাচার শনি চোখের কাপড় খুলতে খুলতে বলেন, এরপর কিছু একটা ঘটলে আমি কিন্তু দায়ী হব না–এ কথাটা বলে রাখছি।

মা দুর্গাও বলেন, তোমায় কেউ দায়ী করবে না। তুমি চোখ খোল।

বাধ্য হয়েই চোখের কাপড় খোলেন শনি। তারপর ঘুরে গণেশের দিকে তাকাতেই–ভোঁ। শরীর থেকে মুণ্ডুটা একবারে লোপাট। শনির দৃষ্টিতে অঘটন যা ঘটার ঘটে গেল। গণেশের মুণ্ডুটা উড়ে যেতেই কেঁদে ওঠেন দুর্গা। শনি বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম। তখন তো কেউ কোনো কথা শুনল না। এখন আর কাঁদলে কি হবে!

'কাঁদলে আর কি হবে' বললে কি কান্না থামে। মা দুর্গার চোখের জলে একবারে প্রলয় হবার দাখিল, তাঁর কান্না শুনে আসতে থাকেন দেবতারা। আবার আসেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণুও। মহাদেবও ফিরে আসেন নন্দী আর ভৃঙ্গিকে নিয়ে।

সব দেখে শুনে বিষ্ণু বলেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এক কাজ কর, কেউ গিয়ে দেখ, উত্তর দিকে মাথা করে কেউ শুয়ে আছে কিনা। যদি কেউ শুয়ে থাকে তবে তার মাথাটা কেটে নিয়ে বসিয়ে দাও গণেশের ধড়ে, তাহলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিষ্ণুর কথা শুনেই একটা খাঁড়া নিয়ে ছুট দেয় নন্দী। কিছুটা গিয়েই দেখে একটা হাতি শুয়ে আছে উত্তর দিকে মাথা করে। অমনি নন্দী তার মাথাটা কেটে দৌড়ে এসে বসিয়ে দেয় গণেশের ধড়ে। আর গণেশও হাতির মাথা নিয়ে উঠে বসে মা'র কোলে।

দুর্গার কান্না কিন্তু তখনও থামে না। তিনি বলেন, এ মা, আমার গণেশের হাতির মাথা। ওকে যে কেউ পাত্তাই দেবে না।

কথাটা শুনেই নেশার ঘোরে মহাদেব বলেন, কি এত বড় কথা। আমার ছেলেকে অবজ্ঞা করবে! এই আমি বলে দিলাম, এখন থেকে সব দেবতার পুজোর আগে পুজো করতে হবে এই লম্বোদর গজমুণ্ড গণেশের।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্য দেবতারাও সংগে সংগে মেনে নেন কথাটা আর তাতেই হাসি ফোটে দুর্গার মুখে। সেদিন থেকে গণেশের হলো হাতির মাথা। আর সব দেবতার আগে তার পুজো হয় বলে এবং সব বিষয়ে সিদ্ধি দেয় বলে তার আর এক নাম হলো সিদ্ধিদাতা।

সিদ্ধিদাতা গণেশকে কিন্তু আরেকটা বিড়ম্বনার মধ্যেও পড়তে হয়। একদিন দুর্গা আর মহাদেব গণেশকে দরজায় বসিয়ে ঘরে গেছেন। ওই সময় কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেবার নির্দেশ দেন তাঁরা গণেশকে। গণেশও তাঁর গদাটি নিয়ে বসে আছেন দরজায়।

এমন সময় সেখানে এসে হাজির পরশুরাম। মহা উগ্র তপস্বী। ব্রাহ্মণ হয়েও সবসময় ঘুরে বেড়ান একটা পরশু বা কুঠার নিয়ে। একুশবার তিনি পৃথিবীকে করেছেন ক্ষত্রিয়শূন্য। শিবের মহাভক্ত। কৈলাসে এসেই তিনি শিবপুরীতে ঢুকতে যান। কিন্তু বাধা দেয় গণেশ। বলে, এখন ভেতরে যাওয়া হবে না।

কি, আমাকে বাধা! জানো আমি কে?

যিনিই হোন, বাবা মা'র হুকুম–এখন কারো ভেতরে যাওয়া চলবে না।

অর্বাচীন ওই গজমুণ্ড বালকের কথায় রেগে পরশুরাম জোর করে ভেতরে ঢুকতে যান। গণেশও গদা তুলে বাধা দেন।

ব্যস, শুরু হয়ে যায় লড়াই। পরশুরামের কুঠারের আঘাতে গণেশের একটা দাঁত যায় ভেঙে। এদিকে, গোলমাল শুনে বেরিয়ে আসেন মহাদেব আর দুর্গা। তাঁদের দেখে গণেশ আর পরশুরাম দুজনেই নালিশ জানাতে যান। তাঁরা দুজনকেই শান্ত করেন। দুজনেই দুজনের পরিচয় পেয়ে শান্ত হন। বাবা-মা'র কথা রাখতে গণেশ পরশুরামের সংগে যুদ্ধ করে একটি দাঁত হারিয়েছেন শুনে মহাদেব বলেন, তাতে কি হয়েছে–এখন থেকে তোমার নাম হবে একদন্তী। সেই থেকেই গণেশের গজমুণ্ডে রয়েছে ওই একটি মাত্র দাঁত।

ছবি: সরোজ সরকার

ভোলা পোদ্দার

বিমল মিত্র
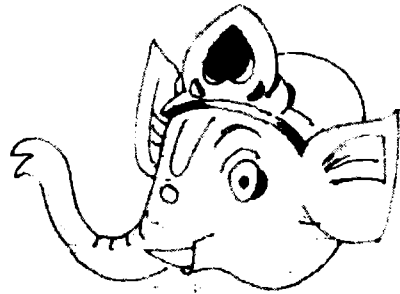
ভোলা পোদ্দারের গল্প বলতে গেলে তার আগের অনেক কাহিনীও বলতে হবে। সেই আগেকার কাহিনীই আগে বলে নিই।

তখন ইংরেজ আমল। যারা ইংরেজ আমলে জন্মেছে তারা জানে সে-আমলে নেটিভদের ওপর কী রকম অত্যাচার হতো। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসে চড়তে খুব আরাম তখন। টাকা খরচ করেও তখন কেউ ওই সব কামরায় উঠতে পারতো না। কারণ ওই কামরাগুলোতে যারা চড়তো তাদের জন্যে সব রকম আরামের ব্যবস্থা থাকতো। তাই সে-কামরাগুলো বেশির ভাগ সময়েই সাদা চামড়ার সাহেবদের জন্যেই বরাদ্দ থাকতো। কামরার সামনে বোর্ডে লেখা থাকতো 'For Europeans only', অর্থাৎ কেবলমাত্র ইয়োরোপীয়দের জন্যে।

শুধু ট্রেনেই নয়। রাস্তা-ঘাটেও এই রকম বিশেষ সুখ-সুবিধে বরাদ্দ থাকতো সাহেবদের জন্যে। সাহেবরা হলো রাজার জাত। সুতরাং রাজার জাতের লোকদের এ-সুবিধে তো থাকবেই। আমরা পরাধীন জাতির লোক, এ নিয়ে আমাদের নালিশ করা শোভা পায় না। তাই কারোর কাছে কেউই কিছু নালিশ করতে সাহস পেতো না।

আর শুধু কি তাই? কলকাতার চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যের সময় কোনও ইন্ডিয়ান হাঁটতে সাহসই করতো না। বড়-গঙ্গার বন্দরে তখন অনেক বড়ো-বড়ো জাহাজ এসে নোঙ্গর করে দশ-বারোদিন থাকতো। এই খিদিরপুরের পুলটা থেকে আরম্ভ করে হাওড়া-ব্রিজ পর্যন্ত রোজ অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাটটা জাহাজ ভেসে থাকতো। জাহাজ জেটিতে ভেড়বার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নাবিকরা তাদের সেই ইউনিফর্ম বা উর্দি পরে ডাঙায় নেমে পড়তো। পাঁচ মাস কি ছ'মাস একনাগাড়ে জলে ভেসে থেকে থেকে ডাঙার জন্যে তখন তাদের মন আই-ঢাই করতো। তাই ডাঙার গন্ধ পেয়েই তখন আর তাদের আনন্দের শেষ থাকতো না। তখন তারা হাতে নগদ টাকা পেয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করতো। কী করে সেই টাকাগুলো খরচ করবে সেইটেই ছিল তাদের সমস্যা।

চৌরঙ্গী বা চৌরঙ্গীর আশে-পাশে পার্কস্ট্রীট বরাবর যত হোটেল আর মদের দোকান ছিল সবগুলো ভর্তি হয়ে যেত সেই সব নাবিকদের ভিড়ে। এমন কি চৌরঙ্গীর ফুটপাথেও তাদের ভিড়ে হাঁটা যেতো না। তাদের সকলের হাতে এক একটা ছোট ছোট সরু ছড়ি থাকতো। তাদের পাশ দিয়ে গেলেই অকারণে তাদের ছড়ির ঘা পড়তো নেটিভদের মাথায়। যদি তুমি প্রতিবাদ করো তো আরো ছড়ির ঘা খেতে হবে মাথায়।

সুতরাং সন্ধ্যেবেলা দিশি লোকেরা ও-সব রাস্তায় হাঁটাই বন্ধ করে দিত। একে তো তারা রাজার জাত, তার ওপরে আবার মাতাল। তাই তাদের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকাটাই পছন্দ করতো দিশি লোকেরা।

যাদের বাবারা আশে-পাশের মফস্বলের অঞ্চল থেকে কলকাতার অফিসগুলোতে চাকরির জন্য আসতেন তাঁরা কলকাতায় সমস্ত সপ্তাহটা মেস-বাড়িতে থেকে শনিবার দিন বাড়ি গিয়ে এই সব গল্প ছেলেদের কাছে করতেন। ছেলেরাও বাবাদের কাছে এই সব গল্প শুনতো আর এক অজানা ভয়ে তাদের বুক দুর-দুর করতো। আমরাও শুনতুম। গোরাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে আমাদের খুব ভয়ও করতো।

আসলে কলকাতা শহর তখন আমাদের কাছে ছিল ভয়ের শহর, তেমনি সংগে সংগে আবার ছিল আকর্ষণেরও শহর। সত্যিই কলকাতা আমাদের সকলকে বড়ো আকর্ষণ করতো। কলকাতা সম্বন্ধে গল্প শুনতেও আমাদের খুব ভালো লাগতো। কলকাতায় নাকি বড়ো বড়ো উঁচু পাকাবাড়ি আছে। রাস্তাগুলো আমাদের রাস্তার মতো মাটির তৈরি নয়, পিচের তৈরি। সে-সব নাকি রোজ সকালে-বিকেলে জল দিয়ে ধোওয়া-মোছা হয়। আর কলকাতায় যে-সব গলিগুঁজি আছে সে-গুলোও নাকি জল ছিটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

তা সত্ত্বেও কলকাতা সম্বন্ধে আমাদের খুব ভয় ছিল। ভয় ছিল ওই 'গোরা' সৈন্য আর 'সেলার' অর্থাৎ ওই নাবিকদের জন্যে। বিশেষ করে 'বড়দিনে'র সময়ে রাত্রে তারা দল বেঁধে রাস্তায় এমন মাতলামি করতো যে কোনও ছেলে বা মেয়ে কেউই রাস্তায় বেরোতে সাহসই পেতো না।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় যদি কোনও গাড়ির ড্রাইভার ইলেকট্রিক হর্ন বাজাতো তো পুলিশ সেই ড্রাইভারকে ধরে জরিমানা আদায় করতো। সন্ধ্যেবেলায় যদি কোনও লোক আলো না জ্বালিয়ে সাইকেল চালাতো তো তার কাছ থেকেও পাঁচ টাকা জরিমানা আদায় করতো পুলিশ।

এ-সব গল্প আমরা আমাদের বাবাদের মুখ থেকেই শুনতুম। আমরা মানে আমি গোপাল কেদার আর ভোলা।

আমাদের মধ্যে ভোলাই ছিল সবচেয়ে গরীব। ভোলা পোদ্দার। ভোলার বাবা ছিল না। মা পরের বাড়ি মুড়ি ভেজে চাল কুটে ডাল বেটে বড়ি দিয়ে যা দু'টো পয়সা পেতো তাই দিয়েই সংসার চালাতো। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু তাদের নিজস্ব একটা মাটির বাড়ি। ভোলা আমাদের সংগে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো। কিন্তু লেখা-পড়ায় তার কোনও মাথা ছিল না। কারণ তাকে পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কোনও লোক ছিল না।

ভোলার মা বলতো—আমার ভোলার কিছু হবে না। কেবল মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ালে কি লেখা-পড়া কিছু হয়!

আমরাও বলতাম—তুই বড়ো হয়ে কী করবি রে ভোলা? কী করে তোর পেট চলবে?

ভোলা ছোটবেলা থেকেই ভাগ্যবাদী। বলতো—যাদের কেউ নেই তাদের পেট যে-ভাবে চলে আমারও তেমনি করেই পেট চলবে।

আমরা বলতাম—বেশির ভাগ লোকেরই তো পেট চলে না, তারা তো সবাই তাই না খেয়ে মরে!

ভোলা বলতো—ভগবানের যদি তাই ইচ্ছে হয় তো আমিও না খেয়ে মরবো!

আমরা বলতাম—ভগবান-টগবানের ওপর তোর বিশ্বাস আছে নাকি?

ভোলা বলতো—আমাদের মতো গরীবদের ভগবান ছাড়া আর কে আছে বল্। সেই ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখেই তো এখনও বেঁচে আছি। নইলে তো কবে আমি পটল তুলতুম—

সত্যিই। ভোলার বেঁচে থাকাটাই একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভোলা যে কতবার মারা যেতে যেতে বেঁচে গেছে তার ঠিক নেই। একবার তাকে একটা কেউটে সাপে কেটেছিল। আমরা তো ভেবেছিলাম ও নির্ঘাৎ মারা যাবে। তিন দিন ওর জ্ঞানই ছিল না। পাশের গ্রাম থেকে একজন রোজা এসে মন্তর পড়ে পড়ে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে লাগলো। মনে আছে ভোলার মা'র কান্নার শব্দে পাড়ার লোকরা তিন দিন ধরে কেউ ঘুমোতেই পারেনি।

গোপাল এসে বললে—ওরে বিলু, ভোলাটা মরে যেতে বসেছে, চল্ একবার ওকে শেষ দেখা দেখে আসি—

গেলাম ভোলাকে দেখতে। ওদের বাড়ির বাইরে থেকেই ভোলার মায়ের কান্নার আওয়াজ আসছিল। ভেতরে গিয়ে

দেখলাম ভোলা মাটির মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর সেই রোজাটা মন্তর পড়ছে বিড়বিড় করে। তার একটা পায়ের হাঁটুতে বেশ শক্ত করে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিষ ওপরে মাথায় উঠতে না পারে।

দেখে বেশ বোঝা গেল আমাদের ভোলা আর বাঁচবে না। ভোলার জন্যে মনে মনে খুব কষ্টও হলো। একে তো গরীব, তার ওপর ভালো করে লেখা-পড়াটাও করলে না, আর বনে-বাদাড়ে বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কারো কথাও শুনবে না।

কিন্তু না, এক সপ্তাহের মধ্যেই ভোলা ভালো হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভোলার বাড়িতে গিয়ে বললাম–কী রে, তুই বেঁচে গিয়েছিস? আমরা তো ভেবেছিলাম এ যাত্রায় তুই বুঝি টেঁশে গেলি।

ভোলা বললে–মরে গেলেই ভালো হতো ভাই–

–কেন, ও-কথা বলছিস্ কেন?

ভোলা বললে–মা বড়ো জ্বালাচ্ছে রে–

জিজ্ঞেস করলাম–কেন, মা কেন জ্বালাচ্ছে তোকে?

ভোলা বললে–আরে মা'র কথা আর বলিসনি। আমার যদি জ্বর হয় তো মা বলবে সেটা নাকি আমার দোষ। আমাকে যে সাপে কামড়ালো তাও নাকি আমার দোষ, আমি যদি মরেও যাই তো মা বলবে সেটাও নাকি আমার দোষ!

ভোলার এ-কথার জবাবে আমরা কী বলবো। ভোলার মায়ের কথায় আমরা কোনও দোষ দেখলাম না। কারণ ভোলার অসুখে যে মা'র অনেকগুলো টাকা নষ্ট হলো সে টাকাগুলো তো মায়ের অনেক কষ্ট করে উপায় করা টাকা, মায়ের মুখের রক্ত-ওঠা টাকা। সে-টাকা এমন করে নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের রাগ হবে না?

ভোলা বললে– ভাই, সেবার যে নদীতে চান করতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিলাম, তারপরে ডাক্তার অনেক ওষুধ খেতে দেওয়ার পর যে বেঁচে গিয়েছিলাম তাও যেন আমার দোষ। মা কেবল বলে–কই, আরো তো কতো ছেলে রয়েছে, তাদের তো তোর মতো এমন অসুখ হয় না, তাদের তো কই এমন সাপে কামড়ায় না, তারা তো কই নদীতে চান করতে গিয়ে তোর মতো জলে ডুবে যায় না–

যা- হোক, একদিন ও মা'র অত্যাচার থেকে বাঁচলো। তার মা মারা গেল। আমরা, যারা ভোলার বন্ধু, তারা ভোলার মা'র শবদেহ নিয়ে শ্মশানে গিয়ে সৎকার করে এলুম। কিন্তু তখন সমস্যা হলো ভোলা করবে কী? সে খাবে কী? কে তার দেখা-শোনা করবে? তার জন্যে কে রান্না-বান্না করবে?

ভোলার মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে কোথা থেকে হঠাৎ তার এক কাকা এসে উদয় হলো, কোনও দিন যে-কাকা ভোলার কোনও সম্পর্ক রাখেনি, সেই কাকা এখন এসে তার বাড়ি অধিকার করে বসলো। সঙ্গে তার ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম–কী রে ভোলা, তোর যে দূর-সম্পর্কের কাকা আছে তা তো কখনও বলিসনি তুই?

ভোলা বললে, মরে গেলেই ভালো হতো ভাই

ভোলা বললে—আরে আমি তা জানলে তবে তো বলবো!

তা না-জানা থাকাতে ভোলার কোনও লোকসান হয়নি। বরং তার লাভই হয়েছিল। ভোলার কাকা না এলে তো তাকে পরের বাড়ি ভিক্ষে করেই পেট চালাতে হতো! তার চেয়ে এ অনেক ভালো হলো। সে তখন থেকে দুবেলা রাঁধা ভাত পেতে লাগলো। তার কাকা তাকে নতুন জামা কাপড়, নতুন জুতো-টুতো কিনে দিলে। ভাঙা বাড়িটা সারিয়ে নিয়ে আরো দু'তিনটে নতুন ঘর বানিয়ে নিলে। ইস্কুলের মাইনেটাও ঠিক মাসে মাসে দিয়ে যেতে লাগলো। ভোলার মা যখন বেঁচে ছিল তখনকার চেয়ে যেন ভোলার অবস্থা ভালো হলো। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাশ করে ফেললে থার্ড ডিভিসনে। হোক, কিন্তু পাশ তো হলো। কিন্তু তারপর?

তারপর আমি আর গোপাল দু'জনেই কলকাতায় চলে এলাম কলেজে পড়তে। তখন কলকাতায় না থাকলে কোনও ছেলে-মেয়েরই লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কলকাতাতেও তখন গোরা-সৈন্যদের অত্যাচার অনেক কমে গেছে। মেদিনীপুরের তিনজন সাদা চামড়ার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপ্লবীরা গুলী মেরে খতম করে ফেলেছে। চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর দল-বল নিয়ে সেখানকার আরমারি লুঠ করে নিয়েছিল। তখন চারদিকে তাঁদের জয়-জয়কার। সে এক অগ্নিযুগ চলছে তখন দেশে। ইংরেজরাও বেশ ভয় পেয়েছে নেটিভদের সাহস দেখে।

এইসব খবরের চাপে পড়েও আমাদের কিন্তু অন্য কোনও দিকে নজর দেবার সময় হয়নি। আমি তখন কলেজের পড়ার বইএর চাপে ব্যতিব্যস্ত। গোপাল থাকে উত্তর কলকাতায় আর আমি দক্ষিণে। আমি আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাই আর গোপাল তাদের পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে মিশেই অবসর সময়টা কাটিয়ে দেয়। হঠাৎ যদি কখনও তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো আমরা পরস্পরের খবরাখবর নিই। ওই পর্যন্তই। তার বেশি কথা হয় না।

হঠাৎ ওই রকম একদিন দেখা হয়ে যাওয়াতে গোপাল বললে—ওরে জানিস, ভোলা কলকাতায় এসেছে রে—

আমি বললাম—কে ভোলা?

গোপাল বললে—আরে, ভোলাকে ভুলে গেলি? আমাদের সেই ভোলা পোদ্দার রে!

ছোটবেলার বন্ধুদের বড় হয়ে আমরা এমনি করেই ভুলে যাই! সময় আমাদের এমনি করেই অকৃতজ্ঞ করে তোলে, এমনি করেই নিমক-হারামি করে আমাদের সঙ্গে। সময় এমনই এক অদ্ভুত জিনিস। সে আপনাকে পর করে তোলে, আর দরকার হলে পরকেও নিজের করে দেয়।

বললাম—সে কলকাতায় কী করতে এসেছে?

গোপাল বললে—এখন সে কলকাতাতেই থাকে।

—কলকাতার কোথায় থাকে?

গোপাল বললে—মানিকতলার এক বস্তিতে। একটা ঝুপড়িতে।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? দেশের বাড়িতে কী হলো?

গোপাল বললে—ওর কাকা ভোলাকে সে-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন? ওটা তো ওর নিজের বাড়ি ছিল। ওর কাকা তাড়ালো কেন ওকে?

গোপাল বললে—অতো কথা জিজ্ঞেস করবার সময় ছিল না আমার। একদিন যাবি তুই ওর বাড়িতে?

আমি রাজী হয়ে গেলাম। বললাম—যাবো—আসছে রবিবার দিন তুই মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকিস—

আমি আর গোপাল সময় করে গেলাম ভোলার বাড়িতে। মানিকতলার বস্তি বললেই কি ভোলার বাড়ি খুঁজে পাবো? বস্তির ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কি অতো সোজা?

আমরা গিয়েছিলাম সকালবেলায়। যাতে তাকে বাড়িতে ঠিক পাওয়া যায়। দেরি করলে পাছে কোথাও বেরিয়ে যায়। ভাগ্য ভালো যে ভোলাকে বাড়িতেই পেয়ে গেলাম। ভোলা তখন বাড়ির সদর দরজায় তালা লাগিয়ে কোথায় যাচ্ছিল। আমাদের দেখে সে একেবারে অবাক। বলল—তোরা?

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

ভোলা বললে—হাসপাতালে—

হাসপাতাল মানে? তোর কিছু অসুখ-টসুখ হয়েছে নাকি?

দেখলাম ভোলার চেহারা খুব রোগা। সেই আগেকার স্বাস্থ্য আর নেই তার।

ভোলা বললে—আমার বুকে খুব ব্যথা হয়।

—হাসপাতালের ডাক্তার কী বলছে?

—কী আর বলবে! ওষুধ দিচ্ছে। বলছে সারতে সময় লাগবে।

জিজ্ঞেস করলাম—কতোদিন ধরে ব্যথাটা হচ্ছে?

—আজ বছর পাঁচেক ধরে ব্যথা হচ্ছে। প্রথমে অতোটা গা করিনি। যখন ব্যথাটা বাড়লো তখন আর থাকতে পারলুম না, হাসপাতালে গেলাম।

গোপাল বললে—একজন ভালো ডাক্তার কাউকে দেখা না—

ভোলা বললে—ভালো ডাক্তার দেখালে তো অনেক টাকা লাগবে। অতো টাকা আমি কোথায় পাবো?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তা তোর কাকা তোকে তাড়িয়ে দিলে কেন তোর বাড়ি থেকে, তুই কী করেছিলি?

ভোলা বললে—আমি কিছুই করিনি। এমনি তাড়িয়ে দিলে। আমার দোষটা আমি কাকার কাছে কলেজে পড়ার টাকা চেয়েছিলুম। টাকা চাওয়ার পর থেকে কাকিমা আমাকে আর খেতেই দিত না। তখন কী করি? তাই বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে এলুম।

গোপাল বললে—তা তুই কাকার নামে কোর্টে মামলা ঠুকে দিলি না কেন?

ভোলা বললে—কাকার নামে মামলা করবো? কী বলছিস্ তুই? কাকা তো গুরুজন হন!

—তা পাড়ার লোকদের কিছু বললি না কেন?

ভোলা বললে—বলেছিলুম, কিন্তু তারা সবাই ভাই আমার কাকার দিকে। কেউ আমার কথা বিশ্বাসই করলে না! তাই একদিন বিনা টিকিটে একটা ট্রেনে চেপে বসলুম। তারপর সোজা একেবারে শেয়ালদ' ইস্টিশান। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে যেদিকে দু'চোখ যায় চলতে লাগলাম। মানিকতলায় এসে পৌছুলুম।

জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কী করে তোর চলছে?

ভোলা বললে—এখানে সন্ধ্যেবেলা বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়াই, তার বদলে তারা আমাকে বিনা ভাড়ায় এই ঝুপড়ির মধ্যে থাকতে দিয়েছে। এখানে যারা থাকে তারা কেউ কারখানায় হাতুড়ি পেটে, রিকশা চালায়, পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে, কেউ বা খবরের কাগজ ফিরি করে, কেউ বা আবার ফুটপাথে বসে জিনিস-পত্তোর বেচে পেট চালায়। সকলের অবস্থাই খারাপ। সকলেই প্রায় দিন-আনে-দিন-খায়। কেউই আমার মতো লেখা-পড়া জানা লোক নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—আর খাওয়া?

ভোলা বললে—এক-একদিন এক-এক বাড়িতে খাওয়া। সোমবার এক বাড়িতে, মঙ্গলবার আর এক বাড়িতে, বুধবার আবার আর এক বাড়িতে, এই রকম ঘুরে ঘুরে এক-এক বাড়িতে এক-একদিন খাই। আর তা ছাড়া সবাই মিলে চাঁদা করে আমাকে মাসে দশ টাকা হাত-খরচ বাবদ দেয়। তাইতেই কোনও রকমে চালিয়ে নিই। এতদিন বেশ চলছিল, কিন্তু এই বুকের ব্যথাটা বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে ভাই। করপোরেশনের হাসপাতালের ডাক্তারকেই দেখাচ্ছি। কলকাতায় তো অনেক হাসপাতালই আছে, সেখানে ফ্রী-বেডও পাওয়া যায়। কিন্তু গরীব লোকদের জন্যে ভাই সব হাসপাতালের দরজাই বন্ধ যে!

ওর হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে অন্য রোগীদের সঙ্গে লাইন দিতে হবে। আমরা দু'জনে মিলে ভোলাকে তিরিশটা টাকা দিলাম। বললাম—কিছু মনে করিসনি, এই টাকা ক'টা রাখ্। তোর কোনও কাজে লাগতে পারে—

সেদিন ওই পর্যন্ত। আমরা চলে এলাম। কিন্তু ভোলার জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে রইল। কাকা ভোলাকে তাড়িয়েছে, আর ভোলা কাকার বিরুদ্ধে কোনও মামলাও করলে না, 'গুরুজন' বলে! এটা খুব মহৎ ব্যাপার হলেও আমরা মনের দিক থেকে সমর্থন করতে পারলাম না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও তো একটা ধর্ম! তা যে করতে পারে না, সে কষ্ট পাবে না তো কে কষ্ট পাবে?

এর পর আমরা সবাই আমাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। ভোলার নিজের যেমন সমস্যা ছিল, তেমনি আমাদের নিজেদেরও তো হরেক রকম সমস্যা। দেশের চারদিকেই বেকারদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বি-এ এম-এ পাশ করা হাজার হাজার ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না, ব্যবসা করবার মূলধন যোগাড় করতে পাচ্ছে না। অথচ দিন-দিন জিনিস-পত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বেড়ে চলেছে। গরীবরা আরো গরীব হচ্ছে, বড়লোকরাও আরো বড়লোক হচ্ছে। গ্রাম থেকে হাজার-হাজার বেকার ছেলে দলে দলে রোজগারের ধান্ধায় কলকাতায় এসে ভিড় বাড়াচ্ছে। আর শুধু তাই-ই নয়, গুজরাট-রাজস্থান-ওড়িশা-বেহার থেকেও সমস্ত লোক দিনের পর দিন কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে থেকে যাচ্ছে। একবার যে-লোক কলকাতায় আসছে সে বরাবরের জন্যে এখানেই থেকে যাচ্ছে। এখান থেকে আর নড়বার নামই করছে না। অথচ কলকাতা শহর যে মাপে বা আয়তনে বাড়বে তারও তেমন উপায় নেই। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গা, পূবে জলা-জমি! সেই দু'দিকে শহর বাড়াবার কোনও উপায় নেই। শুধু

জায়গা আছে উত্তরে আর দক্ষিণে। সে-দিকটাতেই যা-কিছু ফাঁকা। উত্তরে বরানগর, বিরাটি, দমদম আর দক্ষিণে টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বেহালা, গড়িয়া। সেদিকেই শহর বেড়ে যাচ্ছে লোকজনের চাপে। একদিকে বেকারের চাপ, অন্যদিকে মানুষের চাপ!

এই অবস্থায় পড়ে ভোলা পোদ্দারদের অবস্থাই সবচেয়ে সংগীন হয়ে উঠলো। তারা ঘরের ছেলে হয়েও পর হয়ে রইল নিজেদের জন্মভূমিতে।

ওদিকে রাজনীতির জগতেও অত্যাচারের আর ধর-পাকড়ের ঢেউ উত্তাল হয়ে খবরের কাগজের পাতায় উপচে পড়ছে। আজ একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হচ্ছে তো কাল আবার আর একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হচ্ছে। খবরের কাগজের পাতা খুললেই চারদিকে কেবল ইংরেজদের অত্যাচারের খবর পড়ে মানুষের রক্ত রাগে আর উত্তেজনায় গরম হয়ে ওঠে। তারা ইংরেজ-সরকারের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, বিরক্ত হয়ে উঠছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

আমি এই সব দেখতাম আর আমার মনে পড়ে যেতো ভোলা পোদ্দারের কথা। ভোলা পোদ্দারই খাঁটি ভারতীয়। ভারতবর্ষে যতো গরীব লোক আছে তারা দেশের পুরো লোক-সংখ্যার আশি ভাগ। তারা সবাই এক-একজন মূর্তিমান ভোলা পোদ্দার। ভোলা পোদ্দারই তাদের প্রতীক।

যখন দেশের অবস্থা এই রকম তখন হঠাৎ একটা খবর পেয়ে চমকে উঠলাম। গোপালই একদিন খবরটা দিলে আমাকে। বললে—জানিস, ভোলা পোদ্দারের ছ'মাসের জেল হয়েছে।

—কেন?

গোপাল বললে—একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে ভোলা টাকা চুরি করেছিল।

আমি স্তম্ভিত। যে-লোক কাকার বিরুদ্ধে মামলা করেনি 'গুরুজন' বলে, সে কিনা পরের বাড়িতে ঢুকে টাকা চুরি করলো! আর সেই লোকের কিনা ছ'মাসের জেল হয়ে গেল! স্বদেশী করে জেলে যাওয়ার মধ্যে গৌরব আছে। কতো লোক তা করে হামেশা জেলে যাচ্ছে। তাতে তাঁদের মহত্ত্ব বাড়ছে। কিন্তু ভোলা পোদ্দার তো তা নয়। সে তো চোর। সে তো টাকা চুরি করার দায়ে জেলে গেছে!

গোপাল এই খবরটা শুনে এত দুঃখ পেয়েছে যে সংগে সংগে সেই উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় আমাকে খবর দিতে এসেছে।

আমি মনে মনে দুঃখ পেলেও মুখে বললাম—বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। বললাম কাকার নামে কোর্টে মামলা ঠুকে দিতে, তা না করে পরের বাড়িতে সিঁধ কেটে টাকা চুরি করলে। ওর ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল। তবে ওর শিক্ষা হতো—

পৃথিবীর সব ভোলা পোদ্দারদের যা হয়, আমাদের ভোলা পোদ্দারেরও তাই-ই হলো। সবাই ওর নাম পর্যন্ত ভুলে গেল।

তখন ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেছে। একদিন যে-সব নেতারা ইংরেজদের আমলে জেল খেটেছিল তারাই তখন মন্ত্রী। তারাই ইংরেজদের মতোন বড়ো বড়ো রাজভবনে উঠে গিয়ে বড়লাট ছোটলাট হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলো। দেশের ইতিহাসে ক'বছরের মধ্যেই সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। লোকেদের মানসিক জগতেও একটা মহা পরিবর্তন ঘটে গেল। আগে যদি কেউ রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে মানুষের সেবায় গেরুয়া পরে বিবাগী হয়ে যেতো তো তা নিয়ে মানুষের কোনও মাথা-ব্যথা থাকতো না। কিন্তু তাকে সবাই শ্রদ্ধা করতো, তার ছবিতে মালা দিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চিত্রটা উল্টে গেল। যে-লোক খুব গরীব অবস্থা থেকে ব্যবসা করে, সিমেন্টে মাটি মিশিয়ে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে, নার্সিং-হোমের ব্যবসা করে কালো টাকা জমিয়ে বিরাট গাড়ি, প্রাসাদের মতো বিরাট বাড়ি করে ফেললে, লোকে তখন তাকেই শ্রদ্ধা করতে লাগলো, তার ছবিতেই মালা দিতে লাগলো, তাকেই সবাই পুজো করতে লাগলো।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন এক অচেনা ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কেমন আছিস?

বললাম—আমি তো ঠিক আপনাকে চিনতে পারলুম না—

ভদ্রলোক বললে—আমি যে তোদের সেই ভোলা রে। সেই ভোলা পোদ্দার—

আমি তাকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমাদের সেই ভোলা, সেই ভোলা পোদ্দারের এই চেহারা? তার সেই ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবি, সেই খাটো ধুতি কোথায় গেল? সেই রোগা হাড়-জিরজিরে চেহারাই বা কোথায় গেল? গায়ের কালো রংটাও যেন ফরসা হয়ে গেছে। পায়ে চক্চকে পালিশ করা জুতো। হাতে একটা মস্ত বড় ফুলের মালা। মনে হলো আমি কি জেগে জেগে দিনের আলোয় ভূত দেখছি? জিজ্ঞেস করলাম—তুই সেই আমাদের ভোলা? তুই-ই আমাদের সেই ভোলা পোদ্দার?

ভোলা হাসতে হাসতে বললে—হ্যাঁরে। বিশ্বাস হচ্ছে না? সেই যে মানিকতলার বস্তিতে যখন আমি থাকতুম, তখন তুই আর গোপাল আমার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলি? আমার বুকে তখন খুব ব্যথা হতো। আমি হাসপাতালে যাচ্ছিলুম ডাক্তারকে দেখাতে। তোরা দু'জনে আমাকে তিরিশটা টাকা

দিয়েছিলি ? মনে নেই তোর ?

আমার সমস্তই মনে পড়ে গিয়েছিল। বললাম—আর বলতে হবে না রে, আমার সব মনে আছে। তা এখন কোথায় যাচ্ছিস ? হাতে তোর ঐ ফুলের মালা কা'র জন্যে ?

ভোলা বললে—জানিস না, আজ যে পয়লা জুলাই !

বললাম—পয়লা জুলাই তো তা'তে কী ?

—জানিস না, এই পয়লা জুলাই তারিখেই যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন আর মৃত্যুর দিন রে। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাইতেই যে তিনি মারা গিয়েছিলেন ! মনে নেই ?

—তা ডাক্তার বিধান রায়ের জন্মদিন আর মৃত্যুদিনের সংগে তোর কী সম্পর্ক ?

ভোলা বললে—সে কী ? তুই বলছিস্ কী ? তাঁর জন্যেই তো আমি আজও বেঁচে আছি। তাঁর জন্যেই তো আমার সব কিছু হয়েছে—

—তার মানে ?

ভোলা বললে—সত্যি বিশ্বাস কর, আজ যে আমি বেঁচে আছি, গভর্মেন্টের চাকরি করছি, কলকাতায় একটা বাড়ি করতে পেরেছি, আমার যে বিয়ে হয়েছে, আজ যে আমার ছেলে মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বিরাট কন্ট্রাকটার হয়েছে, এই সমস্ত কিছুই তো ডাক্তার বিধান রায়ের জন্যে !

আমার মনে হলো আমি যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনছি। বললাম—তুই কোথায় বাড়ি করেছিস্ ?

আমার কথা শুনে ভোলা তার জামার পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে আমায় দিলে। বললে—আমার বাড়িতে তুই একদিন আয় না। তখন অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে গল্প করা যাবে। একটা রবিবার দেখে আসিস—

আমি কার্ডটার দিকে চেয়ে দেখে আকাশ-পাতাল ভেবে বললাম—শুনেছিলাম চুরি করার দায়ে তোকে একদিন পুলিশে ধরেছিল। তাইতে তোর ছ'মাস নাকি জেলও হয়ে গিয়েছিল ?

ভোলা বললে—সে-খবরটাও দেখছি তোর কানেও গিয়েছে !

বললাম—হ্যাঁ, গোপাল একদিন তোর মানিকতলার বস্তিতে তোর সংগে দেখা করতে গিয়েছিল, সেখানকার লোকরাই গোপালকে খবরটা দিয়েছিল। তাহলে খবরটা সত্যি ?

ভোলা বলল—পুরোপুরি সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যে কথা নয়। কিন্তু সে-সব কথা বলতে গেলে এখন সময় লাগবে।

বললাম—তা এ ফুলের মালা নিয়ে তুই কোথায় যাচ্ছিস তা তো বললি না—

ভোলা বললে—শ্মশানে। ডাক্তার রায়কে শ্মশানে যে-চুল্লীতে পোড়ানো হয়েছিল তারই পাশে আমি প্রত্যেক বছর পয়লা জুলাইতে এই রকম ফুলের মালা রেখে দিয়ে আসি। একটু থেমে আবার বললে—যাই ভাই, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটা রবিবার দেখে সকাল-সকাল আসিস তুই আমার বাড়িতে। সব গল্প করা যাবে। চলি—

ভোলা পোদ্দার হনহন করে শ্মশানের দিকে পা বাড়ালো.....

আমি অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

পরদিনই আমি গোপালের বাড়িতে গিয়ে হাজির। গোপাল বাড়িতে ছিল। আমাকে এতদিন পরে দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। ভেবেছে হয়তো তাকে কোনও দুঃসংবাদ দিতে গিয়েছি। কারণ আমরা সবাই-ই তো নিজের নিজের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। অনেক সময়ে, বছরের পর বছর পরস্পরের দেখাও হয় না। অথচ একই শহরে আমরা বাস করি। আসল ব্যাপারটা বলার পর সেও খুব হতবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি ?

বললাম—আসছে রোববার চল্ না দু'জনে ওর বাড়িতে যাই ! এই দেখ্ না, ও ওর নিজের কার্ড দিয়েছে—এতেই ওর ঠিকানা লেখা আছে—

গোপাল তখনও ভোলার কথা নিয়েই ভাবছিল। বললে—ভাই, ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলুম 'Morning shows the day', দেখছি কথাটা একেবারে ডাহা মিথ্যে—ভোলার যে একদিন এ-রকম হবে তা কি তখন আমরা কল্পনা করতে পেরেছিলুম ? মনে করে দেখ যেবার ওকে সেই কেউটে সাপে কামড়েছিল, তারপর তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়ে ছিল। তখনও কি আমরা জানতুম একদিন ও আবার বেঁচে উঠবে !

বললাম—তাই তো আমি বরাবর বলি, শুরু দেখে কিছুর শেষ বলা যায় না—

পরের রবিবারই ওর ঠিকানা খুঁজে ওর বাড়ি দেখে আমরা চম্‌কে উঠেছি।

এতো বড়ো বাড়ি ? সামনে আবার একটু ছোট বাগান। এই আলিপুর অঞ্চলে অবশ্য সব বাড়ির সামনেই একটু বাগান আছে। সেই সাহেবদের আমলে তারাই এপাড়ায় থাকতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা এখানকার নেটিভদের কাছে বাড়ি-ঘর বিক্রি করে দিয়ে যে-যার দেশে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু কতো টাকা থাকলে এখানকার লোকরা এ-সব বাড়ি কিনতে পারে ?

একজন কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের বসতে বললে। আমরা ঘরের আসবাব-পত্র দেখে অবাক। সেই ভোলা পোদ্দারের এই রকম ঘর ? অথচ একটা ভাঙা-চোরা মাটির তৈরি পুরনো পৈত্রিক বাড়ি কাকা অধিকার করে নিয়ে ভোলাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বলে আমরা তাকে কাকার বিরুদ্ধে মামলা করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ?

সেদিন যদি ভোলা আমাদের পরামর্শ শুনে কাকার বিরুদ্ধে মামলা করতো তাহলে কি তার এই রকম বাড়ি হতো?

দেখলাম ঘরের মধ্যে কারো ছবি নেই। না তার বাবার, না তার মা'র, না তার নিজের। শুধু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের একটা বিরাট অয়েল পেন্টিং ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। আর তার নিচেয় বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন"

মাইকেল মধুসূদনের এই কবিতাটা আমরা ছোটবেলায় স্কুলের বইতে পড়েছিলাম। ভোলা দেখছি সেই কবিতার লাইন ক'টা এখনও মনে করে রেখে দিয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে উৎসর্গ করেছে।

এমন সময়ে ভোলা হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। আমাদের দু'জনকে দেখে সে যে খুব খুশি হয়েছে তা তার মুখ-চোখের ভঙ্গিতে আর কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেল। বললে—আমি তোকে তো এখানে আশা করেছিলাম, কিন্তু গোপাল আমার বাড়িতে আসবে, এ আমি ভাবতে পারিনি। তুই গোপালকে যে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি—

জলযোগ এলো।

আমি বললাম—এ-সব থাক, আমরা বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। এখন তুই তোর গল্পটা বল্ শুনি।

ভোলা বললে—না, না, তা শুনছি না। গল্প তো বলবোই। তার আগে এই সব তোদের খেতেই হবে। এ-সবই ওঁর দয়ায়—বলে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ছবির দিকে উদ্দেশ করে প্রণাম করলে দুই হাত জোড় করে।

আমরা তার কথা এড়াতে পারলুম না। খেতে খেতেই তার গল্প শুনতে লাগলাম। সে তার নিজের জীবনের গল্প আরম্ভ করে বললে—তোরা তো জানিস যে মানিকতলায় আমি কী রকম অবস্থায় ছিলুম। আমার তখন রোজ বুকে অসহ্য ব্যথা হতো। সে এমন ব্যথা যে কেবল মনে হতো যে আমি মরে যাবো। আর আমি বাঁচবো না—

সেদিন ভোলার কাছ থেকে তার জীবনের গল্প শুনতে শুনতে আমাদের স্থান-কাল-পাত্র সব কিছু ভুলে একেবারে সশরীরে যেন সেই যুগে ফিরে গেলুম।

ভোলা রোজ দাতব্য হাসপাতালে যেতো আর করপোরেশনের হাসপাতালের রঙিন জল-ওষুধ গিলতো। কিন্তু তাতে রোগ সেরে যাওয়া দূরে থাকুক, বুকের ব্যথাটা যেন দিন-দিন আরো বেড়ে যেতো। অথচ তার কাছে এমন টাকা নেই যে সে কোনও ভালো ডাক্তারের কাছে যায়। শেষকালে কে একজন তাকে খবর দিলে যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নাকি রোজ সকালে এক ঘণ্টার জন্যে বিনা পয়সায় রোগী দেখেন। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে।

ভোলা তার মানিকতলা বস্তি থেকে ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার বিধান রায়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে বেরোল। তা ওয়েলিংটন স্কোয়ার কি এখানে? সে প্রায় তিন মাইল রাস্তা। পা ব্যথা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। গিয়ে ভোলা শুনলো রোগী দেখা শেষ হয়ে গেছে। আবার পরের দিন রোগী দেখা হবে।

কী আর করা যাবে! ঠিক ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় না এলে ডাক্তারের কী দোষ! পরের দিন ভোলা রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠলো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আবার ডাক্তার রায়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার আগেই আরো অনেক লোক সেখানে এসে লাইন দিয়েছে।

যখন ভোলার ডাক এলো তখন ডাক্তার রায়ের একজন জুনিয়ার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাছে কোনও কাগজ-পত্র আছে?

ভোলা বললে—না স্যার—

—আগে তুমি কোনও ডাক্তারকে তোমার রোগ দেখিয়েছ?

—হ্যাঁ স্যার, দেখিয়েছি।

—সে কাগজ-পত্র কই? সে কোন্ ডাক্তার? তাঁর নাম কী?

ভোলা বললে—আজ্ঞে তিনি তো কাগজ-পত্র কিছু দেননি। তিনি হচ্ছেন ক্যালকাটা করপোরেশনের হাসপাতালের

ডাক্তার। তাঁর নাম জানি না।

–সেখানকার প্রেসক্রিপশন নেই?

–না স্যার।

–তাহলে যাও। বলে তিনি পরের লোককে ডাকলেন। পরের লোকের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভোলাকে দেখে রেগে গেলেন। বললেন–তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন, চলে যাও। অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখিয়ে যদি রোগ না সারে তবে তখন সেই ডাক্তারের কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে এখানে এসো।

কথাটা বুঝলো ভোলা। বুঝতে পারলে যে,সব জায়গায় যা হয় এখানেও তাই। গরীব লোকের জন্যে কেউ নেই। বাইরের ডাক্তারকে দেখাবার মতো টাকাই যদি আমার থাকবে তাহলে এখানে ডাক্তার বিধান রায়ের কাছে আসবো কেন? ইনি বিনা পয়সায় রোগী দেখেন বলেই তো এখানে এসেছি! আর মানিকতলার বস্তি তো এখানে নয়, সে তো এখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে। বাস-ট্রামে চড়ে আসবার মতো পয়সা নেই বলে পুরো রাস্তাটা হেঁটে এসেছি। বুকে ব্যথা নিয়ে এতখানি রাস্তা হাঁটা কি সোজা ব্যাপার!

তখন আর কী করে ভোলা! আবার সেই তিন-চার মাইল রাস্তা হেঁটে সে তার মানিকতলা বস্তির ঝুপড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। তখন মাথার ওপরের সূর্যটা আগুন হয়ে জ্বলছে। বড় রাস্তার মোড়ে একটা জলের কল ছিল, সেখানে গিয়ে এক পেট জল খেয়ে তেষ্টাটা মেটালো।

তারপর সেদিন যে-বাড়িতে খাবার বরাত্ ছিল সেই বাড়িতে নিজের থালাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার ছাত্রীর নাম ধরে ডাকলে–এই ঘন্টে, ঘন্টে–

ঘন্টে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভোলা জিজ্ঞেস করলে–কী রে, আজ তো বুধবার, আজ তো আমার তোদের বাড়িতে খাওয়ার পালা, ভাত তৈরি হয়েছে?

ঘন্টে বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবার তখনি বেরিয়ে এলো। বললে–আজ বাবা এখনও বাজার করে আনেনি মাস্টারমশাই। বাবা বাজার করে নিয়ে এলে মা রান্না করবে। তখন আমি আপনাকে ডেকে আনবো–

ভোলা আবার বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু ঘন্টেদের বাড়ি ছাড়া আজ তো অন্য কোনও বাড়িতে তার খাবার বরাদ্দ নেই। ঘন্টের বাবা ভোরবেলা তার সওদা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়-পাড়ায় ফেরি করতে। সিঁদুর, কালো ফিতে, চুলের কাঁটা, আলতা, এই সব ফেরি করেই তাদের সংসার চালায়। মেয়েটা ভোলা-মাস্টারের কাছে পড়ে বলে মাইনের বদলে প্রত্যেক বুধবার মাস্টারকে সকাল বেলাটা খেতে দিতে হয়। ভোলা তার থালাটা নিয়ে গিয়ে ঘন্টেদের বাড়িতে যায় আর ভাত-ডাল-তরকারি যা-কিছু তারা দেয়, তাই-ই ঘরে নিয়ে এসে খায়। তারপর থালাটা কলের তলায় নিয়ে গিয়ে সেটা ধুয়ে নেয়।

রোজ এই ধরনের কাজ করতে করতে শেষকালে ভোলার নিজের জীবনের ওপরেও কেমন যেন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। চিরকাল তার বুকের ব্যথাটাও থাকবে আর যতো দিন বাঁচবে ততোদিন এমনি পরের বাড়িতে খালি থালা নিয়ে গিয়ে ভাত তরকারি চেয়ে নিয়েও আসতে হবে। ভোলা ধরেই নিয়েছিল এইটেই তার বিধিলিপি।

এই সময়ে তার কানে এল যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কেও নাকি গভর্মেন্ট ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরেছে। তাহলে তাঁর অতোগুলো রোগীদের কী হবে? কে তাহলে দেখবে তাদের? কে তাদের রোগ সারাবে? কিন্তু ডাক্তার রায় কী অপরাধ করেছেন? একমাত্র অপরাধ তিনি স্বদেশী করেন। কতোদিন পরে তিনি ছাড়া পাবেন তারও নাকি কোনও ঠিক নেই। অনির্দিষ্ট কাল ধরেই নাকি তাঁকে জেলে থাকতে হবে।

হঠাৎ ভোলার মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো। সেও তো স্বদেশী করতে পারে। স্বদেশী করলেই যদি পুলিশ জেলে পুরে দেয় তাহলে তো তার খুব আরাম। জেলখানার ভেতরেও হাসপাতাল আছে, জেলখানাতেই মাইনে করা ডাক্তার আছে। সেখানে যেতে পারলে তার চিকিৎসাও হবে, আর বিনা পরিশ্রমে খাওয়াটাও পাওয়া যাবে। কিন্তু পুলিশ তাকে ধরবে কেন? সে তো স্বদেশী করে না। কিন্তু স্বদেশী করা শেখা যায় কার কাছ থেকে?

ভোলা বললে–তখন আমার মনের যা অবস্থা তা আজ আমি তোদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না ভাই। আমার আর তখন কিছু ভালো লাগছিল না। আজ এর বাড়িতে গিয়ে থালা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো, কাল ওর বাড়িতে গিয়ে থালা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো, আর পরশু অন্য আর একজনদের বাড়িতে গিয়ে থালা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো। মনে হতো আমি যেন ভিখিরি, রাস্তায় রাস্তায় যেন আমি ভিক্ষে করে করে বেড়াচ্ছি। তার ওপর একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের লেখা-পড়া করানো। তারা তো আসলে লেখা-পড়া শিখবেও না, লেখা-পড়া শিখতে চাইবেও না। তাদের চৌদ্দ-পুরুষে কেউ লেখা-পড়া করেনি, আমি কেমন করে লেখা-পড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ করে তুলবো? আমি তো লোক ঠকাচ্ছি! সেই কথা ভেবে আমার নিজের মনে খুব কষ্ট হতো, অনুশোচনা হতো! কিন্তু উপায় কী?

শেষকালে মনে মনে একটা ফন্দী আঁটলুম। ফন্দীটা হচ্ছে এই যে আমি চুরি করবো। চুরি করার অপরাধে পুলিশ আমায় ধরে জেলে পুরে দেবে। ডাক্তার বিধান রায় তো জেলখানাতেই আছেন। সুতরাং আমি জেলখানাতে গেলে ডাক্তার বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করার কোনও অসুবিধে হবে না। তখন আর কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমি তখন জেলের ভেতরে তাঁর পা জড়িয়ে ধরবো। বলবো–আপনি আমার বুকের ব্যথাটা সারিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে যে-কোনও রকমে বাঁচিয়ে দিন। আমি চিরকাল

আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো–

তারপর একদিন ভোলা যা করবে ভেবেছিল তাই-ই করে ফেললে। মানিকতলার একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার মনে ভয় হতে লাগলো যদি তাকে পুলিশ না ধরে তা হলে কী হবে? বাড়িটার ভেতরে কোনও মানুষ-জনকে দেখতে পাওয়া গেল না। তাহলে কি বাড়িতে কেউ নেই? তাহলে কি তার সব পরিশ্রম পণ্ড হবে? তবে কি তার সমস্ত মতলব ব্যর্থ হবে? তাকে এখনও কেউ ধরছে না কেন? ভোলা তখন মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলো। বললে–হে ভগবান, যেন আমি ধরা পড়ি, যেন বাড়ির কেউ আমাকে ধরে পুলিশে দেয়। হে ভগবান, আমার যেন জেল হয়। আমার যেন অন্ততঃ এক বছরের জেল হয়! জেলখানায় পাঠিয়ে আমাকে যেন পুলিশ এক বছরের শাস্তি দেয়। আমি যেন জেলখানার কয়েদী হতে পারি। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, শুধু চাই তুমি আমাকে চুরির অপরাধে জেলে পাঠাও।

পৃথিবীর ইতিহাসে আরও অনেক চোর জেল খেটেছে। চুরি করার অপরাধে আরও অনেক চোরের শাস্তি হয়েছে। আরো অনেক চোর যাতে ধরা না পড়ে তারও অনেক চেষ্টা করেছে। বেশির ভাগ চোরই রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে পরের বাড়িতে ঢুকে চুরি করেছে। কিন্তু পুলিশের কাছে ধরা পড়বার ইচ্ছে নিয়ে কেউ পরের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে, এমন নজির একটাও নেই। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ভোলা পোদ্দার এক এবং অদ্বিতীয়।

ঘরে কারো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ভোলার মনে কেমন দুঃখ হলো। কেউ নেই নাকি বাড়িতে? তখন ভোলা এ-ঘর থেকে ও-ঘর, তারপর ও-ঘর থেকে আর এক ঘরে গেল। হঠাৎ কে যেন তাকে পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে জাপ্‌টে ধরে চিৎকার করে উঠলো–চোর, চোর, চোর...

এমন জোরে সে চেঁচাতে লাগলো যে পাড়ার সব লোক সে-শব্দ পেয়ে ছুটে এলো। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকবে কী করে? সদর-দরজা তো বন্ধ।

তখন চার-পাঁচজন ছেলে পাঁচিল টপকে ভেতরে এসে ঢুকে সদর-দরজার খিল খুলে দিলে। আর তারপর তিরিশ-চল্লিশ জন মানুষ হুড়-মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আর সামনে চোরকে পেয়ে যে যতো পারে কিল-চড়-ঘুঁষি মেরে ভোলাকে একেবারে অজ্ঞান করে ফেললে। অজ্ঞান হলেও তখনও ভোলার যেন একটু হুঁশ ছিল। তাই কিল-চড়-ঘুঁষি খেয়ে তার মনে হচ্ছিল যেন তার মাথার ওপর পুষ্প-বৃষ্টি হচ্ছে।

খানিক পরে অফিসের ছুটি হলে যখন বাড়ির কর্তা বাড়িতে ফিরলেন, গিন্নীও সিনেমা দেখে বাড়িতে ফিরলেন, ছেলে-মেয়েরাও বাড়িতে ফিরলো ইস্কুল থেকে, তখন পুলিশকে খবর দিতেই তারা এলো। পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলে–কে তুমি? তোমার নাম কী?

ভোলা পোদ্দার তার নামটা বললে।

–তুমি কী করতে এ-বাড়িতে ঢুকেছিলে?

ভোলা বললে–চুরি করতে–

কে একজন হঠাৎ তাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠেছে–আরে, এ যে আমাদের বস্তির ভোলা মাস্টার। তাই তো। অনেকেই তখন তাকে চিনতে পেরেছে। বললে–আরে, এই তো বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়ায়! একজন বলে উঠলো–বাইরে মাস্টারি আর ভেতরে ভেতরে সেই মাস্টারের আবার এই রকম চুরি-বিদ্যে?

'মাস্টার' কথাটা শুনে পুলিশের বোধহয় একটু মায়া-দয়া হলো, তাই আর বেশি মার-পিট করলে না। কোমরে দড়ি বেঁধে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে থানায় নিয়ে গেল।

ভোলার তখন খুব আনন্দ হচ্ছে। চিরকাল ধরে সে যে ভগবানকে ডেকেছে, তার সে ডাক বোধহয় ভগবানের কানে গেছে এতদিনে। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে রাখলে। অন্ধকার নোংরা দুর্গন্ধময় হাজত-ঘর। সেখানে আরো কয়েকজন চোর-ডাকাত-খুনী ছিল। তারা ভাবলে ভোলাও বুঝি তাদের মতো একজন চোর ডাকাত কিংবা খুনী। সে-রাতে মশার কামড়ে তার ঘুম তো হলোই না, তার ওপর বুকের ব্যথাটাও খুব বেড়ে গেল।

পরের দিন পুলিশ ভোলার হাতে হাত-কড়া পরিয়ে কোর্টে নিয়ে গেল।

যখন তার ডাক পড়লো তখন তাকে হাত-কড়া পরা অবস্থায় হাকিমের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। হাকিম জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

ভোলা বললে—ভোলা পোদ্দার—

—তোমার বিরুদ্ধে নালিশ এই যে তুমি একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিলে। কথাটা কি সত্যি?

ভোলা বললে—হ্যাঁ, হুজুর—

—তুমি তো বলেছ যে তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছো। তাহলে চুরি করেছিলে কেন?

ভোলা বললে—টাকার ওপর আমার লোভ হয়েছিল, তাই আমি চুরি করতে ওই বাড়িতে ঢুকেছিলুম—

এই কথার পর আর ভোলাকে জেরা করার দরকার বোধ করলেন না হাকিম। সঙ্গে সঙ্গে ভোলাকে তিনি ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়ে দিলেন। সেই হুকুম শুনে ভোলার মনে হলো সে যেন লটারির টিকিট কিনে নগদ দশ হাজার টাকা পেয়ে গেল।

তারপর জেলখানা। প্রথম কয়েক দিন জেলখানার নিয়ম-কানুন বুঝতেই তার কেটে গেল। তারপর কতো রকমের কাজ তার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো তার ঠিক নেই। সেই কঠোর শাস্তির চাপের মধ্যেও কিন্তু ডাক্তার বিধান রায়ের কথা সে ভোলেনি।

একদিন ভোলা তার 'ওয়ার্ডার'কে জিজ্ঞেস করলে—ভাই, আপনি বলতে পারেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এখানকার কোন্ ঘরে থাকেন?

ওয়ার্ডার তাঁর নামই শোনেনি তো কী আর বলবে। শুধু বললে—আমি জানি না—

ভোলা অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নাম শোনেনি লোক ভূ-ভারতে আছে নাকি? মতিলাল নেহরু থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত যত লোক আছে সকলেই তো ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বন্ধু। সেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নামও কিনা শোনেনি এই লোকটা! কিন্তু ভোলা জানতো যে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই গোড়া থেকেই সে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। সদিচ্ছে থাকলে একদিন-না-একদিন সুযোগ আসবেই।

সে-সুযোগ একদিন সত্যি-সত্যিই এলো ভোলার জীবনে। সেদিন আরো অনেক কয়েদীর সঙ্গে ভোলা দল বেঁধে বাগান-কোপানোর কাজ করতে চলেছে, হঠাৎ একজন কয়েদী বললে—ওই দেখ ডাক্তার বিধান রায় যাচ্ছেন—

ভোলাও দেখলো ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে। সেই সাদা শার্ট, সেই খদ্দরের ধুতি, হাতে একটা লাঠি। এ ছবি সে আগে অনেকবার এখানে-ওখানে দেখেছে।

কয়েদীটা বললে—উনি রোজ ভোরবেলায় হেঁটে বেড়ান—

যতক্ষণ সেদিন ডাক্তার রায়কে দেখা গেল ততক্ষণ ভোলা প্রাণভরে দেখলে। তারপর তাকে বাধ্য হয়েই বাগান কোপাতে যেতে হলো। তা না করলে বেত মারার শাস্তি পেতে হবে।

পরের দিন সে তৈরি হয়েই ছিল। ভোরবেলা যেই তারা দল বেঁধে বাগান কোপাতে যাচ্ছে, সেদিনও দেখলে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় খদ্দরের সাদা শার্ট আর ধুতি পরে প্রাতঃভ্রমণ করছেন।

সে আর কারো কথা শুনলে না, কয়েদীদের লাইন থেকে বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সোজা ডাক্তার রায়ের সামনে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো—আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান—

তখন কয়েদীদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ওয়ার্ডার চিৎকার করে উঠেছে—পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো। ডাক্তার রায়ও তখন বিব্রত বোধ করছেন। বললেন—কী হলো? কে তুমি? পায়ে পড়ছো কেন?

ভোলা তখন তার মনের কথাগুলো ডাক্তার রায়-এর কাছে সমস্ত গড়-গড় করে বলে যাচ্ছে। বলে যাচ্ছে কেমন করে কাকার অত্যাচারে সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে, কী ভাবে এখন মানিকতলার এক বস্তিতে দিন কাটাচ্ছে, বুকে তার কী-রকম ব্যথা হচ্ছে, ডাক্তার রায়কে বুক দেখাতে গিয়ে কী ভাবে তাঁর জুনিয়ার তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কী ভাবে ডাক্তার রায়কে বুকটা দেখাবার জন্যে নকল চোর সেজে চুরি করেছে, সব বলে গেল ভোলা কাঁদতে কাঁদতে।

ওদিক থেকে ওয়ার্ডারটাও ভোলাকে ধরতে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছে।

ডাক্তার রায় হাত তুলে ওয়ার্ডারকে মারতে বারণ করলেন। অন্য কয়েদীরা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো। ডাক্তার রায় তখন ভোলাকে বললেন—ওঠো, উঠে দাঁড়াও—

ভোলা উঠে দাঁড়ালো। তবু তার কান্না থামলো না।

ডাক্তার রায় এক ধমক দিলেন ভোলাকে। বললে—কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

ভোলা তবু কাঁদতে লাগলো। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো তার কী কষ্ট, কোথায় তার ব্যথা, কী তার দুঃখ। কলকাতা করপোরেশনের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবু তাকে কতদিন চিকিৎসা করেছিলেন।

ডাক্তার রায় আবার এক ধমক দিলেন। বললেন—কাঁদছো কেন তুমি? যা বলবার স্পষ্ট করে বলো? তুমি জেলখানায় কী করে এলে?

ভোলা বললে—শুনেছিলাম আপনি জেলখানায় আছেন, তাই চুরি করবার ভান করলাম, যাতে জেলে আসতে পারি। এ রকম সুযোগ তো আর জীবনে পাবো না। জেলখানার বাইরে তো আপনার কাছে কেউ ঘেঁষতেও দেবে না—তখন তো আপনার কাছে যাওয়া মুশকিল হবে আমার মতো গরীব

লোকের পক্ষে। তাই আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি আমাকে বাঁচান! আমার নিজের বলতে কেউ নেই সংসারে–

ডাক্তার রায় জিজ্ঞেস করলেন–তোমার নামটা কী যেন?

ভোলা নিজের নাম বললে–ভোলা পোদ্দার–

–তোমার বয়েস কত?

ভোলা তার বয়েসটা বললে।

–থাকো কোথায়?

–মানিকতলার বস্তিতে–

–লেখাপড়া তোমার কদ্দূর?

–আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি থার্ড ডিভিশনে!

সব শুনে ডাক্তার রায় বললেন–কাল ঠিক দশটার সময়ে তুমি জেলখানার হাসপাতালে এসো। আমি তখন থাকবো।

তারপর ওয়ার্ডারকেও বলে দিলেন যেন এই কয়েদীকে সকাল দশটার সময়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কয়েদীর অসুখ হয়েছে, চিকিৎসা করবেন তিনি।

পরের দিন ভোলা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়ে গিয়ে হাজির হলো হাসপাতালে। সেখানে সরকারী ডাক্তারের পাশে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও বসে ছিলেন। ঘরে তখন কয়েদী রোগীদের খুব ভিড়। তবু ডাক্তার রায় ভোলাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। দেখেই কাছে ডাকলেন। যন্ত্রপাতি নিয়ে ভোলার বুক পরীক্ষা করলেন। শুতে বললেন ভোলাকে একটা কাঠের বিছানার ওপরে। আরো কী সব পরীক্ষা করলেন ডাক্তার রায় তা কে জানে।

জেল-হাসপাতালের কম্পাউন্ডার কী একটা ওষুধ দিলে দিনে তিনবার খেতে। সেই ওষুধটা খাওয়ার পরেই ভোলা যেন একটু আরাম পেলে। ডাক্তার রায় যে কবে জেল থেকে মুক্তি পেলেন তা আর জানা গেল না। আর কোনও দিন ডাক্তার রায়কে ভোলা দেখতে পায়নি।

সেই যে তার বুকের ব্যথাটা কমতে আরম্ভ করলো, তা আর হলো না। পুরো ছ'মাস কাটলে ভোলা ছাড়া পেলে।

ভোলা বলতে লাগল–ভাই, ছাড়া পাওয়ার পর আমি তখন আর কোথাও যাইনি। সোজা চলে গেলাম একেবারে ডাক্তার রায়ের বাড়ি। সে-বাড়িতে তখনও খুব ভিড়। সেদিন তাঁর জন্মদিন–পয়লা জুলাই–কতো সব বড় বড় গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরেও কতো সব বড় বড় লোক ফুল-মিষ্টি নিয়ে তাঁর সামনে রাখছে। আমি টাকা কোথায় পাবো যে ফুলের মালা কিনবো, মিষ্টি কিনবো। আমি ভিড় ঠেলে কোনও রকমে কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। বললাম–আমি সেই জেলখানার কয়েদী ভোলা পোদ্দার স্যার–মনে হলো আমার কথাটা শুনে যেন তাঁর মনে পড়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন–বুকে আর ব্যথা হয় অগেকার মতো?

বললাম–না স্যার।

এই বলেই চলে এলাম। এর বেশি কথা বলবার বা শোনবার সময় তখন তাঁর ছিল না।

এর কয়েক বছর পরেই তিনি দেশের চিফ্ মিনিস্টার হলেন। সেই সূত্রে একদিন তাঁকে প্রণাম করবো বলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে স্লিপ্ পাঠালাম। স্লিপে শুধু লিখে দিলাম 'ভোলা পোদ্দার', আর কিছু লিখলাম না–ওমা, দেখি আমার স্লিপ্‌টা পেয়েই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গেলুম ভেতরে। গিয়ে টেবিলের তলায় মাথা নিচু করে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞেস করলেন–কেমন আছো? আর বুকে ব্যথা হয়?

–না স্যার, আপনার আশীর্বাদে আমি ভালো হয়ে গিয়েছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন–এখন কী করছো? সেই মাস্টারি?

বললাম–কী আর করবো।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন–চাকরি করবে?

বললাম–আপনার দয়া–

আমার কথা শুনেই তিনি টেলিফোনে কাকে যেন বললেন–কে? ধীরেন? এই ভোলা পোদ্দার বলে একটা ছেলেকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, একে একটা চাকরি দিও–বলে রিসিভারটা রেখে দিলেন। একটা প্যাডের কাগজে কী একটা লিখলেন। লিখে আমাকে দিলেন। বললেন–এই চিঠিটা নিয়ে রাইটার্সে যেও, গিয়ে ধীরেনকে দিও চিঠিটা–।

তখন জানি না কে ধীরেন। পরে গিয়ে শুনলাম ধীরেন কার নাম। ধীরেন মানে ওঁর সেক্রেটারি ডি. এম. সেন। আশ্চর্য ভাই, এই যুগেও যে এ-রকম ঘটনা ঘটে তা অন্য লোকের কাছ থেকে শুনলে ভাবতুম স্রেফ ব্লাফ্। কারণ সেইদিন থেকেই আমার একটা চাকরি হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম–আর এই বাড়ি? এই সব?

ভোলা বললে–এ সব আমার ছেলে করেছে। চাকরি পাওয়ার পর ঘটনাচক্রে আমার একদিন বিয়েও হয়ে গেল। তারপর একদিন আমার এক ছেলে হলো। সে বি.এস্.সি পাশ করে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে চাকরি নিলে না। একটা কনট্র্যাকটারি ফার্ম খুললো। সেই কনট্র্যাকটারি ফার্মই হলো আমার জীবনের লক্ষ্মী। এখন সে বড়-বড় ব্রীজের কনট্র্যাকট পায়, বড় বড় রাস্তা তৈরির কনট্র্যাকট পায়। এত কাজ সে পাচ্ছে যে সব কাজগুলো নিতেও পারছে না। এই সেদিন হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাছ থেকেই একটা ছ'কোটি টাকার চেক এসেছে। ভোলা বললে–আসলে সমস্তই ওই ওঁর জন্যে–বলে সামনের দেওয়ালে টাঙানো ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অয়েল পেন্টিং-এর দিকে চেয়ে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে। একটু থেমে আবার বললে–তাই যতো কাজই থাক, যতো ঝড়বৃষ্টিই হোক, ওই পয়লা জুলাই তারিখে আমি বাইরে কোথাও যাবো না। গেলেও আমি কলকাতায় ফিরে আসবোই। কারণ ওই দিনটায় ওঁকে শ্মশানে যে-চুল্লীতে দাহ-সংকার করা হয়েছিল, সেইখানে একটা ফুলের মালা রেখে আমি ওঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আসি–

ছবি : সরোজ সরকার

নয়নচাঁদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নচাঁদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা। আর দুশ্চিন্তা থাকলেই অনিদ্রা। অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়। সুতরাং টাকা থেকেও নয়নচাঁদের সুখ নেই। সারা বছর কবরেজি পাঁচন, হোমিওপ্যাথি গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনও মতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানা রকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়োয়, আরশোলা খরখর করে, কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ায় কাগজ ওড়ে, আরও কত কী। তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হয়েছিল, শব্দটা হলো জানালায়। জানালার শিক-এ যেন টুং করে কেউ একটা ঢিল মেরেছিল।

বিছানার মাথার দিকেই জানালা, জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড় বাতি জ্বেলে মোড়কটা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখাঃ নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিলে। শেষ অবধি গলায় গামছা বেঁধে আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায় তোমার ঘাড় মটকাবো। ততদিনে ভাল মন্দ খেয়ে নাও। ফূর্তি করো, গাও, নাচো,

হাসো। বেশী দিন তো আর নয়। ইতি তোমার যম জনার্দন।

নয়নচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যান্ড নোট লিখে নয়নচাঁদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। কখনও টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপাড়ে এক জংগলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচা গলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে তা অবশ্য নয়নচাঁদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তাছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে তিনি জল খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে পারল না! এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হলো।গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনও কাজ করতে তিনি ভালবাসেন না। তাঁর সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনও বাড়িতে গেলে তিনি কখনও সদর দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমন কি খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমন কি জানালা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নচাঁদের বাড়িতে বরদা ঢুকলেন টারজানের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের একটা ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে বরদা পাশের একটা জাম গাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা গাছে। সেখান থেকে নয়নচাঁদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলার জানালায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, "এই যে নয়নবাবু, কী হয়েছে বলুন তো?"

জানালায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিড়মি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হলো। বরদাচরণ ততক্ষণে ধৈর্যের সংগে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নচাঁদ তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, "তাহলে এ জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলে বাঁধা চিঠিটা ছোঁড়া হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ বাবা বরদা।"

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, "হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।"

"না। খামোখা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো হাওয়া আসবে, না করালেও আসবে। ঝুটমুট খরচ করতে যাবো কেন?"

"তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?"

"কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবী বলতে পারো।"

"কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?"

"কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই তাই খেয়েছি। দুখানা রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি।"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনি খুবই কৃপণ। ভীষণ কৃপণ।"

"না বাবা, কৃপণ নই। হিসেবী বলতে পারো।"

"আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে।"

নয়নচাঁদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরতে তাঁর বেশ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কৃপণ বা হিসেবী বললে
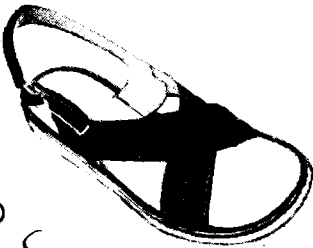
আপনাকে কিছুই বলা হয় না। আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।"

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, "পাড়ার লোক হয়ে তুমি 'পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?"

"আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশী নয়?"

"কিছু কমই হবে বাবা। হিসেব করে দেখেছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশ টাকার বেশী নয়।"

"তবে আমি বললুম, ভিজিট বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।"

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, "যেও না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবোখন।"

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, "চিঠিটা দেখি।"

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতসকাচ দিয়ে অক্ষরগুলো দেখলেন ভাল করে। তারপর নয়নচাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, "এটা কি জনার্দনেরই হাতের লেখা?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যান্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সংগে অনেকটা মিল আছে।"

বরদা বললেন, "হুঁ মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেঁকসই ছিল না।"

"তার মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?"

"গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফাঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে গামছা ছিঁড়ে সে পড়ে যায় এবং বেঁচেও যায়। এ চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে তো বিপদের কথা। আপনি বরং ক'টা দিন একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও করে নিন প্রাণভরে।"

"তার অর্থ কী বাবা। কী বলছো সব? আমি জীবনে কখনও ফূর্তি করিনি। তা জানো?"

"জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভাল? অমাবস্যার তো আর দেরীও নেই।"

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "জনার্দন যে মরেছে তার সাক্ষীসাবুদ আছে। লাশটা সনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।"

"তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।"

নয়নচাঁদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে উঠে বললেন, "প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বলো তাই করি।"

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে, দেখছি।"

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিন

পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে?

দিন পর। মাথার চুল উসকোখুসকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন, "পেয়েছি।"

নয়নচাঁদ আশান্বিত হয়ে বললেন, "পেরেছো ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।"

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, "তাকে ধরা অত সহজ নয়। তবে জনার্দনের বউ ছেলে মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরেরই একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে পরের বাড়িতে ঝি চাকর খেটে কোনও রকমে বেঁচে আছে।"

"অ, কিন্তু সে খবরে আমাদের কাজ কী?"

বরদা কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, "চিঠিটা যদি ভাল করে পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ ছেলে মেয়ে ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।"

"তা বটে।"

"যদি বাঁচতে চান তো তাদের আগে ব্যবস্থা করুন।"

"কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?"

"তাদের বাড়ি ঘর ফিরিয়ে দিন। আর যা সব ক্রোক করেছিলেন তাও।"

"ওরে বাবা! তার চেয়ে যে মরাই ভাল।"

"আপনি চ্যাম্পিয়ন।"

"কিসে বাবা বরদা।"

"কিপটেমিতে। আচ্ছা আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন ? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে ?"

"মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, "তাহলে তাই হবে বাবা।"

অমাবস্যার আর দেরী নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলো বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, "আজ রাতে রুটির বদলে ভাল করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।"

"বলো কী ?"

"যা বলছি তাই করতে হবে। আপনার প্রেশার খুব লো। শক টক খেলে মরে যাবেন।"

"তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।"

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেতে খেতে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

"এই যে নয়নচাঁদবাবু, কেমন লাগছে ?"

"গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।"

"আপনার কাছারিঘরে বসে কাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না।"

"বলো কী বাবা বরদা ? এরপর যে আমিই পথে বসব।"

"প্রাণটা তো আগে।"

কী আর করেন, নয়নচাঁদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হলো রাত্রে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধেবেলা বরদা এসে বললেন, "কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো !"

"ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা।"

"ভয় পাবেন না। আজ রাত্রে আরও দুখানা পরোটা বেশী খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে ?"

নয়নচাঁদ হাঁপ-ছাড়া গলায় বললেন, "তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।"

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে এ বাড়িতে কখনও ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়নচাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শুয়ে শুয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর বেজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে ভাঙিয়ে আনালেন। ভিখিরিরা যখন বিদেয় নিল তখন নয়নচাঁদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা !

দুপুরে একরকম উপোস করেই কাটালেন নয়নচাঁদ। টাকার শোক তো কম নয়।

নিজের ঘরে শুয়ে থেকে একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল তখন চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলোও দিয়ে যায়নি।

আতঙ্কে অস্থির হয়ে নয়নচাঁদ চেঁচালেন, "ওরে কে আছিস ?"

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নচাঁদের। বুকটা ছমছম। চারদিকে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্যে। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নচাঁদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে ধেয়ে গিয়ে বললেন, "কেন রে ভূতের পো, আর কোন্ পাপটা আছে আমার শুনি ? আর কোন্ কর্মফল বাকি আছে ? থোড়াই পরোয়া করি তোর ?"

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ। জানালার বাইরে থেকে বরদাচরণ বললেন, "ঠিকই বলেছেন নয়নবাবু। আপনার আর পাপ টাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে না। অমাবস্যা একটু আগেই ছেড়ে গেছে।"

"বটে ?"

"তবে ফের অমাবস্যা আসতে আর কতক্ষণ ? এবার থেকে যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেট খাওয়া, বিকেলে দানধ্যান সৎচিন্তা, রাত্রে পরোটা, মনে থাকবে ?"

নয়নচাঁদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "থাকবে বাবা থাকবে।"

ছবি : সরোজ সরকার

রাজার খেলা

প্রফুল্ল রায়

ধর্মতলায় নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে যেতে একেবারে হাঁ হয়ে গেল রাজা। চারপাশ থেকে যত বাস মিনিবাস ট্রাম ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার আসছে, সব মানুষে ঠাসা। গাড়িগুলো এসে থামছে কার্জন পার্কে, রাজভবনের গায়ে এবং ওধারের ময়দানে। সেগুলো থেকে গলগল করে মানুষ বেরিয়ে এসে সোজা চলেছে ইডেন

গার্ডেনের দিকে। আজ গোটা কলকাতা যাচ্ছে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়া ভার্সেস ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। অগুনতি গাড়ি সামনে দিয়ে দারুণ স্পীডে রেড রোডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ট্রাফিক কনট্রোলে লাল আলো জ্বলতে ছুটন্ত গাড়িগুলো থেমে গেল। আর নিধু জ্যাঠার হাত ধরে, রাস্তা পেরিয়ে রাজভবনের ফুটপাথে চলে এল। তারপর মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল।

নিধু জ্যাঠার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় সে অনেক লম্বা—প্রায় ছ ফুটের মতো। টান টান চেহারা, শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে, তবু নিধু জ্যাঠা খুব স্মার্ট। তার হাঁটার ভঙ্গি যুবকদের মতো।

এই মুহূর্তে নিধু জ্যাঠার পরনে মালকোচা দিয়ে পরা ধুতি আর ফুল শার্ট, তার ওপর রোঁয়াওলা উলের সোয়েটার। পায়ে কেডস। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

তার পাশে রাজাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। রাজার পরনে এখন ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্ট, তার ওপর লাল পুল-ওভার। পায়ে নীল মোজা আর বুট।

রাজভবনের ফুটপাথটা সেমি সার্কেলে ঘুরে গেছে। সেটা ধরে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল, ওধারের ময়দানে কয়েক হাজার প্রাইভেট কার পার্ক করা রয়েছে। তার মানে গাড়িওলারা ওখানে গাড়ি রেখে স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। খেলা ভাঙলে ফিরে এসে যে যার গাড়িতে উঠে চলে যাবে।

নিধু জ্যাঠার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দারুণ ভাল লাগছিল রাজার, ভীষণ উত্তেজনাও হচ্ছিল। তার কারণ, এই প্রথম সে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে।

রাজারা থাকে উত্তর কলকাতায়—বাগবাজারের কাছে একটা সরু গলিতে। সে পড়ে মডেল স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। আজ একত্রিশে ডিসেম্বর। এ বছরেরই অক্টোবরে সে এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে।

পড়শোনায় রাজা বেশ ভাল। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোতেও তার খুব ঝোঁক। কিন্তু নর্থ ক্যালকাটায় খেলার মাঠ নেই। কখনও সখনও কোনো পার্কে একটু জায়গা পেলে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে টেনিস বল দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল কি ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দ্যায়। নইলে খবরের কাগজের খেলার পাতা আর ঝকমকানো রঙিন সব স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ে কখনও সে স্বপ্ন দ্যাখে পেলের মতো ফুটবল খেলোয়াড় হবে, কখনও বা ভাবে ভিভ রিচার্ডসের মতো ব্যাটসম্যান না হলে চলবে না।

এই খেলাধুলোর ব্যাপারটায় সারাক্ষণ রাজাকে তাতিয়ে রাখে নিধু জ্যাঠা। এই যে আজ জীবনে প্রথম ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে সেটাও নিধু জ্যাঠার জন্যই।

রাজার বাবারও খেলাটেলায় যথেষ্ট আগ্রহ। তিনি মোটামুটি একটা চাকরি করেন। এদিকে ফ্যামিলিতে লোকজন অনেক। রাজারা চার ভাইবোন, বাবা, মা, ঠাকুমা আর এক বিধবা পিসিমা। মোট আটজন। এত বড় সংসার চালাতে অফিস ছুটির পরও বাবা আরো কী সব করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই তাঁর রাত হয়। অনেক কষ্টে টায়টোয় কোনোরকমে রাজাদের চলে যায়।

বাবার পক্ষে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে টেস্ট ম্যাচের টিকেট কেটে দেওয়া সম্ভব না। দামী দামী খেলার ম্যাগাজিনও তিনি কিনে দিতে পারেন না। বাড়িতে একটাই মোটে বাংলা খবরের কাগজ আসে। নিধু জ্যাঠাই এর ওর কাছ থেকে অন্য সব খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন চেয়ে এনে রাজাকে দ্যায়। পড়া হয়ে গেলে সেগুলো ফেরত দিয়ে আসে।

টেস্ট খেলা তো আজ বললে কাল হয় না। ছ মাস কি তারও আগে ঠিক করা থাকে। এবার ইডেনে ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের টেস্ট দেখার জন্য রাজা আর নিধু জ্যাঠা সবাইকে লুকিয়ে পয়সা জমাতে শুরু করেছিল। দু'জনের টিকিটের দাম দেড় শ টাকা। টেস্টের তারিখটা জানার পর থেকেই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটা ফাঁকা পাউডারের কৌটোয় রাখছিল রাজা। এইভাবে পঁচিশ টাকা জমানো গেছে। বাকি এক শ পঁচিশ টাকা দিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আনে নিধু জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠা রাজার আপন জ্যাঠা নয়। এমন কি তার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্কই নেই। না থাক, তবু আপনজনের চেয়ে সে অনেক বেশি।

রাজা শুনেছে, দেশভাগের আগে ঢাকা শহরে বাবারা যে পাড়ায় থাকতেন নিধু জ্যাঠাও সেখানেই থাকত। বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়; সেই হিসেবে সে বাবার দাদা, রাজাদের জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠার পোশাকী নাম প্রিয়নাথ নাগ, ডাকনাম নিধু। ভাল নামটা লোকে ভুলেই গেছে। নিধুটাই সবার মুখে মুখে চালু রয়েছে।

নিধু জ্যাঠার তিন কুলে কেউ নেই, বিয়েও করেনি। রাজা শুনেছে, দেশভাগের কয়েক বছর বাদে ঢাকা থেকে বাবাদের সঙ্গে সে-ও কলকাতায় চলে আসে। তার জন্মের ঢের আগে থেকেই নিধু জ্যাঠা তাদের বাড়িতে আছে। তবে তার খরচ সে নিজেই চালায়। কলেজ স্ট্রীটে একটা বড় বইয়ের দোকানে কী একটা কাজ করে। তাতে যা মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই মাসের শেষে বাবার হাতে তুলে দ্যায়। তাতে রাজাদের যথেষ্ট উপকার হয়। দিনে সাত-আট কাপ চা ছাড়া আর কোনো নেশা নেই। সবাই তাকে ভালবাসে। ছোটদের যত আবদার তার কাছে।

রাজা আরো শুনেছে ঢাকায় থাকতে দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান ছিল নিধু জ্যাঠা। বিখ্যাত উয়াড়ি ক্লাবে সে ছিল পেলে। তখন ঢাকায় ক্রিকেট খেলাটা তেমন একটা হত না। তবু উৎসাহ কম ছিল না। ওরই মধ্যে ব্যাট-ট্যাট কিনে প্র্যাকটিশ করত।

পৃথিবীতে যত বড় বড় ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার সমস্ত রেকর্ড নিধু জ্যাঠার মুখস্থ। তার কাছেই রাজা শুনেছে কে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে, কে বেশি ক্যাচ
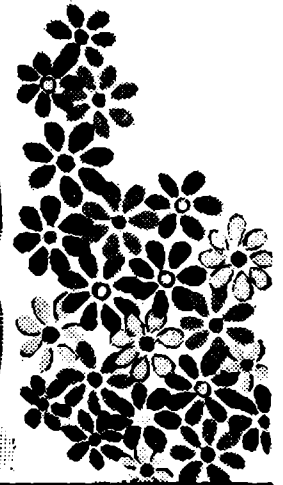
ধরেছে, কোন দেশে সবচেয়ে বেশি অল রাউন্ডার পাওয়া গেছে, ইত্যাদি। ফুটবলের গল্প শুরু হলে তো রাতের পর রাত কাবার করে দিতে পারে নিধু জ্যাঠা। পেলে, লেভ ইয়াসিন, গ্যারিঞ্চা বা জার্ড মুলার থেকে পাওলো রোসি পর্যন্ত কে কীভাবে গোল করে, কার খেলার স্টাইল কী রকম—বলতে বলতে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

এতক্ষণে বাঁ দিকে রেড রোড, নেতাজী স্ট্যাচু, দেশবন্ধুর মূর্তি রেখে আকাশবাণী ভবনের সামনে এসে পড়ল। এখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে নানা গেটের দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে প্রচুর পুলিশ। একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করে সাত নম্বর গেটের হদিসটা জেনে নিল নিধু জ্যাঠা।

মিনিট পনেরর ভেতর দেখা গেল, ক্লাব হাউসের ডান দিকে সিমেন্টের গ্যালারিতে তারা সীট খুঁজে বসে পড়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় দুপুরে খাবার জন্য মা লুচি আলুভাজা ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু দিয়েছিল। খাবারগুলো একটা কাপড়ের সাইড-ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে নিধু জ্যাঠা। ব্যাগটা এখন তার কোলে।

এখনও খেলা শুরু হয়নি। সবে সাড়ে নটা। আরো আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক দশটায় টস হবে, তারপর তো খেলা।

রাজা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তাদের বাঁ পাশে ক্লাব হাউস। তারপর থেকে গোল মাঠটাকে ঘিরে স্টেডিয়ামের অনেকগুলো ব্লক। ব্লকগুলোতে এখন শুধু মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য গেট দিয়ে আরো অনেকে আসছে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকবে না, খেলা শুরু হবার আগে স্টেডিয়াম বোঝাই হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিকের ব্লকগুলোর পেছনে ইডেন গার্ডেনের উঁচু উঁচু গাছ, আরো দূরে হাইকোর্টের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

এতদিন রাজা তার বন্ধু বুবুনদের টিভিতেই রঞ্জি স্টেডিয়াম দেখেছে। এখন নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। এত মানুষ, তাদের নানা রঙের পোশাক, মাথার টুপি, ক্লাব হাউস, ইডেনের গাছপালা—সমস্ত মিলিয়ে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

এ বছর শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। কনকনে হাওয়া ইডেন গার্ডেনের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে। হাওয়াটা এত ঠান্ডা, মনে হয় হিমালয়ের বরফ গায়ে মেখে নেমে এসেছে। অবশ্য রোদও উঠেছে চমৎকার। উষ্ণ সোনালি রোদ আর ঠান্ডা বাতাসে শীতের সকালটা দারুণ লাগছে।

চারপাশের মানুষেরা আজকের খেলাটার ব্যাপারে নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে।

একজন বলল, 'গাভাসকার টপ ফর্মে আছে। ইডেনে ডাবল সেঞ্চুরী করবে।'

আরেক জন বলল, 'কচু করবে। কাওয়ানস আর এডমন্ডসকে ঠেকিয়ে কুড়িটা রান আগে করুক। তারপর বলবেন—'

তৃতীয় লোকটি বলল, 'এই নতুন ছেলেটা, মানে আজাহারউদ্দিন সম্পর্কে কী মনে হয়?'

চতুর্থ লোকটি বলল, 'আমার ধারণা, খুব ভাল খেলবে। ওকে পাওয়াতে ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।'

পঞ্চম লোকটি বলল, 'ইংল্যান্ডের ল্যাম্ব আর গ্যাটিং দুর্দান্ত খেলছে এই সীজনটা। এখানকার টেস্টের রেজাল্ট কী হবে কে জানে।'

রাজারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পাঁচ রো নিচের সীট থেকে একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'এই আইসক্রিম, এই পটেটো চীপস, এই চিউয়িং গাম, এই পপকর্ন, ইধর আও—' অর্থাৎ সামনে দিয়ে যে ফিরিওলা যা নিয়ে যাক তাকেই ডাকছে লোকটা।

রাজার বাঁ পাশের সীটে এক মহিলা স্টেডিয়ামে ঢুকেই ব্যাগ থেকে উলের গোলা বার করে সোয়েটার বুনে চলেছেন। তাঁর ডান ধারে এক বেজায় মোটা মারোয়াড়ী আরেক জনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে শুরু করেছে। খুব সম্ভব উল বোনা আর ঘুমোবার মতো জরুরি কাজের জন্যই তাদের এখানে আসা।

রাজা কিন্তু এসব কিছুই শুনছিল না, বা লক্ষ্যও করছিল না। সে শুধু স্বপ্নের ঘোরে পুরো স্টেডিয়ামটা বার বার দেখছে।

হঠাৎ পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা ডাকল, 'রাজা—'

অন্যমনস্কর মতো সাড়া দিল রাজা, 'উঁ—'

'নোটবইটা এনেছিস?'

একটা তিন ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি মাপের ছোট, সবুজ মলাটের নোট বই রাজাকে দিয়েছে নিধু জ্যাঠা। ওটাতে পেলে গ্যারিঞ্চা বেকেনবাউয়ার থেকে শুরু করে মারাদোনা ফ্রান্সিস কোলি ইউসোবিও পর্যন্ত ফুটবলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের গোল করার কায়দা যেমন লেখা আছে তেমনি ভিভ রিচার্ডস, ব্রাডম্যান, উইকস, গাভাসকার ইত্যাদি ক্রিকেটের বড় বড় স্টাররা কে কীভাবে স্ট্রোক করেন তার নিখুঁত বর্ণনাও নোট বইটিতে পাওয়া যাবে। ক্রিকেট এবং ফুটবলের দারুণ কিছু ঘটলেই রাজার সবুজ নোট বুকে তা উঠে যায়।

রাজা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এনেছি।'

'ভেরি গুড। যখনই কারো ভালো স্ট্রোক কি বোলিং দেখবি তক্ষুণি টুকে রাখবি।'

মুখে কিছু না বলে আবার ঘাড় কাত করে রাজা।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পেঙ্গুইন পাখির মতো ঢলঢলে কালো কোট-পরা দুই আম্পায়ার এবং দু'দলের ক্যাপ্টেন সুনীল গাভাসকার আর ডেভিড গাওয়ার মাঠের মাঝখানে টস করতে এলেন। টসে জিতে ইন্ডিয়া ব্যাটিং নিল। গাওয়ার এবং গাভাসকার ক্লাব হাউসে ফিরে গেলেন। আম্পায়াররা মাঠেই থেকে গেলেন।

একটু পরেই গাওয়ার তাঁর টীম নিয়ে ফিল্ডিং করতে

সারা পৃথিবীকে ভুলে তারা প্র্যাকটিশ করে চলেছে

এলেন। গাভাসকার তাঁর পার্টনার গাইকোয়াড়কে নিয়ে এলেন ব্যাটিং করতে।

সবুজ কার্পেটের মতো গোল মাঠে ধপধপে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা এগার জন ফিল্ডার, দু'জন ব্যাটসম্যান আর কালো কোট-পরা দু'জন আম্পায়ার ছাড়া আর কেউ নেই।

এতদিন টিভিতে আর স্বপ্নে রাজা যাদের দেখেছে, এখন তারা একেবারে চোখের সামনে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে তার, চোখে পলক পড়ছে না।

গাভাসকার আর গাইকোয়াড় কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারলেন না, অল্প রান করেই এডমন্ডস এবং কাওয়ানসের বলে কট আউট হয়ে গেলেন।

কাওয়ানস দুর্দান্ত 'বল' করছিলেন। নিধু জ্যাঠা পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কাওয়ানসের বল করার কায়দাটা টুকে নে।'

রাজা নোটবই আর ডট পেন বার করেই রেখেছিল। তক্ষুণি লিখে ফেলল।

গাভাসকার এবং গাইকোয়াড়ের পর এলেন বেংগসরকার আর অমরনাথ। বেংগসরকার এবং অমরনাথের দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ, একটা স্কোয়ার কাট আর একটা সুইপের বর্ণনা লিখে নিল রাজা।

বেংগসরকার এবং অমরনাথ জুটি আউট হলে এলেন রবি শাস্ত্রী আর আজাহারউদ্দিন। তাঁদের কত লেট কাট, অন ড্রাইভ, পুল আর কভার ড্রাইভের বিবরণ যে রাজার নোটবুকে টোকা হতে লাগল তার ঠিক নেই।

একসময় প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো।

এরপর আরো চার দিন নিধু জ্যাঠার সংগে ইডেনে এল রাজা। ইন্ডিয়ার প্রথম ইনিংস সাত উইকেটে চারশ সাঁইত্রিশ রানে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো। ইংল্যান্ড আউট হলো দুশো ছিয়াত্তর রানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়ে গেল।

এর মধ্যে মাইক গ্যাটিং আর অ্যালান ল্যাম্বের হাঁটু মুড়ে পুল, সুইপ ড্রাইভ, চেতন শর্মা, শিবরামকৃষ্ণ ও শিবলাল যাদবের বোলিং-এর স্টাইল, ডেলিভারি সব টুকে নিয়েছে রাজা।

১৯৮৫-এর পাঁচই জানুয়ারি খেলা শেষ হবার ঘণ্টাখানেক আগে পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা রাজা–'

পাঁচ দিন ধরে রাজার চোখ মাঠের মাঝখানেই আটকে আছে। মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী বলছ ?'

'স্টেডিয়ামে সবসুদ্ধু কত লোক আছে বল্ তো–'

'খবরের কাগজে লিখেছে আশী হাজার।'

'এর মধ্যে কত বাঙালী আছে, মনে হয় ?'

'বলতে পারব না।'

একটু ভেবে নিধু জ্যাঠা বলল, 'ধর মিনিমাম সত্তর হাজার।'

রাজা উত্তর দিল না।

নিধু জ্যাঠা এবার বলল, 'সত্তর হাজার লোকের হাত কতগুলো?'

রাজা হতভম্বের মতো বলল, 'তুমি কি খেলা দেখতে এসে গুণ অঙ্কের ক্লাস বসাতে চাইছ?'

'বল্ না—'

'একজন মানষের দুটো করে হাত হলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।'

'রাইট। ভেবে দ্যাখ, কেউ ভাল ব্যাট, বল বা ফিল্ডিং করলে সত্তর হাজার বাঙালী এক লাখ চল্লিশ হাজার হাতে হাততালি দিচ্ছে। দিচ্ছে কিনা?'

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বিমূঢ়ের মতো তাকালো রাজা। বলল, 'হ্যাঁ, দিচ্ছে।'

'এবার বল্ মাঠে কত জন প্লেয়ার খেলছে?'

'দু' দলের বাইশ জন।'

'তাদের ভেতর ক'জন বাঙালী?'

'একজনও না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর খুব আস্তে আস্তে, অথচ বেশ জোর দিয়ে নিধু জ্যাঠা বলল, 'আর কেউ পারুক, আর না-ই পারুক তোকে অন্তত মাঠের মাঝখানে ওই বাইশ জনের একজন হতে হবে।'

রাজা চমকে উঠল, 'কীভাবে?'

'লেখাপড়ার সংগে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ করে করে, ভাল খেলা শিখে।'

'শিখব কী করে? আমার কি প্যাড আছে? ব্যাট, উইকেট, গ্লাভস, ডিউস বল আছে?'

'ঠিক বলেছিস।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিধু জ্যাঠা বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

টেস্ট ম্যাচ শেষ হবার মাসখানেক বাদে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল রাজা। যতটা অবাক, ততটা খুশি। নিধু জ্যাঠা নতুন ব্যাট, লাল টুকটুকে ডিউস বল, প্যাড, উইকেট আর গ্লাভস কিনে এনে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

রাজার বাবাও হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, 'নিধুদা, এত টাকা খরচ করে এ সব কিনতে গেলে কেন?'

নিধু জ্যাঠা বাবাকে বলল, 'এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ভজন।' বাবার ডাকনাম ভজন।

'কিন্তু টাকাগুলো পেলে কোথায়? নিশ্চয়ই ধার-টার করেছ?'

'যা ভাল বুঝেছি, করেছি। তোর শরীর ভাল না, শুয়ে থাক গিয়ে।'

বাবা তাঁর এই একরোখা জেদী দাদাটিকে ভাল করেই চেনেন। আর একটি কথাও না বলে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'তা হলে কাল থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করা যাক। ভাবছি তোর সঙ্গে আমিও নতুন করে আরম্ভ করব। ভোরবেলা উঠে আড়াই ঘন্টা পড়ে নিবি, তারপর এক ঘন্টা প্র্যাকটিশ। মাঠ থেকে ফিরে আধ ঘন্টা রেস্ট। রেস্টের পর স্নান করে খেয়ে স্কুল। আর আমি চলে যাব কলেজ স্ট্রীটে। কাল থেকে এই হবে আমাদের রোজকার রুটিন। ঠিক আছে?'

রাজা মাথা হেলিয়ে জানালো, 'ঠিক আছে।'

'মনে রাখবি, ইডেন গার্ডেনে মাঠের ভেতর যে বাইশ জনকে দেখেছিস তার একজন তোকে হতেই হবে।'

রাজা বলল, মনে রাখবে।

পরদিন সকালে ব্যাট প্যাড-ট্যাড নিয়ে ঠিক আটটায় রাজা আর নিধু জ্যাঠা চলে গেল কাছাকাছি একটা পার্কে। সেখানে ঘাস-টাস বলতে কিছু নেই। চারদিক গর্তে বোঝাই। এখানে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ অসম্ভব।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'চল, অন্য জায়গায় যাই।'

খানিকটা দূরে আরেকটা পার্কে এসেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। সি. এম. ডি. এ'র কী সব কাজকর্ম হচ্ছে এদিকে। যার জন্য পার্কটায় অগুনতি গুদাম বানিয়ে মালপত্র রাখা হয়েছে। দশ ইঞ্চি জায়গাও এখানে ফাঁকা পড়ে নেই।

এবার রাজারা গেল আরো দূরের একটা পার্কে। সেটা পাতাল রেল দখল করে রেখেছে। এখানেও বিরাট বিরাট গো-ডাউন। সেগুলো সিমেন্ট বালি লোহার রড এবং নানারকম ভারী ভারী যন্ত্রপাতিতে বোঝাই।

রাজার স্কুল আর নিধু জ্যাঠার কাজে যাবার সময় হয়ে আসছিল। ওরা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক হলো, পরের দিন আবার মাঠের খোঁজে বেরুবে।

কিন্তু পরের দিনও খেলার মাঠ পাওয়া গেল না। সব পার্কই হয় সি. এম. ডি. এ, নয় পাতাল রেল কিংবা হকার আর ভিখিরিরা দখল করে রেখেছে।

চারদিন ঘোরাঘুরির পর একটা পার্ক পাওয়া গেল কিন্তু সেখানে বদমাশ বাজে ছোকরাদের আড্ডা। রাজাদের উইকেট পুঁততে দেখে তাড়া তেড়ে এল। 'এখানে খেলা-ফেলা চলবে না। ভাগ–'

রাজা হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু নিধু জ্যাঠা ভেঙে পড়ার মানুষ না। খবর নিয়ে সে জানতে পারল, ওই ছোকরাগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পার্কে বসে থাকে। সারাক্ষণ নেশাটেশা করে। ওরা পারে না, এমন নোংরা কাজ নেই। ওদের জন্য সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ পার্কে ঢুকতে পারে না। তবে সন্ধ্যের পর ঠান্ডাটা যখন আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায় তখন ওরা পার্ক থেকে চলে যায়।

এই পার্কটার ভেতরে এবং চারদিকের রাস্তায় কর্পোরেশন প্রচুর তেজী আলো লাগিয়ে দিয়েছে। এত আলো যে একটা আলপিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

নিধু জ্যাঠা আর রাজা ঠিক করে ফেলল, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আলোয় ঝলমলে ফাঁকা পার্কে তারা প্র্যাকটিশ করতে আসবে। ঠান্ডাটা তখন একটু বেশিই থাকবে কিন্তু কী আর করা যাবে! ক্রিকেট তো শীতেরই খেলা। তা ছাড়া ইংল্যান্ডে গেলে তো এর থেকে অনেক বেশি ঠান্ডায় খেলতে হবে।

পরদিন রাত থেকেই আলোকিত ফাঁকা মাঠে সত্তর বছরের একজন বোলার বারো বছরের এক ব্যাটসম্যানকে বল করতে থাকে। চারদিক নিঝুম, মাথার ওপর জানুয়ারির হিম পড়ে যাচ্ছে অবিরাম। কিন্তু দুই ক্রিকেটারের সে ব্যাপারে হুঁশ নেই। সারা পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে তারা প্র্যাকটিশ করে চলেছে।

নিধু জ্যাঠা বল করতে করতে বলে, 'এই একটা লেগ স্পিন দিলাম। সুইপ কর–'

রাজা ব্যাট চালায়।

নিধু জ্যাঠা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'হলো না, হলো না। ল্যাম্ব শিবরামকৃষ্ণণের বলে হাঁটু মুড়ে কীভাবে সুইপ করেছিল, ভেবে নে–' বল কুড়িয়ে এনে আবার ডেলিভারি দিতে গিয়ে বলল, 'আবার লেগ স্পিন দিচ্ছি। ট্রাই এগেন–'

এইভাবে রাতের পর রাত দু'জনে প্র্যাকটিশ করে যায়। ইডেন গার্ডেনে বাইশ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন হতে পারবে কিনা, রাজা জানে না। কিন্তু চেষ্টা তো করে যেতে হবে।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী

নবনীতা দেবসেন

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল একটিমাত্র ছেলে। ছোটবেলায় রাণীমা মারা গেছেন। রাজার আদরে আদরে ছেলেটি এক্কেবারে বাঁদর হয়ে উঠেছে। ছেলের নাম বৃষস্কন্ধ। সত্যিই তার বিশাল চেহারা। গায়ে জোরও খুব। বৃষস্কন্ধের স্বভাবটি কিন্তু মোটেই ভালো নয়। কেবলই মারামারি করতে পছন্দ করে সে। দুম্‌দাম্‌ একে ঘুঁষি মারলে, চটাপট্‌ ওকে থাপ্পড় কষালে, ক্যাঁৎ করে এক পদাঘাত করে দিলে কারুর পশ্চাদ্দেশে—এটাতেই তার আনন্দ, ছেলেবেলা থেকে এটাই তার খেলা। এবং সে রাজার ছেলে বলে কেউ তাকে উলটে মারতেও পারে না। মনের সুখে রাজপুত্তুর রাজার কুপুত্তুর হয়ে উঠ্‌লো। দেশের লোকের মনে মহা উদ্বেগ। এই ছেলে যখন রাজা হবে, তখন দেশ তো উচ্ছন্নে যাবে। দেশসুদ্ধু সবাইকে জ্বালাবে। রাজার মনে একটুও সুখ নেই। এমন সময়ে রাজার শরীরটাও খারাপ হলো, রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু বৃষস্কন্ধকে মেয়ে দেবে কে? কোনো বাবা মা-ই চায় না তার মেয়েকে ধরে ধরে জামাই পিটুনি দিক!

যতই রাজভোগের লোভ দেখানো হোক না কেন, আশপাশের সব রাজ্য দেশবিদেশ খুঁজে, সওদাগর, কোটাল, মন্ত্রী, উজীর, নাজীর, সভাকবি, কুলপুরোহিত, রাজবৈদ্য, সেনাপতি—মানে রাজসভায় যে যেখানে আছেন, কেউই বৃষস্কন্ধের জন্যে কন্যে যোগাড় করতে পারলেন না। রাজা তো মনের দুঃখে প্রায় মরেই যান বুঝি বা! ছেলের আর বিয়ে হলো না। বংশ আর রক্ষা হলো না। এমন সময়ে রাজার মালী এসে হাতজোড় করে বললে, "রাজামশাই, আমার ছোট মেয়েটি রাজকুমারকে বিয়ে করতে রাজী। কিন্তু তাকে একশো নিজস্ব দাসদাসী, আর একহাজার নিজস্ব সৈন্যসামন্ত দিতে হবে।"

রাজা শুনে বললেন, "বেশ, তোমার মেয়ে যা বলেছে তাই হবে। বৃষস্কন্ধের বিয়ে না দিলেই নয়। আর ছেলের যা সুনাম, এদিকে ওদিকে সাতখানা দেশ থেকে কেউই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি!"

মালীর মেয়ের নাম শ্রীময়ী। যেমন নাম, তেমনি তার রূপ। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। সে দিব্যি হাসিমুখে বৃষস্কন্ধের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে, মালিনী থেকে যুবরাণী হয়ে গেল। এদিকে বৃষস্কন্ধ তাকে সকালে উঠে খানিক পেটায়, তারপর ঘুরতে বেরিয়ে যায়, ফের রাত্রে ফিরে খানিক পেটায়। শ্রীময়ী সহ্য করে, আর মনে মনে ফন্দি আঁটে।

কিছুদিন মারধোর খাবার পরে, শ্রীময়ীর শুকপাখিটি একদিন বৃষস্কন্ধকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—"গরুটাও দুধ দেয় বলেই তাকে জাব্‌না দেওয়া হয়, কুকুরটাও পাহারা দেয় বলেই তাকে হাড় দেওয়া হয়, বেড়ালটাও ইঁদুর ধরে বলে তাকে দুধ দেওয়া হয়ে, কিন্তু দ্যাখ্‌ তো সারি, রাজকুমার কিচ্ছুই না-করে, বসে বসে রাজভোগ খায়। তুই আমি তো তবু দুবেলা রামনামের বুলি পড়ি বলেই ছোলাজল পাই, কিন্তু বৃষস্কন্ধ? সে কেবল সব্বাইকে পেটায় বলে রাজভোগ খায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জার কথা!" সারি অমনি বললে—"ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা! মরে যাই! আমি যদি বৃষস্কন্ধ হতুম তাহলে এখুনি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতুম যে কোনো কাজকর্মের খোঁজে। বউকে খাওয়ায় না, আবার বউকে ধরে মারে? ছিঃ, লজ্জাও করে না যুবরাজের?"

বৃষস্কন্ধ শুক-সারির কথা শুনে খুব রেগে গেল। ইতিমধ্যে

তার বাবার অসুখ সেরে গেছে। তিনিই আবার রাজ্যচালনা করছেন। বৃষস্কন্ধ সত্যিই কিছু করে না। সে রেগেমেগে শুক আর সারির ঘাড় মট্‌কে ভেঙেই দিলে। তার-পরে রাগ কমলে ভেবে দেখলো, ওরা তো ঠিক কথাই বলেছে? নাঃ, উপার্জন না করলেই নয়। বৃষস্কন্ধ তখন বাজার থেকে অনেক কিছু ভাল ভাল মালপত্র নিয়ে, পাশের বড় রাজ্যের সওদাগর রাজার কাছে বাণিজ্য করতে গেল। সওদাগর রাজা দারুণ চালাক। সে বৃষস্কন্ধকে দেখেই বুঝেছে তার মাথায় বুদ্ধি নেই। সে বললে, "দ্যাখো, তোমার গায়ে যদি আমার বেড়ালটা লাফিয়ে পড়ে, তবেই তোমার মালপত্র আমি ন্যায্য দামে কিনে নেব। আর যদি তা না পড়ে, তবে সব মালপত্র আমি অমনি কেড়ে নেব। রাজী তো? কী?"

একটু ভেবে বৃষস্কন্ধ বললে, "রাজী!" কিন্তু সওদাগরের বেড়াল তার গায়ে লাফাবে কেন? অত মোটা লম্বা লোক— ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলছে ঠিক ষাঁড়েরই মতন, যতই "আয় আয় তু তু" করে ডাকুক না কেন, তাকে দেখেই বেড়ালটা লেজ তুলে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। সওদাগর তখন তার সব মালপত্র কেড়ে নিয়ে বৃষস্কন্ধকে তাড়িয়ে দিলে। বৃষস্কন্ধ যেই ভীষণ রেগে উঠে সওদাগর রাজাকে মারতে গেছে, অমনি তার যত পাইক বরকন্দাজ সব এসে বৃষস্কন্ধকেই মেরে ধরে তার রাজপোশাক খুলে নিয়ে, শুধু একটা কৌপীন পরিয়ে মাথা নেড়া করে নদীর পারে এক চাষীর কাছে ছেড়ে দিয়ে এল। বলল, "সব টাকা রোজগার করে, তবে তোর সওদা ফেরৎ নিবি। ততদিন খাট্‌তে থাক্।"

রাজপুত্র বৃষস্কন্ধ এতদিন নিজেই শুধু অন্যকে মেরেছে, অন্যের হাতে মার তো কোনোদিন খায়নি, কাজেই আত্মরক্ষার কায়দাও কিছুই জানে না। সে মার খেয়ে খুব ঘাবড়ে গেল। কী আর করবে, চাষীর ক্ষেতেই মজুরের কাজটা মন দিয়ে করতে লাগলো। টাকা রোজগার করে হারানো সওদা সব উদ্ধার করে তবে তো নিজের রাজ্যে ফিরবে? টাকা হওয়া দূরের কথা, অত সওদা হারিয়ে সে মুখ দেখাবে কেমন করে রাজসভাতে? চাষীর ক্ষেতে কাজ করতে করতে বৃষস্কন্ধের কৌপীনটা ছিঁড়ে গেল, চাষী তখন তাকে নতুন একটা কৌপীন কিনে দিলে। চাষীর কাছে তার হিসেব জমা হচ্ছে, এক বছর হয়েছে মাত্র। আরো ন'বছর কাজ করার পরে সওদার দাম শোধ হবে। বৃষস্কন্ধ প্রচুর খাটতে পারে, তবুও তার রোজগার বাড়ে না। পুরস্কার নেই।

এদিকে শ্রীময়ী তার একশো অনুচরকে সর্বক্ষণ লাগিয়ে রেখেছে রাজপুত্রের খবর সংগ্রহের কাজে। তারা সব খুঁটিনাটি খবর দেয়। রাজপুত্র কবে কী দিয়ে ভাত খাচ্ছে, সেটা পর্যন্ত শ্রীময়ী জানে। কৌপীন বদলের খবর শুনেই শ্রীময়ী বললে, "ওই ছেঁড়া কৌপীনটা আমার চাই!" অনুচরেরা চটপট ছেঁড়া কৌপীনটা আস্তাকুঁড় থেকে তুলে নিয়ে এল।

শ্রীময়ী এবার বেরুল সওদা নিয়ে, পুরুষের সাজে পাশের রাজ্যের সওদাগর রাজার সভায় গিয়ে হাজির হলো। সঙ্গের একহাজার সৈন্যসামন্ত একটু দূরে বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল।

শ্রীময়ীর গায়ে শাল জড়ানো, তার মধ্যে একটা ইলিশ মাছ লুকিয়ে রেখেছে। সওদাগর রাজা তাকে বৃষস্কন্ধের মতোই বললে, "যদি আমার বেড়াল তোমার কাছে যায়, তবেই তোমার সব সওদা আমি কিনে নেব। নইলে তোমার সব সওদা অমনি-অমনিই নিয়ে নেব।"

শ্রীময়ী বললে—"অমন একপেশে শর্তে তো হবে না মশাই? যদি আপনার পোষা বেড়াল আমার দিকে আসে, তবে আমার সব সওদা আপনি কিনে নেবেন আপনার সিংহাসনের বদলে। ওটাই আমার সওদার দাম। আর যদি না আসে, তবে আমাকে সুদ্ধু ক্রীতদাস করে রাখবেন সওদা সমেত।"

সদাগর রাজা তো জানেন, বেড়ালটা কারুর কাছেই যায় না। তিনি তক্ষুণি রাজী। বেড়াল কাছাকাছি আসতেই টুক করে শ্রীময়ী শালটা একটু সরিয়ে বেড়ালটাকে একপলক ইলিশ মাছটা দেখালো। আর যাবে কোথায়? "মিয়্যাঁও" বলে

ঝাঁপিয়ে পড়লো হুলোমশাই শ্রীময়ীর কোলের ওপর, ইলিশ মাছের গন্ধে গন্ধে! কিন্তু দুষ্টু সওদাগর তো মাছটা দেখতে পায়নি, সে একেবারে অবাক! শর্তে হেরে সওদাগর রাজা আর কী করে? শ্রীময়ীর সওদার বদলে নিজের সিংহাসন ছেড়েই দিলে। যেমন তার প্যাঁচালো বুদ্ধি, কেবল লোক ঠকানোর কায়দা, তেমনি তার শাস্তি হলো।

শ্রীময়ী রাজসিংহাসনে বসে সওদাগরকে ডেকে পাঠালে। বললে, "দ্যাখো, তোমার সিংহাসন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তিনটে শর্ত আছে। এক নম্বর, আমাকে তুমি প্রতি বছর খাজনা দেবে। দু'নম্বর, আমাকে এক্ষুণি একহাজার অশ্বারোহী সৈন্য উপহার দিতে হবে। আর তিন নম্বর, আমি চলে যাবার দু'দিন পরে তুমি রাজকুমার বৃষস্কন্ধকে উদ্ধার করবে, তার সমস্ত সওদা তাকে ফেরৎ দেবে, এবং এতদিন তাকে কষ্ট দিয়েছ বলে ঠিক দশ গুণ বেশি সওদা তার সঙ্গে দিয়ে রাজকুমারকে তার নিজের রাজ্যে পাঠিয়ে দেবে লোকজন সমেত। দেখো, এর যেন নড়চড় হয় না। তাহ'লে– শ্রীময়ীর ইঙ্গিতে তার একহাজার সৈন্য একনিমেষেই খাপ থেকে একহাজার ঝকঝকে ইস্পাতের তরওয়াল বের করলে–ঝনাৎ করে ভয়ংকর এক শব্দ হলো, আর রাজসভায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অত ইস্পাতের ওপর এমন আলো ঝলসে উঠলো একসঙ্গে। সওদাগর ভয় পেয়ে বললে, "দেবো, দেবো, নিশ্চয় দেবো। সব শর্ত মানলুম। নড়চড় হবে না।"

শ্রীময়ী তখন নিজের রাজ্যে ফিরে গেল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। একহাজার নতুন অশ্বারোহী সৈন্য ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে চলল তাদের সঙ্গে।

এদিকে বৃষস্কন্ধ তো অবাক। সে এসব কিছুই জানে না। হঠাৎ সওদাগরের হলো কী? এত উদারতা কেন রে বাবা? তবু যাই হোক মুক্তি পেয়ে সে কেবল খুশিই হলো না, এত সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরে তার খুব গর্বও হলো। বাড়িতে গিয়ে স্নান করে খেয়েই সে শ্রীময়ীকে বিরাশী সিক্কার এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিলে। বললে–"কী? খুব যে তোমার শুক-সারি বলেছিল বৃষস্কন্ধ কিছুই করতে পারে না? এইবার? এত ধনদৌলত কে এনেছে?"

শ্রীময়ী একটু হেসে ও-ঘর থেকে ছেঁড়া সেই কৌপীনটা নিয়ে এল।–"ধনদৌলত সব কে এনেছে? এই কৌপীনটা, এটা চিনতে পারো?" বলে বৃষস্কন্ধের হাতে দিলে। শ্রীময়ীর কাছে নিজের কৌপীন দেখে বৃষস্কন্ধের যেমন লজ্জা, সে তেমনি অবাক। এ কি ম্যাজিক নাকি? তবে তো বউ সবই জানে? এ মা! সে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললে।

তখন শ্রীময়ী তাকে বললে–"দ্যাখো রাজকুমার, অতিকষ্টে তোমাকে উদ্ধার করেছি। ফের যদি কোনো মানুষের গায়ে হাত তুলেছো তবে আমার দু'হাজার সৈন্যসামন্ত তোমাকে ফের নির্বাসনে দিয়ে আসবে। তোমাকে আমিই কিনে এনেছি সওদাগরের কাছে থেকে। এখন থেকে যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে চলো, তবেই রাজপ্রাসাদে থাকতে পাবে। তোমার বাবাও আমার সঙ্গে একমত।"

বৃষস্কন্ধ তো লজ্জায় অধোবদন হয়েই ছিল। সে এবার হাত জোড় করে বললে–"শ্রীময়ী, তোমার গুণপনার অবধি নেই। আমাকে মাপ করো। আমি যখন তোমার ক্রীতদাস, তখন আমি আর কোন্ মুখে অন্যের গায়ে হাত তুলবো? কেবল তুমি কৌপীনের কথাটা যেন কাউকে বোলো না।"

সেই থেকে রাজকুমার বৃষস্কন্ধ খুব ভালো ছেলে হয়ে গেছে। প্রতিদিন ক্ষেতে গিয়ে চাষবাস করে। দেশে এখন প্রচুর ধান, প্রচুর ধন, প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর ধরে না। সকলেই শ্রীময়ী যুবরাণীর সুবুদ্ধিকে ধন্য ধন্য করে। রাজামশাই নিশ্চিন্ত। শ্রীময়ীকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী করে নিলেন। বৃষস্কন্ধও তাতে খুশি।

ছবি : রাহুল মজুমদার

বোকা বিশু

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সবাই বলে বিশু বোকা ছেলে। মাথা মোটা। ওর দ্বারা কিছু হবে না। কেউ বলেন, ওকে রিকশা চালাতে হবে। কেউ বলেন, ও মুটে হবে। এক একজনের এক একরকম ভবিষ্যদ্বাণী? আমি বিশু। আমার কান দুটো বড় বড়। আমি সব শুনতে পাই। আমার মন খারাপ হয় না, রাগ হয় না, অভিমান হয় না। আমি একটু বেশি খাই। সবাই বলে, বোকা তো, বোকাদের খাওয়া বেশিই হয়। যারা চালাক তাদের খাওয়া কম। ঘুম কম। আমি একটু বেশি ঘুমোই। শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। আর কখনও কোনও স্বপ্ন দেখি না। চালাকরা নাকি ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে তারা দেখতে পায়, পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসবে।

আমাকে সময় সময় বিশু বলে না ডেকে, বলে, অ্যায় গাধা এদিকে আয়। আমি বোকা তো, তাই রেগে যাই না। আমাদের পাড়ার নিতুবাবু খুব চালাক মানুষ। শুনেছি তাঁর এমন বুদ্ধি, পাছে বেশি পয়সা খরচ হয়ে যায়, সেই ভয়ে কম কম খেতেন। কম খাবার ফলে তাঁদের বাড়ির সকলের চেহারা হয়েছিল ছোট ছোট। রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে। এর ফলে তাঁর বাড়ির দরজায় কম কাঠ লেগেছিল। জামাপ্যাণ্ট করাতে কম কাপড় লাগত। যত বড়ই হোক বত্রিশ মাপের গেঞ্জি কিনলেই হয়ে যেত?

তাঁর এত বুদ্ধি ছিল, ছারপোকা হবার ভয়ে বাড়িতে একটাও খাট-পালঙ্ক ঢোকাননি। মেঝেতেই সব শোবার ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা চেয়ার টেবিলে বসে লেখাপড়া করলে কুঁজো হয়ে যাবে তাই বাড়িতে কোনও চেয়ার টেবিল ছিল না। বই মানেই, উই, ইঁদুর, আরশোলা। তাই বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় বই একটাও রাখেন নি। বাবার বিশাল লাইব্রেরী ছিল, সব বই পুরনো বইয়ের দামে বেচে দিয়েছিলেন।

নিতুবাবুর এত বুদ্ধি; তিনি জানতেন, খাওয়া সহজ, হজম করা কঠিন। আর যা হজম হয় না, তা বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়া মানেই পয়সা নষ্ট। তাই তিনি নিয়ম করেছিলেন, যে তিনটে রুটি খাবে সে বাসন মাজবে, যে চারটে খাবে সে ঘর ঝাঁট দেবে, যে সাতটা খাবে সে একতলা থেকে দোতলায় অন্তত চল্লিশ বালতি জল তুলবে। খাওয়ার পরিমাণের সঙ্গে পরিশ্রম মিলিয়ে একটা চার্ট করে দিয়েছিলেন।

সবাই বলত নিতুবাবুর মতো চালাক আর বুদ্ধিমান মানুষ হয় না। সেই নিতুবাব দুম করে মারা গেলেন। মারা যাবার পর যারা রইল, তারা অনেক টাকা, বিষয়-সম্পত্তি সব পেয়ে গেল। তিন বছরের মধ্যে দুহাতে সব উড়িয়ে দিলে। তখন সবাই বললেন, নিতু একটা গাধা ছিল। মানুষের মত কিরকম পাল্টায়!

আমার নাম বিশু। আমাকে সবাই বলে, ছেলেটা গবেট। মাথায় কিস্যু নেই। দুই আর দুয়ে চার হয়, সে হিসেবটাও জানে না। জানার চাড়ও নেই। ওর যে কি হবে! শেষ পর্যন্ত ভিক্ষে করে খেতে হবে। আমাদের পাড়ার নিধুবাবুকে সবাই বোকা বলে। বোকা বলেই নিধুবাবু একটা আটচালায় থাকেন। কারণ তাঁর বাবার বড় বাড়িটা দাদা নিয়ে নিয়েছেন আর বোকা নিধুকে বের করে দিয়েছেন ঘাড় ধরে। সবাই বলে, ঠিক করেছে। ওরকম লোকের ওই রকমই হওয়া উচিত। গাধাটা দাদা দাদা করে হেদিয়ে মরত। দাদাঅন্ত প্রাণ। সে তাল বুঝে বাপকে ভজিয়ে কেমন সব হাত করে নিলে! কি বড় বাড়ি! ফুলবাগান। সেদিন আবার গাড়ি কিনেছে। বিরাট কারখানা। কত লোক খাটছে! সারাদিন কল চলছে গুমগুম করে। সবাই বলে, নিধুর ভাই সিধুটা খুব চালাক। কত বুদ্ধি ধরে! যাই বলো ভাই পৃথিবীটা চালাকের। বোকারা আঁস্তাকুড়ে পড়ে না খেয়ে মরে। ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব বলাবলি করে, আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। আমি বোকা তো, আমার মাথায় ঢোকে না কিছু। আমার তো মনে হয় সিধুর চেয়ে নিধু অনেক ভাল আছে।

আমি ভীষণ বোকা তো, আমাকে যে যা বলে আমি হাসতে হাসতে তাই করে দি। একটুও রাগ করি না। পরে করব বলে বসে থাকি না। বিশে রেশান তুলে আন। বিশে ছুটল। এইবার গমটা ভাঙিয়ে আন বিশে। বিশে বিশাল এক ব্যাগ হাতে একপাশে হেলে গিয়ে চলল গমকলে। এই কাজের সময় বিশুর মতো সোনা ছেলে আর হয় না। নিধুদার গমকলেই আমি গম ভাঙাতে যাই। আমিও বোকা, নিধুদাও বোকা।

নিধুদা তার আটচালার আশেপাশে ছিটেফোঁটা যেটুকু জায়গা ছিল, সেই জায়গাটুকুতে ফুলগাছ, কচুগাছ, উচ্ছেগাছ, লাউ, কুমড়ো লাগিয়ে এমন সুন্দর করে ফেলেছে, সিধুর অত বড়, অত পয়সার বাগানও হার মেনে যাবে। নিধুদা নিজে হাতে বাগান করে। সিধুর বাগান করে মাইনে করা মালী। সিধু চালাক তো! সিধু বলে, বাগান করে সময় নষ্ট করব কেন, আমি পয়সা করব। পয়সা হলে মানুষের সব হয়। নিধুদা বলে, যে কাজে ভালবাসা লাগে, সে কাজ কি আর পয়সা ঢাললে হয়। বাবুইপাখি ভালবেসে যে বাসা বানায় সে বাসা তুমি হাজার টাকায় বানাতে পারবে! এই যে ধরো কাশ্মীরী শালের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, এ কি পয়সা ফেললেই হবে।

নিধুদা সারাদিন শুধু গান গায়। বাড়িতে গলা ছেড়ে। গমকলে, কল চলার আওয়াজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যখন গান ধরে তখন এত ভাল লাগে! চালুনিতে গম নাচতে থাকে গানের তালে তালে। আমি বলি, 'নিধুদা, তুমিও বোকা, আমিও বোকা। তাই তুমি আমাকে এত ভালবাস, আমিও তোমাকে ভালবাসি। এতদিন তো আমরা বোকা রইলুম, এসো না একটু চালাক হই।'

নিধুদা বলে, 'আমি ভাই বোকাই থাকতে চাই। তোমার ইচ্ছে হয় চালাকি শেখার স্কুলে গিয়ে ভর্তি হও।'

'না, আমি তা বলছি না; তবে কি জানো নিধুদা, মাঝে মাঝে ভীষণ মন খারাপ হয়। আর কত গালাগাল সহ্য করা যায় বলো।'

'শোন বিশু, আমার ভাই সিধু খুব চালাক তো, অনেক লেখাপড়া শিখেছে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিরাট কারখানা করেছে, সব হয়েছে। আচ্ছা বল, সে কি মানুষ হয়েছে। কোনও দিন কারুর উপকার করেছে। এই তো কিছুদিন আগে বাড়িতে পুলিশ পড়ল, তার আগে ইনকাম ট্যাক্সের হামলা হলো। এপাড়ায় কেউ সিধুকে ভালবাসে! সিধুর অনেক পয়সা, তাতে কার কি হয়েছে। ওই যে বললুম, এটা ভাল করে ভেবে দেখিস। যে লোকটা রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না, চালাক হয়ে তার কি লাভ হয়েছে।'

'নিধুদা, আমি যে বোকা, আমার যে লেখাপড়া হবে না। আমি বড় হয়ে কি করব!'

নিধুদা গলা ছেড়ে গান শুরু করল

'শোন, বোকাকে শেখার জন্যে একটু বেশি খাটতে হয়; কিন্তু যা শেখে তা আর ভোলে না। তুই যদি পরিশ্রম করিস তোকে কেউ হারাতে পারবে না। এই দ্যাখ, আমি তো বোকা, আমি কি হেরে গেছি। জীবনে আমি কি কারুর কাছে হাত পেতেছি! ওসব ভাবিসনি। আর আমি তো আছি। আমার পরামর্শ নিস। ভাল হবার, ভাল থাকার অনেক পথ আছে। ঘাবড়াসনি।'

নিধুদা গলা ছেড়ে গান শুরু করল। নিধুদা বলে, গান হলো ভাল থাকার সবচেয়ে ভাল উপায়। দেখিস না পাখিরা গান গায় বলে কত ভাল থাকে! নিধুদার কেউ নেই তো, তাই নিজেই রাঁধে। নিজেই বাজার করে। বাসন মাজে, ঘর পরিষ্কার করে। আমার মতো, কি আমার চেয়েও নিধুদাকে বেশি ভালবাসে আরেকজন, সে হলো একটা দেশি কুকুর। নিধুদার আটচালাটা যেন আশ্রম। সেখানে গেলে আমার আর আসতে ইচ্ছে করে না।

নিধুদা আমাকে বলেছিল, যদি কোনও রকমে দশ হাজার টাকা জমাতে পারে তাহলে পাড়ার প্রাইমারি স্কুলটাকে ভাল করে সারিয়ে দেবে। স্কুল বাড়িটা তিন বছর আগে ঝড়ে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা বাড়িতেই কোনও রকমে স্কুল বসে। বলেছিল, দ্যাখ বিশু, পাড়ায় এত লোকের এত পয়সা, স্কুলটার দিকে কারুর নজর নেই। ঘটা করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, বিদেশ বেড়াতে যাচ্ছে, আর যেখানে তৈরি হবে ভবিষ্যত, সেটাকে দেখেও দেখে না। আর বলেছিল, দেখ বিশু, যদি আর তিন হাজার জমাতে পারি, তাহলে হিমালয়কে একবার দেখে আসব, প্রতি বছর মা দুর্গা যেখান থেকে আসেন আমাদের দেখতে। আমি বলেছিলুম, আমাকে নিয়ে যাবে! বলেছিল, ওঃ, তাহলে তো আরও মজা। দুজনে গেলে তো ভীষণ আনন্দ।

তুমি এত বছর কল চালালে, কিছু জমাতে পারলে না!

দশ হাজার তো জমেছিল, আশার বিয়ে দিলুম না!

আশা এপাড়ার মেয়ে। তিন দিনের অসুখে বাবা মারা গেল। কে আশার বিয়ে দেবে। বোকা নিধুর কষ্ট করে জমানো টাকা সেই কাজে লেগে গেল। বড়লোক, চালাক লোক সিধু, আজ দেব, কাল দেব করে ফুড়ুক করে উড়ে গেল বিদেশে।

নিধুদা বলে, 'জানিস বিশু, মানুষের নিজের বাঁচার জন্যে খুব একটা বেশি কিছু লাগে না। ধর দুটো জামা, দুটো কাপড়, দুটো গেঞ্জি, একটা গামছা। কেমন! শোবার জন্যে একটা মাদুর একটা বালিশ। সকালে জলখাবার, ভিজে ছোলা এক মুঠো। দুপুরে ডাল ভাত আলু ভাতে। রাতে চারখানা রুটি, একটা তরকারি। বাস, হয়ে গেল। এই হজম করতে পারলে ইয়া গোদা শরীর। প্রয়োজন যত বাড়াবি, তত বেড়ে যাবে। বুঝলি বিশু, লোভ বড় বাজে জিনিস। জানিস তো, আমি যেই বুঝে গেলুম, বোকা মানুষ, এই চালাকের দুনিয়ায় চালাকি করার মতো বিদ্যেবুদ্ধি নেই, তখন আমি আমার মতো করে বাঁচতে শিখলুম। আমি দ্যাখ কারুর সঙ্গে মিশি না। মিশলেই লোভ বেড়ে যাবে। মনে হবে, আমি ওর মতো খাবো, পরব, বেড়াব। মিশলেই কথায় কথায় পরচর্চা, পরনিন্দা হবে। কি দরকার বাবা! দাঁড়া না, এবার কিছু পয়সা জমলেই একটা হারমোনিয়াম কিনব। তুই আমার সঙ্গে গান গাইবি!'

'আমার যে গাধার মতো গলা।'

'ধুর, ও তো লোকের কথা। লোকের কথায় কান দিবি না। মন ভেঙে দেয়। নিজেদের সুবিধের জন্যে। হতাশ করে দেয়। চোখ বুজিয়ে বসবি স্থির হয়ে, তখন দেখবি নিজের ভেতরের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিস।

আমি বলেছিলাম, 'নিধুদা, তোমার বাড়িটা একটু সারাও না কেন। মাথার চালাটা তো কোনদিন ভেঙে পড়বে।'

হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ছাদটা পড়ে গেলেও আকাশটা তো থাকবে!'

নিধুদা বলত, জায়গা-জমি, বিষয়-সম্পত্তি, বাড়িঘর বড় বাজে জিনিস। ওসব বোকাদের জন্যে নয়। পৃথিবীতে যত লোক আছে তারা সবাই যদি জমি বাড়ি চায় তাহলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে! একটা পৃথিবীতে কুলোবে না। ওইজন্যে দেখিস না পৃথিবীর যত মারামারি বিষয় নিয়ে ক্ষমতা নিয়ে। দেখলি না সিধু আমাকে মেরে তাড়ালে। জমি মানে এক টুকরো কাগজ, অড়ংবড়ং লেখা। মাথার ওপর চওড়া স্ট্যাম্প। উঃ, সেই কাগজটাকে নিয়ে কি কান্ড রে ভাই! এ বলে সই করো, ও বলে সই করো। না করলে তোমাকে খুন করব। কি দরকার বাবা! একদিন তো যেতেই হবে। তুই দেখ, এখান থেকে একটা ঘাসের টুকরো, তুই কি নিয়ে যেতে পারবি ওখানে? তাহলে কি দরকার বাবা, যা আমার নয় তা নিয়ে সময় নষ্ট করার।

আমি বোকা বিশু। আমার গুরু বোকা নিধু। সবাই বলে জজ ব্যারিস্টার হব। আমি বলি নিধুদার মতো হব। সকালে বিকালে গমকল চালাব। আর গান গাইব। আর যদি একটুকরো জমি পাই, ফুল ফোটাব। একদিন নিধুদা বড় বড় চোখ করে বললে, 'বিশু, জোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কি ব্যবস্থা গো!'

'আরে সেই হিমালয়ে যাবার!'

'কি টাকা যোগাড় করেছ?'

'আরে ধুর, আমি এই আটচালা আর গমকলটা বেচে দিচ্ছি।'

'ধ্যাস্, সে একটা কথা হলো। আমি বোকা, তাও বলছি, তুমি খাবে কি?'

'ধুর, একথাটা তুই চালাকের মতোই বললি। বোকারা খাবার চিন্তা করে না। বোকাদের খাওয়াবার মালিক ভগবান।'

'তুমি হিমালয় থেকে ফিরে এসে কি করবে? কোথায় থাকবে?'

'আমি আর ফিরবই না। তুই কি ভাবিস, সারা জীবন একটা লোক কেবল গমকল চালাবে! কোথাও আটকে যাবার নামই মৃত্যু। জীবনটাকে কি রকম করবি জানিস, নদীর মতো। ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবি সাগরে।'

'কাজটা তুমি ভাল করছ না।'

'তুই সত্যিই এবার বোকা থেকে চালাক হয়ে যাচ্ছিস। ভাল মন্দ ভাবতে শিখছিস। ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে শিখছিস। তোর আর ভাবনা কি বিশু!'

'তুমি চলে গেলে, আমার কি হবে?'

'তোর যা হবে বলে লেখা আছে তাই হবে। এদিকও হবে না, ওদিকও হবে না।'

নিধুদার যে কাজ সেই কথা। গমকল আর আটচালা এক কথায় বিক্রি হয়ে গেল। নিধুদা বলত, পৃথিবীর যত অশান্তি দেখবি বিশু, জমি নিয়ে, বাড়ি নিয়ে। সেই অশান্তি নিধুদা ঘুচিয়ে দিলে এক কথায়।

নিধুদার গমকল বন্ধ হলো, আর আমার খাটুনিও বেড়ে গেল। গমের ভারি বস্তা হাতে আমাকে এখন এক মাইল হাঁটতে হবে। যেখানে সারাদিন গমকল ঘরঘর করে চলত সেই জায়গাটা নিস্তব্ধ শ্মশান। নিধুদার গান বন্ধ। যে লোকটি কল কিনেছে সে নিশ্চয় খুব চালাক। চালাক না হলে পয়সা হয়! একদিনের মধ্যে সব ভেঙে মাঠ করে দিলে। বিরাট বাড়ি করবে। কোথায় গেল নিধুদার ছোট্ট বাগান, আটচালা। গমকলটা আর একজন লরিতে তুলে হইহই করে নিয়ে গেল।

কারুর মনে কোনও দুঃখ নেই। এমন একটা মানুষ সব বিক্রি করে, সমস্ত টাকা প্রাইমারি স্কুলকে দান করে হারিয়ে গেল, যেন কিছুই নয়। চালাকরা এসব ভাবেই না। বোকা লোক এই ভাবেই বোকামি করে একদিন সরে পড়ে।

আমি বোকা বিশু। আমি দিনরাত আমার নিধুদার কথা ভাবি আর চেয়ে চেয়ে দেখি বিশাল একটা বাড়ি ঠেলে আকাশের দিকে উঠছে। আর চারপাশে চালাকদের সে কি চিৎকার চেঁচামেচি।

আমি বোকা বিশু—আমি আর একটু বড় হলে, আর দুহাজার টাকা জমাতে পারলে, সোজা হিমালয়ে যাবো, সেখানে আর এক বোকা আছে, তার নাম নিধু।
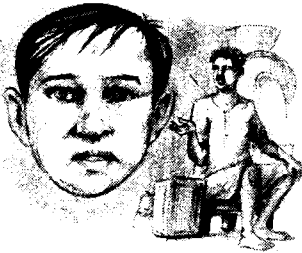
ছবিঃ রাহুল মজুমদার

আষাঢ়ের কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বলেছিলুম গ্রীষ্মকালে
"আয় বৃষ্টি, আয়।"
এখন দেখি, বৃষ্টিধারায়
সৃষ্টি ভেসে যায়।
শুধুই কি গাঁ-গঞ্জ ভাসে,
রাস্তা এবং ঘরে
আষাঢ় মাসেই জল-থই থই
কলকাতা শহরে।
রিকশা ডোবে, ট্যাক্সি ডোবে,
ডুবল ঠেলাগাড়ি,
কোমরজলেই লোকগুলো দেয়
দিগ্বিদিকে পাড়ি।
আকাশে আজ সাতশো বাঁধের
দরজা গেছে খুলে,
ভিজতে-ভিজতে ছাত্রেরা যায়
কলেজে-ইস্কুলে।

ঘড়ঘড়ঘড় ঘোরাচ্ছে কেউ
মেঘ-পেষাইয়ের জাঁতা,
জল ঢেলে আজ ডুবিয়ে দিচ্ছে
সে-ই বুঝি কলকাতা।
বাগবাজারে নৌকো চলে,
মানিকতলার মোড়ে
মস্ত বাজার ওই ভেসে যায়
বৃষ্টিধারার তোড়ে।
গড়পারে কে রাস্তা থেকে
ধরছে মাগুর-সিঙি,
ডুবল বুঝি বাগমারি আর
ডুবল উল্টোডিঙি।
ডুবল আমার শহরতলির
বসতবাড়িটাও।
'আয় বৃষ্টি' আর বলি না,
যাও বৃষ্টি, যাও।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

হাঁদা-ভোঁদার
জুডোর প্যাঁচ

আয়, বচা। ইয়ো-ইয়ো দিয়ে কত রকম কলা-কৌশল দেখানো যায় তোকে করে দেখাই।

দারুণ! তুমি ইয়ো-ইয়ো দিয়ে দুর্দান্ত কিছু ভেল্কিবাজি করলে, ভোঁদাদা!
পরেরটা লক্ষ্য কর, বচা!

আরে, আরে! এটা কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে?
মরেছে! এযে হাঁদাদা! সব সময় হামলাবাজি করছে!

এবার আমি এটা দিয়ে তোদের নয়া ভেল্কি দেখাচ্ছি!

তুই এটা দেখাতে পারিস নি ভোঁদা! হেঃহেঃ!
ওফ!

আর এটা হচ্ছে তোর ইয়ো-ইয়ো দিয়ে সেরা কৌশল, ভোঁদা! হিঃহিঃ!
এর বদলা নিতে হবে, বচা।
জঞ্জাল

এভাবে ও পার পেয়ে যেতে পারে না! ওকে জব্দ করার এই হচ্ছে প্ল্যান।

কে র‍্যা! ভোঁদার চামচা? খামচা মেরে আজ তোর ছাল তুলে নেবো!

তারপর সেই ছাল দিয়ে
জয়ঢাক বানিয়ে বাজাবো!

হিঃ হিঃ! আমি
বেশ ভালোভাবেই
হাঁদাকে ধরেছি!

বাঁচাও!
আমাকে নীচে
নামা শিগগির!

ওখানে ঝুলন্ত হাঁদা,
আর এখানে তাল
তাল কাদা। হাতের
টিপ প্র্যাকটিস
কর, বচা!

কাদার তাল ছুঁড়ে হাঁদার হাল
একেবারে ঢিলে করে দিয়েছি!
সহজে আর ও আমার পেছনে
লাগবে না।

এর বেশ কিছুদিন পর
সেদিনের পর
থেকে হাঁদার আর
দেখা নেই। কোথায়
গেলো বলতো?
মামার বাড়ি
বেড়াতে গেছে
বলে শুনেছি।

আরো কিছুদিন পর
আইসক্রীম খেতে
খেতে একবার
হাঁদাদের
ওদিকটা
ঘুরে আসি।
আইসক্রীম

আরেঃ! হাঁদা যেরে! কোথায় ছিলি এতোদিন ?
আরেঃ ভোঁদা, তুই ?

গেছি রে!

ওওঃ! ব্যাপারটা কি ঘটলো ?
হোঃ হোঃ! সেই ঘটনার পর থেকে আমি জুডো শিখছিলাম!

ঘাবড়াস না, ভোঁদা! আমি তোকে খাড়া হতে সাহায্য করছি।
উফ! ধন্যবাদ!

জুডোর প্যাঁচ কেমন লাগছে বলতো, ভোঁদা?
ইররক! আর না!

সেদিন বেকায়দার ফায়দা যা তুলেছিলি এটা তার বদলা! হেঃ হেঃ!

কিছুক্ষণ পর
হাঁদাদা আমাকে বললো তোর গুরু জুডোর প্যাঁচে কাতরাতে শুরু করেছে, গিয়ে দেখে আয়।
ওকে জব্দ করার একটা মতলব এসেছে, বচা। তুই ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

এই যে, এসে গেছিস, হাঁদা! তোর সঙ্গে আবার দেখা হওয়াতে খুশি হলুম...

তোর ঐ জুডোর প্যাঁচে আমি কিছু মনে করিনি, হাঁদা! নে হাতে হাত মেলা!
আছাড় খেয়ে তোর বুদ্ধি সাফ হয়েছে দেখে আমিও খুশি।

এবার তোকে আমি ধরেছি এবং তোরই কায়দায়!
এ-একি!

হিঃ হিঃ! কিন্তু কিছুই করতে পারলি না, ভোঁদা! তুই আমার পা ই মাটি থেকে হটাতে পারলি না।
আমি হয়তো পারি নি!

...কিন্তু ও পারবে!

গেছি রে! বাঁচাও!
হাঃ হাঃ! প্যাঁচগুলো বেশ ভালোই হচ্ছে কি বলিস, হাঁদা?

পরলোকের হাঁড়ির খবর

আশাপূর্ণা দেবী

লম্বা সাঁকোটার এপারে একপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল বটকেষ্ট। সময় পেলেই এরকম দাঁড়িয়ে থাকে সে। সাঁকোটা দিয়ে মানুষ পারাপার দেখে । এটা বটকেষ্টর একটা নেশা। কে আসছে কে যাচ্ছে, কে চেনা কে অচেনা তার হিসেব রাখা।

তা সাঁকো পারাপার তো করছে সবাই। হরদম। দিনদুপুর নেই, রাতদুপুর নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই। এই যে মাত্র খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বটকেষ্ট, কতক্ষণ তা অবশ্য জানে না হাতে তো ঘড়ি বাঁধা নেই কাজেই সময়ের হিসেবও নেই। তবে খুব বেশিক্ষণ নয়। এইটুকুর মধ্যেই কতজন এলো গেলো। আজ আর চেনা জানা কাউকে দেখল না। আর সবাই তো ঝড়ের বেগে ছুটছে, দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবে, এমন সময় নেই।

যারা যায় তাদের তো কথাই নেই, দৌড়নোর ঘটা কী ? যেন ট্রেন ফেল হয়ে যাচ্ছে, না রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যারা আসে, তারা বরং কখনো কখনো একটু দাঁড়িয়ে বটকেষ্টর কাছে খোঁজ-তল্লাশ নেয়, কতদিন এখানে আছে বটকেষ্ট, জায়গাটা কেমন, এইসব।

আজ আর তেমন কাউকে পায়নি। কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলছিল বটকেষ্টর। হঠাৎ দেখতে পেল ওই দূরে, সাঁকোটার একেবারে ওমাথায় কে যেন আসছে, হাঁটার ভঙ্গিটা যেন চেনা চেনা।

দৈবক্রমে এ-সময় সাঁকোটা একটু ফাঁকা রয়েছে। বটকেষ্ট চোখের ওপর দিকে হাত আড়াল করে নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করল লোকটা কে!

নদীটা বিশাল, সাঁকোটাও বিশাল লম্বা। পার হয়ে আসতে সময় লাগে।

ধৈর্য ধরে থাকতে থাকতেই লোকটা কাছাকাছি এসে গেল। চিনতে পারল বটকেষ্ট। আর চিনে চমকে গেল!

গজগোবিন্দ না ?

ও না মিলিটারীর চাকরি নিয়ে জলন্ধরে না কোথায় চলে গিয়েছিল। তাগড়া জোয়ান চেহারা, এক কথাতেই চাকরি হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি যুদ্ধ করার চাকরি নয়। গজগোবিন্দ হচ্ছে ডাক্তার, সেই চাকরিই পেয়েছিল মিলিটারীতে। তো এক্ষুণি চলে এল মানে ?

ভাবতে ভাবতেই লোকটা, মানে গজগোবিন্দ একদম সামনে এসে গেল, আর চেঁচিয়ে উঠল, কে বটা না ?

বটকেষ্ট শিউরে উঠল। চমকালো খানিকটা আহ্লাদে, খানিকটা দুঃখে। বলল, তুইও চলে এলি ?

তা তো এলুম। যমের মুখে থাকা তো ? কিন্তু তুই কবে ?

সেই তো উল্টোরথের দিন। তুই দেশে না থাকাতেই আমার এই বিপত্তি। তোর ওষুধ একদাগ পড়লেই ঠিক সেরে যেতুম।

গজগোবিন্দ বলে উঠল, হয়েছিল কী ?

আর বলিস ক্যানো! ওই উল্টো রথের মেলা দেখতে গিয়ে খান আষ্টেক পাঁপর ভাজা আর দু কুড়ি মাত্তর বেগুনী ফুলুরি খেয়েছিলুম। বাস। হয়ে গেল। ব্যাটা নিঘ্ঘাত কেরোসিনে

পাঁপর ভেঁজেছিল।

গজগোবিন্দ হো হো করে হেসে বলে উঠল, তুঁই দেখছি এঁক রঁকমই রঁয়ে গেঁলি। মেলার বাঁজারের পাঁপরভাঁজা দেঁখলে আঁর কাঁন্ডজ্ঞান থাঁকে না।

হাসতে হাসতে আহ্লাদের চোটে গজগোবিন্দ ভীমের গদার মতো দুখানা হাত মেলে জড়িয়ে ধরল বটকেষ্টকে। সংগে সংগে বটকেষ্টও তার লিকলিকে হাত দুটো বাড়িয়ে জাপটে ধরল গজুকে। তা ফল দুজনের একই হলো।

'খুস' করে একটু হাওয়া খেলে গেল দু'জনের মধ্যে। দুজনেই তো একটু হাওয়াই জাপটে ধরেছে।

সাঁকো দিয়ে হুড়মুড়িয়ে অনেকগুলো লোক চলে এল। বটকেষ্ট আর গজগোবিন্দর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ধাক্কা অবিশ্যি লাগল না, তবে একটা ডিসটার্বেনস্ তো বটে!

বটকেষ্ট বলল, চঁ গঁজু, আঁমার ওঁখানে। নিঁরিবিঁলিতে।

গজগোবিন্দ তাজ্জব হয়ে বলল, অ্যাঁ। এঁখেনে তোঁর নিজোঁস্বো ঘঁরবাঁড়ি আঁছে?

বটকেষ্ট একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, আঁছে বঁললে আঁছে, নাঁই বললে নাঁই। তোঁ নিঁরিবিঁলিটা আঁছে। নবকেঁষ্টর মা তোঁ সেখাঁনের। পৃঁথিবীর বাঁড়িতে।

গজগোবিন্দ একটু দুঃখিত হয়ে বলল, ওঁ। তাঁই তোঁ! আঁহা। তুঁই আঁসার আঁগে খুঁব কান্নাকাঁটি কঁরল তোঁর গিঁন্নী?

তাঁ কঁরছিল। শুঁনতে শুঁনতে চলে এইচি। বহুদূর অবধি সেঁই চেঁচানির আঁওয়াজ কাঁনে এঁসেছে।

দুজনে আসতে লাগল। তবে হাঁটার কষ্ট তো নেই। হাওয়ায় ভাসা ব্যাপার। অনেকখানিটা দূরে চলে এসে বটকেষ্ট বলল, আঁয়।

গজগোবিন্দ অবাক হয়ে বলল, এঁই বাঁড়িটা আঁগে দেঁখেছি মনে হঁচ্ছে।

তাঁ হঁতেই পাঁরে। এঁটা আঁমার বঁর্ধমানের দেঁশের বাঁড়িটার প্যাঁটার্নেরঁ। ওঁখানে যাঁরা ভঁদ্দর হঁয়ে কাঁটিয়ে এঁসেছে তাঁদেঁরকে এঁমনটা দেঁওয়া হয়। গুঁড্ 'কন্‌ডাঁকটেঁর' প্রাঁইজ আঁর কিঁ!

কিছু গাছপালার পাশ দিয়ে দরজায় চলে এল বটকেষ্ট বন্ধুকে নিয়ে।

[বিঃ দ্রঃ– দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, প্রেসের ভাঁড়ারে 'চন্দ্রবিন্দু' অক্ষরটির শর্ট পড়ে যাওয়ায়, এদের কথোপকথনে আর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া সম্ভব হবে না।]

গজগোবিন্দ কলেজে পাঠকালে একবার বটকেষ্টর দেশের বাড়িতে গিয়েছিল। এখন দেখে অবাক হয়ে গেল, ঠিক যেমন যেমন দেখেছিল সেই রকমই ব্যবস্হা। উঠোনে কুয়ো, কুয়োয় কপিকল লাগানো, পাশে ঘটি বালতি।

দাওয়ার ধারে একখানা বড় চৌকি আর খান দুই তিন জলচৌকি পাতা। অর্থাৎ এটাই ড্রইংরুম।

বটকেষ্ট বলল, হাতমুখ ধুবি?

গজগোবিন্দ বলল, নাঃ। আসার আগে এইসা চান করিয়েছে, সর্দি হয়ে গেছে। বসি আয়।

চৌকিটায় বসল দু'জনে।

বটকেষ্ট বলল, খাবি কিছু?

গজগোবিন্দ বলল, তা পেলে মন্দ হয় না।

কী খাবি বল?

কী আছে তোর?

কিছুই নেই, আবার সবই আছে। যা চাইবি, পেয়ে যাবি।

গজগোবিন্দ যোশ হয়ে বসে বলল, ব্যাপারটা কী বল তো?

ব্যাপারটা এইই। যা চাই মনে করবি, সামনে এসে যাবে। তবে–

একটু দুঃখুদুঃখু আর মজা মজা হাসি হাসল বটকেষ্ট।

কী হল রে বটা? 'তবে' বলে হাসলি যে?

বটকেষ্ট বলল, হাসছি এই জন্যে খেলে তুই টের পাবি না। খাচ্ছিস, খেলি।

অ্যাঁ।

সেই তো। এই যে তখন তোতে আমাতে কোলাকুলি হলো। হাতে বুকে টের পেয়েছিলি কিছু?

গজগোবিন্দ আস্তে মাথা নাড়ল।

হুঁ। ঠিক সেই রকমই। দেখ হাতে হাতেই। তা তুই তো মিষ্টির যম ছিলি, মিষ্টিরই অর্ডার দিই?

তাই দে।

বটকেষ্ট হাতটা একবার উঁচু করে হাতছানি দেওয়ার মতো ভংগীতে বলল, এই যে শুনছেন? বড় এক থালায় নবীনের রসগোল্লা গাংগুরামের চমচম গিরিশের কড়াপাক কল্পতরুর অমৃতি আর তিতু ময়রার রসমালাই পাঠিয়ে দিন তো। বেশ বড় সাইজের থালা নেবেন। আর সব জিনিস চারটে চারটে দেবেন।

গজ বলল, ইয়ে বটা, চিত্রকূট হবে না? আমাদের ঝামাপুকুর লেনের মোড়ে হলধরের দোকানে যে পেল্লায় সাইজের চিত্রকূট বানাতো? অবিশ্যি দামটা একটু বেশী। বোধহয় দুটাকা করে। তবে কী ফাস্ট ক্লাশ।

দামের জন্যে ভাবতে হবে না।

গলাটা একটু চড়িয়ে বলল বটকেষ্ট, ঝামাপুকুর লেনের হলধরের দোকানের চিত্রকূট চারখানা।

গজগোবিন্দ বলল, সবই চারখানা করে বলছিস, তুই খাবি না?

আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ জানিস না? ডায়াবিটিস।

গজ অবাক হয়ে বলল, এখনো, এখানে এসেও আছে সে সব?

থাকবে না? জানিস না স্বভাব যায় না মলে?

বাঃ, এটা কী স্বভাব? এটা তো রোগ!

ও দুই এক। দেখিস এই রোগ নিয়েই আবার জন্মাতে যাবো।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ মানে? দেখিসনি কেউ কেউ জন্ম পেটরোগা, কেউ কেউ জন্ম থেকেই লোহা খেয়ে হজম করে। কারুর বা জন্মকাল থেকেই বারোমাস কানকটকট মাথা ঝনঝন নাকে সর্দি। কারুর ওসবের বালাই মাত্র নেই। মানেটা কী?

মানে বলবার আগেই চোখের সামনে চৌকির ওপর এসে পড়ল বৃহৎ একখানা খাগড়াই কাঁসার থালা। তাতে পরিপাটি করে সাজানো অর্ডারি-মালগুলি।

গজগোবিন্দর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, কতকাল যে এসব জিনিস চোখে দেখিনি রে। মিলিটারীতে তো রুটি আর মাংস, ডাল আর চাপাটি ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু তুই একেবারে খাবি না? একলা খাব?

বটকেষ্ট হেসে বলল, খাব না বলে অর্ডার দিইনি। তবে দে দু একটা।

গজ বিপন্নভাবে বলল, দেবই বা কোথা থেকে? যা গুনেগুনে আনালি। তো যাকগে, ডায়াবেটিসের রুগী মিষ্টি না খাওয়াই ভালো। আমিই হা হা হা গপাগপ লপালপ! এ কী, আরে কী হলো? গেলো কোথায় খাবারগুলো?

তোর পেটের মধ্যে।

ধ্যাৎ। কখন? খেলাম কই?

গপাগপ মুখে পুরলি না?

গজ মনমরা ভাবে বলল, পুরলাম, তাই না? কিন্তু জিভ জানতে পারল কই?

পায় না!

বটকেষ্ট বলল, ওই দুঃখে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শুধু হাওয়া খেয়ে থাকি। কী হবে মিথ্যে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে?

ঋণের বোঝা মানে? এসব ধার করে নিলি না কি?

বটকেষ্ট হেসে বলল, তবে? এই ধার করে রাখলাম, পরের জন্মে শোধ করতে হবে!

গজগোবিন্দ এখানে নবাগত, এপারের হালচাল কিছু জানে না। অবাক হয়ে বলল, পরের জন্মে? কি করে শোধ করবি? এইসব দোকান থাকবে?

থাকবে না আবার? পরের জেনারেশান কি দোকানে মিষ্টি খাওয়া ছাড়বে? তার পরের জেনারেশান?

গজ বলল, কিন্তু এখনকার লোকগুলো কী বেঁচে থাকবে তোর ধার শোধ নিতে?

আরে সে তো নিশ্চয় থাকবে না। তবে ওর নাতি-পুতি গিন্নী-পুণ্যি কেউতো থাকবেই, তাদের দেব।

গজর হাঁ বেড়ে যাচ্ছে। তারা তোকে চিনতে পারবে?

চিনবে না। তবে না পারলেও কিছু এসে যাবে না। একজন্মের পাওনাদার সাতজন্ম পিছনে ধাওয়া করে ফেরে। আদায় না করে ছাড়ে না।

বটা!

কী?

তুই এত শিখলি কী করে?

এই লোকমুখে শুনে শুনে। সবাই তাদের এক্সপিরিয়েন্সের ফল শোনাতে ব্যস্ত।

গজগোবিন্দ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, এটাই তাহলে পরলোক? আমরা মরে গেছি?

শুনে হোহো করে হেসে উঠল বটকেষ্ট।

এতক্ষণে বুঝলি? দশবছর মিলিটারীতে থেকে তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি ভোতা মেরে গেছে।

গজগোবিন্দ বলল, তাই হবে। তবে চল তোর এই পরলোকটা একটু বেড়িয়ে দেখি।

দূর! কোনো চার্ম নেই। সবই তো মরা। বাগানটাগানগুলোয় সেই যে কোন কালে ফুলফল ধরে আছে, সে আর ঝরেও না, শুকোয়ও না। নদীতে বান ডাকে না, পাহাড়ে ধস্ নামে না। শহরে লোডশেডিং হয় না, বর্ষায় রাস্তায় জল জমে না, কোথাও কোনো কলকব্জা বিগড়োয় না, জামা জুতো ছেঁড়ে না–

গজ উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বলে, আরে সাবাস। এ যে দারুণ সুখের জায়গা রে।

দু-দশদিন থাক, বুঝবি ঠ্যালা। সুখে অরুচি ধরে যাবে। তার চে' তুই সেখানের গপ্পো বল। সদ্য এলি। সদ্যই দেখে এলি।

গজগোবিন্দ হতাশ হয়ে বলল, ওখানের আর কী গপ্প। মরছি তা টের পেয়েছি? কোথায় কোনখানে একটা বোমা পড়ল, ধারেকাছেই নয়। শব্দে বুকটা কেমন ধড়মড়িয়ে উঠল, জ্ঞান হারিয়ে গেল। কে জানে কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, চেনা জগৎটা কোথায় হারিয়ে গেছে। মস্ত একটা নদী, তাতে লম্বা সাঁকো। বোকার মতো সেই সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে আছি।....তারপরই হঠাৎ তোকে দেখে যেন বেঁচে গেলাম।

বটকেষ্ট আবার হেসে অস্থির।

বেঁচেই গেলি বটে। তো পৃথিবীর জন্যে মন কেমন করছে না তোর? যেতে ইচ্ছে করছে না?

করছে রে, খুব করছে। হঠাৎ আচমকা চলে আসতে হলো! বৌ ছেলেমেয়েকে লিখেছিলাম সামনের মাসে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছি। হলো না। তারা খুবই মনোকষ্টে আছে তো? একটিবার যদি ঘুরে আসতে পারতাম!

বটকেষ্ট বলে ওঠে, ঘুরে আসা যায়। তবে ভাবছিস তারা তাহলে আহ্লাদে ভাসবে, কেমন? ওই আনন্দেই থাকো। যাও না। গিয়ে দ্যাখোগে। গেলে দেখেই আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে, ওঝা ডাকবে, ভূত ছাড়ানোর মন্তর পড়ে বাড়িতে সর্ষে পড়া ছড়াবে, দরজায় দরজায় আমনাম লিখে রাখবে।

কে বলেছে তোকে এসব?

গজগোবিন্দ তার ভীমের গদার মতো হাতের থাবাটা দিয়ে চৌকিতে একটা ঘুষি মারল! শব্দ-টব্দ হলো না, শুধু ঘুষিটা উঠে এলো হুস করে।

বটকেষ্ট বলল, বলেছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। আমার যে গিন্নী আমার চলে আসার কালে ডাক ছেড়ে কেঁদে কেঁদে বলছিল, 'তোমায় না দেখে আমি কী করে থাকবো গো–কী করে বাঁচবো গো'–তিনিই যেই না ভরসন্ধ্যায় বাইরের জানলায় আমায় একটু দেখেছেন, সেই বিকট চীৎকার করতে করতে সে ঘর ছেড়ে চম্পট। ছেলেটার পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম, ছেলে বলে উঠল, 'বাবা! প্লীজ্। দয়া করে তুমি আমাদের মায়া ত্যাগ করো!' ....বলেই ফটাফট ঘরের তিন তিনটে আলো জ্বেলে দিয়ে চেঁচিয়ে নামতা পড়া শুরু করে দিল,'আম দুই সাড়ে তিন! অমাবস্যে ঘোড়ার ডিম।'

শুনে গজ তো হাঁ।

হঠাৎ এটা বলতে বসল কেন?

বুঝছিস না? ইয়াংম্যান। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান। প্রত্যক্ষে 'আম'নাম করতে লজ্জা! তাই ওই কান ঘুরিয়ে নাকে হাত।

গজ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে বলছিস গিয়ে কোনো লাভ নেই।

লাভ ওই অভিজ্ঞতা। যতক্ষণ তুমি মানুষ, ততক্ষণ সবাই তোমার 'আপন', যেই তুমি 'ভূত' কেউ তোমার নয়।

কী? আমরা এখন ভূত?

গজ মিলিটারী মেজাজে চড়ে উঠল।

বটকেষ্ট বলল, 'ভূত' বলতে দুঃখু হয়, বলতে পারিস প্রেতাত্মা।

গজগোবিন্দ হতাশ গলায় বলল, নাঃ। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। একটু ঘুমিয়ে নিই। দারুণ ঘুম পাচ্ছে।

বটকেষ্ট লবডঙ্কা নেড়ে বলল, ওই 'পাবে'। হবে না।

হবে না?

না। এখানে নিদ্রাজাগরণ বলে কিছু নেই। কিম্ভূতকিমাকার একটা অবস্থা রে গজু। খিদের জ্বালা নেই,– খাওয়ার সুখ নেই। রোগ ব্যাধির যন্ত্রণা নেই, আবার সুস্থ স্বাস্থ্যের আরামও নেই। দেহ আছে দেহ নেই।

গজগোবিন্দ বলে উঠল–'খিদের জ্বালা নেই' সেটা তো একটা শান্তি রে বটু। খিদের জ্বালার বাড়া তো দুঃখ নেই।

কী যে বলিস গজু। খিদের জ্বালা না থাকলে, খাওয়ার সুখটা পাবি? যেটা জীবনের সবচে' সুখ।

তাহলে–

তাহলে বলে কিছু বলতে যাচ্ছিল গজু, হঠাৎ একটা কেলে কুচ্ছিৎ খ্যাকশেয়ালীমুখো লোক এসে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, এই যে গজগোবিন্দ ডাক্তার কে?

এই তো।

নিজের বুকে হাত চাপড়ালো গজ। মানে ভাবলো হাতটা চাপড়েছে।

লোকটা বলল, তা এসেছো তো অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ফ্রেন্ডের সঙ্গে আড্ডা মারা হচ্ছে যে! ডিউটি দিতে হবে না?

ডিউটি।

গজ মিলিটারী। চড়ে উঠে বলল, এখানে আবার ডিউটি কিসের?

অ্যা ডিউটি নাই? ওরে আমার চাঁদুরে! গরমেন্টের রাজত্বে বাস করবে, ডিউটি দিতে হবে না?

এসে পড়ল বৃহৎ একখানা খাড়গাই কাঁসার থালা

গজ চেঁচিয়ে বলল, বটা। ঠিক?

বটকেষ্ট বলল, খুব ঠিক রে ভাই!

তো কাজটা কী?

লোকটা বলল, 'কী তা' গিয়েই দেখতে পাবে। পিথিবীতে যে যা করেছে, করতো, এখানেও তাই করতে হবে। ধোবাকে রাতদিন ধোবার পাটে কাপড় কাচতে হবে, নাপতেকে রাতদিন লোকের গোঁপদাড়ি চাঁচতে হবে। কুমোরকে রাতদিন চাক ঘোরাতে হবে। কলুকে রাতদিন ঘানি ঘোরাতে হবে। কামারকে রাতদিন লোহা পেটাতে হবে। ছুতোরকে–

বুঝলাম। গজগোবিন্দ বলে উঠল। আর আমাকে?

তোমাকে?

লোকটা মিচকে হাসি হেসে বলল, তোমায় দিনভোর রুগীর নাড়ি টিপতে হবে।

তো এখানে তো রোগ-ব্যাধিই নেই শুনলাম।

নাইবা থাকল। তা বলে ডিউটি ফাঁকি দেবে নাকি? বলি ভূতের 'ব্যাগার খাটা' বলে কথা শোনো নাই কখনো? 'ভূতো খাটুনি'? এই যে তোমার বন্ধুবাবু, রেল কোম্পানীর মালবাবু ছিল না? তো ওনার ডিউটি রাতদিন মাল ওজন আর তার হিসেব রাখা। তবে লোকটা মহা ফাঁকিবাজ। একদণ্ডে কাজ সেরে ওই নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে।

ও, ওই যেখান দিয়ে এলাম? বিশাল নদী! তো নদীটার নাম কী হে?

লোকটা নিজের কপাল চাপড়ে বলল, হায় কপাল। তাও বোঝোনি? বেশি পন্ডিতদের এই হয়। বৈতরণী গো। বৈতরণী।

অ্যা।

গজ যেন নতুন করে শক্ খেল। বৈতরণী পার হয়ে চলে এসেছি? তার মানে সত্যি মারা গেছি? সত্যি ভূত হয়ে গেছি।

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে গজকে ধাক্কা দিয়ে বলল, চল চল। প্রেথমে 'স্বরূপ ঘরে' ধোলাই হবে চল। তবেই টের পাবে।

গজগোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে বলল, 'স্বরূপ ঘর' কী রে বটা? কী হয় সেখানে?

বটকেষ্ট হঠাৎ মিচকি হেসে বলল, এই যে এই হয়। আঁ আঁ আঁ আঁক করে ছুট মারল গজগোবিন্দ।

'স্বরূপ ঘরে ধোলাই-এর' পরে কী হয়?

আসল চেহারাটি হয়।

মুলো মুলো দাঁত, কুলো কুলো কান, উল্টো উল্টো পা, জটা জটা চুল, আর কেলে কম্বলে গায়ের রং।

ধোলাই একবার হতেই হবে, মেকআপটাও নিতে হবে। তবে সেটা প্রকাশ করা তোমার ইচ্ছে সাপেক্ষ।

লোকটার সঙ্গে যেতে যেতে গজগোবিন্দ বলল, আমার থাকার জায়গাটা কোথায়?

কেন, হসপিটাল এরিয়ায়।

লোকটার একটু ইংরিজি বুলি প্রবণতা আছে।

গজ চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে যেতে লাগল। ঘরবাড়ি বাগান পুকুর সবই সাধারণ, সবই যেন দেখা দেখা!

লোকটা এগিয়ে যাচ্ছিল, গজ ডাক্তার জোর পায়ে হেঁটে তাকে ধরে ফেলে বলল, এইসব জায়গা কী এরিয়া?

লোকটা অবজ্ঞায় নাক কুচকে বলল, এইসব মিড্‌ল ক্লাসের!

ওর অবজ্ঞার ভাবে রাগ এলেও গজ বুঝল, এর কাছ থেকেই সব তথ্য জানা যাবে। আস্তে বলল, তো ভাই শুনেছি– পরলোকে নাকি 'স্বর্গ' আছে 'নরক' আছে, সেসব কই?

লোকটা আরো অবজ্ঞায় বলল, আছেই তো। কে বলল নেই? তো তোমার চোখের সামনে ঝুলে থাকবে নাকি?

সে তো বটেই, সে তো বটেই। তো কোথায় কোন রাজ্যে আছে?

লোকটা গোঁফে তা দিয়ে বলল, এই রাজ্যেই আছে। চিত্রগুপ্তর রাজ্যে। স্বর্গটা হচ্ছে গিয়ে 'পশ এরিয়া'। মানে বড়মানুষদের পাড়া। সেখানে অভাব নেই, অসুবিধে নেই, জ্বালা নেই। শুধু ঐশ্বর্য জৌলুস, আরাম আয়েস, আর যা ইচ্ছে করার স্বাধীনতা।

ওঃ। আর নরক?

সে হচ্ছে গিয়ে বস্তি ঝুপড়ি নোংরা কাদা পচানালা পেঁকো পুকুর, আর হতভাগা সব লোকেদের চেঁচামেচি। তো তোমার আবার স্বর্গ-নরকের খোঁজ কেন? তোমার পাসপোর্ট তো এই মিড্‌লম্যান এলাকায়। আছে নাকি কেউ আপনজন স্বর্গে কিংবা নরকে? তো আমায় যদি টুপাইস দিয়ে দাও একবার দেখা করিয়ে আনতে পারি।

গজ বলল, না আমার কেউ ওসব জায়গায় নেই। থাকলে এখানেই আছে। তো নাম বললে খুঁজে দিতে পারো?

ও তুমি নিজেই খুঁজে পাবে। মেলা বোকো না। যত্ত সব ঝামেলা। চলো চলো।

তো সেই গেল তো গেল।

বটকেষ্ট রোজ ভাবে, কোথায় নিয়ে গেল গজকে! আর কি কখনো দেখা হবে? এই যে কত আপনজন এসেছে, এ যাবৎ কাউকে কি দেখতে পেয়েছে? ঠাকুর্দাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। বড় ভালবাসতো বুড়ো বটুকে। তো কে জানে সে এখন আবার সেতু পার হয়ে চলে গিয়ে কারুর ঘরে 'নতুন খোকা' হয়ে জন্মে বসে আছে কিনা।

তা শুধু কি ঠাকুর্দা? আরো কত জনই তো এসেছে বটুর জীবৎকালে। কাকেই বা দেখতে পেয়েছে? একবার সেজ পিসেকে দেখেছিল, একবার নতুন জ্যাঠাকে, আর একবার পাড়ার শশীবাবুকে। তো শশীবাবু তো চোখাচোখি হতেই অচেনার ভান করে কেটে পড়লেন। পড়তেই পারেন। এখানে আসার আগে বটকেষ্টর কাছে বেশ কিছু টাকা ধার করেছিলেন কিনা, বিজনেস করব বলে।

তো সে যাক। গজাটার কী হলো?

দিন মাস বছরের হিসেব নেই, হঠাৎ একদিন দেখতে পেল গজগোবিন্দ আসছে দুহাত তুলে নদের নিমাইয়ের ভংগীতে।

বটা আছিস? ওঃ, কতদিন থেকে খুঁজছি। তোর এই ঘরও হারিয়ে মরেছিলাম। হঠাৎ আজ দূর থেকে দেখলাম তুই বসে আছিস। তো সে যাক–বটা স্কুল না গিয়ে তুই কবিতা লিখতিস না? আর কলেজ লাইফে নাটক?

বটকেষ্ট অবাক হয়ে বলল, লিখতাম তো। তা এখন কী?

বলছি–আবার লেখ। আমি তোকে মেটিরিয়ালস দেবো।

বটকেষ্ট হা হা করে হেসে উঠল, এখানে বসে কাব্য নাটক লেখা হবে?

না হবার কী আছে? তুই যদি লেখা ছেড়ে রেলগুদামের মালবাবু বনে না যেতিস এখানে তো তোকে ওই লিখতেই হতো রাতদিন। দেখলাম তো ঘাড় গুঁজে লিখেই চলেছে কত কতজন। বলল, এখন নাকি ভীষণ চাপ, যতসব শারদীয়া সংখ্যা বেরোনোর মুখ। তো তুই একবার পুরনো অভ্যেসটা ঝালিয়ে নে। তখন তো তোর লেখাগুলো নিয়ে কাগজের সম্পাদকদের দোরে দোরে ঘুরতিস, আর মুখ শুকিয়ে ফিরে আসতিস। এখন দ্যাখ্।

বটকেষ্ট হতাশ গলায় বলল, এখনো তাই হবে।

হবে না।

গজগোবিন্দ শূন্যে একটা তুলোর ঘুষি মেরে বলল, শুনলাম, নরলোকে নাকি এখন 'পরলোক'-এর খবরের জন্যে খুব চাহিদা। চটপট লিখে ফেলতে পারলে এই সামনের পুজোতেই কোনো একখানা গাবদা-গোবদা পত্রিকায় লাগিয়ে দিতে পারা যাবে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তুই এখানে এসে ওই মালই ওজন করেছিস, আর সেতুর লোক গুনেছিস। এখানের তথ্য-টত্য কিছুর ধার ধারিসনি। তো একখানা ঘুঘু রিপোর্টারের সংগে বেশ পটিয়ে নিয়ে, আর নিজে ঘুরে ঘুরে অনেক সব মালমশলা জোগাড় করে ফেলেছি। বইয়ের নামও ঠিক করে ফেলেছি। তবে আমার তো লেখার অভ্যেস নেই! তুই কলমটা ধর।

বটকেষ্টর প্রাণটা একটু হাহাকার করে উঠল। আহা! অভ্যেসটা যদি রাখতো। তবে বলা যায় না। লোকে তো বলে, সাঁতার শিখলে আর সাইকেল চালাতে শিখলে লোকে নাকি জীবনে মরণে ভোলে না। তা কলম চালানোটাও কি–

কাঁপা গলায় বলল, বলছিস পারব?

আলবৎ পারবি!

কিন্তু ছাপবে কে? পড়বে কে?

হ্যাঁ, সেটাই তো কথা।

গজ বলল, তার জন্যে অবশ্য আমাদের নরলোকে নামতে হবে। কোনো একটা গাবদা ম্যাগাজিনের এডিটারকে কায়দা করতে হবে। তো তার জন্যে ভাবনা নেই। হয়ে যাবে। তেমন বেকায়দা করে একবার স্বরূপটা দেখিয়ে দেওয়া যাবে। ওঃ

একবার লাগাতে পারলে—একদম হট্ কেক!

বটকেষ্ট বলল, কী করে বুঝছিস?

আরে জানিস না জ্যান্ত মানুষদের চিরটাকালই এই মরে যাওয়াদের সম্বন্ধে অগাধ কৌতূহল। প্ল্যানচেটে আত্মা নামায়, খুঁজে খুঁজে 'পরলোক' তত্ত্বের বই পড়ে। চিরটিকাল! তোর মনে আছে, আমাদের ইস্কুলের হেড্‌স্যার 'পরলোকের কথা' বলে একটা সিরিজ লিখতেন? কী তার ডিম্যান্ড! অথচ সবই অন্যের বই থেকে টুকলিফাই! গাদাগাদা বই জোগাড় করতেন—ইংরিজি বাংলা—

খুব মনে আছে।

তবেই বোঝ? টুকে মেরে বাহাদুরী! আর আমাদের এ বই একদম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ!!

কিন্তু গজু, লেখার সরঞ্জাম?

গজু মুচকি হেসে বলে, সে কি আর যোগাড় না করে বলছি? এই দ্যাখ্ একটা উঠতি কবির টেবিল থেকে বাগিয়ে আনলাম। দিস্তে দিস্তে কাগজ মজুত রেখেছে, গোছা গোছা ডট্‌পেন! এন্তার লিখছে আর ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিচ্ছে। লিখছে আর ছিঁড়ছে। ছিঁড়ছে আর লিখছে। ভ্রূক্ষেপও নেই যে টেবিল থেকে একদিস্তে কাগজ আর একগোছা ডট্‌পেন উপে গেল। এই নে। নাটকাকারে লেখ, ঝপাঝপ এগিয়ে যাবে।

বটকেষ্টকে ধরে দিল গজগোবিন্দ সেই বাগিয়ে আনা কাগজ কলম।

গজু রে—

বটু বলে উঠল—ওরে আমার খাস্তাগজা, জিবেগজা, নোনতা গজা, মশলা গজা! তোকে আমি বলেছিলাম, বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। আয় একটু কোলাকুলি করি, যাক গে কাজ নেই। তো কী যেন বলছিলি, নামটা ঠিক করে ফেলেছিস!

ফেলেছি! নাম হবে 'পরলোকের হাঁড়ির খবর!! প্রত্যক্ষদর্শীর কলমে—'!

'পরলোকের' একটা গুণ ইচ্ছে মাত্রই কাজ হয়ে যায়। চটপট, ঝটপট।

কাজেই বই শেষ হতে দেরি হলো না।

বটু বলল, তবে আর দেরি করা ঠিক নয়, অ্যাঁ। শারদীয়া সংখ্যার মরসুম তো এসেই গেল।

গজু বলল, তবে চল। কিন্তু নাটকের প্রথম দৃশ্যটা একটু দেখা হবে না? আমি গড়গড়িয়ে বলে গেলাম, তুই খসখসিয়ে লিখে গেলি। জিনিসটা কী দাঁড়াল—

বটকেষ্ট সেই দিস্তেভর্তি কাগজ বাগিয়ে মুড়ে ফেলেছে। আর খুলল না। বলল, গোড়াটা? মুখস্থই বলছি। প্রথম দৃশ্য—পরলোকের মহাফেজখানা!

ঘরে ঘরে মন্ত্রী উপমন্ত্রী, আমলা-সামলা, এবং ঘরের বাইরে অপেক্ষারত যত হ্যাংলা ক্যাংলা ন্যাংলা! তাদের আবেদন, পরলোকের পিওন চাপরাশী পাহারাদার ইত্যাদিরা সাধারণদের প্রতি বড়ই দুর্ব্যবহার করে। দুরছাই করে। নিজেদেরকে লাট সাহেব ভাবে—

গজু চঞ্চল হয়ে বলে, থাক রে বটা। শুনতে গেলে আঠা ধরে যাবে, নেশা লেগে যাবে। তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না। উঠে পড়া যাক।

উঠে পড়া মানেই হাওয়ায় ভেসে সেই নদীতীরে সেতুর মুখে।

কিন্তু সেতুর মুখের সামনে এক বিপত্তি।

দুটো মুস্কো কালো লোক বুলডগের মতো মুখে বলে উঠল, থামো থামো! যাচ্ছ কোথায় হে জোড় মানিক? বলি যাবার পাসপোর্ট আছে?

বটকেষ্ট ভয়ে ভয়ে গজুর দিকে তাকাল, কিন্তু গজুর নির্ভীক ভঙ্গী।

পাসপোর্ট আবার কী হে? আসার সময় তো এসব ঝমেলা হয়নি। সরো সরো।

সরার বদলে লোক দুটো ক্যাঁক করে দুজনকে ধরে ফেলে বলল, আসা আর যাওয়া এক হলো। আসার সময় ওখানকার অফিস থেকে রিলিজ অর্ডার হয়ে গিয়েছিল, আমাদের লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

জানি। ডাণ্ডস মারতে মারতে। তা বলে ভেবো না এখানের আইনকানুন আমি জানি না। সব জেনে ফেলেছি। পাসপোর্ট লাগবে তখন আবার যখন দুধের খোকা হয়ে ট্যা ট্যা করতে যাব। সে অনেক কাগজপত্র।

লোক দুটো বলল, সে হবে না। ছাড়া হবে না।

তার মানে টু পাইস চাই? কেমন? নড়তে চরতে টু পাইস। পাবে-টাবে না। এই যাচ্ছি তোমাদের এখানকার কীর্তিকাহিনী কাগজে ছাপিয়ে দিতে।

লোক দুটো ফস করে ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, কাগজের লোক? ও বাবা!

না, লেখক। বই লিখে নিয়ে যাচ্ছি ছাপাতে।

উরিব্বাস!

লোক দুটো হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে হাত কচলে বলে, তাহলে আমাদের 'কথা' একটু লিখে দেবেন স্যার।

তোমাদের আবার 'কথা' কিসের হে? দিব্যি যখন তখন লোককে ডাণ্ডস মারতে মারতে সাঁকো পার করে করে নিয়ে আসছ আর 'মাসল' বাগাচ্ছ। তোফাই তো আছো।

লোক দুটো অসন্তুষ্ট গলায় বলল, ওই তো। ওই দুঃখেই তো মরে আছি। হুকুমের চাকর, হুকুম মতোই চলতে হয়। তো এই নিকৃষ্ট কাজটায় আর মন নাই। যদি কাগজে লেখালিখি করে পিথিবীতে একটা চাকরি মেলে—

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা যাবে। এখন পথ ছাড়ো তো।

লোক দুটো তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয়।

ওরা দুই বন্ধু সাঁকো পার হয়ে চলে আসে।
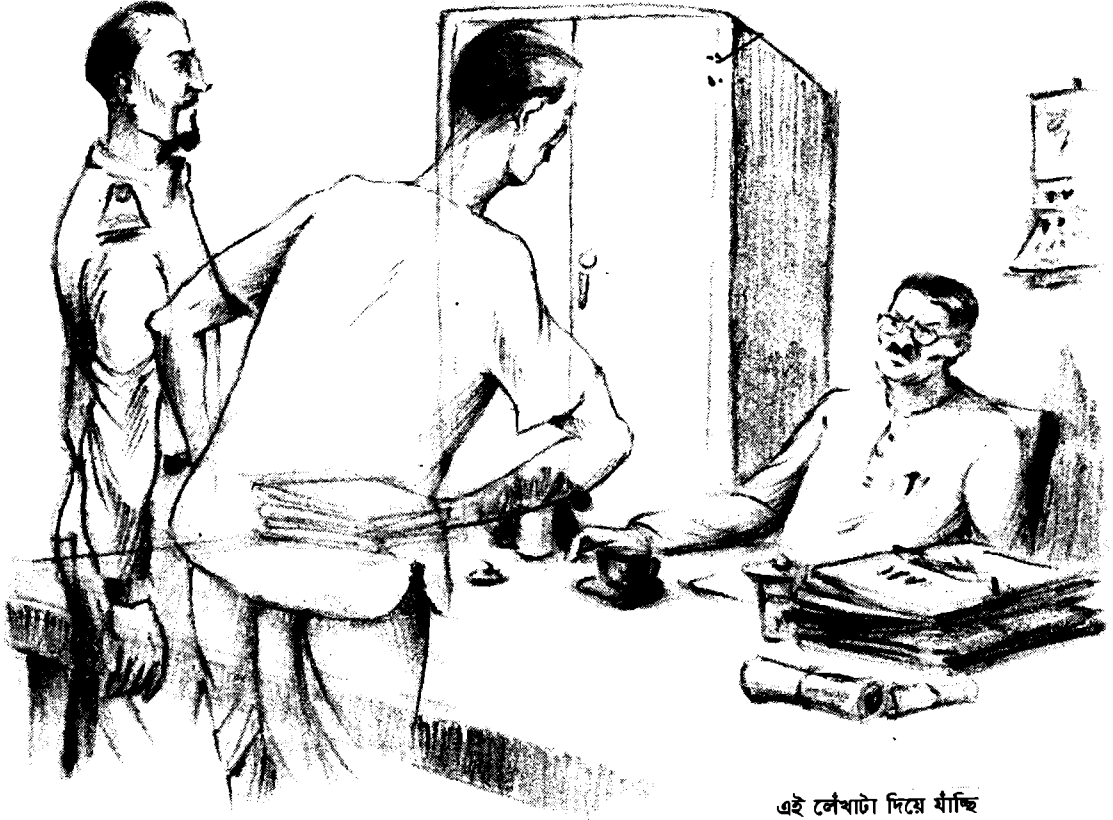
এই লেখাটা দিয়ে যাচ্ছি

তারপর বলে ওঠে, এখন কোন দিকে?

বটকেষ্ট বলে, কোন দিকে আবার? সোজা 'রণডঙ্কা' অফিসে। ব্যাটা সম্পাদক জন্মজীবনে আমার একটা লেখা ছাপেনি। সব অমনোনীত বলে ফেরৎ দিয়েছে। আবার কতগুলো ফেরৎ দেয়ওনি। ওকে দিয়েই এখন এই বই ছাপিয়ে নিতে হবে।

গজগোবিন্দ বলল, নিয়েছিস তো গুছিয়ে?

সে আর বলতে।

বিকেল চারটে।

'রণডঙ্কা' সম্পাদক খগেন ঘোষাল যথারীতি চেয়ারটা টেনে টেবিলের ধারে বসে ডিশ ঢাকা চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে 'আঃ' বলে ওঠবার বদলে বিশাল হাঁক পাড়লেন, বনমালী! এই বনমালী। এ কী দিয়ে গেছিস আমায়? চা না নিমের পাচন? বনমালী!

বনমালীর সাড়া পাওয়া গেল না। তার বদলে কোথা থেকে যেন একটা 'খি-খি খি-খি' হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

এর মানে? খগেন ঘোষালের চুল খাড়া হয়ে উঠল। এত সাহস হয়েছে ব্যাটার!

আবার হাঁক পাড়লেন, এই ব্যাটা বনমালী। বদমাশ শয়তান। আবার হাসি! চায়ে দুধ আর চিনি দিয়ে যা।

আবার হাসি। খি-খি-খি।

খগেন ঘোষাল এখন সচকিত হলেন। হঠাৎ এতোটা দুঃসাহস হবে বনমালীর? শব্দটা যেন ঘরের মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছে। দেওয়াল থেকে সীলিঙে, সীলিং থেকে দেওয়ালে।...নাকি জানলার বাইরে থেকে?

তবু আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন, বনমালী।

তখন সেই হাসিরাই জবাব দিল, বঁনমাঁলীর আঁশা ছাঁড়ুঁন! সেঁ এঁখঁন চোঁখ উঁল্টে হাঁত পাঁ খিঁচছে।

[বিঃ দ্রঃ—প্রেসে নতুন এক কেস 'চন্দ্রবিন্দু' এসে যাওয়ায় আর ঘাটতি পড়ছে না। যথাযথ কাজে লাগানো হচ্ছে।]

খগেন ঘোষাল সাহসী ব্যক্তি। তিনি কড়া গলায় বললেন, তোমরা কে হে? কোথা থেকে কথা বলছ?

আঁগ্যে এঁই আঁপনার সাঁমনে থেঁকেই। আঁপনি যঁদি চোঁখ থাঁকতে অন্ধ হঁন আঁমরা নাচাঁর। এঁই আঁপনাঁর ডাঁন দিঁকে আঁমি কঁবি বঁটকিষ্ট পাঁল। আঁর আঁপনার বাঁদিঁকে আঁমার বঁন্ধু

ডাক্তার গজগোবিন্দ খাসনবীশ!

খগেন ঘোষাল অনুভব করলেন তাঁর দুটো হাতের ওপর দিয়ে একটা হিমালয়ের হিমেল হাওয়া বয়ে গেল।

খগেন ঘোষাল কোনোমতে জামার মধ্যে থেকে পৈতেটা টেনে বার করে মনে মনে রামনাম জপ করতে করতে বললেন, কী উদ্দেশ্যে হঠাৎ আমার এখানে?

দুটো গলা থেকে বা দুটো নাক থেকে একসঙ্গে একটা কথা উচ্চারিত হলো, উঁদ্দেশ্যঁ মহঁৎ। 'রণডঙ্কা'র শাঁরদীয়ার জন্যে এঁকখানা বিঁশ্বের সেঁরা কৌতুক-নাট্য এঁনেছি, পঁরলোঁকের হাঁড়ির খঁবঁর। এঁটা এঁ বঁছর পুঁজো সংখ্যা রণডঙ্কায় ছাঁপিঁয়ে দেঁবেঁন।

ছাঁপিয়ে দেঁবেঁন!

শুনেই খগেন ঘোষালের সম্পাদক সত্তাটি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে ওঠেন, ছাপিয়ে দেব? মামাবাড়ির আবদার? পুজো সংখ্যার সব কমপ্লীট হয়ে গেছে, বুঝলেন? কেটে পড়ুন! কেটে পড়ুন।

কী! কেঁটে পঁড়ঁব? অঁত সঁস্তা নাঁ। তুঁমি বুঁড়ো খগেন ঘোঁষাঁল। একদাঁ আঁমায় অনেঁক কাঁট মাঁরিয়েঁছো। আঁর ছাঁড়ান না। দেঁখিঁস বুঁড়ো, এ লেঁখা বাঁজাঁরে পঁড়তে পাঁবে না। হট কেঁকেঁর মতন উঠে যাঁবে। শাঁরদীয় 'রণডঙ্কা' আঁবার ছাঁপাঁতে হঁবে।

'আপনি' থেকে 'তুমি', তুমি থেকে 'তুই'।

মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে তো?

খগেন ঘোষাল চেঁচিয়ে ওঠেন, পুলিশ। পুলিশ। কনস্টেবল, কনস্টেবল। পাহারোলা। পাহারোলা। ও সি! ও সি! মুখ্যমন্ত্রী! মুখ্যমন্ত্রী! রাজ্যপাল! রাজ্যপাল! জৈল সিং! জৈল সিং! রাজীব! রাজীব!

হেঁ হেঁ, খেঁ খেঁ হিঁক্ হিঁক্, হঠাৎ যেন অদৃশ্য শূন্যে দুটো গলা দুইয়ে শূন্য কুড়িটা হয়ে হাসির বান ডাকিয়ে দেয়, ওঁ বঁটা! তোঁর এঁডিটাঁর দাঁদু অ্যাঁতো নার্ভাস? শুঁধু বাঁণী শুঁনেই এই। চোঁকে দেঁখলে তোঁ-তাঁ থাঁকগেঁ! আঁপনাঁকে আর ভির্মি খাঁওয়াবোঁ না। এঁই লেঁখাটা দিঁয়ে যাঁচ্ছি, ছাঁপা হঁওয়া চাঁই। দেঁ বঁটা, দিঁয়ে দেঁ। থঁলিটা উঁপুড় কঁরে দিঁয়ে চঁটপঁট চঁলে যাঁই।

ব্যস থলি উপুড় করে বটকেস্ট! আর সেই 'লেখা'রা খগেন ঘোষালের গা মাথা টেবিল চেয়ারের ওপর ঝরঝরিয়ে ঝরে উপচে ছড়িয়ে পড়ে।

কী এ? কী এ? আ আ আ। এ সব কী?

চেয়ার ঠেলে টেবিল উল্টে চায়ের পেয়ালা ভেঙে কালির দোয়াত ছিটকিয়ে সারাঘরে দাপাদাপি করে বেড়ান খগেন ঘোষাল আর্তনাদ করতে করতে, বনমালী। বনমালী! তুই কি মরে গেছিস! ওরে বাবারে! এগুলো কিরে?

ক্যাঁনো? এঁই তোঁ আঁমাদের কাঁলজঁয়ী কৌতুক-নাঁটক 'পঁরলোঁকেঁর হাঁড়ির খঁবঁর-এর ম্যাঁনাঁসক্রীপট্' পিঁন কঁরা হঁয়নি, গুঁছিয়ে নেঁবেন। ছাঁপাবেন তোঁ দাঁদাঁ, অ্যাঁ-! না ছাঁপালেঁ কিন্তু-

না ছাপলে কী হবে তা আর শুনতে পান না খগেন ঘোষাল। কারণ? কারণ তখন-

চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে একজোড়া 'স্বরূপ'। দুপ্রস্থ মূলোর সারিতে ফিক ফিক হাসি, আর দুখানা দুখানা চারখানা 'কুলো'র লটপটানি।

ভির্মি খেয়েই দমাস করে পড়ে যান খগেন ঘোষাল। ফেনা-ওঠা মুখে একটি আওয়াজ বেরোয়, ফুঃ ফুঃ ফুঃ লিঃ শ্।

ওরা সাঁকোয় উঠে হাস্যবদনে বলে, নাঁটকটা যঁদি স্টেঁজে নাঁমায় খুঁব জম্পেঁস হঁবে, কী বঁলিস?

এদিকে নরলোকের হাঁড়ির খবর এই-

'পুলিশ কোনো কাজের নয়' একথা ভুল। ঘন্টাকয়েক পরেই এসেছিল পুলিশ। যা করবার করেও ছিল। চটপট। পরদিনই কাগজে কাগজে খবর, 'রণডঙ্কা পত্রিকা' অফিসে লন্ডভন্ড কান্ড!!...গতকাল বিকালে দুইজন দুর্বৃত্ত 'ভূতের ছদ্মবেশে' পত্রিকা অফিসে বলপূর্বক হানা দিয়া তান্ডব নৃত্য শুরু করে। যথেচ্ছ ভাঙচুর ও মারপিটের পর সম্পাদককে শাসাইয়া রাশি রাশি হিজিবিজি আঁকিজুঁকি কাটা কাগজের টুকরা সর্বত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া রহস্যজনক ভাবে অন্তর্ধান করে।

কাগজগুলি দেখিয়া মনে হয় কোনো সাংকেতিক ভাষায় লিখিত বিশেষ ইস্তাহার! দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত এই 'ইস্তাহারের কয়েকটি' নমুনা পাঠোদ্ধারের জন্য 'বিশেষজ্ঞ'-দিগের কাছে পাঠানো হইয়াছে।

আততায়ীদিগের উদ্দেশ্য বোঝা যাইতেছে না। কেহ ধরা পড়ে নাই।

সম্পাদক খগেন ঘোষাল ও বেয়ারা বনমালী দাস এখন হাসপাতালে।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

নীল মানুষের মন খারাপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গভীর জঙ্গল, এখানে মানুষ প্রায় আসেই না, দু'একজন কাঠুরে বা শিকারী দৈবাৎ এসে পড়লেও ভূতের ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে রটে গেছে যে ঐ জঙ্গলে ভূত আছে। কেউ কেউ বলে, ভূত নয়, ব্রহ্মদৈত্য।

এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে একটা হাইওয়ে গেছে, সেখান দিয়ে ট্রাক যায়, অন্য গাড়ি যায়। কিন্তু কোনো গাড়ি কখনো থামে না এই জায়গায়। বিশেষত একটা পাহাড়ের গা দিয়ে যখন যেতে হয়, তখন ড্রাইভাররা রামনাম জপ করে। ঐ পাহাড়ের আড়াল থেকে দিনে দুপুরেও একটা প্রকান্ড ভূতকে মুখ বাড়াতে নাকি দেখেছে কেউ কেউ।

সেই ভূত আসলে নীল মানুষ।

জঙ্গলের মধ্যে সংসার পেতে নীল মানুষ এমনিতে বেশ ভালোই আছে। তার ছোট্ট বন্ধু গুটুলি নানা রকম মজার কথা বলে। তাদের সেবা করবার জন্য রয়েছে তিন তিনটে কাজের লোক। রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। এরা কুটনো কোটে, রান্না করে, বাসন মাজে, পা টিপে দেয়। ঐ তিনজনকে দিয়ে গুটুলি আবার একটা পুকুরও কাটাচ্ছে। ওরা খন্তা-শাবল নিয়ে রোজ সকালে কয়েক ঘণ্টা করে পুকুর খোঁড়ার কাজ করে, কাছে দাঁড়িয়ে গুটুলি খবরদারি করে ওদের ওপর।

রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি আগে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। এখন তারা নীল মানুষের চেয়ে গুটুলিকেও কম ভয় পায় না। গুটুলির গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। এর মধ্যে ওরা পাঁচবার পালাবার চেষ্টা করেছে। পাঁচবারই গুটুলির বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে। প্রত্যেকবার ধরা পড়লেই ওদের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যায়।

সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে, তবু এক একদিন নীল মানুষ ছটফট করে ওঠে।

মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে সে কান্না কান্না

গলায় বলে, গুট্‌লি, ও গুট্‌লি! আমার কিছু ভালো লাগছে না!

গুট্‌লি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন, তোমার কী হলো, নীল মানুষ? শরীর খারাপ লাগছে?

নীল মানুষ একটা ঝড়ের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, শরীর নয়, মন! আমার তো কখনো শরীর খারাপ হয় না!

গুট্‌লি জিজ্ঞেস করলো, কেন তোমার মন খারাপ লাগছে? নতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

নীল মানুষ বললো, ধ্যুৎ! খাওয়ার কথা কে বলছে! দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকতে কারুর ভালো লাগে?

গুট্‌লি বললো, আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি এত বেঁটে বলে শহরে গেলেই লোকে আমাকে ঠাট্টা করে, মাথায় চাঁটি মারে, আমার জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। তার চেয়ে এই জঙ্গলই বেশ ভালো!

নীল মানুষ বললো, বেঁটে বলে তোমায় দেখে সবাই ঠাট্টা করে, আর এত লম্বা বলে আমায় দেখে সবাই ভয় পায়। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। আমার ইচ্ছে করে শহরে গিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, গান শুনতে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে।

গুট্‌লি বললো, সে আর তুমি এজন্মে পারবে না। তুমি তো শুধু লম্বা নও, তুমি যে তালগাছ। তুমি এখনও রোজ রোজ লম্বা হচ্ছো। তোমায় আমি প্রথম যে-রকম দেখেছিলুম, তারচেয়েও তুমি এখন বেশি লম্বা হয়ে গেছ। মাপলে বোধহয় দশ ফুটেরও বেশি হবে। তার ওপরে তোমার গায়ের রং একেবারে আকাশের মতন নীল, এমনকি তোমার জিভটা পর্যন্ত নীল! তোমায় দেখলে তো মানুষ ভয় পাবেই।

—আমি যদি শহরে গিয়ে সবার সামনে হাত জোড় করে বলি, ওগো, যদিও আমার শরীরটা এত লম্বা আর গায়ের রংটা অন্য রকম, কিন্তু আমি তোমাদের মতনই সাধারণ মানুষ! আমি কারুর ক্ষতি করতে চাই না!

—তোমার কথা শোনবার আগেই সবাই ভয়ে পালাবে। কিংবা শুনলেও বুঝতে পারবে না। তোমার গলার আওয়াজটা যে এখন জয়ঢাকের মতন হয়ে গেছে। আমিই শুধু বুঝতে পারি।

—যদি ফিসফিস করে বলি? হাঁটু গেড়ে বসে সবার কাছে ক্ষমা চাই?

—তা হলে ওরা তোমাকে বেঁধে চিড়িয়াখানায় ভরে দেবে!

—কেন?

–তোমাকে আর কেউ মানুষ বলে মানবে না! ভাববে অন্য কোনো জন্তু!

নীল মানুষ পাশ ফিরে হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, ওহো হো, কেন আমায় মানুষ বলে মানবে না? আমি মানুষ, মানুষ! ওহো হো, কতদিন ফুটবল খেলা দেখিনি। কতদিন ফুটবল খেলিনি! একসময় আমি ফুটবল খেলতে কী ভালোই না বাসতাম।

নীল মানুষের দু'চোখ দিয়ে কলের জলের মতন গলগল করে কান্না ঝরতে লাগলো।

গুটুলি একটা গামছা দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে দিতে বললো, আহা, কেঁদো না, কেঁদো না! লক্ষ্মী ছেলে, তোমার জন্য আমি ফুটবল এনে দেবো। তুমি এইখানেই ফুটবল খেলবে!

নীল মানুষ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, কার সংগে খেলবো? একা একা বুঝি ফুটবল খেলা যায়!

–ঐ রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি খেলবে তোমার সংগে।

–দূর দূর, ওরা তো ছিল ডাকাত, ওরা ফুটবল খেলার কী জানে?

–একেবারে জন্ম থেকেই তো ডাকাতি শুরু করেনি। ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছে নিশ্চয়ই!

–যারা ছোটবেলায় ফুটবল খেলে, তারা বড় হয়ে কখনো ডাকাত হয় না। ফুটবল খেললে মন ভালো হয়ে যায়।

–ওদের ডেকে জিজ্ঞেসই করা যাক না, ওরা ফুটবল খেলা জানে কি না!

ডাকা হলো রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে। ওরা জল-কাদা মাখা হাত-পা নিয়ে লাইন করে দাঁড়ালো সামনে।

নীল মানুষ শুয়েই আছে মাটিতে। গুটুলি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে জিজ্ঞেস করলে, অ্যাই, তোরা কেউ ফুটবল খেলা জানিস?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেল তিন ডাকাত।এ ওর মুখের দিকে তাকালো। হ্যাঁ কিংবা না কোন উত্তরটা দিলে ভালো হবে, তাই-ই বুঝতে পারছে না।

ন্যাড়া গুলগুলি ফস্ করে বলে ফেললো, হ্যাঁ। আমি অনেক ফুটবল খেলেছি। এ গ্রামে ও গ্রামে খেলতে গেছি।কত গোল দিয়েছি!

গুটুলি চোখ পাকিয়ে বললো, তা হলে লোকের পেটে ছুরি মারতে শিখলি কখন?

ন্যাড়া গুলগুলি লজ্জা পেয়ে কান চুলকে বললো, সে আমাকে অন্য একজন গুরু শিখিয়েছিল। কিন্তু ফুটবল খেলা আমি ভালোই জানি!

দামোদরই বা কম যাবে কেন। সে ঠোঁট উল্টে বললো, ফুটবল মানে ঐ গোল গোল বলে লাথি মারা তো? সে আমি অনেক লাথিয়েছি।

রঘু ওদের চেয়ে আর একটু বড় ডাকাত। সে বললো, ওরা আর কী খেলেছে। আমি আমাদের গ্রামে খেলুড়ে দলের সর্দার ছিলাম। আমার দলকে খেলার জন্য কত জায়গা থেকে ডেকে নিয়ে যেত। সে অবশ্য গোঁপ-দাড়ি ওঠবার আগের কথা।

গুটুলি বললো, আর গোঁপ-দাড়ি গজাবার পর থেকেই বুঝি ডাকাতি শুরু করলি!

রঘু লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে বললো, বারবার ঐ কথা বলে লজ্জা দাও কেন, গুটুলি দাদা! সে সব তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

গুটুলি বললো, ছেড়ে দিয়েছিস, না সুযোগ পাস না! যাক গে, যা এখন পুকুর কাটতে যা। এই নিয়ে পরে আবার কথা হবে!

ওরা চলে যাবার পর গুটুলি নীল মানুষকে বললো, তা হলে দেখলে তো? ওরা তিনজনেই একসময় খেলেছে বললো। আমি আজই বল যোগাড় করছি। তুমি খেলার মাঠটা ঠিক করবে বলো। ওঠো, ওঠো, ওরকম মন খারাপ করে শুয়ে থাকতে নেই।

পাহাড়ের একপাশে খানিকটা ঢালু জায়গা। প্রায় সমতলই বলা যায়, মাঝে মাঝে কয়েকটা ছোটোখাটো গাছ রয়েছে। সেই জায়গাটা পছন্দ হলো দু'জনেরই। নীল মানুষ পটপট করে গাছগুলো উপড়ে ফেললো। শুধু মাঠের দু'ধারে ছোট গাছ রইলো। সেই দুটো হবে গোল পোস্ট!

গুটুলি বললো, আজ রাতেই আমি বল যোগাড় করে আনছি। কাল খেলা হবে। আজ ভালো করে খেয়ে দেয়ে ঘুমোও, মন খারাপ করে থেকো না। মন খারাপ থাকলে ভালো করে খেলা যায় না।

বিকেলের দিকে রঘু আর দামোদরকে নিয়ে গুটুলি চলে গেল শহরে।

যাবার পথে গুটুলি বললো, এই, তোরা আবার যেন পালাবার চেষ্টা করিস না। তাহলে এবার কিন্তু ধরে এনে কান কেটে দেবো!

দামোদর বললো, আরে ছি ছি, এখন পুকুর কাটা বন্ধ রেখে ফুটবল খেলতে বলছো, এখন কেউ পালায়? খেলাটা কত আমোদের জিনিস!

রঘু বললো, এক হিসেবে জংগলে আটকে রেখে তুমি আমাদের উপকারই করেছো, গুটুলি দাদা। বছর খানেক এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের কথা ভুলে যাবে। তখন নিশ্চিন্তে ফেরা যাবে, কী বলো?

জংগল থেকে ওরা একটা হরিণ মেরে এনেছিল, শহরে এসে সেই মাংস বিক্রি করে যা টাকা পাওয়া গেল, তাতে ফুটবল কেনা হলো, আরও চা-বিস্কুট, নুন-মশলা, অন্য খাবার-দাবার কেনা হলো।

খেলা আরম্ভ হলো পরের দিন সকালে। বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে, বেশি জোর হাওয়া নেই, ফুটবল খেলার পক্ষে বেশ ভালো দিন। একদিকে নীল মানুষ, আর একদিকে তিন

ওঠো, ওরকম মন খারাপ করে শুয়ে থাকতে নেই।

ডাকাত। গুটুলি হলো রেফারি। সে একটা হুইশ্‌লও কিনে এনেছে।

ন্যাড়া গুলগুলি কিছুতেই সামনে আসতে চায় না, সে দামোদরের পেছনে লুকোচ্ছে। দামোদর তাকে বলছে, এই ঠেলছিস কেন, আমাকে ঠেলছিস কেন? রঘু বুক ফুলিয়ে বললো, তোরা সোজা হয়ে দাঁড়া, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছিস কেন?

মাঝখানে বলটা রেখে গুটুলি হুইশ্‌ল বাজাতেই তিন ডাকাত পিছিয়ে গেল অনেকটা। তারা নীল মানুষের কাছাকাছি গিয়ে বলে পা ছোঁয়াতে সাহস পায়নি!

গুটুলি ধমক দিয়ে বললো, ও কি হচ্ছে। মন দিয়ে খেলবি সবাই।

নীল মানুষ বলে একটা শট লাগালো।

অমনি সেটা চোখের নিমেষে প্রায় আকাশে উড়ে চলে গেল পাহাড় পেরিয়ে !

তিন ডাকাত হাঁ করে ওপরের দিকে চেয়ে রইলো। নীল মানুষ বললো, যাঃ, ও কি হলো? বলটা চলে গেল।

গুটুলি বললো, তাতে চিন্তার কিছু নেই। আমি আরও বল এনে রেখেছি। চিন্তার কিছু নেই। তবে, নীল মানুষ, একটু আস্তে খেলো। ফুটবল খেলাটা তো আর গায়ের জোরের ব্যাপার নয়। একটু আস্তে!

আর একটা বল সে রঘুদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এইবার তোমাদের দিক থেকে মারো!

রঘু বললো, দামোদর, তুই মারবি নাকি?

দামোদর বললো, ন্যাড়া গুলগুলিকে দাও। ও ভালো খেলে বলেছিল।

ন্যাড়া গুলগুলি বললো, আমার বল ঐ দৈত্যের গায়ে লাগলে যদি সে চটে যায়? ও সবের মধ্যে আমি নেই।

দামোদর রঘুকে বললো, ওস্তাদ, তুমি আমাদের সর্দার, প্রথম বলটা তুমিই মারো।

রঘু বললো, তোরা সব ভীতুর ডিম। দ্যাখ আমি কেমন মারতে পারি। এটা হচ্ছে খেলা।

সাধারণ মানুষের তুলনায় রঘুর গায়ে বেশ জোর। সে কষে একটা ফ্রি কিক্ ঝাড়লো বলটাকে, সেটাও বেশ অনেক উঁচুতে উঠলো।

নীল মানুষ খুশি হয়ে বললো, বাঃ বাঃ, এই তো চাই!

সে লাফিয়ে হেড করতে গেল বলটাকে। তার মাথায় লেগেই বলটা ফটাস করে ফেটে গেল।

নীল মানুষ বললো, ঐ যাঃ, কী হলো?

গুটুলি বললো, তাতে কিছু হয়নি, তাতে কিছু হয়নি। আরও

বল আছে। কিন্তু তোমার আবার লাফিয়ে হেড করার কী দরকার ছিল, বলটা তো এমনিই এসে তোমার মাথায় লাগতো!

আর একটা বল সে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এবারে একটু আস্তে মারো, নিচু করে মারো!

নীল মানুষ বললো, এবারে খুব আস্তে, আলতো করে মারবো। এই দ্যাখো।

বলটা সে নিচু করে মারলো ঠিকই, সেটা এসে লাগলো রঘুর পেটে, কিন্তু তাতে বলটা থামলো না। রঘু বলটা সমেত উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল পেছনের গোল পোস্ট গাছটায়। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিও মাটিতে শুয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, ওরে বাবারে, আমরা আর খেলবো না, আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা পুকুর কাটবো, ফুটবল খেলতে পারবো না। ওরে বাবা রে....

নীল মানুষ গুটুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, এটা আমার গোল হয়েছে না হয়নি ?

গুটুলি তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, তুমি বড্ড ফাউল করো! আর খেলা হবে না। দেখি রঘু বেচারার কী হলো!

আর খেলা হবে না ? আর খেলা হবে না বলতে বলতে নীল মানুষ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। তারপর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, খেলা হলো না, খেলা হলো না আমার! কিছু ভালো লাগে না!

রঘুর মাথায় জল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরানো হলো। তারপর তিন ডাকাতই দৌড়ে খেলার মাঠ ছেড়ে পুকুর কাটতে চলে গেল স্বেচ্ছায়।

সেই থেকে নীল মানুষের আরও মন খারাপ হয়ে গেল। সে কিছু খেতেও চায় না, কারুর সঙ্গে কথাও বলে না। শুধু গাছতলায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে।

গুটুলি তিন ডাকাতকে ধমক দিয়ে বললো, ছি ছি, ছি, তোরা কী বলতো! তোরা কি মানুষ! ছেলেটা একটু ফুটবল খেলতে চেয়েছিল, তোরা তাও খেলতে পারলি না ? এই মুরোদ নিয়ে তোরা ডাকাত হয়েছিলি ?

রঘু আর দামোদর লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলো। ন্যাড়া গুলগুলি হাত জোড় করে বললো, দাদা, আর যা করতে বলো সব পারবো, কিন্তু ঐ খেলার কথা উচ্চারণ করো না। বাবারে, এখনও আমার বুক কাঁপছে!

পরপর দু'দিন নীল মানুষ কিছু না খেয়ে রইলো আর কাঁদলো। গুটুলির কোনো কথাও সে শোনে না।

গুটুলি দেখলো এই রকম ভাবে আর কয়েকদিন চললে তো মহাবিপদ হবে। না খেয়ে খেয়ে নীল মানুষ খুব দুর্বল হয়ে যাবে আর সেই সুযোগে রঘু-দামোদরেরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তখন আর তাদের আটকানো যাবে না। এমনকি ওরা তখন নীল মানুষকে মেরে ফেলারও ব্যবস্থা করতে পারে।

সে তখন নীল মানুষের কানের কাছে মুখ এনে বললো, তোমার নিজের খেলা তো হলো না। কিন্তু তুমি ফুটবল খেলা দেখবে বলেছিলে, চলো, আমরা শহরে ফুটবল খেলা দেখতে যাবো! শহরে যাবো!

নীল মানুষ বললো, আমি শহরে গেলে আর কেউ খেলবে! সবাই তো ভয়ে পালাবে!

গুটলি বললো, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও! আমি যদি তোমায় ফুটবল খেলা দেখাতে না পারি, তা হলে আমার নামে তুমি কুকুর পুষো। আমি আর কোনোদিন তোমার কাছে মুখ দেখাতে আসবো না! এখন ওঠো, উঠে চাট্টি খেয়ে নাও তো লক্ষ্মীটি!

নীল মানুষ তখন ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলো। নদীতে গিয়ে স্নান করলো। তারপর দু'দিনের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে মেঘ গর্জনের মতন একটা ঢেঁকুর তুলে বললো, আঃ! এবার দশ খিলি পান দাও তো।

তিন ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে পান সাজতে বসলো।

কিন্তু কী করে যে নীল মানুষকে ফুটবল খেলা দেখানো হবে, তা আর গুটুলির মাথায় আসে না। যে-শহরটায় তারা জিনিসপত্তর কেনাকাটি করতে যায়, সেখানে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলা হয় বটে। বাইরের টিমও খেলতে আসে। কিন্তু ফুটবল খেলা তো আর রাত্তিরে হয় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই শেষ হয়ে যায়। দিনের আলোয় নীল মানুষকে নিয়ে সেই শহরে যাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। নীল মানুষকে দেখলেই সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালাবে।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়। নীল মানুষ রোজই জিজ্ঞেস করে, কী গো গুটুলি, আমার ফুটবল খেলা দেখার কী হলো ?

গুটুলি হাত তুলে বলে, হবে, হবে, ঠিকই হবে, আমাকে একটু সময় দাও!

জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যে হাই-ওয়েটা গেছে, গুটুলি প্রায় সেই রাস্তাটার কাছে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসে থাকে। কত রকম গাড়ি যায়, সে লক্ষ্য করে। ট্রাক, মোটর গাড়ি, বাস। কত রকম মানুষ। কেউ এই জায়গাটায় থামে না।

একদিন সকালে একটা ট্রাকে করে একদল ছেলে যাচ্ছে, হঠাৎ তারা দেখলো রাস্তার মাঝখানে একটা বড় পাথরের চাঁই ট্রাকটা আর যেতে পারবে না। ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠলো। গতকাল বিকেলে তারা এই পথ দিয়ে গেছে, তখন এরকম কোনো পাথর ছিল না। তারা ড্রাইভারকে বললো, ব্যাক করো। ব্যাক করো। গাড়ি ঘোরাও। এটা ভূতের জায়গা!

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে দেখলো, পেছন দিকেও রাস্তায় এখন ঐ রকম আর একটা পাথর। সেদিকেও যাবার উপায় নেই।

ছেলেরা তখন ট্রাক থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে সবাই মিলে

একটা পাথর ঠেলে সরাবার চেষ্টা করলো।

তখন একটা হুইশ্‌ল বেজে উঠলো। রেফারির পোশাকে একটা ফুটবল বগলে নিয়ে গুটুলি হাজির হলো সেখানে। এক হাত তুলে হাসি মুখে সে বললো, ওহে ছেলের দল, আজ তোমাদের এখানে নেমন্তন্ন। তোমরা তো শহরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলে, এবারে আমাদের টিমের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলে যাও!

কয়েকটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, ভূত! ভূত! এই তো সেই ভূত!

আর কয়েকটা ছেলে বলল, দূর, এ তো একটা বেঁটে বাঁটকুল। এ ভূত হলেও একে আমরা পরোয়া করি না।

গুটুলি বললো, ভূত-টুত কিছু নেই। তোমরা এই জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা ম্যাচ খেলবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া করবে। ফিরে এসে দেখবে রাস্তা পরিষ্কার! এসো, ভয় পাচ্ছো কেন?

ঐ ছেলেদের যে ক্যাপ্টেন, সে বললো, খেলার ব্যাপারে আমাদের কেউ চ্যালেঞ্জ জানালে মোটেই ভয় পাই না। চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জি হলেও লড়ে যেতে রাজি আছি। তোমাদের কেমন টিম, বলো তো দেখি।

রাস্তা ছেড়ে ওরা ঢুকে এলো বনের মধ্যে। গুটুলি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো খেলার মাঠে।

ক্যাপ্টেন বললো, কই, তোমাদের খেলোয়াড় কোথায়?

গুটুলি আর একটা হুইশ্‌ল বাজাতেই বেরিয়ে এলো রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলি। তারা পরেছে হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি। তারা মার্চ করে গিয়ে দাঁড়ালো মাঠের এক দিকে।

এদিকের ক্যাপ্টেন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, এই তোমাদের টিম! আর খেলোয়াড় কই?

গুটুলি বললো, আগে এই টিমকেই হারাও তো দেখি, তারপর আমার অন্য টিম বার করবো!

ক্যাপ্টেন বললো, তুমি কে হে বাপু? এই জঙ্গলের মধ্যে শুধু শুধু আমাদের আটকিয়ে এখানে নিয়ে এলে? আমাদের ক্লাবের নাম ইলেভেন বুলেটস। আমরা এই জেলার চাম্পিয়ন! এই তিনটে লোকের সঙ্গে আমরা কী খেলবো? এ তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

ওদিক থেকে রঘু সর্দার বললো, ওহে, খুব যে বড় বড় কথা বলছো? খেলেই দেখো না, ক'টা গোল দিতে পারো!

ক্যাপ্টেন বললো, এগারো মিনিটে বাইশটা গোল দেবো, দেখবে?

গুটুলি বলটা মাঠের মাঝখানে ছুঁড়ে দিতেই ক্যাপ্টেন একাই বলটা নিয়ে ড্রিবল করতে করতে, রঘু, দামোদর আর ন্যাড়া গুলগুলিকে তিনটে ল্যাং মেরে শুইয়ে দিয়ে ওপাশের গাছটার গায়ে বলটা ঠেকিয়ে বললো, এই নাও এক গোল!

অমনি কোথায় যেন ধুপ ধাপ ধুপ ধাপ শব্দ হলো?

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে বললো, ওকি? ও কিসের শব্দ!

গুটুলি বললো, ও কিছু না, ও কিছু না, আমাদের একজন সাপোর্টার হাততালি দিচ্ছে!

ক্যাপ্টেনের মুখখানা হাঁ হয়ে গেল, সে বললো, ঐ আওয়াজ, ঐ তোমাদের সাপোর্টারের হাততালি? কোথায় তোমাদের সেই সাপোর্টার?

গুটুলি বললো, ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। নাও-নাও, আবার খেলা শুরু করো।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে আর একজনকে বললো, নে, এবার তুই গোল দিয়ে আয়!

দ্বিতীয় গোলটা অবশ্য তত সহজ হলো না। দামোদর-রঘু-ন্যাড়া গুলগুলি যথেষ্ট ফাইট দিল, এমনকি ন্যাড়া গুলগুলি বলটা পায়ে নিয়ে এদের দিকে অনেকটা এগিয়েও এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ মেঘের ডাকের মতন বাঃ বাঃ শব্দ শুনেই সে এমন চমকে গেল যে বল বেরিয়ে গেল তার পা থেকে। এবারেও তারা গোল খেল।

এইরকম ভাবে পরপর এগারোটা গোল খাবার পর এদিককার ক্যাপ্টেন বললো, গোল খেয়ে পেট ভরেছে, না আরও চাও?

রঘু সর্দার বললো, আর চাই না। যথেষ্ট হয়েছে। কী বলো গুটুলিদা?

গুটুলি বললো, হ্যাঁ, এবারে তোমরা সরে যাও। এবারে আমাদের আর একজন খেলোয়াড় আসবে। তোমরা তার সঙ্গে একটু খেলে দ্যাখো তো বাপু!

গুটুলি আবার হুইশ্‌ল বাজাতেই গাছপালার আড়াল থেকে এক লাফে এসে হাজির হলো নীল মানুষ। তার মাপের তো কোনো প্যাণ্ট হয় না। তাই সে একটা ধুতি মালকোছা মেরে পরেছে। আর খালি গা। সে এসেই হাত জোড় করে বললো, বেশি জোরে বল মারবো না। খুব আস্তে আস্তে, কোনো ভয় নেই!

কিন্তু তার কথা কে শুনবে। ওদিককার এগারো জন খেলোয়াড়ই অজ্ঞান।

নীল মানুষ বললো, এ কী হলো? আর খেলা হবে না? ওদের গোল শোধ দেওয়া হবে না?

গুটুলি এক ডজন ফুটবল নিয়ে এসে বললো, খেলা দেখার শখ ছিল, সে শখ তো মিটেছে? এ নাও, এবারে একটা একটা করে মারো, ওদের গোল শোধ দাও।

পরপর বারোখানা বলে কিক্ কষিয়ে ওপারে পাঠিয়ে নীল মানুষ হাসি মুখে বললো, শোধ দেবার পরেও একখানা বেশি!

গুটুলি বললো, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে তুমি রাস্তার ওপরের পাথর দুটো সরিয়ে দিয়ে এসো। আমি এই ছেলেগুলোর জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

নীল মানুষ খুশি মনে লাফাতে লাফাতে চলে গেল রাস্তার দিকে।

ছবি : সরোজ সরকার

স্পাই গাই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এ বছর স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট অ্যানাউন্স্ করার সঙ্গে সঙ্গে নাম আর নম্বর সমেত গেজেট ছেপে বেরোয়নি কেন?

কেনই বা মেকসিকোয় ফুটবলের বিশ্বকাপ ফাইনালের খেলা দূরদর্শনে দেখাবার জন্যে ইন্ডিয়া গোড়ায় রেডি ছিল না?

এটা কি সত্যি—বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরিয়ে যেতো?

এসব কোশ্চেনের ভেতরে ঢোকার আগে জানা দরকার সাধু কালাচাঁদকে আমরা শেষ কোথায় দেখেছি।

রামনগরে ব্যাঙ্কের টেম্পোরারি ক্যাশিয়ারের পোস্টে কালাচাঁদকে নিয়ে গিয়েছিল তার নৃসিংহ মেসো। সেখানে তিনি ম্যানেজার। কালাচাঁদ দেশে ফিরেছে ছুটি নিয়ে। যদি গোপনে দিয়ে স্কুল ফাইনালটা টপকানো যায় তো ক্যাশিয়ারির পোস্টে সে পারমানেন্ট হয়ে যেতে পারে। সে আসলে এখন একজন প্রবীণ স্কুল ফাইনালী। তার দেশের কচি স্কুল ফাইনালীরা কিন্তু জানে—কালাচাঁদ একজন প্রবীণ টিচার। বি টি পরীক্ষা দেবে বলেই প্রিপারেশন করতে এসেছেন। সব সময় গম্ভীর হয়ে একা একা সন্ধ্যেবেলা হাঁটেন।

কালাচাঁদ এই আনকোরা স্কুল ফাইনালীদের বলল, সে আসলে একজন রাইটার বা অথর। লাস্ট মিনিট সাজেশন—বাই অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর বইখানার সেই টিউটর—আসলে সে নিজেই। লাস্ট মিনিট সাজেশন তো এখন ছাপা হচ্ছে। সাতশো টাকা পেলে সে লিক্ করতে পারে। কিছু খরচ—খরচা আছে তো। কিন্তু পাবলিশারের স্পাই চারদিকে ছড়ানো। তারা কালাচাঁদকে সব সময় নজরে নজরে দেখেছে। এমনকি মাঠে যেসব গরু চরছে—তাদের ভেতরেই পাবলিশারের ছড়ানো স্পাই গাইও থাকতে পারে। কিছুই বিশ্বাস নেই।

কালাচাঁদের দেশ মানে কলকাতা থেকে ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েক। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, গম ভাঙানোর কল, একটা খোয়া-ওঠা বাসরুট, সারের দোকান, সর্ষের খোলের দোকান আর বাড়ি বাড়ি ছাদে কিছু অ্যান্টেনা—থাকার বড় ঘরে কাপড়ের ঘোমটায় ঢাকা একটি করে টি ভি। মাঠ থেকে ফিরে দেশগাঁয়ের লোক খালি গা হয়ে যায়, ঘোমটা খুলে সামনে বসে যায়—ছবি দেখবে বলে।

বলা দরকার জায়গাটা বারাসাত আর দেগঙ্গার মাঝামাঝি।

তা কালাচাঁদ যখন কচি স্কুল ফাইনালীদের বোঝাচ্ছিল—সে আসলে একজন এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর—সে নিজেই লাস্ট মিনিট সাজেশন বইখানার অথর—বইখানা বেরোবে বেরোবে—এখন লিক্ করতে সাতশো টাকার মতো খরচ-খরচা পড়বে—তোমরা সাতজন আছো যখন—মাথাপিছু একশো টাকা করে যোগাড় করে ফেল—ব্যাপারটা খুব সাবধানে করতে হবে—

পাবলিশার সবসময় স্পাই লাগিয়ে তাকে নজরে নজরে রেখেছে।

ঠিক তখন সন্ধ্যের মুখে মাঠ থেকে খুটো তুলে কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু তাঁর কালো গাইটা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তার কেমন সন্দেহ হয়। তিনি পরিষ্কার কালাচাঁদকে বলেন, ওরা সব কাঁচা স্কুল ফাইনালী, ওদের সংগে তুমি আবার নতুন কোন্ খেলা খেলতে যাচ্ছো বাবা! তুমি ছুটিতে এসেছো।

সেই সাত স্কুল ফাইনালী অঘোরবাবুকে পাবলিশারের স্পাই ভেবে চোঁ-চাঁ দৌড়। কালাচাঁদও চেঁচিয়ে বলে, দেখেছো—আমার বাবার ছদ্মবেশে স্পাই পাঠিয়েছে! আমি সামলাচ্ছি।

তখন কালো গাইটা অঘোরবাবুর হাতের দড়ি ছাড়িয়ে ওদের তাড়া করে যায়। ছেলেগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে ছোটে—স্পাই গাই! স্পাই গাই!!

ঘোর সন্ধ্যেবেলা কালাচাঁদকে নিয়ে অঘোরবাবু বাড়ি ফিরলেন। ও কালাচাঁদের মা—

কালাচাঁদের মা তখন ঘটকের সংগে কথা বলছিলেন। ছেলে আমার ব্যাংকের চাকুরে—সময় মিলিয়ে অফিসে যেতে হয়—সময় মিলিয়ে বেরোতে হয়। বউমার বাবাকে বলবেন—একটা সোনার হাতঘড়ি দিতে হবে ছেলেকে—একই তো ছেলে আমার! তায় আবার এত্ত অল্প বয়সে অফিসের বাবু।

কোন্ ভদ্রলোকের সব্বোনাশ করছো দ্যাখো—বলতে বলতে অঘোরবাবু বারান্দায় উঠলেন। উঠে ঘটকের দিকে কটমট করে তাকালেন। বলেছি না—এখন আসার দরকার নেই। আমি ছেলের বাপ। সময় হলেই খবর পাবেন—

ঘটক ছাতা হাতে উঠে দাঁড়াল। কোনো তাড়া নেই তেমন।

তবে সন্ধ্যেবেলা দেখে আসা কেন?

ঘটক একলাফে রাস্তায় পড়ল।

কালাচাঁদের মা ফোঁস করে উঠলেন। তবে কি কালাচাঁদ আমার সন্ন্যেসী হয়ে যাবে? সারাটা জীবন দূরদেশে বসে শুধু চাকরি করে যাবে?

থামো। চাকরি এখনো কাঁচা। তারপর এখানে এসেই সে আবার লেজে খেলতে শুরু করেছে। শেষে চাকরিটা না খোয়ায়—

তোমার যত্ত অলুক্ষণে কথা। গুরুদেব বলে গেছেন না—

থামো তুমি। রামনগর যাবার আগের দিন অব্দি ও বাড়ি থেকে বেরোবে না।

সে কি বাবা। আমার তো এখনো মাসখানেক ছুটি।

সারাটা ছুটি তুমি বাড়িতেই কাটাও। বিশ্রাম নাও। বেরোবার দরকার নেই। আমি তোমার বাবার ছদ্মবেশে মাঠে ঘাপটি মেরে ছিলাম? তাহলে তোর বাবা কে আগে বল?

আহা! অত বড় ছেলের গায়ে হাত তুলো না—বলতে বলতে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল কালাচাঁদের মা।

এতদিন কালাচাঁদ বস্তা বস্তা ভিজে নোট ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে বংগোপসাগরের তীরে শুকোতে যেতো। শুকিয়ে ভাজা ভাজা হলে নোটগুলোকে আবার বস্তাবন্দী করে সে সন্ধ্যে সন্ধ্যে ব্যাংকে ফিরে যেতো শরৎ গাড়োয়ানের গোগাড়িতে চড়ে। খোলা হাওয়ায় চলাফেরা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

আর এখন সে গৃহবন্দী। যাকে বলে অন্তরীণ। নজরবন্দী। দাড়ি কাটা ছেড়ে দিল কালাচাঁদ।

তার মা বলল, শেষে কি সন্ন্যেসী হয়ে যাবি বাবা?

না। আমি ছাদে বসে ঘুড়ি ওড়াবো। তুমি বাবাকে বল।

অঘোরবাবু সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে ফিরে সব শুনে বললেন, আমি নতুন কোনো ফাঁদে পা দিচ্ছি না। লাটাই বা সুতো কিছুই কিনে দিতে পারবো না। ছাদে যেতে হয় যাও। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনো নয়। বেরোলে একদম সেই রামনগরে গিয়ে কাজে জয়েন করবে।

অগত্যা।

কালাচাঁদ তার বাবার আনা সিনথেটিক সারের বস্তা থেকে সুতোলির পাতলা ফিতে খুলে খুলে বিরাট এক পাঁক হালকা সুতোলি বানিয়ে ফেলল।

কচি স্কুল ফাইনালীরা একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সারামুখ দাড়িভর্তি কালাচাঁদকে দেখে ফেলল রাস্তার দিককার জানলায়।

স্যার! আপনি আর বেরোচ্ছেন না?

কালাচাঁদ মুচকি হাসল। চারদিকে স্পাই। আমি তো প্রায় নজরবন্দী।

লাস্ট মিনিট সাজেশন বেরিয়েছে?

নাঃ! বেরোবার সময় হয়ে এল। টাকার কি করলে তোমরা?

কিছুটা যোগাড় হয়েছে—

কত?

সওয়া তিনশো স্যার।

তাই নিয়েই চলে এসো কাল দুপুরে।

আবার যদি স্পাই বেরোয় স্যার—

দুপুরটা দেখছি ফাঁকাই থাকে। আসবে কিন্তু। আসবার সময় হাফ ডজন ঘুড়ি কিনে আনবে।

ঘুড়ি? স্যার?

এসোই না। দেখবে'খন।

পরদিন দুপুরে অঘোরবাবু যখন মাঠে—কালাচাঁদ তার কচি স্কুল ফাইনালীদের নিয়ে ছাদে উঠল। সংগে সিনথেটিক সারের বস্তার সুতো খুলে নিয়ে হালকা সুতোলির আন্ডিল আর খানকয়েক ঘুড়ি।

বিকেলের ফার্স্ট ক্লাশ বাতাসে ঘুড়ি দিব্যি আকাশে উঠে গেল। কচি স্কুল ফাইনালীরা সারাদিন বাড়িতে পড়ে পড়ে হদ্দ। তারা ঘুড়ি-ওড়ানো এমন এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর কোনোদিন পায়নি। একজন তো আনন্দের চোটে কালাচাঁদকে

বলেই ফেলল, আপনিই আমাদের এ যাত্রা তরাবেন। আপনি আমাদের কোশ্চেন-টোশ্চেন যা হয় এবার বলুন—

সদ্য পাওয়া সওয়া তিনশো টাকার নোট তখন কালাচাঁদের বুকপকেটে। সে গম্ভীর গলায় বলল, অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেকস্ জ্যাক্ এ—

ডাল বয়!

তাহলে আর কথা নয়। এখন আমরা ঘুড়ি ওড়াবো।

এক কচি স্কুল ফাইনালী বলল, স্যার আপনিই আমাদের ভরসা। আপনিই আমাদের অথর বাবা!

সে কথায় বাকি কজন বলে উঠল, ঠিক বলেছিস তো। স্যারই তো আমাদের অথর বাবা। তাঁরই লেখা সাজেশন—তিনি নিজেই লিক্ করবেন।

ঘুড়ি তখন অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়ে এক গোত্তায় গাছপালার আড়ালে আটকে গেল। পুরনো বোম লাটাই গুটিয়েও ঘুড়ি ফের আকাশে তুলতে পারলো না কালাচাঁদ।

একজন বলল, ওখানেই তো অথর বাবা টি ভি রিলে সেন্টারের বুস্টার—

তাতেই লটকে গেল নাকি?

নিশ্চয় ওখানে আটকে গেছে অথর বাবা,ওখানেই তো রিলে টাওয়ার। ওখান থেকেই তো গাইঘাটা, দেগঙ্গা, বারাসাত—চাদ্দিক কলকাতা টি ভি-র ছবি রিলে হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

শনিবারের বিকেল। কালাচাঁদের কাছে-পিঠের ঘরবাড়ি থেকে সব লোক হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এল।

কালাচাঁদ টানাটানি করেও ঘুড়ি ওড়াতে পারল না। টানাটানিতে সুতোলি ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

অথর বাবা? সবাই ঘুড়ি ওড়াবে নাকি?

তা তো জানিনে। কিন্তু সব বাড়ির লোক যে ছাদে দেখছি। অ্যান্টেনা নাড়ছে যেন সবাই—

কালাচাঁদ গম্ভীর গলায় বলল, মাই বয়েজ। তোমরা এবার চারদিক ছড়িয়ে পড়ো তো।

কেন? কেন অথর বাবা?

এইসব সময় কালাচাঁদের ভেতর থেকে তার নিজের আদি পান্ডা ভাবটা জেগে ওঠে। সে বলল, আমি যেন কিসের গন্ধ পাচ্ছি। তোমরা সাবধানে মুদিখানা, নিতাই হোমোপ্যাথের চেম্বার, জগেন মিস্ত্রির মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে এসো তো একবারটি। পাবলিশার যদি স্পাই লাগায় তো আমরাই বা কম কিসে? জেনে এসো তো—সবাই ছাদে উঠে অ্যান্টেনা নাড়ছে কেন? সেই ফাঁকে আমি লাটাইটা গোটাই।

আর ঘুড়ি ওড়াবেন না অথর বাবা?

আগে তোমরা ঘুরে তো এসো।

ওরা দশ মিনিটের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে এসে একই কথা বলল। বড় বড় চোখ করে।

অথর বাবা—আজ টি ভি-তে লর্ডস্-এর ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড ক্রিকেট দেখানো হচ্ছিল। তখন নাকি ঘচ করে একখানা বড় মুখ ভেসে ওঠে। তারপর টি ভি থেকে অজানা ভাষায় খালি ভেসে আসছিল— আদুলিমুদালিয়র, জাফনা, জয়বর্ধনে, টুলফ্—এইসব কথা।

বড় মতো মুখখানা কার?

লোকে বলছে—জয়বর্ধনের—

তাহলে তো শ্রীলঙ্কা স্টেশন আসছে টি ভি-তে।

তাই তো অথর বাবা। যেখানে কলকাতাই পরিষ্কার আসতে চায় না—সেখানে শ্রীলঙ্কা আসে কি করে?

আজ ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ থাকলো। তোমরা এখন আসতে পার।

কালাচাঁদ যা জানতে পারলো না—তা হলো—সেই রাতেই লোকাল থানার বড়বাবু তড়িঘড়ি কলকাতার ট্রেন ধরতে চলে গেলেন। সাদা পোশাকেই।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে অঘোরবাবু মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে মহা শোরগোল তুললেন। সারাদিন বাড়ি থাকিস। একগাল দাড়ি। গাইগরুগুলোর সিং জুড়ে নালি হয়ে গেল—একবার খালে নামিয়ে রগড়ে চান করিয়ে দিবি ওদের—

কালাচাঁদ একগাল দাড়ি নিয়ে নিজের বাড়িতেই অন্তরীণ। সে আজকাল বিশেষ কথা বলে না। একরকম মৌনীই থাকে। তবু বলল, কি দিয়ে রগড়াবো?

সারের খালি বস্তাগুলো রয়েছে কি করতে?

যেমন কথা তেমন কাজ। পরদিনই সারের কয়েকটা ছেঁড়া ফাটা খালি বস্তা নিয়ে গাইগরুদের কালাচাঁদ খালে নামালো।

তারপর খসখসে সিনথেটিক বস্তা দিয়ে ওদের সিংয়ের গোড়া আচ্ছা করে রগড়ে দিল।

কালাচাঁদকে খালে নামতে দেখে সেই কচি স্কুল ফাইনালীদের দু'জন পাড়ে এগিয়ে এল। অথর বাবা? আমাদের পরীক্ষা তো এগিয়ে এল। সাজেশন?

আসতে দে না। আমার তো শেষ রাতের মার! একেবারে লাস্ট মিনিটে এমন সাজেশনই দেবো—দেখবি—

দেখবেন কিন্তু অথর বাবা—আমাদের সর্বস্ব আপনার কাছে—

কালাচাঁদের মনে পড়লো, সে ওদের সওয়া তিনশো টাকা নিয়ে রেখেছে। আলতো করে হেসে বলল, বাকি টাকার কতদূর?

হয়ে এসেছে অথর বাবা–

আচ্ছা তোরা আমায় অথর বাবা ডাকিস কেন? আমি তো একজন এক্সপিরিয়েন্সড্ টিউটর মাত্র।

আপনি তো একজন লেখক। রাইটার। আপনার লেখা লাস্ট মিনিটের সাজেশন তো সবাইকে টেক্কা দিয়ে–সব নোটবইকে পেছনে ফেলে শেষ রাতের মার দেয় অথর বাবা! আপনি তাই অথরদেরও বাবা–

ওঃ! হোঃ! হোঃ!!–বলতে বলতে কালাচাঁদ গরুদের তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলো। তখনই বলল, এই তো এখন কোশ্চেন লিক্ করার সময় হয়ে এল। তোমরা আমায় ক'টা টাকা দিয়ে যেন ধৈর্যহারা হয়ো না। এ যে লাস্ট মিনিটের কারিকুরি। বুঝলে না? বাকি টাকাটা জোগাড় করে ফেল।

কালাচাঁদের একথায় সেই দুই স্কুল ফাইনালী গভীর বিস্ময়ে কালাচাঁদের দিকে তাকালো। এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীর অত বড় পরীক্ষা–স্কুল ফাইনাল–লাস্ট মিনিটে সেই এগজামিনের কোশ্চেনের সাজেশন দিয়ে আইদার–অর–সব কোশ্চেন মিলিয়ে দেন যে মহান অথর–সেই অথরদের বাবা কি সিম্পিল! সেই অথর বাবা একটা অর্ডিনারি খাল থেকে এইমাত্র গাইগরু চান করিয়ে নিয়ে উঠলেন। তাদেরই চোখের সামনে। বিশ্বাস হয়? পরে বললে লোকে বিশ্বাস করবে? কখনো করে! ওই তিনি চলেছেন–ভিজে কাপড়ে। ওদের চোখ গোল্লা গোল্লা হয়ে উঠলো।

বাকি স্কুল ফাইনালীদের সবার এতটা ধৈর্য ছিল না। ফিরতি পথে কালাচাঁদকে পিওন একখানা পোস্টকার্ড দিল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা–

মান্যবরেষু ইথারবাবা,

আপনিই আমাদের ভরসা। সময় তো আসিয়া গেল। এখন আপনি যা করিবেন তাই হইবে। আমরা কিছু দিয়াছি–বাকিটাও দিবার কোনো অন্যথা হইবে না। এখন যাহা করিবার আপনিই করিবেন। আমরা আপনার পথের দিকে তাকাইয়া আছি। একেবারে লাস্ট মিনিটে পাইলে তৈরি হওয়া অসম্ভব। অন্যে যাহা লাস্ট মিনিটে পাইবে–আমাদের যে তাহা কিছু আগে দরকার। প্রণামান্তে–

ডট! ডট!! ডট!!! –আপনারই ফাইনালীরা।

তাড়াতাড়িতে অথরের জায়গায় ইথার লিখে বসে আছে। হাসলো একটু কালাচাঁদ।

গাইগরু রগড়ে চান করিয়ে কালাচাঁদ আজ কিছু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দুপুরে কাটোয়ার ডাটার সঙ্গে মেমারির কুমড়ো আর কুচো চিংড়ি দিয়ে কাঁচা লঙ্কা ঘষে সাপটে ভাত খেয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল অঘোর ঘুমে। গরুরা তখন শহরের শেষে কেষ্টনগর রোডের গায়ে পেল্লায় এক মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। কাছেই কলকাতার টি ভি প্রোগ্রাম রিলে করার বুস্টার টাওয়ার। তার ডগায় তখনো কালাচাঁদের লটকে যাওয়া লাল ঘুড়িখানা বাতাসে লটকাচ্ছিল।

বারাসাত কোর্টে কাজ সেরে তিনখানা ডেমিকাগজ নিয়ে সন্ধ্যের মুখে মুখে ফিরলেন কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু। গালের ডানদিক দাঁতের ব্যথায় ফুলে গেছে। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কালাচাঁদের মাকে বললেন, একটু জল ফুটিয়ে তাতে নুন দিয়ে দাও–কুলকুচো করে দেখি–যদি কমে–

অসময়ে চুলোয় আর আঁচ দেবেন না বলে কালাচাঁদের মা শুকনো পাটকাঠি নিতে গোহালে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে। তোমার কালো গাই চরতে বেরিয়ে আপনা-আপনি ফিরে এসেছে। আর বাঁট থেকে আপনাআপনি দুধ পড়ছে–

বল কি?–সেই ব্যথা নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন অঘোরবাবু।

হ্যাঁ। আমি বাটি এনে ধরেছি। তোমার কালাচাঁদ ভাল করে আজ সিং রগড়ে চান করিয়ে দিয়েছে ওদের।

খালে নামিয়েছিল?
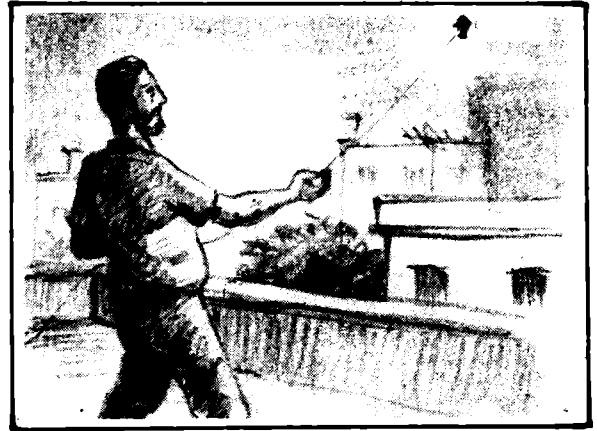
নয়তো কি!–বলতে বলতে কালাচাঁদের মা বাঁটে বাটি ধরলো। দুধে ফুলে ওঠা বাঁট ধরে টান দিতেই দুধ বেরোতে লাগল। কালাচাঁদের মা দুধ দুইতে দুইতেই বলতে লাগল, কতদিন চান করে না–নইলে এমন দুধই তো দেওয়ার কথা। সবে তিন মাস গাভিন। কালাচাঁদ আমার সাধু প্রকৃতির লোক। সাধুর হাতে চান করেই তো দুধ ফিরে পেলো বাঁটে।

দেখো–বেশি বাখিয়ো না!

এ কথায় কান না দিয়ে কালাচাঁদের মা বলল, নুন জলে আর দরকার নেই। গরম গরম দুধ খাও তো। ঠিক কমে যাবে–

এই–না না করেও অঘোরবাবু তাকে থামাতে পারলেন না। অগত্যা অনিচ্ছায় ভর সন্ধ্যেবেলা একবাটি গরম দুধ খেতে হলো।

খাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল। কোথায় ব্যথা!

অঘোর নিজেই অবাক হয়ে বললেন, দাঁতের ব্যথায় দুধের দাওয়াই–আগে তো কোনোদিন শুনিনি!

একগাল হেসে কালাচাঁদের মা বলল, সবই তোমার সাধুর কেরামতি! এমন রগড়ে চান করিয়েছে কালাচাঁদ–

অঘোরবাবু কিছু না বলে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসলেন। তিন মাস গাভিন গাই কিছুটা দুধ দিচ্ছিল ঠিকই–কিন্তু কালাচাঁদের রগড়ানি খেয়ে এতটা দুধ দেয় কোত্থেকে? ভেবে ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না তিনি। মনে মনে বললেন, হবেও বা–

সন্ধ্যের মুখে ঘুম ভেঙে চোখ লাল করে বিছানায় উঠে বসলো কালাচাঁদ। জানলার বাইরে তখন বাড়ি বাড়ি আলোর ফুটকি।

এতক্ষণ বাড়ির বাইরে কি ঘটছে তার কিছুই জানে না কালাচাঁদ। জানেন না অঘোরবাবুও। কিংবা কালাচাঁদের মা। গরুরাও চরে ঘুরে নিজের মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরে এসেছে বিকেল বিকেল। একজনের পর একজন। এখন জাবনা দিয়ে তাদের ডিনার চলছে।

ইণ্ডিয়া-চায়না বর্ডারে মাউন্টেন ডিভিশনের সোলজারদের খাবার সাপ্লাই, এনিমি বম্বার প্লেনের মহড়া দিতে নর্থ বেঙ্গলের হাসিমারায় জঙ্গলের ভেতর বিমানঘাঁটি। সেখান থেকে দুপুরের দিকে এয়ার ফোর্সের একখানা প্লেন উঠেছিল আকাশে। তিব্বত বর্ডারে একটা চক্কর খেয়ে ফিরে আসার কথা। আকাশে উঠেই পাইলট তো ঘাবড়ে গেল।

প্লেনের রেডিওতে শুধু চীনে ভাষায় মেসেজ ভেসে আসছে। হোয়াইকু ঝিয়াও। ঝান ঝিয়াও হোয়াইকু। হোয়াইকু ঝিয়াও–

কি ব্যাপার? বর্ডারের ওপারে কোনো চীনা প্লেন হয়তো চক্কর দিতে আকাশে উঠেছে। কিন্তু তাদের কথা তো এখানে ধরা পড়ার কথা নয়। ইথার তরঙ্গে জট পাকালো নাকি?

কোনো ঝুঁকি না নিয়ে পাইলট প্লেন নিয়ে হাসিমারায় ফিরে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে আরেকটু হলেই পাইলট অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছিল আর কি! ডান দিকের ডানা ডাবগাছে গিয়ে ধাক্কা মারছিল প্রায়।

খবরটা ওয়ারলেসে দিল্লিতে এয়ার হেড কোয়ার্টার সুব্রত হাউসে গিয়ে পৌঁছালো মুহূর্তে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারির চাইনিজ ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্টরা শলা-পরামর্শে বসে গেল। হোয়াইকু ঝিয়াও। ঝান ঝিয়াও হোয়াইকু। কোডে পাঠানো এই সাংকেতিক কথা কটির মানে কি হতে পারে?

এয়ার ইণ্ডিয়ার যে বিমান টোকিও যাচ্ছিল–ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে বিমান রেঙ্গুন হয়ে আন্দামান যাচ্ছিল–তাদের পাইলটরা আকাশেই অর্ডার পেল–ফিরে এসো। প্রসিড নো ফারদার।

আসলে সারা ইণ্ডিয়ার একটি মোটে থানায় টি ভি খুললেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সেই বিখ্যাত ঝোলা মুখ ফুটে উঠছে–এই কাণ্ডে কলকাতা দিল্লি একই সঙ্গে চিন্তিত হয়ে পড়ে। লোকাল থানার বড়বাবু কলকাতায় পৌঁছেই সিধে পুলিশের আই জি-র বাড়িতে চলে যায়।

রাত তখন প্রায় বারোটা। মাথার কাছে ওয়ারলেস সেট নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে। হঠাৎ কানের কাছে ধস্তাধস্তির গোলমাল শুনে আই জি উঠে বসলেন। নাঃ। ওয়ারলেস সেটে তো কোনো আওয়াজ নেই। দোতলার জানলা দিয়ে দেখলেন–বাড়ির গেটে পাহারার সঙ্গে কার যেন তুমুল ধস্তাধস্তি হচ্ছে। তিনি মাথার বালিশের তলা থেকে ছ'ঘড়া রিভলবার বের করে চেঁচিয়ে বললেন, এক্ষুণি থামো তোমরা–নয়তো আমি গুলি করবো।

এতক্ষণ গেটের পাহারাদার কালাচাঁদদের থানার বড়বাবুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। দু'জনে প্রায় কুস্তি হচ্ছিল। আই জি-র গলা চিনতে পেরেই বড়বাবু প্রায় কেঁদে উঠলেন। আপনাকে খবরটা দিতে এসেই এই বিপত্তি–

কোন্ থানা?

বড়বাবু চেঁচিয়ে থানার নাম বললেন–

তা এখানে এসেছেন কেন? এস পি-র কাছে যান।

তিনি হসপিটালে স্যার–

তাহলে অ্যাডিশনাল এস পি-র কাছে যান।

তিনি স্যার বসিরহাটে বিয়ে করতে গেছেন। ভীষণ খবর স্যার–

অসময়ে এসে ঘুম ভাঙালেন। যান। আমি এখন ঘুমোবো।

খবরটা শুনে ঘুমোতে পারবেন না স্যার–

কি খবর? ওখান থেকেই বলুন–

জোরে বলা যাবে না স্যার। ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাপার–আমি ওপরে উঠে আপনাকে বলেই চলে যাবো।

অগত্যা–

দোতলায় বসার ঘরে বসে আই জি বড়বাবুর মুখে সব শুনলেন। শুনে বললেন, আপনি নিজে দেখেছেন?

হ্যাঁ স্যার। সেই জয়বর্ধনের মুখ। আমাদের ওখানে অনেকেই দেখেছে। মুখের পাশে সিংহলী ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব লেখা।

হুম্। আপনি যান এখন। কারও কাছে মুখ খুলবেন না।

ইয়েস স্যার।

আপনি যেতে পারেন এবার।

বড়বাবু চলে যেতেই আই জি চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে ফোন করে তাঁকে তুললেন। চিফ মিনিস্টার সব শুনে বললেন, কী বলছেন? এটা তাহলে জয়বর্ধনের ইজরায়েলি ইনটেলিজেন্সের কাজ। আমাদের ইথার তরঙ্গ জ্যাম করতে চাইছে।

তাই তো মনে হয় স্যার। কিংবা সি আই এ স্বয়ং সব চালাচ্ছে। অবিশ্যি আমরাও অ্যালার্ট আছি।

তাই থাকবেন। আমায় প্রাইম মিনিস্টারের হট লাইন দিতে বলুন।

বলছি স্যার।

প্রধানমন্ত্রীকে সারাদিন পাহারায় পাহারায় থাকতে হয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সময় কাটাবার একদম সময় পান না। আজ অনেকদিন পরে খাবার টেবিলে বোর্ড পেতে প্রিয়াংকার সংগে ক্যারাম খেলছিলেন। রাহুলকে নিয়ে সোনিয়া তখন গভীর ঘুমে। ঠিক এই সময় কলকাতা থেকে ফোনটা পেলেন।

সব শুনে প্রাইম মিনিস্টার বললেন, বেটার টক উইথ অরুণ।

অরুণ নেহরু বললেন, ডোন্ট ওয়ারি। সব কুছ করায়ত্ত হো জায়েগা। আপ নিশ্চিন্তমে নিদ্ যাইয়ে–

এর পরে কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়। তবু চিফ মিনিস্টার এসে তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়লেন–পাশ বালিশ জড়িয়ে।

অরুণ নেহরুর ঘর থেকে একটা ফোন গেল কমান্ডো হেড কোয়ার্টারে। আরেকটা গেল এয়ার হেড কোয়ার্টারে।

রাত তিনটের ভেতর দমদম এয়ারপোর্টে এয়ারফোর্সের বিরাট এ এন-১২ ট্রান্সপোর্ট প্লেন এসে নামলো। এইসব বিমান থেকেই পাহাড়ি এলাকায় সোলজারদের খাবার হিসেবে আকাশ থেকে প্যারাসুটে বেঁধে ডজন ডজন খাসি নামিয়ে দেওয়া হয়।

এখন সেই বিমান থেকে নামলো–ইস্পাতের পাতের মতো চেহারা–কয়েকজন কমান্ডো। সংগে তাদের নানা রকমের যন্ত্রপাতি। নেমেই তারা কাছে দাঁড় করানো ঢাউস ঢাউস হেলিকপ্টারে গিয়ে চড়ে বসলো। কপ্টারগুলো চালু করাই ছিল। তাদের মাথার ওপরের ডানা শব্দ করে চক্কর খাচ্ছিল। ওরা বসতেই বাজপাখিগুলো হুস্ করে আকাশে উঠলো।

আধঘণ্টার ভেতর দেগংগার কাছাকাছি জুবিলি স্কুলের ছাদে একখানা কপ্টার নেমে পড়লো। আরেকখানা নামলো পুরনো জমিদার চৌধুরীদের পেল্লাই ছাদে। শেষ রাতের দিকে কালাচাঁদের ঘুম ভেঙে গেল।

সারা এলাকার দিশী কুকুর একসংগে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। দিনের আলো ফুটতেই অঘোরবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। মিলিটারি মিলিটারি দেখতে–কিন্তু আসলে মিলিটারি নয়। কোমরে কি সব যন্ত্রপাতি। কানে হেডফোন। কারো কারো মুখে আবার ঝুলন্ত শুঁড় বসানো মুখোশ। গত মহাযুদ্ধের পর এরকম গ্যাসমুখোশ খুব বিক্রি হত বাজারে।

শ'খানেক লোক সারা এলাকা চষে বেড়াচ্ছে। গোড়াতেই অর্ডার হয়ে গেল–কেউ কারও বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারবে না। যে যেখানে যেমন আছো থাকো। অঘোরবাবু অনেক বলে কয়ে তার গাইগুলো চরাতে দিয়ে এল মাঠে।

প্রথম দিনেই কমান্ডোরা সারাটা এলাকা তছনছ করে দিল। কার পিসিমা বারান্দার রোদে কাঁথা মেলে দিয়েছিল শুকোতে। তিন কমান্ডো এসে কাঁথার সব সুতো খুলে নিয়ে পাকিয়ে আন্ডিল করলো। তারপর সেই সুতো কাঁটাওয়ালা একটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পাশ করালো।

কালাচাঁদের মা বড়ি মেলে দিয়েছিল কুয়োতলার ঢিবিতে। কমান্ডোরা এসে বড়িগুলো গুঁড়ো করে মিহি পাউডার বানালো। তারপর সেই গুঁড়ো কী সব কেমিকালে মিশিয়ে কাচের স্লাইডে ঢেলে দেখলো।

জনা ছয় কমান্ডো গরু চরার মাঠের ঘাসের স্যাম্পেল নিল খুব সাবধানে। কেউ নিল পুকুরের জলের স্যাম্পেল। কমান্ডোদের কমান্ডার–জাঁদরেল গোঁপ–কোমরের বেল্টে বিরাট পিস্তল–সে হাঁটু গেড়ে বসে লোকাল ছাগলের শুকনো নাদির স্যাম্পেল কালেক্ট করলো মন দিয়ে।

তাই দেখে কালাচাঁদের বাবা অঘোরবাবু বিড়বিড় করে বলল–আস্ত পাগল!

কালাচাঁদের মা বলল, আস্তে। বেশি কথা বোলো না।

পরদিন কমান্ডোরা যেন ক্ষেপে উঠলো। কেননা–ততক্ষণে তাদের কাছে এয়ার হেড কোয়ার্টার থেকে খবর এসে গেছে–হোয়াইকু বিয়াও ঝান–

কমান্ডোরা সবার গলার স্বর রেকর্ড করতে লাগলো। রেকর্ড করে টেপের পাশে গলার স্বর যার তার নাম, তার বাপের নাম, মৌজা, থানা, গাঁয়ের নাম লিখে রাখতে লাগলো।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা কালাচাঁদের গাইগুলো চরে ঘুরে নিজেরাই যে যার মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরে ডিনারে বসলো।

বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে বাগবাজারের মানুষ। বাগবাজারেই বড় হয়েছেন। কিছুদিন হলো কলকাতার বাইরে বিরাটির কাছাকাছি বাঁদু রোডে নতুন বাড়ি করে এসেছেন। সাবধানী লোক। স্কুল ফাইনালের সব কোশ্চেন তাঁর কাছে। তিনি সেগুলো সিংগিল মিছিল করে রাখতে অফিসের ভল্টে কমপিউটরে চড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাড়ি ফিরেছেন।

ফিরেই টি ভি খুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন।

বসেই তাঁকে স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠতে হলো।

এ কি সর্বনাশ! অফিসে কমপিউটরে চাপানো কোশ্চেনের গোছা থেকে কয়েকখানা কোশ্চেনের ময়লা পাতার ছবি এই মাত্র স্ক্রিনে ফুটে উঠলো। হিস্ট্রি কি লাইভ সায়ান্স—ঠিক বোঝা গেল না। পুরো এক মিনিটও ছিল না ছবিটা। আইদার অর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

বসার ঘর থেকেই ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন বাঁড়ুজ্যেমশাই। রাত ন'টা নাগাদ তিনি বাদুড়বাগানে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ি এসে হাজির।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বাড়ি ছিলেন। বললেন, বসুন। সি এম-কে জানাই।

সি এম-এর সঙ্গে কি কথা হলো—বাঁড়ুজ্যেমশাই জানতে পারলেন না। ফোন নামিয়ে—উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, চলুন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডাকছেন।

মুখ্যমন্ত্রী রীতিমত চিন্তিত হয়ে ঘরে বসে আছেন। ঘরে তখন অন্য কেউ আর নেই। মঞ্জুগোপালের মুখে সব শুনলেন। শুনে চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন—হুম! আপনাদের আসতে বলে আমি হটলাইনে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। এ যা অবস্থা—তাতে তো দেখছি কোনো খবরই আর সিক্রেট রাখা যাবে না। সব ফাঁস হয়ে যাবে। সে দুর্দিনের কথা ভাবলে আমার মাথা ঘোরে।
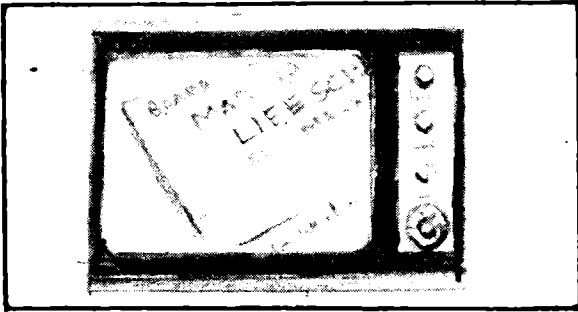
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, স্যার—স্টেট এমপ্লয়িদের শেষ দুই কিস্তি মহার্ঘ ভাতার ফাইলটা কোথায়?

ওটার তো ক্যাবিনেট ডিসিসান হয়ে গেছে। এখন লিক্ হলে কেলেংকারি। সামনে ইলেকশান। আচ্ছা কারা করছে বলুন তো? এর পেছনে খালিস্তানীরা নেই তো?

তাদের লাভ! বরং আমার মনে হয়—এর পেছনে ইজরায়েল, চায়না আর খোদ সি আই এ রয়েছে।

পি এম তাই বললেন একটু আগে হট লাইনে।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, ওরা কি চায় স্যার?

এটাও বুঝলেন না! ওরা চায়—ইন্ডিয়া তামিল রেফিউজির চাপে ভেসে যাক। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ভুল রেডিও মেসেজে দিশেহারা হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ুক। আর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটা ভণ্ডুল হোক।

তাতে ওদের লাভ স্যার?

একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হোক ইন্ডিয়ায়—তাই ওরা চায়। দেশের তরুণ আর কিশোররা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা না দিতে পেরে ক্ষেপে উঠুক। এরোপ্লেনগুলো আছাড় খাক। তামিল উগ্রপন্থীদের বান ডাকুক ইন্ডিয়ায়। বলছিলাম কি—

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বললেন, বলুন না স্যার—

ডি এ নিয়ে ডিসিসনের ফাইলটা একটা বাক্সে ভরে এখনকার মতো লালদীঘির পাড়ে কোথাও কবর দিয়ে রাখুন। সময় হলে আনা যাবে।

বেশ তো।

মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে বললেন, তাহলে যে দুই পেপার কোশ্চেন টি ভি স্ক্রিনে ভেসে উঠেছিল—তা কি বাতিল হবে স্যার?

আলবৎ বাতিল হবে। ফিরে কোশ্চেন করুন। ফিরে ছাপুন। আমি তো প্রাইম মিনিস্টারকে বললাম—এবার বিশ্বকাপ টি ভি-তে দেখানো বন্ধ রাখুন। দেখাবার সময় ওরা যদি কোনো বড় স্টেট সিক্রেট টি ভি স্ক্রিনে ফাঁস করে দেয়—তখন? তখন কি মুখ থাকবে?

টি ভি-তে এই কোশ্চেন ভেসে ওঠার খবরটা চাউর হতে বিশেষ দেরি হলো না। কমান্ডোরা মরীয়া হয়ে উঠলো। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবার তোশক, লেপ, ঘুটের গাদি, পুরনো চিঠির বস্তা, কেরোসিনের টিন নেড়ে ঘেঁটে দেখতে শুরু করলো।

সন্ধ্যে এলেই সবাই তটস্থ। না জানি আজ আবার কী ভেসে ওঠে স্ক্রিনে। কিন্তু অঘোরবাবুর গাইগুলোর কোনো হ্যাং ক্যাং নেই। তারা চরে ঘুরে নিজেদের মতো সার দিয়ে গোহালে ফিরেই জাবনার ডিনারে মুখ নামিয়ে দেয়। পথে ঘাটে এত যে কমান্ডো—জুবিলি স্কুলের ছাদে যে এই হেলিকপ্টার নামছে—এই হেলিকপ্টার উঠছে—সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই।

বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে তাঁর বাঁদু রোডের বাংলোয় বসে বাতিল কোশ্চেন পেপারের জায়গায় ছাপিয়ে আসা নতুন কোশ্চেন পেপার দেখছিলেন। টি ভি-তে ওয়ার্লড্ অব স্পোর্টসে মোটর র‍্যালি দেখাচ্ছিল। এমন সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে মঞ্জুগোপালের চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

তারই হাতে লাইভ সায়ান্সের নতুন ছাপা কোশ্চেন। সেই কোশ্চেনের পয়লা পাতার ছবি টি ভি-তে। একটু মন দিয়ে তাকালে কোশ্চেনগুলোও চেনা যায়। মঞ্জুগোপাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের টি ভি-টা বন্ধ করে দিলেন। দিয়ে তক্ষুণি কলকাতা পাড়ি।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। মঞ্জুগোপাল সাহস করে একাই চিফ মিনিস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কি ব্যাপার?

মঞ্জুগোপাল কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আবার স্যার–

হুঁ। আমিও দেখেছি। এ নিশ্চয় ইণ্টারন্যাশনাল টেররিজম। আমাদের স্টুডেণ্ট উইংগুলোকে কোশ্চেন লিক্ করে নীতিহীনতার দিকে–গণটোকাটুকির দিকে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

এখন তো দেখছি হুড়হুড় করে সব কোশ্চেনই লিক্ হয়ে যাবে স্যার।

টি ভি-টা বন্ধ রাখা যায় না?

কি করে বন্ধ হবে! সামনে যে বিশ্বকাপ ফাইনাল–

স্কুল ফাইনালের আগে না পরে?

অনেক পরে স্যার।

আপনি আজই বেশি রাতে–নয়তো কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি যান। প্রাইম মিনিস্টারকে গিয়ে সব বলুন।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী?

তিনি তো এখন শ্রীনগরে–এডুকেশন কনফারেন্সে আছেন। এখন না হয় কোশ্চেন লিক্ করছে। পরে হয়তো রেজাল্ট লিক্ করে দেবে। এ নিশ্চয় ইণ্টারন্যাশনাল টেররিস্টদের কান্ড–আপনি কালই ভোরে দিল্লি চলে যান।

এদিকে কমান্ডোদের কমান্ডারের সকাল সন্ধ্যে এক কাপ করে চা খাওয়া অভ্যেস। অঘোরবাবু গাই দুয়ে এবেলা আড়াইশো–ওবেলা আড়াইশো দুধ দিয়ে আসেন। কমান্ডারের তাঁবুতে দু'বেলা দুধের যোগান।

সেই দুধের চা খেয়ে কমান্ডার তো অবাক। হাঁটুতে তার এত দিনকার বাতের ব্যথা কোথায় মিলিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে ঘন ঘন ধাতানি আসছে। কি হলো? কি হলো? এ ভাবে কাজ এগোলে দেশের সব সিক্রেট ফাঁস হয়ে যাবে। পাবলিক তো জানবেই। চাই কি শত্রুর হাতে গিয়েও পড়তে পারে। এতদিনে কিছু কিছু নিশ্চয় বর্ডার পেরিয়ে চলেও গেছে। হয়তো ইথার তরঙ্গে আড়ি পেতে চাইনিজ অর্ডার কি করে আমাদের ফাইটার প্লেনের রেডিও চ্যানেলে ঢুকে পড়ে?

রাত এগারোটা। দেগঙ্গার বিখ্যাত মশা উর্দির মোটা কাপড় ফুঁড়ে কমান্ডারের হাঁটুতে, কোমরে কামড়াচ্ছিল। ঘুমের দফা রফা। কমান্ডার এর আগের পোস্টিংয়ে ছিলেন টিবেট বর্ডারে–ম্যাকমোহন লাইনের এপাশে। চোখে ঘুম এলেই সেখানকার ছবি ভেসে ওঠে।

ইন্ডিয়ান আর্মি বর্ডারে মাইন পুঁতে রেখেছে। চীনা চাষী সেপাইরা প্রথমে সেই মাইন পোঁতা জায়গার ওপর দিয়ে গাইগরুর পাল চালিয়ে দেয়। তাদের পেছনে থাকে চাষী সেপাই। মাইন ফেটে কিছু গাইগরু উড়ে যায়। জায়গাটা নিরাপদ হয়ে যায়। তখন সেপাইরা এগিয়ে আসে। তাদের পেছনে থাকে আসল সোলজার। হাতে স্টেনগান। মেশিন গান। এভাবে ওরা সেবারে সেলা অব্দি নেমে এসেছিল।

সেই সব চীনা গরুর চেহারা বেঁটে বেঁটে। টান টান পিঠ। ওদের দুধ দিয়ে কোনোদিন চা খাওয়া হয়নি। খেলে কি বাতের ব্যথা–হাঁটুর রস টেনে যেতো?

কী মনে হওয়ায় বিছানায় উঠে বসলেন। মাথার কাছে সিগনাল টেলিফোন তুলে সরেজমিনে তদন্তের রিপোর্ট চাইলেন।

ঘাস পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? কিছু পাওয়া গেল?

হ্যাঁ স্যার। না স্যার।

কোনটা হ্যাঁ? কোনটা না?

আগেরটা হ্যাঁ স্যার। পরেরটা না স্যার।

ঘুঁটের ছাই?

না স্যার।

ভয়েস টেস্ট?

না স্যার।

এনিথিং মোর?

কয়েকখানা চিঠির ভেতর একখানা চিঠি–

কালই দেখাবে সকালে। না। সকালে নয়। সকালে আমি একটা গরুকে চেক করতে চাই–বেলা দশটায় আসবে।

দড়াম করে ফোন রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন কমান্ডার। তারপর নিজের গালেই চড় মেরে একসঙ্গে দুটো মশাকে মারলেন।

দিল্লিতে সাউথ ব্লকে গিয়ে মঞ্জুগোপাল তাঁর কার্ডের পেছনে লিখে দিলেন–'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব লিক্ থ্রু টি ভি।'

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। প্রধানমন্ত্রী ডাকলেন। তাঁর সামনে মিলিটারি পোশাকে একজন–বুকের কাছে অনেকগুলো তারা। আরেকজন এমনি কোট প্যাণ্ট পরে বসে আছেন। তাকে দেখেই মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে চিনতে পারলেন। পরমাণু কর্তা ডঃ রামান্না। মিলিটারি মানুষটি ঘুরে তাকাতে তাঁকেও চিনলেন মঞ্জুগোপাল। জেনারেল সুন্দররাজ। প্রধান সেনাপতি।

প্রাইম মিনিস্টার শুনলেন সব। শুনে বললেন, তাহলে এবার বিশ্বকাপ আমরা দেখাবো না টি ভি-তে। তখন সারা দেশ হুমড়ি খেয়ে টি ভি-র সামনে বসবে। তখন যদি বড় কোনো সিক্রেট ফাঁস হয়ে যায়–

জেনারেল বললেন, আমরাও খবরটা পেয়েছি। নর্থ ইস্টার্নে আমাদের দশটা মাউণ্টেন ডিভিশন রয়েছে। এনিমি যদি কোনো সিক্রেট পায়–

ডক্টর রামান্না বললেন, আমাদেরও খবর এসেছে। একটা টিম কাল দেগঙ্গা গিয়ে পৌঁছাবে। আই বিলিভ দেগঙ্গা ইজ নিয়ার বারাসাট–

মঞ্জুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়–মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেণ্ট–তিন লাখ স্কুল ফাইনালীর দন্ডমুন্ডের কর্তা। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ভেরি নিয়ার স্যার।

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, আমাদেরও একটা ভুল হয়ে

গেছে–ওখানেই আমরা এশিয়ার টলেস্ট বুস্টার টাওয়ার বসিয়েছি। সায়েদ ডরনা নেহি।

শেষে না সব কোশ্চেন আবার লিক্ হয়–এই ভয়ে মঞ্জুগোপাল বললেন, ওটাকে মাঝখান থেকে ভেঙে আধখানা করে দেওয়া যায় না স্যার?

প্রাইম মিনিস্টার এবারও বললেন,সায়েদ ডরনা নেহি। উই উইল ডু–হোয়াট উই ক্যান ডু–

অঘোরবাবু ভোরবেলা উঠে তার কালো গাই দুইছিলেন। হঠাৎ দেখেন–সামনে দাঁড়িয়ে কমান্ডোদের কমান্ডার। কি ব্যাপার?

দুধটা দেখি।

অঘোরবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, একদম বটের আঠা। এ গাই আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। নয়তো চার মাস গাভিন–এখনো এতটা দুধ দেয়?

কতটা দুধ?

অঘোরবাবু দেখলেন, কমান্ডারের মুখখানা গম্ভীর–গোল চালতার পারা। তা এবেলা ওবেলা নিয়ে চার কিলো। এই দুধ খেয়েই আমার দাঁতের ব্যথা সেরে গেল–

তাই নাকি? আজ আমি সবটা দুধই নেব।

ঘেরো ভর্তি দুধ নিয়ে কমান্ডার তাঁর তাঁবুতে ফিরলেন। এসে দেখেন কীসব যন্ত্রপাতি হাতে জনা তিনেক বসে।

তারা বলল, আমরা অ্যাটমিক–

আর বলতে হবে না। এই দুধটা একবার দেখা দরকার।

ওরা ঘেরো ভর্তি দুধ নিয়ে চলে গেল। তারপর এল চিঠির ঝাঁপি নিয়ে তিন কমান্ডো। এই চিঠিখানা স্যার–বিশেষ করে ঠিকানাটা দেখুন–

ঠিকানা দেখে তো কমান্ডার চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ করে। ইথারবাবা–!

সন্ধ্যের মুখে মুখে গাইগরুরা চরে ঘুরে গোহালে ফিরতেই প্রথমে অ্যারেস্ট হলো কালাচাঁদ। তার পেছন পেছন গরুদেরও অ্যারেস্ট করলো কমান্ডোরা।

অ্যারেস্ট করেই গাইগরু সমেত কালাচাঁদকে চালান দিল তাঁবুতে।

দুধের রিপোর্টও এসে গেল সন্ধ্যে সন্ধ্যে। হাইলি রেডিয়েটেড্। দুধের ভেতর পরমাণু কিলবিল করছে।

তাঁবুর ভেতরেই কালাচাঁদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়ে গেল। গরুদের তো ইন্টারোগেট করা যায় না। পরমাণুর লোকজন ওদের সিংয়ে যেই না গাইগারোমিটার বসিয়েছে–অমনি সারাটা তাঁবুর ভেতর বিপ বিপ আওয়াজ হতে লাগল। লাল কাঁটা খটাক্ করে সবটা ঘুরে গেল।

কমান্ডার বললেন, এ তো সিগনাল পাঠাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটমিকের লোকেরা ফ্লানেলের পটি দিয়ে ওদের সিং ভাল করে মুড়ে দিল। দিয়ে বলল, বলা যায় না–আবার কোন্ সিক্রেট ইথারে পাঠিয়ে রেডিও চ্যানেল, টি ভি চ্যানেল দখল করে রিলে করতে থাকে।

দেশলাই ভিজে। কমান্ডোদের কমান্ডার হেরিকেন কাৎ করে সিগারেট ধরালেন। সুখটান দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা কালাচাঁদকে বললেন, তারপর ইথারবাবা! কাদের হয়ে এসব কাজ চালানো হচ্ছিল!

কালাচাঁদ কিছু না বলে নিজের আকাটা দাড়ি চুলকালো।

কমান্ডোরা বলল, আগে স্যার বুস্টার টাওয়ারটা দেখা দরকার। নিশ্চয় ওখান থেকেই সিগন্যাল রিলে করা হচ্ছিল।

টাওয়ারে উঠে যাও দু'জন। এক্ষুণি।

ঘন্টাখানেকের ভেতর দুই কমান্ডো খানিক সুতোলি সমেত একটা রঙচটা ঘুড়ি নিয়ে টাওয়ার থেকে নেমে এল। সন্ধ্যেরাতের অন্ধকারে।

কমান্ডার ধমকে উঠলেন কালাচাঁদকে। গাইগরুগুলোকে এরকম রেডিও অ্যাকটিভ করার মানে?

তখনো কালাচাঁদ না-কামানো গাল চুলকোচ্ছিল।

কমান্ডার দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, দিল্লিতে রেডিও মেসেজ পাঠাচ্ছি। দেখি কি রিপ্লাই আসে। তারপর তোমার মেরামতি হবে–ভাল চাও তো এক্ষুণি মুখ খোলো।

কালাচাঁদ বলল, আমি কিছুই জানি না স্যার। বাবা বলায়–আমি ওদের রগড়ে ভাল করে চান করিয়েছি খালে–

অ্যাটমিকের লোকরা জানতে চাইল, কোন্ খালে?

ইরিগেশন ক্যানেলে–সবাই যেখানে গরু-মোষ ধোলাই করে।

কমান্ডার জানতে চাইলেন, কি দিয়ে রগড়ালে?

কেন? সারের বস্তা দিয়ে স্যার।

কমান্ডার চোখ টিপলেন। অমনি দু'জন কমান্ডো নিয়ে অ্যাটমিকের লোকজন ছুটলো অঘোরবাবুর গোয়ালে। খানিক বাদে তারা ফিরে এল, কয়েকটা ছেঁড়া সারের বস্তা হাতে।

আলোয় একটা বস্তা তুলে ধরলেন কমান্ডার। তাতে লেখা–সি সি সি পি। তিনি বললেন, হুম। এ যে দেখছি সিনথেটিক বস্তা–রাশিয়া থেকে ইমপোর্ট করানো।

কালাচাঁদ বলল, বাবা আস্ত বস্তা ধরে সার কেনে–

শাট আপ। ধমক দিয়ে কমান্ডার ওয়ারলেস সেটের সামনে বসলেন। সেট চালু করার আগে অ্যাটমিকের লোকদের বললেন, বস্তা, ঘুড়ি, ঘুড়ির সুতো টেস্ট করে দেখুন–

ওরা স্যাম্পেল নিয়ে চলে গেল।

এমন সময় দুই কমান্ডো খটাক্ করে পা ঠুকে একসঙ্গে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

কি ব্যাপার? এখন আমি দিল্লির সঙ্গে কথা বলবো। কোনোরকম ডিস্টারব্যান্স টলারেট করবো না।

গাইগরুগুলো তাঁবু ছিঁড়ে ফেলছে ঢুঁসিয়ে। গোবরে চোনায় রসাতল দশা। টেলিফোনের তার চিবিয়ে চিবিয়ে কেটে ফেলেছে।

তবু তোয়াজ করে যাও। সিং থেকে ফ্লানেলের পটি যেন

খসে না পড়ে। কারও গায়ে হাত দেওয়া চলবে না–

এক কমাণ্ডো বলল, কারও কথা শুনছে না। এখন ওদের ডিনার টাইম স্যার।

এখানে জাবনা পাবে কোথায় ? কিচেন থেকে আলু পটল যা আছে–দিয়ে যেতে থাকো। ওরা যে রেডিও অ্যাকটিভ গাই। ওরাই এ কেসে প্রাইম এভিডেন্স।

কমাণ্ডো দু'জন মনমরা হয়ে ফিরে গেল। কালাচাঁদ দাড়ি চুলকোতে লাগলো। কমান্ডার ওয়ারলেস সেট খুলে নিজের সাংকেতিক নাম বলতে লাগলো–

পিকক্ স্পিকিং। পিকক্ স্পিকিং। হ্যালো দিল্লি। পিকক্ স্পিকিং–

অ্যাটমিকের লোকজন হুড়মুড় করে ছুটে এসে তাঁবুতে ঢুকলো। তারা উত্তেজিত। ঘুড়ি, সুতোলি, বস্তা–সবই রেডিও অ্যাকটিভ স্যার–

দাঁত চেপে কমান্ডার বললেন, সায়লেন্স!

খানিকবাদে ওয়ারলেসে কথাবার্তা শেষ হলে চারদিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। হেলিকপ্টারগুলো গর্জে উঠলো। তাঁবু খুলে ফেলা হতে লাগলো।

আশপাশের লোকজন ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই নিশুতি রাতে স্কুলমাঠ ফর্সা হয়ে গেল। গরুদের ভাগ ভাগ করে তিন হেলিকপ্টারে তোলা হলো। গাই পিছু একজন কমাণ্ডো আর একজন করে অ্যাটমিকের লোক। গরুদের সিং ফ্লানেলের পটি পেঁচিয়ে লিউকোপ্লাস্টার দিয়ে আটকানো। বড় হেলিকপ্টারটায় কালাচাঁদের পাশে বসলেন খোদ কমান্ডার। নিজে পাশে না বসলে যেন ইথারবাবা উড়ে যেতে পারে।

প্রথমে দমদম। তারপর সেখানে সেই এ এন-১২ মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট প্লেনের পেটে তাঁবু, গাইগরু সমেত সবাই দিব্যি ঢুকে গেল।

তখনো আকাশ অন্ধকার। প্লেন এসে নামলো–দিল্লির নতুন ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

প্লেন থেকে নামিয়ে গাইগরুদের তোলা হলো ওয়েপন ক্যারিয়ারে। কালাচাঁদদের চড়তে হলো জিপে। সবটাই ঘটলো শেষ রাতের অন্ধকারে।

আর্মি হেড কোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের টেবিলে ইন্টারোগেশন অফিসারের পাশে সাত সকালে খোদ জেনারেল সুন্দররাজকে দেখতে পেয়ে কমাণ্ডোদের কমান্ডার তো অবাক। স্বয়ং প্রধান সেনাপতি। না জানি কত বড় কেস। চাই কি প্রমোশন নাচছে তার কপালে এ যাত্রায়।

জেনারেল প্রথমেই বললেন, প্রিজনারের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিন।

কমান্ডার ছুটে গিয়ে কালাচাঁদের হাতকড়া খুলে দিলেন।

এবার ওঁকে ভাল করে বসতে দিন।

কমান্ডার অবাক। ভয়ে কালাচাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ।

অনেক হয়রানি গেল আপনার।

কমান্ডার তো হতভম্ব। ঘরের বাইরে গরুগুলো ছাড়া পেয়ে প্রায় একসংগে হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠলো। একজন দেশদ্রোহীকে নিয়ে আর্মি চিফ এ কি আদিখ্যেতা জুড়ে দিলেন? আশ্চর্য!

অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল কমান্ডারের।

জেনারেল বললেন, চা? না, কফি?

কালাচাঁদ কোনোক্রমে বলল, ভোরে আমরা দুধ খাই।

জেনারেল বললেন, আশা করি বুঝতে পারবেন—এই গাইদের দুধ কেন আপনাকে দেওয়া যাবে না!—আপনার অজানা কিছুই নেই তা আমরা জানি।—বলেই অর্ডারলিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন জেনারেল।

এক কিলো দুধ ধরে এমন একগ্লাসে দুধ এসে গেল। সংগে সংগে কালাচাঁদ চোঁ চোঁ করে দুধটা মেরে দিল।

তখন জেনারেল বলে চলেছেন, কেটলিতে ফুটন্ত জল দেখে একদিন বাষ্পের শক্তির আন্দাজ করেছিলেন একজন মহান বিজ্ঞানী। তার ফলে আমরা পেলাম স্টিম ইনজিন। এ ভাবে গ্রাহাম বেল, টমাস এডিসন আলভাদের মতো বিজ্ঞানীদেরও নাম করা যায়। আপনি জানেন না—আপনার অজান্তে আপনি আপনার দেশের মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারে কত বড় নোহাউ আবিষ্কার করে বসে আছেন। প্রাইম মিনিস্টার কাল গভীর রাতে আমায় ডেকে পাঠান। এতক্ষণে নিশ্চয় অর্ডার সই করেছেন তিনি। আজ থেকে আপনি ইন্ডিয়ান আর্মির অনারারি লেফটেনান্ট কর্নেল।

কমান্ডারের চেয়েও বেশি অবাক স্বয়ং কালাচাঁদ। সে একদম বোবা হয়ে গেল।

তখনো জেনারেল সুন্দররাজ হেসে হেসে বলে চলেছেন—ক'মাস আগে রাশিয়ার চেরনোবিলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে। তার কাছাকাছি কৃষ্ণ সাগরের বন্দর ইলিয়েভিচে দু'খানা ইন্ডিয়ান জাহাজ চা আর গম নামিয়ে দিতে যায়। ফেরার পথে ওরা চেরনোবিলের স্ল্যাগ থেকে বানানো সারভর্তি বস্তা বোঝাই দিয়ে ফিরেছিল। এই সার ইন্ডিয়ার যেখানে যেখানে গেছে—তার ভেতর দেগংগাও ছিল। অ্যাটমিক এনার্জির তদন্ত রিপোর্ট, বৃস্টার টাওয়ারে লটকানো ভোকাট্টা ঘুড়ি আর সুতোলি—এমনকি গাইগরুদের সিং ওই সারের বস্তা দিয়ে রগড়ে চান করানোর স্টোরিও আমাদের সিচুয়েশন রুমে এসে যায় রাত এগারোটার ভেতর। তখনই আমরা রেডিও অ্যাকটিভ সিং, সুতোলি, ঘুড়ি আর বস্তার রহস্য ভেদ করি।

শুনতে শুনতে কালাচাঁদের মাথা গুলিয়ে গেল।

জেনারেল বললেন, র, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স—সবাই ভেবে ভেবে মাথা খাটিয়ে খেলছিল। বাই জোভ! গাই কি করে স্পাই হয়! ক্লুটা আমার মাথায় এসে গেল রাত যখন প্রায় বারোটা। আর তখনই বুঝলাম—এবার বর্ডারে এনিমির বিরুদ্ধে আমরা যদি হিউম্যান ওয়েভের পর ওয়েভ পাঠাই তো—এনিমির মতো সবচেয়ে আগে যাবে বড় সিংয়ের গাইগরু—আর সে গাইগরুর সিং থাকবে রেডিও অ্যাকটিভ—যা কিনা এনিমির রেডিও ওয়েভ ভুলভাল, আনতাবড়ি সিগন্যাল পাঠিয়ে বানচাল করে দেবে—ওরা ঘাবড়ে যাবে। আপনার জন্যেই আমরা এখানে টেক্কা দিতে পারবো। এনিমিকে ঘাবড়ানো সম্ভব হবে।

ক্লুটা মাথায় আসতেই আমি নিজে পি এম-কে সব জানিয়ে ফোন করি। আধঘন্টা পরে পি এম নিজে আমায় ডেকে পাঠান।

এখন পাঠকদের আশা করি বুঝতে অসুবিধে হবে না—কেন গোড়ায় টি ভি-তে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখানো স্থির ছিল না। কেনই বা এবার গোড়াতেই নম্বর সমেত স্কুল ফাইনালের গেজেট বের করা হয়নি। কেনই বা বিশ্বকাপ ফাইনালের পর স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বের করা হলো।

সব কিছু গোপন জিনিস ঘন ঘন টি ভি-তে লিক্ হয়ে যাচ্ছিল দেখে বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট মঞ্জুগোপাল বাঁড়ুজ্যে ভয়ংকর আতংকে ভুগছিলেন। ভয় থেকে এত সব ভন্ডুল।

এবার স্বাধীনতা দিবসে টি ভি-তে সবাই নিশ্চয় দেখেছেন—প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে কালাচাঁদ পি' ভি এস এম পদক নিচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কালাচাঁদের বুকে পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল লটকে দিচ্ছেন। মিলিটারির এক নম্বর মেডেল। টি ভি-র স্ক্রিন জুড়ে লেফটেনান্ট কর্নেল কালাচাঁদ পি ভি এস এম-এর বুকে মেডেলখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিল। পরদিন কাগজেও বেরিয়েছিল—র‍্যানডম রেডিও ওয়েভ চ্যানেল আবিষ্কর্তার বিশেষ সম্মান।

ছবি : রাহুল মজুমদার

দাদু ও নাতনি

অন্নদাশঙ্কর রায়

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ !
তোমরা তখন করছিলে কী
ভাঙল যখন বঙ্গ ?

দিদি, আমরা তখন করতেছিলুম
ভা'য়ে ভা'য়ে দঙ্গ
আপন যদি পর হয়ে যায়
ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ !
দঙ্গ কেন করতে গেলে
কাটতে দিলে অঙ্গ ?

দিদি, আস্ত কেক খাবে বলে
পণ করেছে কঙ্গ
লীগ বলেছে, কাটতে হবে,
নইলে হবে জঙ্গ ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ !
ইঙ্গ ছিল রাজা, সে কি
বাধতে দিত জঙ্গ ?

দিদি, রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে যে তার
অন্যরকম ঢঙ্গ ।
দুই শরিকের খাঁই মেটাতে
রাজ্য হলো ভঙ্গ ।

দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
দাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ
তাই যদি হয় তবে কেন
লড়লে রাজার সঙ্গ ?

দিদি, স্বপ্ন ছিল আমরা পাব
সিন্ধু থেকে গঙ্গ
সিন্ধু গেছে গঙ্গা আছে
স্বপ্ন হলো ভঙ্গ ।

ছবিঃ দিলীপ দাস
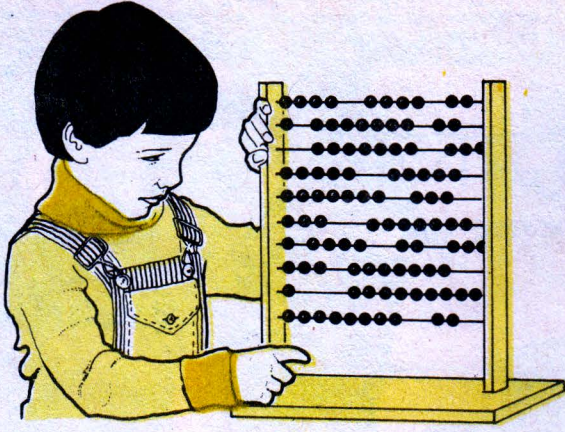
আবাকাস কি ভাবে হিসেব কষে

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বেশ কয়েক বছর আগে টোকিওতে একটি প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতাটি গণনা নিয়ে। প্রতিযোগীদের একজন মার্কিন সেনাবাহিনীর এক সৈনিক এবং আরেকজন জাপানি ডাকঘরের এক কর্মচারি। সেই গণনা প্রতিযোগিতায় মার্কিন সেনাটির হাতে ছিল বিদ্যুৎ-চালিত এক সর্বাধুনিক গণনাযন্ত্র আর জাপানি প্রতিযোগীটি ব্যবহার করেন একটি আবাকাস। আবাকাস অতি প্রাচীন। এর মূল চেহারাটার দু'হাজার বছরেও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সেই প্রতিযোগিতাটি সব রকম গণনা নিয়েই করা হয়েছিল—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। দেখা গেল যোগ বিয়োগে আবাকাসের জয়। ভাগেও আবাকাস এগিয়ে রইল। কেবল গুণের বেলায় আবাকাসের অল্পের জন্যে পরাজয়।

এই যে আবাকাস, এ দেখতে কি রকম? কি এমন জিনিস

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে প্রাচীন কালের আবাকাস এখনও আধুনিক ক্যালকুলেটারকে পাল্লা দিয়ে চলে।

আবাকাস কাজ করে কি ভাবে?

এটি, যা আজও চীন জাপানের ব্যবসায়ী এবং দোকানদারেরা তাদের হিসেব রাখার কাজে ব্যবহার করে?

আবাকাসের কাঠামোটিতে আছে কয়েকটি দণ্ড আর সেই সঙ্গে ছোট ছোট গুটি। গুটিগুলি স্থির নয় এবং দণ্ডের ভেতরে এই গুটিগুলিকে ইচ্ছেমতো ওপর-নিচ করানো যায়।

সাধারণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আজ পর্যন্ত কত রকম আবিষ্কারই না হয়েছে। আবাকাস এই রকমই একটা আবিষ্কার। এই সামান্য আবিষ্কারে সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এত সহজেই করা চলে যে, বহু সভ্যতার হাত ঘুরে এ আজও টিকে রয়েছে।

প্রাচীনকালে রোমানদের মধ্যে আবাকাসের প্রচলন ছিল। আঙ্গুল দিয়ে যে সংখ্যার হিসেব তা কোনো না কোনোভাবে আজও চালু আছে, কিন্তু তার শুরু বহুকাল আগে। প্রাচীন রোমানদের মধ্যেও তার প্রচলন ছিল। কিন্তু সে হিসেব-নিকেশে যতটা সময় লাগে আমাদের ধরিত্রীর বুকে বালির উপরে বা ধুলোর উপরে আঙ্গুল দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে আঁচড় কেটে সে হিসেব করা যায় তুলনায় তাড়াতাড়ি। আর এই ভাবেই হলো আবাকাসের সূচনা। আজ যে কোনো হিসেব নিকেশে মনের সঙ্গে আছে কাগজ কলম, কিন্তু যে যুগে মন ছাড়া কাগজ কলম কিছু ছিল না, সে সময় ধুলো-বালিতে আঁচড় কেটেই কাগজ কলমের অভাব মেটাতে হত।

কিন্তু এইভাবে বেশিদিন চলে না, চললোও না। লিখবার জন্যে যে বালির ব্যবহার তার বদলে এল কাঠের ফ্রেম। গণনার জন্যে এল নুড়ি বা পাথর কুচি। পাথর কুচিকে বলা হত Calculi ; এই Calculi শব্দ থেকেই Calculation, Calculus প্রভৃতি ইউরোপীয় শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। Calculation শব্দের মানে হল গণনা।

প্রাচীন রোমকরা যে আবাকাস ব্যবহার করতো, তা কি রকম ছিল?

সেখানে ভগ্নাংশও ব্যবহার করা হত। কিন্তু ভগ্নাংশের কথা বাদ দিয়ে এখানে শুধু পূর্ণসংখ্যার কথা বলা যাক। পূর্ণসংখ্যার হিসেবের জন্যে বাম থেকে ডাইনে আর উপর থেকে নীচে পরপর সাতটা সমান্তরাল রেখা টেনে সাতটা সারি ও সাতটা স্তম্ভ রাখা দরকার। আর এই স্তম্ভগুলির সপ্তম থেকে প্রথম পর্যন্ত পরপর একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি বোঝায়। এখন সাতটি স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর নীচের ভাগে চারটি করে গুটি, উপরের ভাগে একটি।

হিসেবের সময়ে নীচের গুটিগুলির মান বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু উপরের গুটিগুলির মানের হিসেব করা হবে কি করে?

যে কোনো স্তম্ভের উপরের গুটির মান, সেই স্তম্ভের পাঁচগুণ বৃহৎ সংখ্যা। তাহলে এককের স্তম্ভে ওই গুটির মান হবে ৫, দশকের স্তম্ভে ৫0, শতকের স্তম্ভে ৫00।

তারপর এক সময় এল ইউরোপীয়রা যখন আরবিক সংখ্যার ব্যবহার করতে শুরু করল। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, আর 0 নিয়ে সংখ্যা লিখবার যে পদ্ধতি আমরা সবাই জানি, যে পদ্ধতি আজ সারা পৃথিবীতে চলে, আরবিক সংখ্যা লেখায় সেই পদ্ধতিই আছে। শুধু আরবিক সংখ্যার সাহায্য নিলেই তো চলবে না, লিখবার সাজ-সরঞ্জামও পেতে হবে। তা না হলে কিসে লিখবো কী দিয়ে লিখবো? কিন্তু তাও এক সময়ে চালু হওয়ার সংগে সংগে সব কিছু যখন সুলভ আর সহজ হয়ে উঠল তখন আবার আবাকাসের ব্যবহার কমে এল। তবু আবাকাস আজও অনেক দক্ষ লোকের হাতে সবচেয়ে দ্রুত চলে এমন গণকযন্ত্র।

আজ যে ধরনের আবাকাস চলছে, তার বৈশিষ্ট্যের কৃতিত্ব খুব সম্ভব চীন দেশেরই পাওয়ার কথা।

এখন ১৮৫২ রোমক আবাকাসে সাজাবো কি ভাবে?

নিচের	বাম	দিক	থেকে	চতুর্থ	সারির	একটি	গুটি	উপরে	১000
উপরের	বাম	দিক	থেকে	পঞ্চম	সারির	একটি	গুটি	উপরে	৫00
নিচের	বাম	দিক	থেকে	পঞ্চম	সারির	তিনটি	গুটি	উপরে	৩00
উপরের	বাম	দিক	থেকে	ষষ্ঠ	সারির	একটি	গুটি	উপরে	৫0
নিচের	বাম	দিক	থেকে	সপ্তম	সারির	দুটি	গুটি	উপরে	২
									১৮৫২

১নংচিত্র　　রোমক আবাকাসে ১৮৫২

আবাকাস নানা ধরনের পাওয়া যায়। সাধারণ আবাকাসের প্রতিটি দণ্ডে নটি করে গুটি থাকে।

প্রথম দণ্ডের গুটি দিয়ে এককের হিসেব, দ্বিতীয়টিতে দশক, তৃতীয়তে শতক আর এইভাবে পর পর হিসেব করা হয়।

কিন্তু সংখ্যার হিসেব নিকেশে আবাকাস ব্যবহার করতে হয় কী ভাবে?

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

আবাকাস হাতে নিয়ে এককের দণ্ডের তিনটে গুটি সরালাম, দশকের চারটে এবং শতকের ছ'টি। তাহলে ফল কি হলো?

ফল হলো ৬৪৩।

যদি এককের দণ্ডের আরও চারটে গুটি সরাই! তাহলে ৬৪৩ এর সংগে আরও ৪ যোগ হবে।

তখন ফল হবে ৬৪৭।

না, এখানেই না থেমে আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।

সহস্রের ঘরের একটা গুটি সরানো যাক এবার।

এখন ফল নিশ্চয় হবে ১৬৪৭।

যেমন যোগ, তেমনি বিয়োগ।

যোগের বেলায় বিভিন্ন দণ্ডে গুটি উপরে তুলেছিলাম। বিয়োগের বেলায় গুটি নামিয়ে আনতে হবে।

যদি ১৬৪৭ থেকে ৬00 বিয়োগ করার কথা বলি, তাহলে কি করবো?

শতকের দণ্ডের ছটি গুটি নামিয়ে আনবো। উপরেও তুলেছিলাম ছটা গুটি। ছটাই নামিয়ে আনার জন্যে ফল শূন্য শতকের ঘরে। বিয়োগফল তাই ১0৪৭।

অনেক সময়ে দেখা যায়, হিসেব নিকেশে যে সংখ্যাটি আসছে দণ্ডে হয়তো ততগুলি গুটিই নেই। হয়তো এককের দণ্ডে ছটা গুটি সরানো হয়ে গেছে। কিন্তু আরও ৭ তার সংগে যোগ করতে হবে। এদিকে হাতে রইল মাত্র ৩।

তখন কি করবো?

শুধু তিনটে গুটি থাকলেও হিসেব করা কঠিন হয়।

এককের দণ্ডের শেষ তিনটি গুটি এক, দুই, তিন করে সরানো যাক। আর কিছু নেই। তাহলে এরপর এককের দণ্ডের নটি গুটিই নামিয়ে আনা হবে। এখন দশক দণ্ডের একটি গুটি উপরে নিয়ে যাওয়া যাক। এককের দণ্ড আবার ভর্তি। সেই দণ্ড ধরে পাঁচ, ছয়, সাত গুনতে গুনতে তিনটে গুটি উপরে নিয়ে যেতে হবে।

তাহলে কি হল?

দশকের একটি গুটির সংগে এককের তিনটে গুটি মিলল। দশকের গুটির জন্যে ১0 আর এককের ৩, ফল ১৩।

চীনা আবাকাসে 000৩৫৬১৪ এর হিসেব

৩নং চিত্র

জাপানী আবাকাসে 00১২৪৫৮৯ এর হিসেব

এই হলো আবাকাসের সাহায্যে হিসেবের মূল কথা।

আধুনিক আবাকাসের চেহারাটা কি রকম?

চীন জাপানে এখন যে আবাকাসের ব্যবহার তাতে কিন্তু ন'টা গুটি নেই। তবু এই ন'টা গুটির ধারণাকে নিয়ে আসা হয়েছে কায়দা করে।

চীনের আবাকাসটির কথা বলা যাক।

সেটিতে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ প্রভৃতির যে দন্ড, তার উপর দিকে আড়াআড়িভাবে একটা দন্ড আছে। তাহলে এই আড়াআড়ি দন্ড, প্রতিটি লম্বালম্বি দন্ডকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। এই দু'ভাগের উপর ভাগে আছে দু'টি করে গুটি আর নীচের ভাগে পাঁচটি। দন্ডের উপরের প্রত্যেকটি গুটি নিচের পাঁচের সমান।

গোনা শুরু করার আগে নিচের গুটিগুলি নিচে আর উপরের গুটি থাকবে উপরে।

এককের ঘরে গোনা শুরু করলাম। নিচের গুটিগুলি উপর থেকে এক এক করে গুনতে শুরু করলাম। কিন্তু সেখানে তো পাঁচের উপরে নেই। তাই পাঁচ পর্যন্ত গোনার পরে গুটিগুলি আবার নামিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু পাঁচ পর্যন্ত হিসেব রাখা হবে কি ভাবে?

এককের দন্ডে উপরদিকে যে গুটি দুটি আছে তার নিচেরটি আড়াআড়ি দন্ড বরাবর নামিয়ে এনে পাঁচের হিসেব রাখলাম। ছয়, সাত, আট, নয়ের হিসেব রাখার সময়ে পাঁচের পর থেকে গুনে যাবো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচের বেলায় যেমনভাবে গুনেছি তেমনি করে। তার আগে আড়াআড়ি দন্ডের তলার গুটিগুলি আবার নিচে নামিয়ে নেবো।

যে কোনো সংখ্যাকে আমরা একইভাবে সাজাতে পারি। এককের, দশকের, শতকের বা যে কোনো ঘরের হোক।

কিন্তু দুটো সংখ্যার যোগের বেলায় যখন তা দশকে ছাড়িয়ে যাবে, তখন কি হবে?

তখন পরের দন্ডের নিচের গুটিগুলির উপরের গুটিটাকে
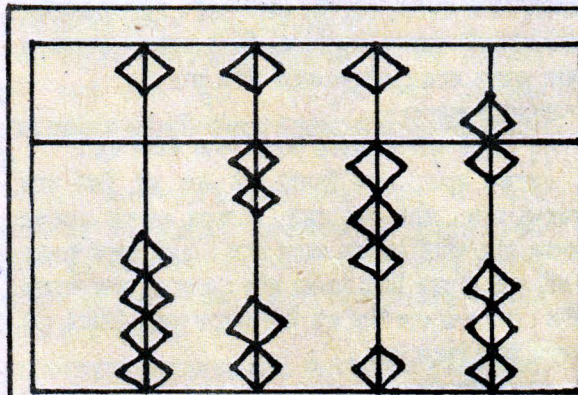
যোগের আগে ২৩৬ ৪নং চিত্র যোগের পরে ৫০৮
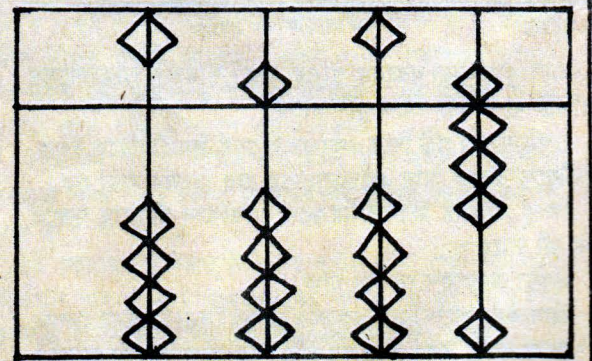
তুলে দেবো হাতে এক রইল এই হিসেবে। তারপর আগের মতন আবাকাসের নিয়মে যোগ।

আবাকাসে বিয়োগের বেলায় আমরা কি করবো? যোগে যা করি তা তো আমরা দেখলাম। যোগে গুটি যোগ করা হলে বিয়োগে গুটি বাদ দেওয়া। আর গুণ তো ধারাবাহিক যোগ, ভাগ সে রকম ধারাবাহিক বিয়োগ। সেইজন্যে আবাকাসে যোগ বিয়োগের সঙ্গে গুণ ভাগও করা যায় সহজে।

জাপানি আবাকাস ঠিক চীনের মতো নয়। তাতে আড়াআড়ি দণ্ডের নিচে চারটে গুটি। দণ্ডের উপরে এক, সবশুদ্ধ পাঁচ। এতে উপরের গুটিটাকে নিয়েই পাঁচ গণনা। আর উপরের গুটিতেই পাঁচের হিসেব।

চীন জাপানের আবাকাসে দুটো সংখ্যার হিসেব দেখে নেওয়া যাক।

চীনের আবাকাসে যে সংখ্যার হিসেব তা হলো ৩৫৬১৪। আরও ঠিকভাবে বললে তা বলা যায় ০০০৩৫৬১৪। জাপানী আবাকাসের সংখ্যা সেইভাবে ১২৪৫৮৯ বা ০০১২৪৫৮৯।

এবার জাপানি আবাকাসে কটা সংখ্যার হিসেব দেখিয়ে দুটো সংখ্যা যোগ করা যাক।

জাপানি আবাকাসে ১, ২, ৭, ১৪, ২৭ আর ৩৪৫ নিশ্চয়ই ঠিকমতো সাজাতে পারবো।

কিন্তু শুধু সংখ্যা নয়, ২৩৬-এর সঙ্গে ২৭২-ও যোগ করবো সহজে।

জাপানিদের যোগ করার রীতি বামদিক থেকে ডাইনে। একেবারে বাঁ দিকের ছবিতে ২৩৬। আবাকাসের বাঁ দিকের দ্বিতীয় দণ্ডটি শতকের ঘর। ২৭২ যোগ করা মানে ২০০, ৭০ আর ২ যোগ করা। এখন ২০০ বাড়ানো মানে শতকের ঘরে দুটো গুটি উপরে তুলতে হবে। তোলা হলো। তাহলে শতকের ঘরের নিচের চারটে গুটিই উপরে। এর সঙ্গে ৭০ বাড়ানো মানে দশকের ঘরে সাতটা গুটি তুলতে হবে। কিন্তু সাতটা গুটি কোথায় সেখানে? কি করা যায় তাহলে?

এখন যদি একশো বাড়িয়ে তিরিশ কমানো যায়, তাহলে তাই তো সত্তরের সমান হবে। একশো বাড়ানো মানে শতকের ঘরে আবার হাত লাগানো। নিচের চারটে গুটিই তোলা হয়ে গেছে। তাহলে আর একশো যোগ করা মানে উপরের গুটিটা নিচে নামাবো। দশকের ঘরের তিনটে গুটি নামালাম। আর এককের ঘরে দুই যোগ করার জন্যে দুটো গুটি পাওয়া যায়। তাহলে সেখানে কোনো সমস্যাই নেই।

এখন ডানদিকের আবাকাসটির দিকে তাকানো যাক। যে ফল দেখা যাচ্ছে আবাকাসে তা হলো ৫০৮।

আমরা কি কোনো কার্ডের উপরে দাগ কেটে গুটির বদলে পয়সা রেখে আবাকাসের নিয়মে হিসেব-নিকেশের চেষ্টা করতে পারি?

উলটোডিঙির ফুলটুমামা

শ্যামলকান্তি দাশ

উলটোডিঙির ফুলটুমামা
থাকেন দুধেভাতে,
সাতপুরুষের কথা শোনান
তোতলাতে-তোতলাতে।
বেঁটেবাঁটুল ফুলটুমামার
বুদ্ধি ক্ষুরধার,
আড়বাঁশিতে ভৈরোঁ বাজান
ভারী চমৎকার।
সবই ভাল ফুলটুমামার
রঙটা যা মিশমিশে,
ফি-বছরই ভোগেন তিনি
এনকেফেলাইটিসে।
প্রতিভা তাঁর এত বিশাল
তারই ছটা লেগে,
সুতানুটি গোবিন্দপু[illegible]
গ্রাম [illegible]

দুপুররাতে আঁকেন তিনি
কচু-ঘেঁচুর ছবি,
সাতসকালে সাঁতরে আসেন
যমুনা-জাহ্নবী।
যখন-তখন শূন্যে ওড়ান
জ্যান্ত হাতি-ঘোড়া,
এত পেরেও ফলটুমা[illegible]
ক[illegible] পোড়া।
পোড়া কপাল [illegible] হলে কি
গুবরেপো[illegible] দেখে,
কেউ কখনো পিট্টান দেয়
উলটোডিঙি থেকে।

ছবি: দিলীপ দাশ

অদৃশ্য মানুষের হাতছানি

সমরেশ বসু

সেবার গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গেছল দার্জিলিংয়ে। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এর আগেও গোগোল দার্জিলিং গেছে। তখন যে-ঘটনা ঘটেছিল, তা এতদিনে সবাই জেনেও গেছে। দু বছরের আগের ঘটনাটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। যে-ঘটনা লোকজনের মধ্যে জানাজানি হয় নি। কোনো রকম হৈচৈও হয় নি। সেজন্যই ঘটনাটার কথা সাধারণ লোকে কিছু জানতে পারে নি।

ঘটনাটা একরকম ভূতুড়ে ঘটনা বললেই চলে।

সেবার দার্জিলিংয়ে যাবার, আগে থেকে কোনো কথা ছিল না। পুজোর ছুটিতে কোথাও যাওয়া হবে না, সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে, পুজোর ছুটির মাত্র দিন সাতেক বাকি থাকতে, হঠাৎ একটা নিমন্ত্রণ জুটে গিয়েছিল। বাবার এক বন্ধু, হাইকোর্টের তিনি একজন ব্যারিস্টার। বাবারই বয়সী। ভদ্রলোকের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিংয়ে, ম্যালের আগে একটু নিচেই, হাসপাতালের খুব কাছেই, তাঁর পিতামহের আমলের একটি বাড়ি ছিল। নীলমাধববাবুর বাবাও ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র। নীলমাধববাবু নিজেও তাঁর বাবার একমাত্র ছেলে। সেই সূত্রেই, দার্জিলিংয়ের বাড়িটি তিনি পেয়েছিলেন।

গোগোল শুনেছে, বাবার সেই ব্যারিস্টার বন্ধু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অনেকবার বাবাকে সপরিবারে দার্জিলিংয়ে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবা সময় করে উঠতে পারেন নি। বছর দুয়েক আগে, বাবা সেবার অফিসের কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ছুটি নিতে পারেন নি। সেজন্য পুজোর পরে, অফিস থেকে ছুটি পেতে তাঁর অসুবিধা ছিল না। আর তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধুর তখনও হাইকোর্ট বন্ধ। তিনি বাবাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

পুজোর ছুটির পরেই, সাধারণতঃ বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে। সেজন্য মা গোগোলের পড়ার ব্যাপারে, প্রথমে

একটু আপত্তি তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নীলমাধববাবু মাকে বলে রাজি করিয়েছিলেন। আর তিনি মাকে রাজি করিয়েই, বাবার সম্মতি পেয়ে, নিজের থেকেই বাগডোগরা পর্যন্ত প্লেনের টিকেট কেটেছিলেন। বাবা ট্রেনেই যাবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন, আর সেই মতো ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু নীলমাধববাবু বাবাকে বলেছিলেন, "পুজোর ছুটিটা এখনো রয়েছে বলে, ট্রেনে টিকেট পাওয়া একটু মুশকিল আছে। তাই আমি প্লেনের টিকেটই কেটেছি। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমরা দার্জিলিং পৌঁছে যাব।"

বাবা বাধ্য হয়েই প্লেনে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুকে, গোগোলের হাফ টিকেট নিয়ে, আড়াইটি টিকেটের টাকা দিতে গিয়েছিলেন। নীলমাধববাবু তাতে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "সমীরেশ, তোমার জন্য আমি টিকেট কেটেছি, তার জন্য তুমি আমাকে টাকা দেবে? আর সে-টাকা আমি নেব। তুমি তা ভাবতে পারলে?"

বাবা তবুও তাঁর বন্ধুকে টাকাটা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নীলমাধববাবু টাকা নেন নি। অবশ্য নীলমাধববাবু খুবই বড়লোক, আর বাবার ছেলেবেলারই বন্ধু। গোগোলকে বলা হয়েছিল, ও যেন নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি কাকা বলে ডাকে।

গোগোল তারপরে শুনেছিল, নীলমাধব কাকা বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কাকীমা বেশী দিন বাঁচেন নি। তিনি আর বিয়ে করেন নি। তাঁর কোনো ছেলেমেয়েও ছিল না। অথচ লোকজন নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। গোগোলের সংগে পরিচয় হয়ে যাবার পরেই, দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ব্যানার্জি কাকার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। দমদম থেকে, বাগডোগরায় প্লেনে যেতে সময় লেগেছিল মাত্র চল্লিশ মিনিট। বাগডোগরায় ব্যানার্জি কাকা খবর দিয়ে, আগেই একটি গাড়ি রেখে দিয়েছিলেন। তখন বেলা দশটায় দমদম থেকে বাগডোগরার প্লেন উড়তো। বেলা একটাতেই গোগোলরা দার্জিলিং পৌঁছে গেছল। ট্রেনে করে যাবার মধ্যে দু রকমের আনন্দ আছে। দিনের বেলা গেলে, মাঠ ঘাট গ্রাম নদী, অনেক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। আর রাত্রের গাড়িতে গেলে, তারও একটা মজা আছে। গোগোলের ট্রেনে ঘুম এলেও, বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারে না। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। আর জেগে উঠে, হঠাৎ মনে করতে পারে না, ও কোথায় আছে। তারপর ট্রেনের শব্দে আর ঝাঁকুনিতে টের পায়, ও চলেছে রাত্রের রেলগাড়িতে। টের পেয়েই, আবার শুয়ে পড়ে। আবার ঘুম ভেঙে যায়। যেন একটা স্বপ্নের খেলার মধ্য দিয়ে, ভোরের আলোয়, হঠাৎ এক নতুন দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ট্রেনে যাবার সেই ভালো লাগা একরকম। প্লেনে যাবার মজা আর একরকম। সেবারই অবশ্য গোগোলের প্রথম প্লেনে ওড়া ছিল না। আগেও প্লেনে উড়েছে। পরেও বেশ কয়েকবার উড়েছে। প্লেনে জানালার ধারে বসে যেতে পারলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। তার মধ্যেও একটা মজা আর উত্তেজনা আছে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে, নীচের অনেক কিছুই দেখা যায়। যেমন নদী, জংগল, চাষের মাঠ, রেল লাইন, রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলা ট্রেন, রাস্তা, রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটা মোটর গাড়ি, সবই খুব ছোট আকারে দেখা যায়। গ্রামের পরে, হঠাৎ কোনো শহর বা কারখানা এলেও চোখে পড়ে। আবার প্লেন যখন কাৎ হয়ে যায়, তখন মনে হয়, এক দিকের নীচের ভূমি একদম আবছা হয়ে যায়। উল্টো দিকের জানালায় চোখ পড়লে, নীচের আর এক দৃশ্য। বড় নদীগুলোকে দেখায় যেন বিরাট আঁকাবাঁকা অজগরের মতো। সেই অজগরের বুকে, খুব ছোট পুতুলের মতো নৌকোও ভাসতে দেখা যায়। কোনো কোনো জায়গায় নদী এত চওড়া, বহুদূর পর্যন্ত তার বালির চড়া দেখা যায়। আর ছোট নদীগুলো ছোট সাপের মতো দেখায়। সেবার ব্যানার্জি কাকার সংগে অক্টোবর মাসের একেবারে শেষ দিকে যাওয়া হয়েছিল। আকাশ এত পরিষ্কার ছিল, বাগডোগরায় নামার আগেই, বরফ ঢাকা কাঞ্চনজংঘা পরিষ্কার দেখা গেছল। প্লেনে যাবার মজাটা হলো, অনেকটা পথ আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। দার্জিলিং মেলে যেতে হলে, সন্ধ্যা রাত্রি থেকে, শিলিগুড়ি পৌঁছতেই সকাল হয়ে যায়। তারপরে গাড়িতে দার্জিলিং পৌঁছানো। অবশ্য, দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে গোগোল চেপেছে। জীপ বা মোটর গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে, ওতেই আনন্দ বেশী, তবে টয় ট্রেনে যেতে সময় বেশী লেগে যায়।

দুবছর আগে, ব্যানার্জি কাকার সংগে, কলকাতার বাড়ি থেকে, সকাল সাড়ে আটটায় গাড়িতে বেরিয়ে, প্লেনে উড়ে, বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং পৌঁছেছিল বেলা একটায়। ম্যালের বাঁ পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে নেমে, বাঁ দিকে ঘুরে হাসপাতালের দিকে গেছে। হাসপাতালের সামনে থেকেই, একটা প্রায় কুড়ি গজ চওড়া রাস্তা সোজা ব্যানার্জি কাকার বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে গেছল। গেটটা খোলাই ছিল। আর একজন নেপালী মহিলা দরজার সামনে হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়িটা সোজা, শান-বাঁধানো চত্বরে ঢুকে গেছল। ব্যানার্জি কাকা গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন। দরজা খুলে নামতেই, নেপালী মহিলা কপালে দুহাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে কী যেন বললেন। গোগোলদের জানালার কাঁচ তোলা ছিল। তাড়াতাড়ি কাঁচ নামিয়ে দিয়েছিল। ব্যানার্জি কাকাও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। যে-ভাষায় নেপালী মহিলার সংগে কথা বলেছিলেন, গোগোল তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে নি। বাবা বলেছিলেন, ব্যানার্জি কাকা নাকি নেপালী ভাষাতেই মহিলার সংগে কথা বলেছিলেন।

গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছিল। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে, পাহাড়ের নীচে তখনও গরম ছিল। কিন্তু মা আগে থেকেই সকলের জন্য গরম জামা আর শাল বের করে রেখেছিলেন। গাড়ির কাঁচ বন্ধ থাকলেও, কার্শিয়াং আসার আগেই, গোগোল একটা ফুল হাতা সোয়েটার গায়ে দিয়েছিল। দার্জিলিংয়ে পৌঁছে ওর আর তেমন শীত করে নি। রোদ ছিল বেশ ঝকঝকে। আকাশ ছিল নীল।

ব্যানার্জি কাকার বাড়িতে ঢোকার সামনে, বাঁধানো চত্বরটা বেশ বড়। সামনেই কাঁচের মস্ত বড় দরজায়, অনেকটা আয়নার মতোই, গোগোলরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছিল। ওটাই ছিল বাড়ির ভেতরে ঢোকবার দরজা। ঢোকবার দরজার পাশেই ছিল আর একটা ঘর। কাঠের দেয়ালের সেই ঘরটার দরজা ছিল খোলা। ভেতরে দেখা যাচ্ছিল, একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার। কিন্তু লোকজন কেউ ছিল না। একটা জানালার কাঁচের পাল্লা ছিল বন্ধ। বাঁধানো চত্বরের সামনে, লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছিল। রেলিংয়ের ওপারে কোনো ঘর বা চালের মাথা উঁচিয়ে ছিল না। চত্বরে দাঁড়িয়ে, নীচে বেশ কিছু ছবির মতো দেখতে সুন্দর বাড়ির ওপারে, বড় আর চওড়া কার্ট রোডের ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল করতে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরেও, নানা গাছপালা বাড়ি ঘরের পাশ দিয়ে, ছোট রাস্তায় দু চারটি ছোট গাড়ি চলছিল। আর মাথার ওপরে নীল আকাশ। ব্যানার্জি কাকার বাড়িটার পেছনে পাহাড়ের ধাপে ধাপে, কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। আর সেই সব বাড়ির পাশ দিয়ে, ছোট সরু রাস্তা উঠে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যানার্জি কাকার বাড়িটা যেন ঘিঞ্জির মধ্যে। কিন্তু চত্বরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের দিকে তাকালেই কার্ট রোড, গাড়ি-ঘোড়া বাজারের কিছু অংশ, লোকজনের যাতায়াত সব সময়েই দেখা যেত। তাছাড়া রাস্তার ওপরের পাহাড়ে গাছপালা বাড়িঘর ছোট রাস্তায় গাড়ি চলা আর আকাশ একেবারে অবারিত। তবে হ্যাঁ, ওদিকটায় কাঞ্চনজংঘা দেখতে পাবার কোনো আশা ছিল না।

বাড়ির ভেতর চত্বরে গাড়ি ঢুকতেই, নেপালী মহিলা গেটটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা গোগোল আর বাবা মায়ের সঙ্গে মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মহিলার বয়স মায়ের থেকে কিছু বেশী। তাঁর ফর্সা রঙ মুখে বেশ কিছু রেখা পড়েছিল। তাঁর ছোট চোখ দুটি ছিল কালো। আর মুখের হাসিটি ভারি ভদ্র আর সুন্দর। তিনি মায়ের মতোই শাড়ি পরেছিলেন। আর একটা নীল রঙের ফুল হাতা সোয়েটার ছিল তাঁর গায়ে। তিনি বাবা মাকে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেছিলেন। বাবা মাও তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলেন। তিনি বাংলায় বলেছিলেন, "আসুন মিঃ চ্যাটার্জি, মিসেস চ্যাটার্জি, বাড়ির ভেতরে আসুন।"

মহিলার বাংলা কথা শুনে বাবা মা খুব অবাক হয়েছিলেন। গোগোলও কম অবাক হয় নি। তবে তাঁর বাংলা বলার মধ্যে, উচ্চারণটা ছিল একটু অন্যরকম। ব্যানার্জি কাকা আবার নেপালী ভাষায় মহিলাকে কিছু বলেছিলেন। মহিলা পাশের কাঠের ছোট ঘরের দিকে একবার দেখে কী যেন জবাব দিয়েছিলেন। ব্যানার্জি কাকা তারপরে মহিলাকে দেখিয়ে বাবা মাকে বলেছিলেন, "এই মহিলাকে আমি ময়লি দিদি বলে ডাকি। ময়লি মানে মেজো। তার মানে মেজদিদি। তোমরাও ওঁকে মেজদিদি বলেই ডাকতে পার। মেজদি মেয়ে হলে কী হবে? তিনি একজন জবরদস্ত মহিলা। আর খুবই বুদ্ধি রাখেন। তাঁর স্বামী ছিলেন মিলিটারিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের
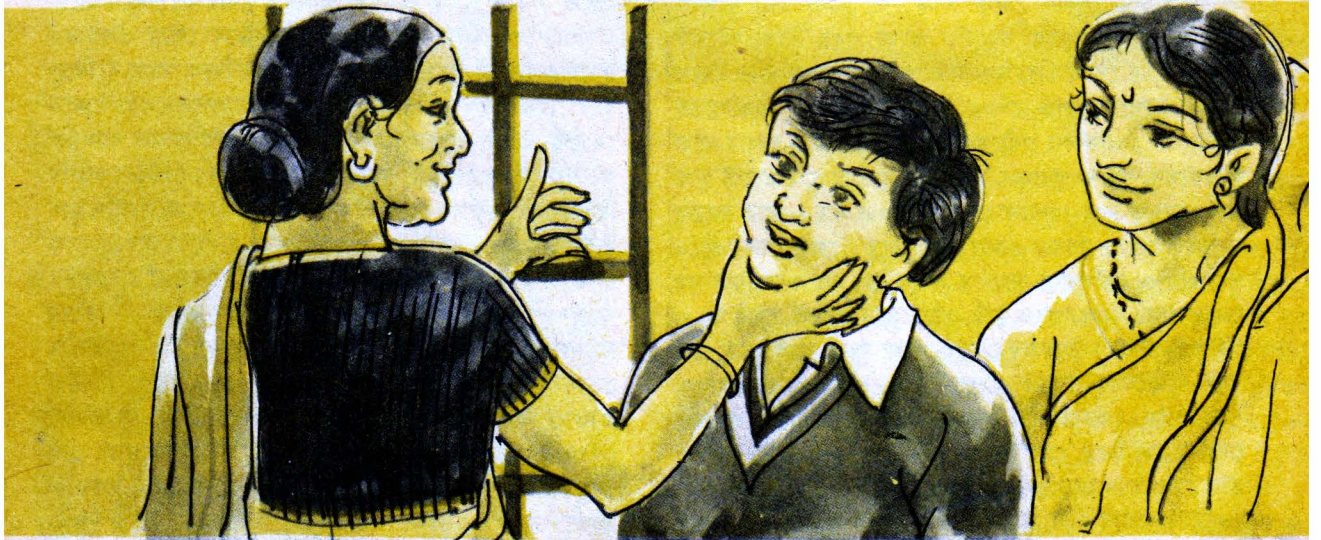
তুমি আমাকে ময়লি আন্টি বলে ডাকবে গোগোল।

সময়, বার্মার কাছে, জাপানীদের হাতে তিনি অনেকদিন বন্দী থাকেন। যুদ্ধের শেষে যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছিল। তখন তাঁরা ম্যালের যেদিকে লেবং, সেদিকে নীচের একটা বাড়িতে থাকতেন। আমার বাবা তাঁদের এ বাড়িতে নিয়ে আসেন। আর এ বাড়িতেই ময়লি দিদির স্বামী মারা যান। জাপানীদের হাতে বন্দী হবার আগে, তিনি হাবিলদার পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন। বন্দী না হলে, বা অসুস্থ না হয়ে পড়লে, তিনি হয় তো ক্যাপটেন বা মেজর হতেন। কিন্তু শেষ জীবন পর্যন্ত অসুস্থ সৈনিক হিসেবে, তিনি কেবল পেনশনই পেতেন।"

ব্যানার্জি কাকা প্রথমে লক্ষ্য করেন নি, তাঁর কথা শুনতে শুনতে ময়লি দিদির মুখটি বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। আর ওঁর চোখ দুটি উঠছিল ছলছলিয়ে। গোগোলের মা সেটা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, "ব্যানার্জি ঠাকুরপো, এসব কথা আমরা পরে শুনবো। এখন থাক।"

ব্যানার্জি কাকা তখনই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। আর লজ্জা পেয়ে, দুঃখের সঙ্গে ময়লি দিদিকে নেপালী ভাষায় কিছু বলেছিলেন। ময়লি দিদি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হেসে নেপালী ভাষায় কিছু বলে, গোগোলকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মাস্টার চ্যাটার্জিকে আমি একটা কথাও বলি নি। তোমার জরুর খুব ভুখ লেগেছে। চলো, ভেতরে চলো। খাবার সব তৈরী আছে। কেবল গরম জলে সাবান দিয়ে হাত ধোবে, আর ডাইনিং টেবলে খেতে বসে যাবে।"

"এই হলেন আমাদের ময়লি দিদি!" ব্যানার্জি কাকা হেসে বাংলায় বলেছিলেন, "ময়লি দিদির দুটি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার নাম দুর্গা। আর ছোট মেয়ের নাম মায়া। তার এখনো বিয়ে হয় নি। তবে হতে আর বেশীদিন দেরীও নেই। দুর্গা আর মায়াও ময়লি দিদির সঙ্গে থাকে। দুর্গার বর প্রতাপ বাহাদুর বাজারের এক শেঠ মারোয়াড়ির দোকানে চাকরি করে। দুর্গার একটি ছেলে আছে। মায়া গত বছর ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। ময়লি দিদিই আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার। তিনিই সব দেখাশোনা করেন। ময়লি দিদি না থাকলে, আমাদের আর দার্জিলিং আসা হত না।"

ময়লি দিদি বাংলা কথা সবই বুঝতে পারছিলেন। লজ্জা পেয়ে হেসে বাংলায় বলেছিলেন, "ব্যানার্জি ভাইয়া যাই বলুক, তিনি আমাকে প্রতি মাসে যা টাকা পাঠান, তাতেই আমি সব করতে পারি। আমার সংসার আর মেয়েদের সব তিনিই দেখাশোনা করেন। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনারা নীচে থেকে ওপরে এসেছেন। বাইরের রোদটা ভালো লাগলেও, বেশী ঠান্ডা এখন লাগাবেন না। আপনাদের গরম জল রাখা আছে। আমি বলব, আজ আপনারা চান করবেন না। হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বেলাও হয়েছে। এখন দুপুরের খাবারের সময়। আপনারা সবাই সকালবেলা কলকাতা থেকে কতোটুকু আর খেয়ে এসেছেন?"

গোগোল বলে উঠল, "আমরা গাড়িতে আসতে আসতে কমলালেবু, বিস্কুট, চকোলেট আর গরম দুধ খেয়েছি।"

ব্যানার্জি কাকা কাঁচের দরজার কাছে গিয়ে, দু ধাপ সিঁড়ির ওপর উঠেছিলেন। কাঁচের বড় দরজাটা খুলে ধরে বলেছিলেন, "সবাই ভেতরে চলে এস।"

গোগোল তখন মাকে জিজ্ঞেস করছিল, "মা, ময়লি দিদিকে আমি কী বলে ডাকব?"

"তুমি আমাকে ময়লি আন্টি বলে ডাকবে গোগোল।" ময়লি দিদি নিজেই হেসে বলেছিলেন, আর গোগোলের গাল টিপে দিয়ে আদর করে বলেছিলেন, "তুমি খুব মিষ্টি ছেলে। দিদিরা তোমাকে পেলে খুব আদর করবে।"

বাবা আর মা যখন কাঁচের দরজার ভেতরে ঢুকছিলেন, গোগোলের চোখে পড়লো, খুবই জরাজীর্ণ খাকি রঙের মিলিটারি পোশাক পরা, রোগা আর লম্বা একজন দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় একটা নেপালী কালো টুপি। চোখের কোল বসা লোকটির চোখ দুটো যেন বড় বেশী জ্বলজ্বল করছিল। নাকের নীচে, দুদিকে ঝুলে পড়া এক জোড়া গোঁফ। জরাজীর্ণ মিলিটারি পোশাকের মধ্যে খাকি রঙেরই ছেঁড়া খোঁড়া একটা ফুল হাতা উলের সোয়েটার পরা। হাতার বাইরে হাত দুটো ময়লা আর শীর্ণ। তার মুখেও যেন নানা রকমের হিজিবিজি দাগ। কিন্তু তার চোখ দুটো ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল। গোগোলের দিকে একবার তাকাতেই ও চোখ সরিয়ে নিল। ওই চোখে চোখ রাখা যায় না।

ব্যানার্জি কাকার ঠিক উল্টো দিকে, সিঁড়ির ওপরে, দরজার এক পাশে লোকটি দাঁড়িয়েছিল। দেখছিল ব্যানার্জি কাকাকে। কিন্তু ব্যানার্জি কাকা যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছিলেন না। অথবা ইচ্ছে করেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখছিলেন না। তিনি না হয় দেখছিলেন না। বাবা মাও কি লোকটিকে দেখতে পেলেন না? আশ্চর্য! জলজ্যান্ত একটা লোক দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা মাকে জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে। অথচ বাবা মা একবার লোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন না। দরজার ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপরে ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সিঁড়ির ধাপে উঠলেন। লোকটির সঙ্গে গোগোলের চোখাচোখি হলো। আর আশ্চর্য! সেই জ্বলজ্বলে চোখের চাউনিটা কেমন নরম হয়ে গেল। ঝুলে পড়া গোঁফের দু পাশে একটু হাসি ফুটল। অথচ ময়লি আন্টি সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। গোগোলকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপরেই ভেতরে ঢুকে এলেন ব্যানার্জি কাকা। কাঁচের বড় পাল্লা দরজাটা বন্ধ করে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। গোগোল পেছন ফিরে দেখল, দরজার বাইরে, তখনও লোকটি দাঁড়িয়ে, কাঁচের দরজা দিয়ে, ভেতরের দিকে দেখছে।

পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে, কাঠের মেঝের ওপর পাতা

কার্পেটে গোগোল জুতো পায়ে হোঁচট খেল। ময়লি আন্টি বললেন, "আহা, লাগে নাই তো? কার্পেটের এ জায়গাটা একটু উঁচু হয়ে আছে।"

গোগোল তখনও পেছন ফিরে তাকিয়ে লোকটিকে দেখছিল। সেও গোগোলকেই দেখছিল। ময়লি আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বাইরে কী দেখছ? কিছু ফেলে এসেছ?"

"না!" গোগোল মাথা নেড়ে দরজার বাইরে চোখের ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে দরজার বাইরে এক পাশে, ও লোকটি কে দাঁড়িয়ে আছে?"

ময়লি আন্টির অবাক চোখে যেন হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। বললেন, "কই, ওখানে কেউ নেই তো! তুমি কাকে দেখতে পেলে?"

"খুব পুরনো খাকি রঙের ছেঁড়া মিলিটারি পোশাক পরা একটি লোক তো এখনো দরজার এক পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।" গোগোল বলল, "মাথায় কালো নেপালী টুপি, পায়ের জুতো ময়লা ছেঁড়া। হাত দুটোও ময়লা আর রোগা। মুখে এক জোড়া গোঁফ। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসছে। আপনারা কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেন না?"

ময়লি আন্টি যেন কেবল অবাক হলেন না। হঠাৎ খুব রেগে উঠে, চোখ পাকিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। গোগোল আরও অবাক হয়ে দেখল, লোকটি মুখ ফিরিয়ে, আস্তে আস্তে সিঁড়ি থেকে নেমে, চত্বরের ওপর দিয়ে হেঁটে, বাঁ দিকে রেলিংয়ের ওপাশের আড়ালে চলে গেল। ময়লি আন্টি কিন্তু বললেন, "না তো গোগোল, কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা কেউ দেখতে পাই নি। নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ। চল, ভেতরে চল।"

গোগোল কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু ভুল যে ও দেখে নি, সে বিষয়ে ওর নিজের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ও দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা সেখানে নেই। কার্পেটের তিন দিকে সোফা সেট। মাঝখানে একটা গোল সেন্টার টেবিল। সামনেই একটা কাঠের পার্টিশন। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে রয়েছে, কাঁচের পাল্লা বন্ধ একটা বড় জানালা। সামনের পার্টিশনের এক পাশে একটি কাঁচের পাল্লার দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভেতরে একটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলের হাত ধরে, সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কাঠের মেঝের খানিকটা অংশ খোলা। বাকী সবই কার্পেটে পাতা। সেখানে মস্ত বড় ডাইনিং টেবিল। টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে কাপড় পাতা। দুটো ছোট ফুলদানিতে ফুল। দুটো বড় পেতলের মোমদানিতে, দু' ইঞ্চি ডায়মেটারের মোটা গোলাপী রঙের বড় মোমবাতি রয়েছে। এখন জ্বলছে না। কোনো আলোও জ্বলছে না। ডান দিকেই, কাঠের দেয়ালে, বড় বড় দুটো কাঁচের পাল্লার জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতেই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাইনিং টেবিলের ওপর, চারটি প্লেটের ওপর, একটি করে চাইনিজ সুপের বউল রয়েছে। পাশেই রয়েছে চীনে মাটির সুপ খাবার চামচ। প্রত্যেক প্লেটের বাঁ দিকে একটি করে ছোট প্লেট। তার প্রত্যেকটার পাশে, ছোট বড় দুটো স্টিলের চামচে, কাঁটা চামচে, আর ছুরি ঝকঝক করছে। কাঁচের গেলাসে সাদা কাপড়ের ন্যাপকিন, ত্রিভুজ করে দাঁড় করানো রয়েছে। গোগোলের মনে হল, কলকাতার নাম-করা বড় হোটেলে যে-রকম খাবার টেবিল সাজানো থাকে, এই ডাইনিং টেবিলও সেইরকম করে সাজানো রয়েছে। কিন্তু–

ময়লি আন্টি টেবিল পেরিয়ে, গোগোলের হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেলেন। গোগোল আবার পেছন ফিরে একবার দেখল। না, এবার এ ঘরের কাঁচের দরজা দিয়ে, পাশের ঘরের কাঁচের দরজার সিঁড়ির কাছে কারোকে দেখতে পেল না। ময়লি আন্টি টেবিলটা পেরিয়ে কয়েক গজ গিয়ে, বাঁ দিকের একটি দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কাঁচের দরজার ভেতরে, পর্দা টাঙানো। ভেতরটা দেখা যায় না। ময়লি আন্টি দরজার পাল্লা ঠেলে খুলে দিলেন। গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, মস্ত একটা সুন্দর সাজানো ঘর। ঘরে প্রচুর আলো। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে, এক ধাপ কাঠের সিঁড়ি উঠে, সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। গোগোল দেখল, সামনেই একটা বিরাট ঝকঝকে খাটের ওপর সুন্দর বিছানা। মা সেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছেন। বাবা একপাশের কাঠের দেয়ালের দিকে, লম্বা ড্রেসিং টেবিলের সামনে, দুটো বড় বড়, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে এত আলো এল কোথা থেকে? বাইরের দিকে কোনো কাঁচের দেয়াল বা জানালা কিছুই নেই। তারপরেই ওর চোখ পড়ল, ঘরের মাথার দিকে। কাঠের ছাদের ঠিক মাঝখানে স্কাই লাইট। যেন রোদের আলো সেই স্কাই লাইটের কাঁচে পড়ে, গোটা ঘরটা আলোয় ভরে দিয়েছে।

ঘরটা অনেক বড় বলেই, আর একটা খাটও ছিল পেছন দিকে। সেই খাটেও রয়েছে পরিষ্কার বেডশীট ঢাকা দেওয়া বিছানা। দুটো খাটের মাঝখানে রয়েছে একটি গোল পাথরের টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটি খুব সুন্দর চেয়ার। চেয়ারগুলোর আকৃতি, বেগুনি রঙের গদি, সব মিলিয়ে খুবই রাজকীয়। বাবা যেদিকে বসেছিলেন. সেদিকে কাঠের দেয়ালের সংগে লম্বা ড্রেসিং টেবিল জোড়া, অনেকটা তাকের মতো। তার ওপর পাতা আছে লিনেনের সাদা কাপড়। সেখানে রয়েছে, যতো রাজ্যের নাম-করা দেশী বিদেশী কোল্ড ক্রিম, পাউডার, অডিকলনের দারুণ সুন্দর দেখতে নানা আকারের শিশি বোতল। আর ওদিকের কাঠের দেয়ালে, কুঁচিয়ে সেলাই করা লিনেনের পর্দা টাঙানো। ঘরের বাকী দেওয়াল ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের। ঘরের কাঠের মেঝের ওপর সুন্দর কাজ করা পশমের কার্পেট। কাঠের দেয়ালের দু দিকে দুটো তেল রঙের ছবি। কোট-টাই পরা, গোঁফওয়ালা, চোখে চশমা ফরসা এক ভদ্রলোক। আর একটা ছবি এক মহিলার। মাথায় সামান্য
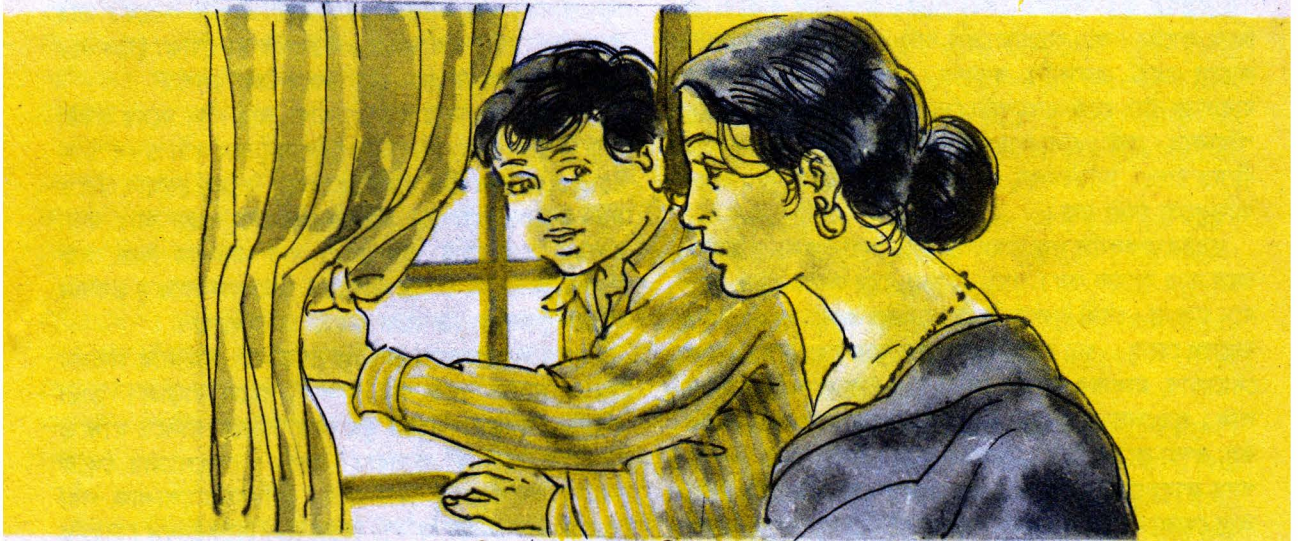
তুমি বাইরে বাগানে কী দেখতে পাচ্ছ বল তো?

ঘোমটা টানা, কাঁধের কাছে জড়োয়ার ব্রোচ আটকানো। দেখতে তিনি সুন্দরী। অনেকটা আগের কালের বড়লোক মহিলাদের মতো তাঁর সাজগোজ। ডান দিকের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরে স্কাই লাইটের দিনের আলো নেই। আলো জ্বলছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ময়লি আন্টি গোগোলকে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেন, ঘরের একটা শেষ দিকে। সেখানে দু ধাপ সিঁড়ির ওপর একটি বন্ধ দরজা ছিল। ময়লি আন্টি দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। তিনি দু ধাপ সিঁড়ি উঠে, ভেতরের অন্ধকারে গেলেন। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ডাকলেন, "মাস্টার গোগোল, অন্দরে এস।"

গোগোল ভেতরে ঢুকল। দেখেই বোঝা গেল, বাথরুম। বাথরুমের মেঝে শান বাঁধানো। গিজারের লাল আলোটা জ্বলছে। একদিকে রয়েছে মস্ত বড় বাথটাব। ঠান্ডা গরম জলের লাইন আর শাওয়ার। বাথরুমের পাশেই রয়েছে আর একটা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে, ভেতরে চোখে পড়ে কমোড। পাশের ঘরটার দেয়ালে রয়েছে একটা জানালা, যার কাঁচের পাল্লা বন্ধ। ময়লি আন্টি বেসিনের দুদিকের কলের মুখের একটা দেখিয়ে বললেন, "এটা খুললে, গরম জল পাবে। এই রয়েছে সাবান। আর ঐখানে রয়েছে তোয়ালে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি বাবা মাকে তাড়া দিচ্ছি। গরম গরম খাবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কর।"

ময়লি আন্টি বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোগোল গরম জলের কল খুলে, সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। কিন্তু সেই ঝরঝরে মিলিটারি পোশাক পরা, মাথায় নেপালী টুপি লম্বা রোগা গোঁফওয়ালা মূর্তিটার কথা ভুলতে পারছে না। তোয়ালে দিয়ে, হাত মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, কেবল ময়লি আন্টিই যে লোকটিকে দেখতে পান নি, তা নয়। বাবা মা ব্যানার্জি কাকা, কেউই তাঁকে দেখতে পান নি। অথচ লোকটি যে দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল, গোগোলের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

ও বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই, মা এলেন। বললেন, "তোমার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" বলে গোগোল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

মা পেছন থেকে বললেন, "গোগোল, খুব সাবধান। শীত বেশ ভালোই আছে। ঠান্ডা লাগিও না যেন।"

"আচ্ছা।" গোগোল বলল।

মা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা তখনও চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। বাঁ দিকের খোলা দরজা দিয়ে ব্যানার্জি কাকা বেরিয়ে এলেন। কলকাতা থেকে তিনি এসেছিলেন স্যুটেড বুটেড হয়ে। এখন দেখা গেল, পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে মোটা একটা শাল চাপিয়েছেন। পায়ে মোজা আর স্যান্ডেল। গোগোলকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে? বেশ, ভালো। এবার খেতে যাবার আগে, পাশের ঘরটাও দেখে এস। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে, তারপরে দোতলাটা দেখবে।"

গোগোল পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরটাও বেশ বড়। খাট রয়েছে একটাই। কাঠের চকচকে দেয়াল। এ ঘরেও রয়েছে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা গদী-আঁটা সুন্দর রাজকীয় চেয়ার। একদিকে ড্রেসিং টেবিল আর কাঠের দেয়াল জুড়ে বড় আয়না। টেবিলের ওপর প্রসাধন সামগ্রী। পেছন দিকের বন্ধ দরজাটা দেখে মনে হল, ওটা এ ঘরের বাথরুম। তবে দুদিকের দেওয়ালের ঢাকা পর্দার ফাঁকে কাঁচের অংশ চোখে পড়ল। গোগোল এগিয়ে গিয়ে, একদিকের দেয়ালের পর্দা সরাতেই,

বড় কাঁচের বন্ধ জানালা দেখা গেল। জানালার বাইরে, বাঁ দিকে, কাঠের একটা আলাদা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা কাঠের ছোট একফালি বারান্দা। কোনো রেলিং নেই। বারান্দার নীচে ছোট একটুখানি খোলা জায়গা। শান বাঁধানো, পরিষ্কার। সেই খোলা জায়গার একধারে রেলিং, যেখান দিয়ে নীচের রাস্তা, গাড়িঘোড়া, ওপারের পাহাড় আর ছবির মতো বাড়িগুলো দেখা যায়।

কাঠের একফালি সরু বারান্দায় শাড়ি পরা একজন মহিলা। বয়স তার অনেক কম। গায়ে কোনো গরম জামা আছে বলে মনে হল না। বেণী ঝুলছে পিঠে। কোলে একটি বছর খানেক বয়সের ছেলে। তার গায়ে পুরো হাত আর গলা ঢাকা উলের সোয়েটার, মাথায়ও উলের বোনা টুপি। গাল দুটো টুকটুকে লাল। পুতুলের মতো দেখতে। আর একজন, তার বয়স আরও কম, লম্বা ফ্রকের মতো পোশাক গায়ে। কিন্তু গায়ে কোনো গরম জামা দেখা যাচ্ছে না। এর মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, আর খোলা। বয়স সতর আঠারর বেশী হবে না। গোগোলের মনে হল, এরাই বোধহয় ময়লি আন্টির দুই মেয়ে, দুর্গা আর মায়া। দুজনের কেউ গোগোলের দিকে দেখছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

গোগোল পর্দা টেনে দিয়ে, ঘরের আর একপাশে গেল। সেদিককার পর্দা খুলতেই, বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে বাগান দেখা গেল। বেশ কিছু গোলাপ গাছ রয়েছে, কিন্তু ফুল নেই। চন্দ্রমল্লিকার টব রয়েছে বেশ কয়েকটা। ক্যাকটাসও রয়েছে নানা রকম। তা ছাড়া আছে সবজি বাগান। সবজি বাগানে ফুল আর বাঁধাকপি, টমাটো, আর ধনে পাতা রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাগানটির নিয়মিত যত্ন করা হয়।

গোগোল পর্দাটা ফেলে সরে আসবার মুহূর্তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সেই জরাজীর্ণ মিলিটারি পোশাক পরা, নেপালী টুপি মাথায়, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা শীর্ণ হাত। আর গোঁফওয়ালা রোগা লম্বা লোকটি, ডান দিকের কাঠের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ডান দিকের কাঠের বাড়িটায় ময়লি আন্টি থাকেন। গোগোল একটু আগেই, বাড়িটার অন্যদিকের বারান্দায় ময়লি আন্টির দুই মেয়েকে কথা বলতে দেখেছে। এ লোকটা কি ময়লি আন্টির বাড়ির ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল?

গোগোল ভাবতেই, লোকটা বাগানের দিকে নেমে, গোগোলের দিকে তাকাল। সে যে বাইরে থেকে, কাঁচের মধ্যে গোগোলকে দেখতে পাচ্ছে, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, গোগোল পর্দা ফেলে সরে আসবে ভেবেও, সরে আসতে পারল না। লোকটা যেন ওকে দেখা দেবার জন্যই কাঠের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। গোগোলের চোখে চোখ রেখে সে অপলক তাকিয়ে আছে। কিন্তু এখন তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করছে না। অবশ্য তার চোখ দুটো বড় বেশী সাদা। এখন সে গোগোলের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। আর যেন সামান্য ঘাড় নাড়িয়ে, কিছু একটা ইশারা করছে। তার ঝুলে পড়া গোঁফ জোড়া নড়ে উঠল কি না, বোঝা গেল না। অথচ মনে হল, সে যেন ঠোঁট নেড়ে কিছু বলল।

বাগানের সীমানার বাইরে, সাদা আর নীল রঙের একটা ছোট কাঠের বাড়ি। বাগানের পেছনে যেমন জমি ওপর দিকে উঠে গেছে, সাদা নীল বাড়িটার পেছন দিকেও তেমনি উঁচুতে জমি উঠেছে। সেখানে রয়েছে কয়েকটা পাইন আর নানা রকমের ছোট ছোট গাছপালা। যার মাঝখান দিয়ে, সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ওপরে উঠেছে। সেই সরু পথে দু একজন মহিলা-পুরুষকে ওঠা-নামা করতে দেখা যাচ্ছে।

গোগোল দেখল, সাদা নীল বাড়িটার সীমানার লতানে বেড়ার সামনে এসে দুটি নেপালী ছেলে দাঁড়াল। তারা এদিকের বাগানের দিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে, হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলছে। গোগোলের থেকে দুজনেই বয়সে একটু ছোট হবে। মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি একবার মুখ ফিরিয়ে ছেলে দুটির দিকে দেখল। তাদের মধ্যে দূরত্ব ছ' সাত গজের বেশী নয়। অথচ ছেলে দুটি যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে, তা মোটেই মনে হচ্ছে না। ওরা বাগানের দিকে মুখ করে কথা বলছে, হাসছে। অথচ একবারও লোকটার দিকে ফিরে দেখছে না। অবশ্য ওরা এই জানালায়, পর্দার পাশে গোগোলকেও দেখছে না। নিজেদের কথা আর হাসিতেই ব্যস্ত।

"কী ব্যাপার গোগোল, তুমি এখনো জানালায় দাঁড়িয়ে কী দেখছ?" পেছনে মায়ের গলা শোনা গেল, "ময়লি দিদি আমাদের গরম গরম খাবার বেড়ে দেবার জন্য তৈরী। তাড়াতাড়ি এস।"

গোগোল ডাকল, "মা শোন, এখানে একটু এস।"

মা গোগোলের কাছে এগিয়ে গেলেন। গোগোল বন্ধ কাঁচের জানালা থেকে পর্দা আর একটু সরিয়ে বলল, "তুমি বাইরে, বাগানে কী দেখতে পাচ্ছ বল তো?"

"কী আবার দেখব?" মা অবাক হয়ে বললেন, "ফুলগাছ, ক্যাকটাস, কপি টমাটো, এই সব?"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না?"

"পাচ্ছি বই কি।" মা বললেন, "ওপাশের বাড়ির বেড়ার ধারে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কেন বল তো?"

গোগোলের চোখ তখন সেই লোকটির দিকে। লোকটিও গোগোলের দিকেই তাকিয়েছিল। গোগোল তবু মাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই ছেলে দুটো ছাড়া, আর কারুকে দেখতে পাচ্ছ না?"

"না তো?" মা অবাক হয়ে বললেন, "আবার কাকে দেখব? ওখানে তো আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাচ্ছ নাকি?"

গোগোল থতমত খেয়ে গেল। ও মাকে সত্যি কথাটা বলতে পারল না। কারণ, জানে মা বিশ্বাস তো করবেনই না। আর

সমস্ত ব্যাপারটাকে আজেবাজে আজগুবি কিছু ভেবে, গোগোলকে একা আশেপাশে কোথাও একটু বেরোতেও দেবেন না। ও উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, "না, দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছিল, একটা অন্য লোককে যেন হঠাৎ দেখলাম।"

"ভুল দেখেছ।" মা বললেন, "ওই সব গাছপালার মধ্যে, লোকজন মাঝে মাঝে পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা করছে। তাদেরই দেখেছ। আর কাকেই বা দেখতে পাবে। এখন তাড়াতাড়ি খেতে চল।"

গোগোলের চোখে চোখ রেখে, লোকটা তখনও একইভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে যেন ঘরের ভেতরে মায়ের কথা শুনতে পেল, আর ঘাড় ঝাঁকিয়ে, গোগোলকে চলে যেতে ইশারা করল। গোগোল তাতে আরও অবাক হল। মা আবার তাড়া লাগাবার আগেই ও পর্দাটা টেনে দিল। মায়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে আসতেই গোগোল চীনা খাবারের গন্ধ পেল। গন্ধ পেয়েই, অনেকক্ষণের চাপা পড়া খিদেটা যেন চনমনিয়ে উঠল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা পাশের ঘরে ছিলেন না। গোগোল মায়ের সঙ্গে বাইরে গেল। বাবা আর ব্যানার্জি কাকা টেবিলের কাছে বসে পড়েছিলেন। ময়লি আন্টি একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ছোট মেয়ে মায়া। ময়লি আন্টি মায়াকে মা আর গোগোলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরে এগিয়ে এলেন টেবিলের সামনে।

টেবিলের ওপরে তখন ঢাকা দেওয়া বেশ কয়েকটি চীনা মাটির পাত্র এসে গেছে। ময়লি আন্টি একটির ঢাকনা খুলতেই ধোঁয়া বেরোল। সেটাতে ছিল চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ। সয়াবিন সস্ আর চিলি সসের পাত্র সামনে রাখা ছিল। মায়া কাঁচের গেলাসগুলো থেকে ন্যাপকিন তুলে, গেলাসে গেলাসে জলের জাগ থেকে জল ঢেলে দিল। ময়লি আন্টি একটা স্যুপ তোলার বড় হাতায় করে, স্যুপের পাত্র ঘেঁটে, প্লেটের ওপর উল্টে ঢেলে দিলেন। গোগোল চটপট স্যুপের বউলে খানিকটা সয়াবিন সস্ ঢেলে দিল। মা বলে উঠলেন, "গোগোল, তুমি চিলি সস্ খেও না।"

গোগোল জানত, মা ওকে চিলি সস্ খেতে বারণ করবেনই। ও একটু নুন আর গোলমরিচ মিশিয়ে নিল। ন্যাপকিনটা কোলের ওপর পেতে, চামচে করে স্যুপ মুখে দিয়ে, সামনের দিকে তাকাল। সেই হিলকার্ট রোডের লোকজন যানবাহনের ভিড়। ওপারের পাহাড়ের গাছপালা বাড়িঘর। ওদিকে কোথাও সেই লোকটি নেই।

স্যুপ খেতে খেতে গোগোল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপরে, ওর প্রিয় চিকেন ফ্রায়েড চীনা ভাত, টক মিষ্টি দিয়ে তৈরি কর্ন, নরম করে ভাজা হাড়বিহীন ভেড়ার চীনা রান্না মাংস, আর মিষ্টি, সবই ও বেশ পেট ভরে খেল। কিন্তু সেই লোকটার চিন্তা ওর মাথা থেকে দূর হল না।

বাবা মা ব্যানার্জি কাকা, সবাই ময়লি আন্টির চীনা রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। ময়লি আন্টি মায়াকে দেখিয়ে বললেন, "আমি একা করি নাই। মায়াও আমার সঙ্গে খাবার বানিয়েছে।"

মায়ার মুখ এমনিতেই অনেকটা লাল। সকলের প্রশংসা শুনে, আরও লাল হয়ে উঠল। খাওয়ার শেষে, ব্যানার্জি কাকা বললেন, "দার্জিলিংয়ে দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর ম্যাজ্-ম্যাজ্ করে। তবে আজ আমরা সবাই একটু শুয়ে বিশ্রাম করব। বিকেলে চা খেয়ে, দোতলাটা তোমাদের সবাইকে দেখাব।"

আরে, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করিনি দেখছি।

ব্যানার্জি কাকা নেপালী ভাষায় ময়লি আন্টিকে কিছু বললেন। তারপরে গোগোল সামনের ঘরে, বড় খাটে বাবার কাছে শুয়ে পড়ল। খাওয়ার পরে শীতটা যেন বেড়ে গেল। মা অন্য খাটে শুলেন। ব্যানার্জি কাকা চলে গেলেন পাশের ঘরে। খানিকক্ষণ পরেই গোগোল টের পেল, বাবা মা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। ওর চোখের সামনে ভাসছে সেই লোকটির চেহারা। কী আশ্চর্য! কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ গোগোল কেমন করে দেখছে? ও জীবনে এমন ঘটনা কখনওদেখে নি। একেই কি ভূত বলে? নাকি, সেই অদৃশ্য মানুষের গল্পই সত্যি? তাই যদি হবে, অদৃশ্য মানুষকে গোগোল একা দেখবে কেন? তাকে তো কেউ দেখতে পায় না। অথচ সে নানান কাণ্ড করে।

গোগোল ঘুমন্ত বাবাকে একবার দেখে, আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল। দরজা খুলে ঘরের বাইরে গেল। ডাইনিং টেবিল আবার ফিটফাট সাজানো হয়ে গেছে। সামনে বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের সেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ও কাঁচের দরজা খুলে, পাশের বসবার ঘরে গেল। তাকাল বাইরের ঢোকবার বড় কাঁচের দরজার দিকে। সেখানে এখন কেউ নেই। চত্বরের একপাশে, রোদে মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বসবার ঘরের কাঠের দেয়ালে, একটি খোলা দরজা চোখে পড়ল। দরজার ওপরে সেই মিলিটারি পোশাক পরা লোকটি দাঁড়িয়ে, গোগোলের দিকে তাকিয়ে দেখছে। গোগোল শুধু চমকে উঠল না। ওর গাটা কেমন ছমছম করে উঠল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই। শুধু ও আর লোকটা। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভেতরে একটা অন্ধকার ঘর। প্রথম ঢোকবার সময়, ওই দরজাটা খোলা ছিল না। ঘরটাও দেখা যায় নি।

গোগোল কী করবে, বুঝতে পারছে না। এর আগে দুবার লোকটিকে ঘরের বাইরে দেখেছে, এখন ঘরের ভেতরে! লোকটার সাদা অপলক চোখের কালো মণি দুটো স্থির। গোগোলের দিকে তাকিয়ে যেন গোঁফের ফাঁকে হাসছে। গোগোল সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

লোকটি কোনো জবাব দিল না। কিন্তু তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। তারপরে সে গোগোলকে অবাক করে দিয়ে, বাইরে যাবার কাঁচের দরজাটা না খুলেই, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কাঠের মেঝের ওপর তার ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতোর কোনো শব্দ হল না। কিন্তু দরজা না খুলে, কাঁচ ফুঁড়ে সে বেরিয়ে গেল কেমন করে? বাইরে গিয়েও লোকটি, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গোগোলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। আর মনে হল, যেন ঘাড় বাঁকিয়ে সে গোগোলকে ইশারায় ডাকল।

গোগোল দু পা এগোতেই, পেছন থেকে ময়লি আন্টির গলা শোনা গেল, "কোথায় যাচ্ছ মাস্টার গোগোল? তুমি শোওনি?"

গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "আমার ঘুম আসছিল না। তাই বেরিয়ে এসেছি।"

ময়লি আন্টি বললেন, "আর একটু পরেই তোমার বাবা মা উঠে পড়বেন। আমি চা তৈয়ার করব। তারপরে তোমরা ম্যালে বেড়াতে যাবে। এখন তুমি ঘরেই যাও।"

"আচ্ছা ময়লি আন্টি, বাইরে দরজার ধারে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে কে?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

ময়লি আন্টি বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে, ভুরু কুঁচকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, "কই, দরজার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে নেই তো?"

"কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি।"

"কী রকম লোক দেখতে পাচ্ছ বল তো?"

"খুব পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া মিলিটারি পোশাক, খাকি রঙেরই ছিঁড়ে যাওয়া উলের সোয়েটার, মাথায় নেপালী টুপি, পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো।"

ময়লি আন্টি যতই শুনছিলেন, তাঁর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠছিল। আর একটা আতঙ্ক ফুটে উঠছিল তাঁর দৃষ্টিতে। বাইরের কাঁচের দরজার দিকে তাকিয়ে, তিনি আবার গোগোলের দিকে তাকিয়ে, ওর একটা হাত ধরলেন। বললেন, "ও কিছু নয়। তুমি ভুল দেখছ। চল, ঘরের ভেতরে চল।"

ময়লি আন্টি গোগোলকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "আরে, এ ঘরের দরজাটা আবার কে খুলল? এটা তো খোলা ছিল না।"

"ওই লোকটি একটু আগে এই দরজায় দাঁড়িয়েছিল।" গোগোল বলল, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? কোনো জবাব দিল না।"

ময়লি আন্টি খোলা দরজাটা টেনে, বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়ে বললেন, "তুমি যে-রকম লোকের কথা বললে, সে-রকম কোনো লোক ঘরের অন্দর ঢুকতেই পারে না। তুমি ভুল দেখেছ। এখন চল, ঘরে গিয়ে আধঘণ্টা শুয়ে থাক। আমি এবার চায়ের জল গরম করতে যাচ্ছি।"

ময়লি আন্টি গোগোলকে হাত ধরে, খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। গোগোল পেছন ফিরে দেখল, লোকটি তখনও বড় কাঁচের দরজার বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তাকে যদি আর কেউ দেখতে না পায়, গোগোল কী করেই বা সবাইকে বিশ্বাস করাবে। আর লোকটা গোগোলকেই কেন শুধু দেখা দিচ্ছে? এর মধ্যেই বা কী রহস্য আছে?

গোগোল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। দেখল বাবা মা উঠে বসেছেন। ব্যানার্জি কাকাও এ ঘরে এসেছেন। গল্প করছেন তিনজনেই। গোগোলকে দেখে ব্যানার্জি কাকা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গেছলে গোগোল? ময়লি দিদির ঘরে নাকি?"

"না। খাবার ঘর থেকে বাইরের দিকে দেখছিলাম।" গোগোল বলল। লোকটার কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারল না। কারণ,কেউ বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু গোগোলই বা নিশ্চিন্ত থাকবে কেমন করে? ওর চোখের সামনে ময়লি

আন্টির মুখটা ভেসে উঠল। লোকটির কথা শুনতে শুনতে, তাঁর চোখে মুখে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল। গোগোলের মনে হয়েছিল, উনি কিছু জানেন। অথচ ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। রহস্যটা কি অজানাই থেকে যাবে?

চা পর্বের পরে, সবাই বাইরে যাবার জন্য তৈরী হলেন। মা গোগোলকে সোয়েটারের ওপর কোট পরে নিতে বললেন। বাইরে যাবার আগে, খাবার ঘরের পাশের বসবার ঘরের বন্ধ দরজাটা ব্যানার্জি কাকা খুললেন। ভেতরে গিয়ে আলো জ্বাললেন। বাবা মায়ের সঙ্গে গোগোল ঢুকল। দেখল, এ ঘরটা প্রায় ফাঁকা। সাজানো গোছানোও তেমন নেই। এ ঘরেরই বাঁ দিকে, দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি রয়েছে।

ময়লি আন্টি এ সময়ে এসে পড়লেন। ব্যানার্জি কাকা সবাইকে ডেকে, ওপরে নিয়ে গেলেন। ওপরটা আরও সুন্দর। সমস্ত কাঁচের জানালায় ঢাকা দেওয়া মোটা পর্দাগুলো ময়লি আন্টি সরিয়ে দিলেন। বিকালের উজ্জ্বল আলো তখনও ছিল। ওপর তলার কাঠের ঘর বারান্দা সবই কার্পেট দিয়ে মোড়া। তিনটে পাশাপাশি ঘর সাজানো। কিন্তু মাঝের ঘরের পেছনের দরজা খুলতেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে অর্ধ-গোলাকার বারান্দা। অনেকটা গাড়ি-বারান্দার মতো। তার সবটাই কাঁচের জানালা। ময়লি আন্টি মোটা পর্দা সরিয়ে দিলেন। একটি গোল টেবিল ও খান কয়েক চেয়ার সেখানে রয়েছে। এ বারান্দা থেকে ম্যালের কাছাকাছি ওপরের দিক এবং আকাশ দেখা যায়।

ব্যানার্জি কাকা সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। মাঝখানের ঘরের বাইরে, বসবার ঘরের একটা আরামকেদারা দেখিয়ে বললেন, "আমার ঠাকুর্দার নেমন্তন্নে, রবীন্দ্রনাথ একদিন বিকেলে চা খেতে এসে এই আরামকেদারাটায় বসেছিলেন। আর বলা হয়, এ বাড়িতে বিবেকানন্দও এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর স্মৃতি রাখা আছে পাশের ঘরে।"

পাশের ঘরে দেখা গেল, গুল বাঘের ছালের ওপরে ছোট গদির বিছানা, বালিশ, আর পাশবালিশ। ওখানে বিবেকানন্দ থাকতেন। সামনের দরজা খোলা থাকত। তা ছাড়া, ব্যানার্জি কাকার ঠাকুর্দার আমলে, দার্জিলিংয়ের অনেক সাহেব-সুবোরাও আসতেন। ঠাকুর্দা বাবা ছুটি পেলেই দার্জিলিংয়ে চলে আসতেন। ব্যানার্জি কাকার বছরে একবারও হয়তো আসা হয়ে ওঠে না। তবে তিনি বাবা ঠাকুর্দার প্রিয় বাড়িটি সযত্নে রক্ষা করছেন। তার জন্য, ময়লি আন্টির কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ, কেবল টাকা দিয়েই মানুষের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। ময়লি আন্টি বাড়িটিকে সযত্নে রক্ষা করেন।

দোতলা দেখা হয়ে যাবার পরে, গোগোল সকলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল, সেই লোকটি সকলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। অথচ কাঠের সিঁড়িতে কোনো শব্দ হচ্ছে না। ব্যানার্জি কাকা বললেন, "দাঁড়ালে কেন গোগোল? ওপরে আরো কিছু দেখবে?"

"না না।" গোগোল সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল।

লোকটি গোগোলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। গোগোল তার পেছনে পেছনে নেমে এল। লোকটি ঘরের বাইরে, বসবার ঘর থেকে কাঁচের দরজা ঠেলে, বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোল কী করবে, বুঝতে পারছিল না। পেছন থেকে ব্যানার্জি কাকা বললেন, "চল গোগোল, বাইরে চল। আমরা গাড়িতে চেপে, ম্যালের কাছে যাব। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি পার্ক করে, আমরা ম্যালে বেড়াতে যাব।"

গোগোল ব্যানার্জি কাকার কথা ভালো শুনতে পেল না। ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি দরজার বাইরে, পাশে সরে দাঁড়াল। তার অপলক চোখের দৃষ্টি এখন জ্বলজ্বল্ করছে। সে গোগোলকে দেখছিল না। গোগোল দরজা টেনে খুলে বাইরে বেরোল। লোকটা এবার ওর দিকে তাকাল। অমনি জ্বলজ্বলে ভাবটাও কেটে গেল। শান্ত আর করুণ হয়ে উঠল। ব্যানার্জি কাকা পেছন থেকে বললেন, "আবার এখানে দাঁড়ালে কেন গোগোল?"

গোগোল সিঁড়ির দু ধাপ নেমে চত্বরে এগিয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখল, লোকটি সবাইকে দেখছে। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। ময়লি আন্টি এগিয়ে গিয়ে, গেট খুলে দিলেন। বাগডোগরা থেকে যে-গাড়িটি এসেছিল, আর যে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তার কোনো বদল হয় নি। ড্রাইভার গাড়ির এঞ্জিন চালিয়ে, এগিয়ে নিয়ে এল। ব্যানার্জি কাকা সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। গোগোল বাবা মার সঙ্গে পেছনে, দরজার পাশে বসল। দেখল, লোকটি ওদের গাড়ির দিকেই। কিন্তু হঠাৎ সে গাড়ির কাছে দৌড়ে এল। আর দরজাটা খুলে ফেলল। গোগোল প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল।

ব্যানার্জি কাকা অবাক হয়ে বললেন, "আরে, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করি নি দেখছি। হঠাৎ খুলে গেল।" বলে দরজাটা আবার টেনে, লক করে দিলেন।

গোগোল দেখল, ব্যানার্জি কাকা আর ড্রাইভারের মাঝখানে লোকটা সামনে মুখ করে বসে আছে। কী মতলব লোকটার? কোনো বিপদ-আপদ ঘটবে না তো? গাড়ি তখন হাসপাতালের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। একমাত্র গোগোল ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে না, গাড়িতে আর একটা লোক। আশ্চর্য! ব্যানার্জি কাকা বা ড্রাইভারও টের পাচ্ছেন না, তাঁদের মাঝখানে একজন বসে আছে!

ম্যালে যাবার রাস্তার যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়, ড্রাইভার সেখানে গাড়ি দাঁড় করাল। ব্যানার্জি কাকা সামনের সিট থেকে নামলেন। গোগোল বাবা মায়ের সঙ্গে নামল। তখনও রোদ আছে। রাস্তায় বেশ ভিড়। গোগোলের চোখ লোকটার ওপর। দেখল, লোকটা গাড়ি থেকে নেমে, গোগোলের দিকে

লোকটা গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তাকাল। এবার সে স্পষ্টই হাসল।

ব্যানার্জি কাকার সঙ্গে তখন বাবা মা ম্যালের দিকে হেঁটে চলেছেন। লোকটি হাত তুলে গোগোলকে ইশারায় সেদিকে দেখাল। বাবাও তখন পেছন ফিরে ডাকলেন, "গোগোল এস, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

গোগোল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। লোকটা গোগোলদের ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল। রাস্তায় নানা রকমের, নানা পোশাকের লোকজন। দু পাশে কত রকমের দোকান। গোগোলের কোনোদিকে খেয়াল নেই। ও দেখছে লোকটি আগে আগে চলেছে, আর মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে গোগোলদের দেখছে।

গোগোলরা ম্যালে এসে পৌঁছুল। যেদিকে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর চা বাগান, সেদিকে দেখতে গিয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য গোগোল লোকটির কথা ভুলে গেল। বিশেষ করে, পরিষ্কার আকাশে, তখন কাঞ্চনজংঘা দেখা যাচ্ছে। এ সময়ে ময়লি আন্টির মেয়ে মায়াকে কাছে দেখা গেল। ব্যানার্জি কাকা মায়ার সঙ্গে নেপালী ভাষায় কিছু কথা বললেন। মায়াও বলল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপরেই ওর চোখ পড়ল সেই লোকটির দিকে। সে এই প্রথম হাতছানি দিয়ে গোগোলকে ডাকল।

গোগোল দেখল, বাবা মা ব্যানার্জি কাকা গল্প করছেন। মায়াদিদিও দুই নেপালী মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেড়াচ্ছে। গোগোল লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা লেবংয়ের দিকে, রেলিং ঘেরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। আর মাঝে মাঝে গোগোলকে পেছন ফিরে দেখতে লাগল।

গোগোল দেখল, রোদ চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। ও থেমে পড়ল। লোকটাও থেমে পড়ে, গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। এমন ভাবে ডাকল, যেন বলতে চায়, "কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে এস, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।"

গোগোল কৌতূহল দমন করতে পারল না। ও লোকটার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। বিকেলের আলো খুব তাড়াতাড়ি যেন ম্যাজিকের মতো নিভে গিয়ে, সন্ধ্যা নেমে এল। বাতি জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে রাস্তার ধারে। নীচের বাড়িগুলোতে। চা বাগানের কোথাও কোথাও। লোকটি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে রেলিং শেষ হয়ে ডান দিকে নীচে রাস্তা নেমে গেছে। লোকটা সেই দিকেই চলল। যাবার আগে গোগোলকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোগোলের আশপাশ দিয়ে যারা যাতায়াত করছে, তাদের ও দেখতে পেল না। তারাও সব অচেনা লোক। কেউ গোগোলকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখল না।

লোকটি ক্রমেই, আঁকাবাঁকা পথে নীচে নেমে চলেছে। অন্ধকার নেমে এল। এদিকটায় আলোও বিশেষ নেই। কিন্তু গোগোল লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে। সে হাতছানি দিচ্ছে। আর গোগোল দমবন্ধ কৌতূহল নিয়ে তার পেছনে পেছনে চলেছে।

এক সময়ে মনে হল, লোকটি একটি পুরনো অন্ধকার বাড়ির, পোড়ো লনে গিয়ে দাঁড়াল। গোগোলও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি হাত তুলে সামনে দেখিয়ে, এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল। লোকটি লনের নীচে যাবার একটা কাঁচা সরু পথে নামতে লাগল। গোগোলও নেমে চলল।

এমন সময় গোগোলের কানে এল, ক্ষীণস্বরে ওকে যেন কেউ ডাকছে। কিন্তু তখন আর ও থামতে পারছে না। লোকটির পেছনে পেছনে যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছে। ক্রমেই

ওর নাম ধরে ডাকা মেয়েলি স্বর কাছে এগিয়ে আসছে যেন। লোকটি পেছন ফিরে গোগোলকে দেখছে, আর পাহাড়ি সরু পথে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। কাছে-পিঠে আর একটাও বাড়ি নেই।

গোগোল দেখল, লোকটি এবার এক জায়গায় থামল। পেছন ফিরে গোগোলকে ওপরের দিকে হাত তুলে দেখাল। গোগোল দেখল, একটা ছোট চূড়া। লোকটি হাতছানি দিয়ে সেই চূড়োয় উঠতে লাগল। গোগোলও উঠতে লাগল। চূড়োয় উঠে, লোকটি একবার থামল। তারপর হাতছানি দিয়ে, সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। গোগোলও গেল। কিন্তু লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কে যেন পেছন থেকে চিৎকার করে গোগোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে ডাকল, "গোগোল, আর এক পাও বাড়িও না। বহু নীচে পাথরের ওপরে পড়ে যাবে।"

গোগোল দেখল, সেই লোকটি নেই। আর ওর সামনে একটা বিশাল অন্ধকারের শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই। কিন্তু কে ওকে জড়িয়ে ধরেছে? এই সময়েই টর্চ লাইটের আলো পড়ল ওদের গায়ে। ব্যানার্জি কাকার গলা শোনা গেল, "মায়া মায়া।"

গোগোলের কাছ থেকে মায়া চিৎকার করে বলল, "আংকল, গোগোল মিলেছে। তবে আর কয়েক সেকেন্ড গেলে, ওকে আর পাওয়া যেত না।"

টর্চের আলো দু-তিনটে এগিয়ে আসতে লাগল। মায়া জিজ্ঞেস করল, "গোগোল, তুমি এখানে কেন এসেছ?"

"আমাকে একজন ডেকে এনেছিল। তাকে আমি ছাড়া কেউ দেখতে পায়নি।"

"সে দেখতে কেমন?"

গোগোল লোকটার চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা দিল। মায়া কেঁদে উঠে বলল, "তুমি তো আমার বাবার কথা বলছ। তিনি তো চার পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন?"

"মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, অসুখে ভুগে ভুগে মনের দুঃখে আমার বাবা এখান থেকেই নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মারা গেছলেন। উঃ, আমি না এসে পড়লে তুমিও নিশ্চয় নীচে গিয়ে পড়তে।"

গোগোলের শিরদাঁড়াটা এবার কেঁপে উঠল। ও ভয়ে মায়াদিদিকে জড়িয়ে ধরল। টর্চের আলোয় পথ দেখে, ব্যানার্জি কাকা, মা আর বাবা তখন এগিয়ে আসছেন।

সেবারে তারপরেও যে-কদিন গোগোল দার্জিলিংয়ে ছিল, ওকে সব সময়েই চোখে চোখে রাখা হতো। কিন্তু আশ্চর্য! সেই অন্যের চোখে অদৃশ্য লোকটি আর গোগোলকে দেখা দেয়নি।

ছবি : দিলীপ দাশ
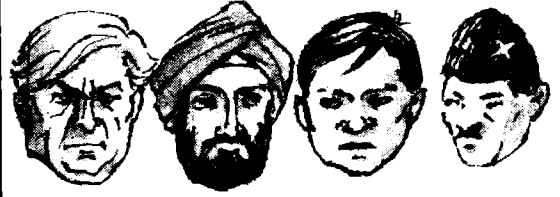
শোন ভাই, শোন

অমিতাভ চৌধুরী

ফরসা মোটা দৈত্য আছে কোথায়?
আফ্রিকায় আফ্রিকায়।

কোথায় গেলে তোমার আমার জান যাবে?
পাঞ্জাবে পাঞ্জাবে।

কোন্ শহরে বাঙালী খায় কিল চড়?
শিলচর শিলচর।

কুকরি হাতে কোথায় চলে ঘিসিং?
দার্জিলিং দার্জিলিং।

দেশদ্রোহীর কোথায় বেশি দাম?
মিজোরাম মিজোরাম।

কোন প্রদেশে ছুরির লড়াই রোজ রাতে?
গুজরাতে গুজরাতে।

কথায় কথায় কোথায় লড়াই বিল্লিতে?
দিল্লিতে দিল্লিতে।

কার চেহারা যেন ছেঁড়া কাঁথা?
কলকাতা কলকাতা।

ছবি : রাহুল মজুমদার

জন্মদিনের উপহার

চিৎপুর রাস্তার দোকান থেকে আমার জন্য একটা মুর্গীর রোস্ট কিনে নিয়ে এসো।
আমার জন্মদিনের সকালটা মুর্গী দিয়েই শুরু করবো আজ!
স্যারকে কিছু উপহার দিলে হয়।

যেভাবেই হোক বাচ্চু, টুবলুর প্ল্যান ভেস্তে দিতে হবে!

স্যারকে আমরা একটা জন্মদিনের কেক উপহার দেবো।

বেশ ভাল করে বেঁধে দিন।

ওখানে কী হচ্ছে?
!

টিকিটঘর
দ্য গ্রেট ম্যাজিক শো
ইস, দারুণ ম্যাজিক! দুটো টিকিট কেটে নে।

বিদ্যালয়
আজ সন্ধ্যায় বেশ মজা করে ম্যাজিক দেখা যাবে।
টিকিট আর কেকের বাক্স এখানে থাকুক...
কী করা যায়, কিছুই মাথায় আসছে না!
আরে, এতো স্যারের মুর্গীর রোস্ট নিয়ে যাচ্ছে...
আহা কী গন্ধ!
বাঃ বাঃ, এসে গেছো! টেবিলের ওপর রাখো, স্নানটা সেরে আসি
আমি আর লোভ সংবরণ করতে পারছি না!

স্যার, ফিরে আসার আগেই, মুর্গীর রোস্ট পেটে চালান করে দিই!
প্রভাতে উঠিয়া মুর্গী চাখিনু; দিন যাবে আজ ভাল!
মাংসের হাড়গুলো এবার সরিয়ে ফেলি!
চল, স্যারকে নিয়ে আসি.
বিচ্ছুটা কী করছে বলতো?
!
মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!
এবার একটু হাত সাফাই করতে হবে।

মুর্গীর রোস্টের জন্য আমার
আর সবুর সইছে না!

এ কি! আমার মুর্গীর রোস্ট
কোথায়!

কোন পাষণ্ড আমার রোস্ট
অপহরন করেছে!

স্যার, আমাদের ঘরে
আপনাকে একবার
যেতে হবে!

কোন কী
প্রয়োজন?
স্যার আপনার জন্য
একটা জন্মদিনের কেক
এনেছি!

রোস্টের বদলে জন্মদিনের কেক,
মন্দ নয়!
চল, যাচ্ছি

বেশ বড় কেক মনে হচ্ছে!

একি, কেক কোথায়? এতো মাংসের হাড়! আমার মুর্গীর রোস্ট তাহলে তোরাই চুরি করেছিস!
?

নাটক জমে উঠেছে! এবার আমি আসরে প্রবেশ করবো

তবেরে! আমার রোস্ট চুরি করে, আমার সঙ্গে রসিকতা

গেছিরে!
বাঁচাও

স্যার আপনার জন্য আমি কেক এনেছি

আপনার আর আমার জন্য দুটো ম্যাজিক শোয়েরও টিকিট এনেছি
বা: চমৎকার কেক!

দেখেছিস বিচ্চুটার কাণ্ড, আমাদের আনা কেক আর ম্যাজিক শোয়ের টিকিট চুরি করে স্যারকে খুশি করছে।
ম্যাজিক দেখতে যাচ্ছে ওরা!
আমার মাথায় বুদ্ধি এসেছে একটা, ওরা পৌঁছুবার আগে ম্যাজিকের ওখানে চল।
যাদুকর মশাই, এটা আপনাকে করতেই হবে।
ঠিক আছে তোমাদের জন্য এটা আমি করবো
এবার একটি আশ্চর্য খেলা দেখাবো এইযে খোকা আমাকে একটু সাহায্য করবে এসো।
এখন আমি দেখাবো মানুষ দ্বিখণ্ডিত করার খেলা...
বাঁচাও, বাঁচাও! আর কাটবেন না, স্বীকার করছি; আমি বাচ্চু আর টুবলুর টিকিট ও কেক চুরি করেছি!
তবেরে, তোর একদিন কী আমার একদিন।
কে কোথায় আছো, বাঁচাও

এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ড সাহেব

বিমল কর

সে কী আজকের কথা! চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। আমার তখন কী বা বয়েস; বছর বাইশ। অনেক কষ্টে একটা চাকরি পেয়েছিলাম রেলের। তাও চাকরিটা জুটেছিল যুদ্ধের কল্যাণে। তখন জোর যুদ্ধ চলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমাদের এখানে যুদ্ধ না হোক, তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। হাজারে হাজারে মিলিটারি, শয়ে শয়ে ক্যাম্প, যত্রতত্র প্লেনের চোরা ঘাঁটি, রাস্তাঘাটে হামেশাই মিলিটারি ট্রাক আর জিপ চোখে পড়ত।

ওই সময়ে সব জায়গাতেই লোকের চাহিদা হয়েছিল, কল-কারখানায়, অফিসে, রেলে। মিলিটারিতে তো বটেই।

চাকরিটা পাবার পর আমাদের মাস তিনেকের এক ট্রেনিং হলো, তারপর আমায় পাঠিয়ে দিল মাকোড়া সাইডিং বলে একটা জায়গায়। সে যে কী ভীষণ জায়গা আজ আর বোঝাতে পারব না। বিহারেরই একটা জায়গা অবশ্য, মধ্যপ্রদেশের গা ঘেঁষে। কিন্তু জংগলে আর ছোট ছোট পাহাড়ে ভর্তি। ওদিকে মিলিটারিদের এক ছাউনি পড়েছিল। শুনেছি গোলা বারুদও মজুত থাকত। ছোট একটা লাইন পেতে মাকোড়া থেকে মাইল দেড় দুই তফাতে ছাউনি গাড়া হয়েছিল।

স্টেশন বলতে দেড় কামরার এক ঘর। মাথার ওপর টিন। ইলেকট্রিক ছিল না। প্লাটফর্ম আর মাটি প্রায় একই সংগে। অবশ্য প্লাটফর্মে মোরন ছড়ানো ছিল।

স্টেশনের পাশেই ছিল আমার কোয়ার্টার। মানে মাথা গোঁজার জায়গা। সংগী বলতে এক পোর্টার। তার নাম ছিল হরিয়া। সে ছিল জোয়ান, তাগড়া, টাংগি চালাতে পারত নির্বিবাদে। হরিয়া মানুষ বড় ভাল ছিল। রামভক্ত মানুষ। অবসরে সে আমায় রামজী হনুমানজীর গল্প শোনাত। যেন আমি কিছুই জানি না রাম-সীতার।

হরিয়াকে আমি খুব খাতির করতাম। কেননা সেই আমার ভরসা। হরিয়া না থাকলে খাওয়া বন্ধ। ভাত রুটি, কচুর তরকারি, ভিন্ডির ঘেঁট, অড়হর ডাল, আমড়ার টক—সবই করত

হরিয়া। আহা, তার কী স্বাদ! মাছ মাংস ডিম হরিয়া ছুঁত না। আমারও খাওয়া হত না। তা ছাড়া পাবই বা কোথায়! হপ্তায় একদিন করে আমাদের রেশন আসত রেল থেকে। চাল আটা নুন তেল ঘি আলু পিঁয়াজ আর লঙ্কা। ব্যস্।

জায়গাটা যেমনই হোক আমাদের কাজকর্ম প্রায় ছিল না। সারাদিনে একটা কি দুটো মালগাড়ি আসত। এসে স্টেশনে থামত। তারপর তিন চারটে করে ওয়াগন্ টেনে নিয়ে ছাউনির দিকে চলে যেত। একসঙ্গে পুরো মালগাড়ি টেনে নিয়ে যেত না কখনো। আর প্রত্যেকটা মালগাড়ির দরজা থাকত সিল্ করা। ওর মধ্যে কী থাকত জানার উপায় আমাদের ছিল না। বুঝতে পারতাম, গোলাগুলি ধরনের কিছু আছে। হরিয়া তাই বলত।

আমি অবশ্য অতটা ভাবতাম না। মালগাড়ির দরজা 'সিল্' করা থাকবে—এ আর নতুন কথা কী! তার ওপর মিলিটারির বরাদ্দ মালগাড়ি। খোলা মালগাড়িতে আমরা যে তারকাঁটা, লোহা লক্কড় দেখেছি।

মালগাড়ি ছাড়া আসত অদ্ভুত এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন। জানলাগুলো জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরের শার্সি ধোঁয়াটে রঙের। কিছু দেখা যেত না। দরজায় থাকত রাইফেলধারী মিলিটারি। হপ্তা দু হপ্তা বাদে এই রকম গাড়ি আসত। দু এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াত। আমাকে দিয়ে কাগজ সই করাত। তারপর চলে যেত ছাউনির দিকে। গাড়িটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত—ততক্ষণ কেমন এক গন্ধ বেরুতো। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

সঙ্গী নেই, সাথী নেই, লোক নেই কথা বলার, একমাত্র হরিয়াই আমার সাথী। দিন আমার বনবাসে কাটতে লাগল। এসেছিলাম গরমকালে, দেখতে দেখতে বর্ষা পেরিয়ে গেল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। মনে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কেমন করে। চাকরি পাবার লোভে বন্ড সই করে ফেলেছি। না করলে হয়ত চলত। কিন্তু সাহস হয়নি।

আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত মালগাড়ির গার্ড-সাহেবগুলোকে। ওরা কেউ মিলিটারি নয়, কিন্তু স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে দু চার ঘণ্টা সময় যা কাটাত, কেউ এসে গল্পগুজব পর্যন্ত করত না। ওরা কোন লাট-বেলাট বুঝতাম না। কাজের কথা ছাড়া কোনো কথাই বলত না। আর এটাও বড় আশ্চর্যের কথা, গার্ডগুলো যারা আসত—সবই হয় মদ্রাজী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, না-হয় গোয়ানিজ ধরনের।

একজন গার্ড শুধু আমায় বলেছিল, চুপি চুপি, "কখনো কোনো কথা জানতে চেয়ো না। আমরা মিলিটারি রেল সার্ভিসের লোক। তোমাদের রেলের নয়। আমরা আমাদের ওপরঅলার হুকুমে কাজ করি। আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না। কাউকে কিছু বলবে না।"

সেদিন থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম।

সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ওই জঙ্গলে, ওই ভাবে একা পড়ে থাকতে থাকতে ছ'মাসের মধ্যেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পাগল পাগল লাগত নিজেকে। হরিয়াকে বলতাম, "চল্ পালিয়ে যাই।"

হরিয়া বলত, "আরে বাপ রে বাপ।" বলত,"অমন কাজ করলে হয় ফাটকে ভরে দেবে, না হয়, ফাঁসিতে লটকে দেবে। অমন কাজ করবে না বাবু!"

ভয় আমার প্রাণেও ছিল। পালাব বললেই তো পালানো যায় না।

সময় কাটাবার জন্যে আমি প্রথমে অনেক বলে কয়ে দু প্যাকেট তাস আনাই। রেশনের চাল ডালের সঙ্গে তাস পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধু। পেশেন্স খেলা শুরু করি। তবে কত আর পেশেন্স খেলা যায়! তাসগুলোয় ময়লা ধরে গেল।

তারপর শুরু করলাম রেলের কাগজে পদ্য লেখা। এগুতে পারলাম না। পদ্য লেখা বড় মেহনতের ব্যাপার।

শেষে পেনসিল আর কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলাম। স্কুলে আমি ছেলেবেলায় ড্রয়িং ক্লাসে 'কেটলি' এঁকেছিলাম, ড্রয়িং স্যার আমার আঁকা দেখে বেজায় খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ! বেশ লাউ এঁকেছিস তো! এক কাজ কর—এবার লাউ আঁকতে চেষ্টা কর 'কেটলি' হয়ে যাবে।...তুই সব সময় উলটে নিবি। তোকে বলল, বেড়াল আঁকতে, তুই বাঘ আঁকা শুরু করবি, দেখবি বেড়াল হয়ে গেছে।'

লজ্জায় আমি মরে গিয়েছিলুম সেদিন। তারপর আর ড্রয়িং করতে হাত উঠত না। বন্ধুদের দিয়ে আঁকিয়ে নিতুম।

এতকাল পরে আবার ছবি আঁকতে বসে দেখলুম, ভূত-প্রেত দানব-দত্যিটা হাতে এসে যায়। গাছপালা মানুষ আর আসে না।

ছবি আঁকার চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। তবে হিজিবিজি ছাড়তে পারলাম না। কাগজ পেনসিল হাতে থাকলেই কিম্ভূতকিমাকার আঁকা বেরিয়ে আসত।

এই ভাবে শরৎকাল চলে এল। চলে এল না বলে বলা উচিত শরৎকালের মাঝামাঝি হয়ে গেল। ওখানে অবশ্য ধানের ক্ষেত, পুকুর, শিউলি গাছ নেই যে চট্ করে শরৎকালটা চোখে পড়বে। ধানের ক্ষেতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কেউ ডাকার নেই, পুকুর নেই যে শালুকে শাপলায় পুকুর ভরে উঠবে, আর একটাও শিউলি গাছ নেই যে সন্ধে থেকে ফুলের গন্ধে মন আনচান করবে।

ও-সব না থাকলেও, আকাশ আর মেঘ, আর রোদ বলে দিত—শরৎ এসেছে। একটা জায়গায় কিছু কাশফুলও ফুটেছিল।

এই সময় একদিন এক ঘটনা ঘটল।

তখন সন্ধে রাত কি সবেই রাত শুরু হয়েছে, এঞ্জিনের হুইসল শুনতে পেলাম। রাতের দিকে আমাদের ফ্ল্যাগ স্টেশনে ট্রেন আসত না। বারণ ছিল। একদিন শুধু এসেছিল।

কোয়ার্টারে বসে এঞ্জিনের হুইসল শুনে আমি হরিয়াকে বললাম,"তুই কচুর দম বানা ; আমি দেখে আসছি।" বলে একটা জামা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোয়ার্টার থেকে স্টেশন পঁচিশ ত্রিশ পা।

বাইরে বেরিয়ে যেন চমক খেলাম।মনে হলো,যেন সকাল হয়ে এসেছে। এমন ফরসা! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টলটল করছে চাঁদ। এমন মনোহর চাঁদ জীবনে দেখিনি। কী যে সুন্দর কেমন করে বোঝাই। মনে হচ্ছে, রুপোর মস্ত এক ঘড়ার মুখ থেকে কলকল করে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছে নিচে। জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস মাটি–সবই যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে। এ-আলোর শেষ নেই, অন্ত নেই রূপের। আকাশের দু এক টুকরো মেঘও সরে গেছে একপাশে, চাঁদের কাছাকাছি কিছু নেই, শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে।

দেখি গার্ড সাহেব চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে

স্টেশনে এসে দরজা খুললাম। তার আগেই চোখে পড়েছে, অনেকটা দূরে এক মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এঞ্জিনের মাথার আলো জ্বলছে না। ড্রাইভারের পাশের আলোও নয়।

দরজা খুলে আমাদের লণ্ঠন বার করলাম। লাল সবুজ লণ্ঠন। লণ্ঠনের মধ্যে ডিবি ভরে দিলাম জ্বালিয়ে।

বাইরে এসে হাত নেড়ে নেড়ে লণ্ঠনের সবুজ আলো দেখাতে লাগলাম। মানে, চলো এসো, স্টেশন ফাঁকা, লাইন ফাঁকা।

ট্রেনটা এগিয়ে এল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি মালগাড়ির দিক থেকে কে আসছে। হাতে আমার মতনই লাল-সবুজ লণ্ঠন। তার হাঁটার সঙ্গে লণ্ঠন দুলছিল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না।

এ-রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

লোকটা কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় আমি তার পোশাকটা দেখতে পেলাম। সাদা পোশাক। গার্ড সাহেবের পোশাক।

দেখতে দেখতে গার্ডসাহেব একেবারে কাছে চলে এল। সামনে।

আমি অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। লম্বা চেহারা, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাঁ হাতে এক টিফিন কেরিয়ার।

গার্ডসাহেব কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল আমাকে। "তুমি এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আছ?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আমাদের এঞ্জিন বিগড়ে গেছে। মাইল চারেক আগে এঞ্জিনের কী হলো কে জানে। থেমে গেল। ড্রাইভাররা চেষ্টা করেও চালাতে পারল না।"

"আচ্ছা!"

"বিকেল থেকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। কোনো সাহায্য নেই। পাবার আশাও নেই। সন্ধের আগে এঞ্জিন আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে, চাকা ঘষটে। কোনো রকমে এই পর্যন্ত এসেছি। আর এগুনো গেল না।"

আমি বললাম, "তা হলে খবর দিতে হয়, স্যার!"

"হ্যাঁ, মেসেজ দিতে হয়। চলো মেসেজ দাও।"

স্টেশনের ঘরে এসে টরে টক্কা যন্ত্র নিয়ে বসলাম। খবর দিতে লাগলাম। ভাগ্যিস টরে টক্কা যন্ত্রটা ছিল। তিন জায়গায় খবর দিয়ে যখন মাথা তুলেছি—দেখি গার্ড সাহেব চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

"দিয়েছ খবর?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এবার তা হলে খাওয়া-দাওয়া যাক। তোমার এখানে নিশ্চয় জল আছে?"

"ওই কলসিতে আছে।"

"ধন্যবাদ।"

গার্ডসাহেব উঠে গিয়ে রেল কোম্পানীর মগ আর অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে জল নিয়ে বাইরে গেল।

লোকটা বাঙালী নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও নয়। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারছিলাম না। তার হিন্দি বুলিও স্পষ্ট নয়।

হাত মুখ ধুয়ে এসে লোকটা বলল, "আমি বড় হাংগরি। আমি খাচ্ছি। তুমি কিছু খাবে?"

"না স্যার। আপনি খান।"

"তুমি একটু খেতে পার। আমার যথেষ্ট খাবার আছে।"

"থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কোয়ার্টার কাছে। আমাদের রান্না হয়ে গেছে। আপনি খান, আপনার খিদে পেয়েছে। আগে যদি বলতেন—আপনাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যেতাম। খাবারগুলো গরম করে নিতে পারতেন।"

গার্ড সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে কেমন করে যেন হাসল। বলল,"তোমার হাতটা বাড়াবে? বাড়াও না?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে হাত বাড়ালাম।

গার্ডসাহেব টিফিন কেরিয়ার থেকে এক টুকরো মাংস তুলে আমার হাতে ফেলে দিল। হাত আমার পুড়ে গেল যেন। মাটিতে ফেলে দিলাম।

হাসতে লাগল গার্ড সাহেব। হাসতে হাসতে খাওয়াও শুরু করল। আমি কাগজে হাত মুছতে লাগলাম। হাতে না ফোস্কা পড়ে যায় আমার।

খেতে খেতে গার্ড সাহেব বলল, "তোমার নাম কী ছোকরা?"

নাম বললাম।

"এখানে কত দিন আছ?"

"ছ মাসের কাছাকাছি।"

"ভাল লাগে জায়গাটা?"

"না।"

"তা হলে আছ কেন?"

"কী করব! চাকরি স্যার!"

"চাকরি।" গার্ড সাহেব খেতে লাগল। দেখলাম সাহেব খুবই ক্ষুধার্ত। খেতে খেতে সাহেব বলল, "তোমাদের এখানে আজ কোনো ট্রেন এসেছে?"

"না স্যার। আজ কোনো গাড়ি আসেনি।"

"আমি বুঝতে পারছি না—আমার গাড়িটার কেন এ-রকম হলো? ভাল গাড়ি, ঠিকই রান্ করছিল। হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

"এঞ্জিন ব্রেক ডাউন?"

"কিন্তু কেন?...আমরা যখন ওই ছোট নদীটা পেরোচ্ছি, জাস্ট্ একটা কালভার্টের মতন ব্রিজ, তখন একটা শব্দ শুনলাম। এরোপ্লেন যাবার মতন শব্দ। কিন্তু শব্দটা জোর নয়, ভোমরা উড়ে বেড়ালে যেমন শব্দ হয় সেই রকম। ব্রেকভ্যান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আকাশে কিছু দেখতে পেলাম না।"

"নদীর শব্দ—?"

"না না; জলের শব্দ নয়।...আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, দু এক ফার্লং আসার পর এঞ্জিন বিগড়ে গেল।"

"হঠাৎ?"

"একেবারে হঠাৎ। আর একটা ব্যাপার দেখলাম। খুব গরম লাগতে লাগল। এই সময়টা গরমের নয়, জায়গাটাও পাহাড়ী। বিকেলও ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ অমন গরম লাগবে কেন? সেই গরম এত বাড়তে লাগল—মনে হলো গা হাত পা পুড়ে যাবে। ড্রাইভাররা পাগলের মতন করতে লাগল। পুরো গাড়িটাও যেন আগুন হয়ে উঠল।"

অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কি স্যার?"

"ঘন্টা খানেক এই অবস্থায় কাটল। আমরা সবাই নিচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলাম।"

"তারপর ?"

"তারপর গরম কমতে লাগল। কমতে কমতে প্রায় যখন স্বাভাবিক তখন দেখি এঞ্জিনটাও কোনো রকমে চলতে শুরু করেছে।"

"এ তো বড় অদ্ভূত ঘটনা।"

"খুবই অদ্ভূত।...আরও অদ্ভূত কী জানো! আমরা গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগুবার পর কোথা থেকে মাছির ঝাঁক নামতে লাগল।"

"মাছির ঝাঁক ?" আমার গলা দিয়ে অদ্ভূত শব্দ বেরুলো।

"ও! সেই ঝাঁকের কথা বলো না। পঙ্গপাল নামা দেখেছ ? তার চেয়েও বেশি। চারদিকে শুধু মাছি আর মাছি। আমাদের গাড়িও ছুটতে পারছিল না যে মাছির ঝাঁক পেছনে ফেলে পালিয়ে আসব। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমি তো ব্রেক-ভ্যানের জানলা টানলা বন্ধ করে বসেছিলাম। ড্রাইভাররা মরেছে। জানি না, মাছিগুলো এঞ্জিনের কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল কিনা! তবে, আগেও তো এঞ্জিন খারাপ হয়েছিল।"

আমি চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললাম, "এ-রকম কথা আমি আগে শুনিনি, স্যার।"

"আমারও ধারণা ছিল না।"

গার্ড সাহেবের খাওয়া শেষ। জল খেল। হাত ধুয়ে এল বাইরে থেকে।

"তুমি জানো, এখানের ক্যাম্পে কী হয় ?" গার্ড সাহেব জিজ্ঞেস করল।

"না, স্যার। শুনি মালগাড়ি ভরতি করে গুলিগোলা আসে।"

"ননসেন্স।...এখানে প্রিজনারস অফ্ ওয়ার রাখা হয়। যুদ্ধবন্দী। ক্যাম্প আছে। বিশাল ক্যাম্প।"

আমার মনে পড়ল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা। জানলায় জাল, ধোঁয়াটে কাচ। বললাম, "এখন বুঝতে পারছি, স্যার।"

"তা ছাড়া, হাত পা কাটা, উন্ডেড্ সোলজারদের চিকিৎসাও করা হয়। মরে গেলে গোর দেওয়া হয়। জান তুমি ?"

চমকে উঠে বললাম, "আমি কিছুই জানি না। মালগাড়ি দেখে ভাবতাম..."

"মালগাড়িতে হাজার রকম জিনিস আসে। খাবার-দাবার, বিছানা, ওষুধপত্র, ক্যাম্পের নানান জিনিস।" টিফিন কেরিয়ার গোছানো হয়ে গিয়েছিল গার্ড সাহেবের। একটা সিগারেট ধরাল। আমাকেও দিল একটা। বলল, "থ্যাংক ইউ বাবু।...আমি আমার গাড়িতে ফিরে চললাম। ড্রাইভাররা কী অবস্থায় আছে দেখি গে।...কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, বাবু। বী কেয়ারফুল।...আমার মনে হচ্ছে, এদিকে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে—আমি বলতে পারব না। সামথিং পিকিউলিয়ার। ম্যাগ্নেটিক্ ডিস্টারবেন্স, না, কেউ এসে নতুন ধরনের বোমা ফেলে গেল—কে জানে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অত মাছি...হাজার হাজার...লাখ লাখ...।"

গার্ড সাহেব চলে গেল।

স্টেশন ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কোয়ার্টারের দিকে আসছিলাম। দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধব করছে সব। হঠাৎ চোখে পড়ল, মালগাড়িটা কিসে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারপর দেখি মাছি। মাছির বন্যা আসছে যেন। দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে পড়ল। বৃষ্টি পড়ার মতন মাছি পড়ছিল। ভয়ে ঘেন্নায় আমি ছুটতে শুরু করলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মরে যাবার অবস্থা।

ঘুম ভাঙল পরের দিন। হরিয়া ডাকছিল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই হরিয়া বলল, "বাবু, জলদি..., গাড়ি আয়া।"

স্টেশনে গিয়ে দেখি একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই জানলায় জাল লাগানো, ধূসর কাচের আড়াল দেওয়া। ওষুধের গন্ধ ছড়াচ্ছে প্লাটফর্মে।

গার্ড সাহেব কাগজ সই করাতে এগিয়ে এল।

তাকিয়ে দেখি, গতকালের সেই গার্ড সাহেব নয়, নতুন মানুষ। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি ; গার্ড সাহেব এমন চোখ করে তাকাল—যেন আমাকে ধমক দিল। কথা বলতে বারণ করল। আমি চুপ করে গেলাম।

কাগজ সই করে ফেরত দিলাম গার্ডকে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, গতকালের মালগাড়ি, গার্ড সাহেব আর অত মাছি কোথায় গেল!
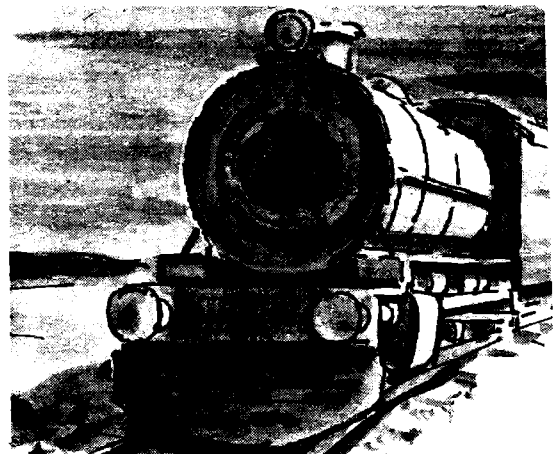
ছবি—দিলীপ দাশ

গোয়েন্দা অর্ক

মঞ্জিল সেন

অর্ক একটা বই হাতে চুপচাপ বসেছিল, মনটা ভাল নেই। কাল রাতের দিকে একটু জ্বর হয়েছিল তাই মা আজ স্কুলে যেতে দেননি। স্কুলে না গেলে কি ভাল লাগে! বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হৈ, টিফিন পিরিয়ডে খেলা, এসব ওর কাছে মস্ত আকর্ষণ। ওদের স্কুলের মাঠটাও প্রকান্ড। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর মিশনারি স্কুল, খুব নাম-ডাক। নানান দেশের ফাদাররা পড়ান, সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের কত ঘটনা বলেন। জেনারেল নলেজ এমনিতেই বেড়ে যায়। মিশনারি স্কুলে মাস্টারমশাইদের সবাই ফাদার বলে, হেড্‌স্যারকে রেক্টর আর যিনি সব দেখাশোনা করেন তিনি প্রিফেক্ট। ওদের প্রিফেক্ট বেলজিয়ামের মানুষ, খুব হাসি-খুশি, ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন, নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এমন নিয়ম কিন্তু অন্য স্কুলে নেই বললেই চলে।

অর্কর বয়স চোদ্দ, ক্লাশ নাইনে পড়ে। বয়স হিসেবে ওর শরীরের গড়ন কিন্তু বড়োসড়ো, এখন আবার জুডো শিখছে। বইটা আবার ও তুলে ধরল। ফেলুদার কাহিনী। ওর খুব ভাল লাগে ফেলুদার গল্প, তবে সবচেয়ে ভাল লাগে তোপসেকে, খুব ইচ্ছে করে ফেলুদার মতো একজন গোয়েন্দার ও শাগরেদ হবে। বুদ্ধি আর সাহস দুটোই ওর আছে, গোয়েন্দাগিরিতে ও দুটোই তো সবচেয়ে বেশি দরকার।

বাইরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে ও বসেছিল, অলস দুপুর। বইটা মুখের কাছে তুলে ধরতে গিয়েই ও ভুরু কোঁচকালো। একটা রঙচটা কালো গাড়ি ওদের বাড়ির উল্টোদিকে ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে এসে থামল। পাঁচতলা ওই বাড়িটায় অনেকগুলো ফ্ল্যাট। অর্কর এক বন্ধুও থাকে একটা ফ্ল্যাটে, নাম বালচন্দ্রণ। কেরালায় বাড়ি, সুন্দর বাংলা বলে। অর্কর সঙ্গেই পড়ে। অর্ক কিন্তু গাড়িটাকে দেখে ভুরু কুঁচকেছিল। আজ বারকয়েক গাড়িটাকে ও এই পাড়ায় চক্কর দিতে দেখেছে। কালো গাড়ি, এখানে ওখানে রঙ উঠে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে, মনে হয় যেন সারা গায়ে তাপ্পি মারা। গাড়ির নম্বরটা একনজরে দেখে নিল অর্ক, ডব্লু.বি.ওয়াই ১০৪৫।

গাড়ি থেকে তিনজন নেমে এল, একজন বসে রইল ড্রাইভারের সিটে। যে তিনজন নামল, তাদের সবার পরনে জিনসের আঁটো প্যান্ট আর রঙচঙে হাওয়াই শার্ট, পায়ে চপ্পল। একজনের হাতে একটা কালো ব্রিফকেস, আর দুজনের হাতে থলি। সবার চোখেই কালো চশমা। ওরা গাড়ি থেকে নেমেই আশপাশের দিকে তাকাচ্ছিল, অর্কদের বাড়ির বারান্দার দিকেও তাকালো। অর্ক তাড়াতাড়ি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বইটা উঁচু করে মুখ আড়াল করবার চেষ্টা করল। ওর কেন জানি লোকগুলোর হাবভাব ভাল লাগছিল না।

গাড়িটাই বা ওদের পাড়ায় অত ঘোরাঘুরি করছিল কেন? এখন ওর মনে পড়ছে, দুদিন আগে ও যখন স্কুল থেকে ফিরছিল, এই গাড়িটাকেই ও দেখেছিল। সেদিনও এই ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল।

দাঁত দিয়ে তলার ঠোঁটটা কামড়ে ধরল অর্ক। মা ঘুমুচ্ছেন, পাড়া নিঃঝুম। শুধু খানিকটা দূরের ফুটপাতে বাড়ির কাজকর্ম করে এমন কয়েকজন তাস খেলায় মশগুল। এখন আগুন লাগলেও তারা খেলা ছেড়ে উঠবে না।

ফেলুদার ভক্ত, অর্কর অনুসন্ধিৎসু মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। ফ্ল্যাটবাড়িতে ডাকাতির কথা কয়েকবারই ও কাগজে পড়েছে। ওসব বাড়িতে নানান জাতের, নানান প্রদেশের পরিবার বাস করেন। কত রকম লোক আসছে যাচ্ছে কেউ তার খোঁজ রাখে না। হুট্ করে ঢুকে পড়লেই হলো। যে লোকটি গাড়ির চালকের আসনে বসেছিল, সে যেন ছটফট করছে, গতিক ভাল নয়।

মিনিট পনের কেটে গেল। না, ফ্ল্যাটবাড়িটা থেকে কোনোরকম গোলমাল বা পটকার আওয়াজ শোনা গেল না। অর্ক মনে মনে একটু স্বস্তি পেল, হয়ত সবই ওর মনের ভুল। ঠিক তখুনি যে তিনজন ভেতরে গিয়েছিল, তারা বেরিয়ে এল। দুজনের হাতে দুটো বড় স্যুটকেস, একজনের হাতে একটা বেডিংয়ের মতো, যেন বাইরে কোথাও যাচ্ছে। বেরিয়েই ওরা চটপট গাড়িতে উঠে পড়ল, কোনোদিকে তাকাবার যেন আর সময় নেই। তারপরই গাড়িটা ছেড়ে ছিল। বইয়ের ওপর দিয়ে তিনজনকে একনজরে দেখল অর্ক। একজনের ঢ্যাঙা চেহারা, মিশকালো গায়ের রঙ, বাবরি চুল। আরেকজন একটু বেঁটেই বলতে হবে, তবে বেশ ষন্ডামার্কা, তামাটে গায়ের রঙ, চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। তৃতীয়জনের মাঝারি চেহারা, গালে দাড়ি। আজকাল যেমন আধগাল দাড়ি রাখা ফ্যাশন হয়েছে তেমন। ড্রাইভারের মুখটাই একটু গোবেচারির মতন, হাব-ভাবেও মনে হচ্ছিল যেন ঘাবড়ে গেছে, বার বার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

সন্ধ্যেবেলা ব্যাপারটা জানা গেল। বালচন্দ্রণের মুখেই সবিস্তারে ঘটনা শুনল অর্ক। দশ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন এক গুজরাটি পরিবার। তাঁদের দুই মেয়ে স্কুলে গিয়েছিল, ভদ্রলোকের বড়বাজারে স্টেনলেস স্টিল বাসনের বড় ব্যবসা। দুপুরে ভদ্রমহিলা শুয়েছিলেন, কলিংবেল শুনে দরজায় লাগানো 'আই হোল্' দিয়ে দেখেন একজন ভদ্রগোছের লোক একটা টেলিফোনের রিসিভার আর একটা কালো ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের টেলিফোনটা সত্যিই খারাপ ছিল, টেলিফোন অফিসে খবরও দেয়া হয়েছিল। তাই ভাবলেন টেলিফোন সারাতে এসেছে। তিনি কোনো সন্দেহ না করে দরজা খুলে দিতেই ওই লোকটির সঙ্গে আরও দুজন ঢুকে পড়ে। তাদের তিনি দেখতে পাননি, নিশ্চয়ই আড়ালে ছিল। ঢুকেই প্রথমজন বলেছিল, "আপনার টেলিফোনটা দেখতে এসেছি।"

তিনি পেছন ফিরতেই একজন দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, বাকি দুজন তাঁকে সহজেই কাবু করে হাত-মুখ বেঁধে একটা চেয়ারে বসিয়েছিল। তারপর ছোরা দেখিয়ে চাবি আদায় করে গডরেজের আলমারি খুলে গয়না, দামী জিনিসপত্র, এমনকি দামী শাড়ি, শার্ট-প্যান্ট পর্যন্ত নিয়ে গেছে। দুটো স্যুটকেসে জিনিসপত্র ভরেছিল আর একটা চাদরে জামা-কাপড় আর অন্যান্য জিনিস। অর্কর মনে পড়ল, সেটাকেই বিছানার মতো দেখাচ্ছিল। অনেক টাকার জিনিসপত্র নাকি চুরি গেছে, তা ছাড়াও বাড়িতে দশ হাজার নগদ টাকা ছিল তাও গেছে। ডাকাতরা যাবার আগে বাইরের দরজাটা টেনে বন্ধ করে গিয়েছিল। মেয়েরা বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পর ঘটনা জানা গেছে। কান্না পড়ে গেছে ওই ফ্ল্যাটে। পুলিশ এসেছে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অর্ক বালচন্দ্রণকে বলল, "একটা কথা বলব, কাউকে বলবি না।"

"ঠিক আছে।"

"প্রমিস।"

"হ্যাঁ, প্রমিস।"

"আমি ডাকাতদের দেখেছি," অর্ক দুপুরের ঘটনা খুলে বলল।

"গ্লোরিয়াস", বালচন্দ্রণ লাফিয়ে উঠল, "তুই পুলিশকে সব বললে একদম হিরো বনে যাবি।"

"না", অর্ক বলল, "পুলিশকে আমরা কিছু বলব না, এটা আমি আর তুই ছাড়া আর কেউ জানবে না। আমরা গোয়েন্দাগিরি করে ওদের ধরব, তুই আমার শাগরেদ হবি। রাজী?"

"ও.কে।" বালচন্দ্রণ অর্কর হাতে হাত মেলালো। তারপর শুরু হলো শলা-পরামর্শ। অর্কই বলল, "গাড়ির নম্বরটা আমি দেখেছি। আমি জানি বেলতলা রোডে মোটর ভেহিকেলসে গাড়ির লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়, আমার বাবার সঙ্গে আমি একবার গেছিলাম। ওই নম্বরের গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা ওখান থেকেই জানা যাবে। কিন্তু আমরা ফোন করলে সন্দেহ করবে।"

বালচন্দ্রণ বলল, "নো প্রবলেম, আমার মেসো মোটর ভেহিকেলসের এ.সি. (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার), আমি কালই খবরটা যোগাড় করছি।"

"তুই কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস করে দিস না," অর্ক সাবধান করে দিল, "বলিস গাড়িটা একজনকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল তাই তুই জানতে চাইছিস।"

"ডোন্ট ওরি," বালচন্দ্রণ ভরসা দিয়ে বলল, "আমি কায়দা করে খবরটা যোগাড় করব, মেসো ধরতেই পারবে না।"

পরদিন সত্যিই খবরটা নিয়ে এল বালচন্দ্রণ, কিন্তু ফলে সব

কিছু আরও গোলমেলে হয়ে গেল। ডব্লু.বি.ওয়াই ১০৪৫ গাড়ির মালিক একজন ডাক্তার, নাম পি.জি.বাসু, থাকেন পরাশর রোডে।

ওরা দুজন পরামর্শ করতে বসল। অর্ক বলল, "আমার মনে হয় ডাকাতরা নিশ্চয়ই গাড়িতে ফল্‌স্ নাম্বার প্লেট লাগিয়েছিল, গোয়েন্দা গল্পেও আমি এমন পড়েছি।"

"ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ফোন করলেই বোঝা যাবে," বালচন্দ্রণ বলল।

যুক্তিটা অর্কর মনে ধরল। সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবা সকালেই পিসির বাড়ি গেছেন, মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। অর্ক তখুনি টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে পরাশর রোডে ডাঃ পি. জি বাসুর ফোন নম্বরটা দেখে ডায়াল করল। ফোন ধরলেন একজন মহিলা। অর্কর প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এটা ডাঃ পি.জি.বাসুর বাড়ি, আমাদের গাড়ির নম্বর ডব্লু.বি.ওয়াই ১০৪৫।"

অর্ক যেন হোঁচট খেল, বলল, "ওই নম্বর আপনাদের গাড়ির?"

"হ্যাঁ, কেন বল তো?"

"মানে...গাড়িটা আমাদের পাড়ায় কয়েকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে।"

"সে কি!" ভদ্রমহিলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "ওটা তো কারখানায় দেয়া হয়েছে, রঙ করার জন্য।"

"কোন কারখানায় জানেন?" অর্ক ব্যগ্র কণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ, প্রিমিয়ার গ্যারেজ, হাজরা লেনে।"

অর্কর সংগে সংগে মনে পড়ল। কতদিন ও স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। হাজরা লেন দিয়েই শর্ট-কাট্ করে ওকে ফিরতে হয়, ওই গ্যারেজটা কতবার দেখেছে।

"তুমি কে? কোথা থেকে বলছ?" ভদ্রমহিলার প্রশ্নে ওর চিন্তায় বাধা পড়ল, বলল, "আমার নাম অর্ক, আমি দেশপ্রিয় পার্কের কাছেই থাকি।" তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ও নামিয়ে রাখল।

"ব্যাপারটা বুঝলি?" বালচন্দ্রণকে বলল অর্ক, "ডাঃ বাসু তাঁর গাড়িটা রঙ করার জন্য কারখানায় দিয়েছেন, ওখান থেকে ডাকাতির জন্য গাড়িটা নেয়া হয়েছে।"

"তা কি করে হয়?" বালচন্দ্রণ অবিশ্বাসের কণ্ঠে বলল।

"কেন?" অর্ক বলল, "হয়তো কারখানার মালিক ভাল টাকার বদলে গাড়িটা ওদের ভাড়া দিয়েছে। কিংবা–"

"কি?" বালচন্দ্রণ প্রশ্নভরা চোখে তাকালো।

"কারখানার মালিকের ডাকাতির সংগে যোগ আছে। তার পক্ষে গাড়ি নিয়ে যেখানে খুশি যেতে বাধা কোথায়?"

"দারুণ," বালচন্দ্রণ বলল, "তুই সত্যিই বড় হলে একজন গোয়েন্দা হবি।"

"চল্ আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ি," অর্ক বলল, "ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে আমার ফোন পেয়ে নিশ্চয়ই ওখানে

একজনের হাতে একটা কালো ব্রিফ কেস

খোঁজ পড়বে। তার আগেই আমাদের কাজ হাসিল করতে হবে।"

ওরা বেরিয়ে পড়ল। কারখানা বলতে বড় ধরনের একটা গ্যারেজ। তেলচিটে প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা মিস্ত্রিরা কাজ করছে, ভেতরে মাঝবয়সী একজন লোক বসে আছে, বোধহয় গ্যারেজের মালিক। অর্ক সাবধানী চোখে দেখে নিল সেই ডাকাতদের কেউ ওখানে নেই, মালিকের সংগে তাদের চেহারার কোনো মিল নেই। অর্ক একটু দমে গেল, তারপরই ওর চোখ পড়ল গাড়িটার উপর। মিস্ত্রিরা ঘষে ঘষে রঙ তুলে ফেলেছে তাই প্রথমে বুঝতে পারেনি, কিন্তু নম্বরটা দেখেই ওর বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। বালচন্দ্রণের দিকে তাকিয়ে ও ইংগিত করল, বালচন্দ্রণও দেখল।

কারখানার মালিক সেইসময় বেরিয়ে এল, ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি চাই খোকা তোমাদের?"

"মানে," অর্ক চট্ করে ভেবে নিয়ে বলল, "আমরা স্কুল থেকে ফিস্ট করতে যাব, স্কুলের বাসে সবার একসংগে জায়গা হচ্ছে না, আপনারা কি গাড়ি ভাড়া দেন?"

মালিক চোখ দুটো ছোট ছোট করে বলল, "এখানে গাড়ি মেরামত করা হয়, ভাড়া পাওয়া যায় কে বলল তোমাদের?"

"না, কেউ বলেনি," অর্ক তাড়াতাড়ি বলল, "আপনাদের এখানে অনেক রকম গাড়ি তো আসে, সবই তো মেরামতের জন্য নয়, রঙের জন্যেও আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাড়া অনেক গ্যারেজই দেয়, আমাদের স্কুলের বাস ড্রাইভার

বলেছে, আমরা ভাল টাকা দেব।"

"হুঁ!" মালিক গম্ভীর মুখে বলল, "তোমাদের কবে দরকার?"

"আগামী রবিবার," অর্ক উত্তর দিল।

"আজ বেস্পতিবার," মালিক হিসেব করতে করতে বলল, "রবিবার একটা গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। পেট্রল ছাড়া দেড়শ টাকা লাগবে সারাদিনের জন্য। তবে আগামীকালের আগে কথা দিতে পারব না, আরও একটা পার্টি বলে রেখেছে।"

"ঠিক আছে, তবে কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে জেনে যাব।"

ফিরবার জন্য পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল অর্ক। ওদের দিকেই বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে ঢ্যাঙা মতো একজন লোক, গায়ের রঙ কালো, বাবরি চুল। অর্কর বুকের ভেতর দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। লোকটিকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হয়নি ওর।

লোকটি এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ওদের দিকে, বিশেষ করে অর্কর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন মনে করবার চেষ্টা করল, তারপর মালিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে গজুদা।"

ওরা ভেতরে চলে গেল।

অর্ক বালচন্দ্রণকে নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়াই ভাল। ডাকাতদের সঙ্গে মালিকের যে একটা সম্পর্ক বা জানাশোনা আছে তাতে আর সন্দেহ নেই, হয়তো সেও একটা ভাগ পায়। ভাগ্যিস ডাকাতটা ওকে চিনতে পারেনি, তবেই হয়েছিল!

ডাকাতদের আড্ডা জানা হয়ে গেছে, এবার অ্যাকশন শুরু করতে হবে। তা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই ওরা বাড়ি ফিরল। বালচন্দ্রণ একবার বলল, এবার পুলিশকে সব জানিয়ে দিলেই ভাল হয়, তারা বাকি কাজটুকু করবে।

"বাঃ! আমরা আসল কাজটা করলাম আর ক্রেডিট নেবে ওরা! তা হতে দিচ্ছি না," অর্ক বলল, "কাল মালিকের সঙ্গে কথা বলে একটা ফাঁদ পাতব। তারপর আমাদের ক্লাসের সব ছেলে নিয়ে ঘেরাও করব ওদের, বাছাধনরা পালাবার পথ পাবে না। দরকার হলে আরও ছেলে নেব। ডাকাতরা যে ওখানে আসে সে কথা তো মিথ্যে নয়। মালিকের মুখ থেকেই আমরা সব বার করব, তারপর পুলিশে খবর দেব।"

পরদিন বালচন্দ্রণ স্কুলে গেল না, ওর পেট খারাপ হয়েছে, আর সেটাই ঘটনার মোড় ফেরালো।

অর্ক একাই ফিরছিল। গ্যারেজের কাছে আসতেই দেখল মালিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওর জন্যই অপেক্ষা করছে। ওকে দেখে সে একগাল হেসে এগিয়ে এল, বলল, "এস অর্কবাবু, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।"

অর্ক খুব অবাক হলো, ওর নাম জানল কি করে মালিক, ও তো বলেনি! ওকে খাতির করে ভেতরে নিয়ে ঢুকল মালিক আর তখুনি চমকে উঠল অর্ক। আজ মিস্ত্রিরা কেউ নেই, কিন্তু ঘরের মধ্যে যে চারজন রয়েছে তাদের অর্ক ভালমতোই চেনে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে তারা, খর দৃষ্টি।

ওকে একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে মালিক বলল, "তোমাদের স্কুলে খোঁজ নিয়েছিলাম, ফিস্টের কথা কেউ জানে না," দাঁত বার করে হাসল মালিক।

"মানে," অর্ক একটু আমতা আমতা করে বলল, "স্কুলের তো নয়, শুধু আমাদের ক্লাসের ছেলেরা মিলে করবে, আমি মনিটর, তাই আমার উপর ভার পড়েছে।"

"ও।" মালিক বলল। "ডাঃ বাসু কাল তোমরা চলে যাবার পর এসেছিলেন। কে এক অর্ক নামে একটি ছেলে তাঁর বাড়িতে ফোন করে তাঁদের গাড়ি সম্বন্ধে কি সব বলেছে, ওখান থেকেই এই গ্যারেজের কথা সে জেনেছে।"

অর্কর ভেতরটা শুকিয়ে গেল। উত্তেজনায় ডাক্তারবাবুর বাড়ির কথাটা ও ভুলেই গিয়েছিল। ইস, মস্ত ভুল হয়ে গেছে, ওরা সব জেনে ফেলেছে।

"তুমি পার্কসাইড্ রোডে থাক, তাই না?" এবার প্রশ্ন করল বাবরি চুল।

"হ্যাঁ," ঢোঁক গিলে জবাব দিল অর্ক।

"ওই ফ্ল্যাটবাড়িটার উল্টোদিকে?"

অর্ক জবাব দিতে পারল না, শুধু ঘাড় দোলালো।

"চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ওর হাত ধরে প্রায় টেনেই একটা গাড়িতে তুলল বাবরি চুল, বাকি তিনজনও উঠল, গাড়ি ছেড়ে দিল।

"সেদিন তুমি আমাদের দেখেছিলে," বাবরি চুল আবার বলল, "আমি এক পলকের জন্য তোমার মুখটা দেখেছিলাম। তুমি বই দিয়ে মুখ আড়াল করবার চেষ্টা করেছিলে।"

"আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?" এবার অর্ক সাহস করে জিগ্যেস করল।

"তোমাকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি না," বাবরি চুল জবাব দিল, সেই বোধহয় দলের সর্দার, "তুমি ছাড়া থাকলে আমাদের বিপদ। এত কাঁচা কাজ আমরা করতে পারি না। তবে তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে কষ্ট দিয়ে মারব না। একটা ঘরে বন্ধ করে রাখব, না খেয়ে শুকিয়ে তুমি মরবে। ভাল কথা, কাল তোমার সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিল, সে কোথায়?"

"সে আজ স্কুলে আসেনি।"

"হুঁ! একটু অসুবিধে হয়ে গেল। তাকেও আমরা চাই। তোমার ব্যবস্থা করে তার জন্য আবার আমাদের ফিরে আসতে হবে।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপরই দাড়িওলা লোকটি বলল, "তুমি আমাদের কথা বাড়িতে বলনি মনে হচ্ছে, তা যদি হত তবে পুলিশ গ্যারেজে হানা দিত। ব্যাপারটা কি?"

"আমি পুলিশের কাছে যেতে চাইনি, তাই বাড়িতে বলিনি,"

অর্ক জবাব দিল।

"সেখানেই যদি থেমে যেতে তবে তোমার আজ এ অবস্থা হত না," বাবরি চুল বলল, "কৃষ্ণুণেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ফোন করে গ্যারেজে আমাদের খোঁজ করতে গিয়েছিলে। যে বয়সের যা তাকে তাতেই মানায়, তোমার উচিত ছিল লেখাপড়া নিয়ে থাকা। গোয়েন্দাগিরির বয়স তোমার এখনও হয়নি।"

গাড়ি কলকাতা ছাড়িয়ে শহরতলিতে পড়ল, তারপর একটা ছোট বাড়ির সামনে থামল। আশেপাশে বাড়ি নেই, ফাঁকা মাঠ। অর্ককে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে ডাকাতরা পরামর্শয় বসল। দুজন এখানে পাহারায় থাকবে, বাবরি চুল আর দাড়িওয়ালা যাবে পার্কসাইড্ রোডে, যেমন করেই হোক অন্য ছেলেটিকেও ধরে আনতে হবে, নইলে তার মুখ থেকেই পুলিশ সব জানতে পারবে। যত তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করা যায় ততই মঙ্গল।

সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু অর্ক ফিরল না দেখে ওর মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ও কোনোদিন এত দেরি করে না। তিনি বালচন্দ্রণদের ফ্ল্যাটে গেলেন, ওরা একসঙ্গে পড়ে, নিশ্চয়ই অর্কর খবর বলতে পারবে। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন, বালচন্দ্রণ আজ স্কুলে যায়নি।

অর্ক ফেরেনি শুনে বালচন্দ্রণ উসখুস করল, তারপর বলল, "আন্টি, আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"কেন?" অর্কর মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

বালচন্দ্রণ আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না, সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। অর্ক যে আজ ওই গ্যারেজে যাবে সে কথা বলতেও ভুলল না। যদি ওখানে ওর কোনো বিপদ ঘটে থাকে!

সব শুনে অর্কর মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। বালচন্দ্রণের মা বুদ্ধি করে ওর মেসোকে ফোন করে তক্ষুণি ওদের বাড়ি আসতে বললেন। ভীষণ জরুরী। তিনি পনের মিনিটের মধ্যেই চলে এলেন। তাঁকে সব বলা হলো। তিনি খুব রেগে গেলেন, এমন ছেলেমানুষির পরিণাম যে কি হতে পারে তা ভাবা উচিত ছিল। বালু যখন তাঁকে ফোন করে গাড়ির নম্বর বলে মালিকের নাম, ঠিকানা জানতে চেয়েছিল তখনই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে টালিগঞ্জ থানায় ফোন করে ও.সি-কে ফোর্স নিয়ে চলে আসতে বললেন। এমার্জেন্সি।

এদিকে অর্কর বাবাও এসে গেছেন। তিনি ঘটনা শুনে যেন পাথর হয়ে গেলেন। এত কান্ড কিন্তু ছেলে কিছুই তাঁদের বলেনি। এত বড় একটা ডাকাতি, সেই ডাকাতরা কি প্রাণে ছেড়ে দেবে অর্ককে!

ও.সি. ফোর্স নিয়ে এসে পড়লেন। বালচন্দ্রণের মেসো পুলিশের একজন এ.সি., তাই তাড়াতাড়ি সব ঘটে গেল।

এদিকে পুলিশ ওখানে আসার কিছু পরেই বাবরি চুল আর দাড়িওলা গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির। পুলিশের গাড়ি দেখেই তারা বুঝল ব্যাপার সুবিধের নয়, তারা ওখান থেকে সরে পড়ল।

ও.সি. বালচন্দ্রণের মুখে আদ্যোপান্ত সব শুনলেন। একটা কথাই তিনি শুধু বললেন, "এইসব আজগুবি ডিটেকটিভ গল্প ছোটদের মাথা খাচ্ছে।"

আর সময় নষ্ট না করে সবাই বেরিয়ে পড়লেন। গ্যারেজে কাউকে পাওয়া যাবে বলে ও.সি.-র ভরসা হচ্ছিল না। ডাকাতরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে আরও একজন ছেলে এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছে, তার মুখেই পুলিশ সব জানতে পারবে। তারপরও কি পাখি থাকবে?

গ্যারেজের মালিক হিসেব মিলোচ্ছিল, মিস্ত্রিরা সব চলে গেছে। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠেছে। বাবরি চুল আগে তার গ্যারেজেই মেকানিক ছিল, পরে বাঁকা পথ ধরে। তার কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে এসব করছিল, গাড়ি না দিলে প্রাণের ভয় দেখাচ্ছিল। অবশ্য ডাকাতির একটা ভাগ তাকে দেয় কিন্তু সেটা তেমন আহা মরি নয়। বাবরি চুল, যার নাম নিতাই, সে হেসে বলে, "তোমার ভয় কিসের? ধরা পড়লে তুমি বলবে টাকার বদলে গাড়ি ভাড়া খাটাই, কিসের জন্য কে গাড়ি নিচ্ছে তা আমার জানার কথা নয়। তা ছাড়া তুমি তো আর ডাকাতি করছ না, মাঝখান থেকে দাঁও মারছ।"

হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষল গ্যারেজের সামনে, তারপরই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল নিতাই আর তার চ্যালা রঘু।

"গজুদা, শিগগির চল," নিতাই এক নিশ্বাসে বলল, "অর্কদের পাড়ায় পুলিশ এসে গেছে, ওই ফ্ল্যাটবাড়ির সামনেই পুলিশ দেখলাম। ওর বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে পুলিশ এখুনি এসে পড়বে।"

গজেন অর্থাৎ গ্যারেজের মালিকের কপাল দিয়ে দর্‌দর্ করে ঘাম নামতে শুরু করল। কান্না কান্না গলায় সে বলল, "আমি জানতাম এমন হবে। তোরা নিজেরাও ফাঁসবি, আমাকেও ফাঁসাবি। তোদের কথায় কান দিয়ে কি ভুলই না করেছি।"

"চুপ কর," গর্জে উঠল নিতাই, তারপর গজেনকে প্রায় পাঁজাকোলা করেই গাড়িতে তুলল।

"আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দে," গজেন কাঁদতে শুরু করল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস তোরা?"

"যেখানে তুমি আমাদের হদিস কাউকে কোনোদিন দিতে পারবে না," বিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠল নিতাই।

গজেন তবু জোর করে নামতে যাচ্ছিল, রঘু একটা ছোরার তীক্ষ্ণ ফলা তার পাঁজরে ঠেকিয়ে বলল, "আর ট্যাফু করেছ তো পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব।"

নিতাই গাড়ি স্টার্ট দিল।

মোড়ের মাথায় এসেই ওরা পুলিশের গাড়ির মুখে পড়ল। প্রথমে একটা জিপে ও.সি. আর দুজন সাব-ইন্সপেক্টর, পেছনে একটা ট্রাকে সশস্ত্র পুলিশ। ও.সি. হয়তো গাড়িটাকে

পাশ কাটিয়েই যেতেন, তাঁর তখন ভীষণ তাড়া। ওই গাড়িটাকে লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ ওই গাড়ি থেকে একজন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই তাঁর চমক ভাঙল। তাকিয়েই ড্রাইভারের সিটে যাকে দেখলেন তাকে দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। কেরালার ছেলেটির মুখে ওদের একজনের চেহারার যে বর্ণনা তিনি পেয়েছেন তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। গুজরাটি ভদ্রমহিলাও এই একই চেহারার কথা বলেছিলেন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটার পথরোধ করলেন। গাড়িটা তবু বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রিভলভার গর্জে উঠল। ওই গাড়ি থেকেও এল প্রত্যুত্তর। রিভলভারের গুলি আর বোমা। ও.সি. জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন, পুলিশ বাহিনীকে হুকুম করলেন ওদের ঘিরে ফেলতে। বোমার ধোঁয়ায় যে আড়াল হয়েছিল তার সুযোগে ডাকাত দুজন গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিকে দৌড়েছিল, কিন্তু পালাতে পারল না, পুলিশ তাদের ধরে ফেলল। তবে দুজন পুলিশ তাদের গুলিতে আহত হলো।

গাড়ির ভেতর গ্যারেজের মালিককে পাওয়া গেল। পুলিশ দেখে বাঁচার আশায় সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে রঘু তার পাঁজরে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো।

অর্ককে কোথায় গুম করা হয়েছে তা ওদের মুখ থেকে বার করা সহজ হলো না। পুলিশের অনেক রকম দাওয়াইয়ের পর মাঝরাতে রঘু ভেঙে পড়ল, বলে দিল বাড়ির ঠিকানা।

পুলিশ যখন বাড়িটা ঘিরে ফেলল তখন রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। বাকি দু'জন বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করল না। অতর্কিত পুলিশের হানায় তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

অর্ককে যখন উদ্ধার করা হলো, তখন সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না ব্যাপারটা। ওর বাবাও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি জড়িয়ে ধরলেন ওকে। পরম স্বস্তিতে ও চোখ বুজল।

ডাকাতি-করা সব টাকা-পয়সা, গয়না ওই বাড়ি থেকেই উদ্ধার করল পুলিশ।

গোয়েন্দা হবার শখ মিটে গেছে অর্কর, গোয়েন্দা কাহিনীও আর ও পড়ে না।

ছবি : সুবোধ দাশগুপ্ত

পেলে-মারাদোনা

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কাকা, কাকার কাকা
তার যে ভায়ের ছেলে,
চিনবে তাকে এক ডাকেতেই।
নামটি যে তার পেলে।
ব্রাজিল থেকে আসে চিঠি,
দাদার খবর নিয়ে।
দেখতে পারিস চিঠিগুলো,
কাকার বাড়ি গিয়ে।

* * *

সবটা শুনে মুচকি হেসে
বলল এবার বিশে,
জানিস পিনু, মারাদোনার
পায়ের জাদু কিসে?
মায়ের মুখে শুনেছি ভাই,
আমার মামার কাছে,
খেলা শিখে মারাদোনা
আজও ঋণী আছে।

ভূতের যদি থাকে খুঁৎ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিয়ে বাড়ির হ্যাপা চুকতে বেশ রাত হয়ে গেল। বর কনে যখন বাসরে ঢুকলো নিবারণ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো প্রায় বারটা।

শীতের রাত্তির। চারদিক থমথমে নিশুতি। দুচোখ এবার ঘুমে জড়িয়ে আসছে নিবারণের। ইচ্ছে করছে এক্ষুণি কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর হবে নাই বা কেন—বরযাত্রী দলের সংগে পাক্কা ছ'ঘন্টা বাস জার্নি করে তবে এই পাড়াগাঁয়ে বিয়ের আসরে এসেছে নিবারণ। নেহাত বর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, না হলে আজকাল এসব ঝক্কি পোষায় না নিবারণের।

কিন্তু শোবার জায়গাই বা এখানে কোথায়? পুরো বরযাত্রী দলটাকেই আজ রাতে থাকতে হচ্ছে। বর বাসরে ঢুকতেই যে যার জায়গা ম্যানেজ করে শুয়ে পড়েছে। একমাত্র ঠাঁই করতে পারেনি নিবারণ। আর বাসরে ঢুকে সারারাত রংগ করাও নিবারণের ধাতে সয় না। তাহলে এখন উপায়? এই মাঘ মাসের শীতের রাতে বাইরে শুয়েও তো কাটান যায় না!

অতএব ছাউনি দেয়া আস্তানা একটা চাই।

এ সময়ই হঠাৎ নজর পড়লো নিবারণের। বাড়ির খিড়কির পুকুরের ওধারে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। শুক্লপক্ষের ঢেউ-ভাঙা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি। এখান থেকে খুব দূরেও নয়। এদের সংগে যদি জানাশোনা থাকে, কাউকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে একটা রাত ওখানে অতিথি হয়ে কাটিয়ে দেয়া যায় না কি?

ভাবার সংগে সংগে নিবারণ আর দেরি না করে এদের বাড়ির একজন মাতব্বর গোছের লোককে পাকড়ে মতলবের কথাটা জানাল। কিন্তু শুনেই তো আঁতকে উঠলেন মাতব্বর ভদ্রলোক। বললেন—মশাই, ও চিন্তা মনেও আনবেন না। ও বাড়িতে মানুষ বাস করে না, ও ভূতুড়ে বাড়ি।

—মানুষ বাস না করলেই যে সেটা ভূতুড়ে বাড়ি হতে হবে তার কোনো মানে আছে? নিবারণ ব্যাজার মুখে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে। এমনিতেই ভূত-টুতের প্রতি বিশ্বাস নিবারণের কোনোকালেই বিশেষ নেই।

—আরে মশাই, একথা এখানে সবাই জানে। ও বাড়িতে যে থাকতো সে এক কাগজকলের কর্মী ছিল। বছর কয়েক আগে কারখানার মেশিনে দুটি হাতই কাটা যেতে চাকরিটা চলে যায়। সেই দুঃখে মাসখানেক বাদেই আত্মহত্যা করেছিল লোকটা। কিন্তু আত্মহত্যা করেও নাকি ও বাড়ির মায়া সে ছাড়তে পারেনি,—বলতে বলতে দস্তুরমতো চোখ বড় বড় করে মাতব্বর—আজ পর্যন্ত কেউই ওখানে গিয়ে একটা রাতও কাটাতে পারেনি।

কিন্তু ততক্ষণে একটা শতরঞ্জি আর চাদর বগলদাবাই করে ফেলেছে নিবারণ আর কথার মধ্যেই মাতব্বরের হাত থেকে হ্যারিকেনটাও নিয়ে নিয়েছে। তারপর সোজা পা চালিয়েছে খিড়কির দরজার দিকে। ক্লান্ত দেহে ভূতুড়ে গল্প শোনার মেজাজ এখন তার নেই। বাড়িটা ফাঁকা, এ খবরটাই তার কাছে যথেষ্ট, বাকিটা পরে দেখা যাবে।

পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বদনাম হলেও বাড়িটা এখনও বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যায়নি, সেটা ঢুকেই টের পাওয়া গেল।

ঘর বলতে একটাই। সেখানে থাকার মধ্যে আছে এক ধুলো-মলিন তক্তাপোশ, ভাঙা টেবিল আর খান দুই ভাঙা চেয়ার। অল্প সময়ের মধ্যে তক্তাপোশটা কিছুটা ঝাড়ামোছা করে তার ওপরই শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে পড়লো নিবারণ। ঘরের সব ক'টা জানলা দরজা বন্ধ থাকায় ভালই হলো, এই মাঘ মাসের শীতে হাড়-কাঁপানো বাতাস ঢোকার ভাবনা রইলো না। হ্যারিকেনের শিখাটা কমিয়ে রাখলো টেবিলটার ওপর। আর কি! আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে এখন একঘুমে রাতটা কাটিয়ে দিলেই হলো।

একটা নিশ্চিন্ত হাই তুলে নিবারণ ভাবলো ইচ্ছে করলেই আরও দু'একজন এসে এই পরিত্যক্ত ফাঁকা ঘরে আরামে রাতটা কাটিয়ে যেতে পারতো। হয়তো যারা ভেবেছিল ওই মাতব্বরই আসতে দেননি। লোকটা নিজেই একটা ভূত, নিবারণ ভাবলো—ভূত না হোক, অদ্ভূত তো বটেই।

হ্যারিকেনের অল্প আলোয় ঘরটা রহস্যময় দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এল নিবারণের।

কত সময় কেটেছে কে জানে! হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল!

ঘর অন্ধকার। হ্যারিকেনের আলো নিভে গেছে। নিবারণ কান পাততেই শুনলো দুমদাম দুদ্দাড় শব্দ। ঘরের দরজা জানলাগুলো বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। তবে কি হঠাৎ ঝড় এল—এই মাঘ মাসের শীতের রাতে? তাই বা যদি হয়, জানলাগুলো খুলছে বটে, তবে হাওয়া-টাওয়া তো ঢুকছে না।

নিবারণ হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করে হ্যারিকেনটা নতুন করে জ্বেলে দিল। দরজা-জানলা পড়ার শব্দ ততক্ষণে থেমে গেছে। হ্যারিকেনের আলোয় নিবারণ দেখলো, কই, কোনো জানলা তো খুলে নেই। সবই আগের মতো ভেতর থেকে বন্ধ। তবে কি স্বপ্ন দেখছিল? এমন সশব্দ স্বপ্ন জীবনে কোনোদিন দেখেনি নিবারণ।

আসলে সেই মাতব্বর ভদ্রলোক যে ভয় দেখিয়েছিলেন সেটাই বোধহয় অবচেতন মনে...ভাবতে ভাবতে হাই তুললো নিবারণ।

কিন্তু ভাবনা আর হাই দুটোই আর শেষ হলো না, তার আগেই দেখতে পেল—

ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা কালো বেড়াল বসে রয়েছে।

আশ্চর্য! বেড়ালটা ঘরের মধ্যে ঢুকলো কি করে! ঘরের প্রতিটি জানলা দরজাই তো ভেতর থেকে বন্ধ! তবে কি আগে থেকেই এই তক্তাপোশের নিচে এসে বসেছিল, প্রায়-অন্ধকার ঘরে ঢুকে নিবারণ দেখতে পায়নি?

কুচকুচে কালো রঙের বেড়ালটার চোখ দুটো জ্বলছে অতি তীব্র দীপ্তিতে। দেখলে অস্বস্তি হয় বৈকি। কালো বেড়াল নাকি আবার অশরীরীর প্রতীক। হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ্য পড়লো নিবারণের। বেড়ালটার সামনের দুপায়ের থাবা সমেত কিছুটা অংশ কাটা। অদ্ভূত তো! এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আশঙ্কা দেখা দিল নিবারণের মনে। বিয়ে বাড়ির মাতব্বর বলেছিলেন এ বাড়িতে দু হাত কাটা এক ভূতের বাস আছে—সেই ভূতটাই বেড়ালের রূপ ধরে বসে নেই তো?

ভাবতে ভাবতেই অবাক কান্ড—বেড়ালটা চোখের সামনেই বদলে গিয়ে একটা কুকুর হয়ে গেল। যাকে বলে খাঁটি নেড়ে কুত্তা। তেমনি ডিগডিগে ঘিয়ে ভাজা। কিন্তু তখনও সেই এক ব্যাপার—কুকুরের সামনের দুটি পায়ের কিছু অংশ কাটা। স্বভাবতই থেবড়ে বসে রইলো কুকুরটা।

নাঃ; আর কোনো সন্দেহ নেই, ওটা এ বাড়ির সেই ভূতটাই বটে!

কিন্তু রাতদুপুরে চোখের সামনে ভূত বাবাজির খামকা ওই সব ম্যাজিক দেখানোর কারণটা কি নিবারণ বুঝতে পারলো না। ওর কি ধারণা নিবারণ মুগ্ধ হয়ে বাহবা জানাবে?

ধুত্তোরি! ঘুমের সময় এসব ব্যাঘাত নিবারণের একেবারেই পছন্দ নয়। হ্যারিকেনটা জ্বেলে রেখেই আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো নিবারণ।

কিন্তু ঘুম আসার কি জো আছে—বিশেষতঃ ভূতের সংগে একঘরে থেকে?

একটু বাদেই শুরু হয়ে গেল নতুন উপদ্রব। সারা ঘর দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো কেউ। জানলা দরজা থেকে শুরু করে তক্তাপোশটা পর্যন্ত টানাটানি শুরু করলো।

এ তো মহাঝামেলা হলো! এভাবে অনবরত ঝামেলা বাধিয়ে চললে আজকের ঘুমের তো দফা রফা। কাল ভোরেই আবার আট ঘন্টা বাস-জার্নি করতে হবে। এর একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া দরকার। চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে তড়বড়িয়ে উঠে বসলো নিবারণ—

আর উঠে বসতেই একেবারে মুখোমুখি। বিকট চেহারার এক মূর্তি তক্তাপোশের ঠিক সামনেই নিবারণের দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা চমকে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল নিবারণ। মাতব্বরের কথামতো এই তাহলে পোড়ো বাড়ির ভূত।

কিন্তু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অমন বীভৎস অংগভংগি করছে কেন? ভয় দেখিয়ে নিবারণকে ঘরছাড়া করার মতলবে কি?

ভয়ের বদলে এবার হাসিই পেল নিবারণের। একেই তো ভূতের ভয় জীবনে ওর কোনোদিনই নেই, তার ওপর এ হলো.....

মুখ ফুটে বলেই ফেললো—তোমার দৌড় তো জানি বাপু। আর যাই কর, ওই কব্জি পর্যন্ত কাটা হাত দুটো নিয়ে কারুর অনিষ্ট করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব মেলা উৎপাত না করে একটা রাত এই অতিথিটিকে ঘরে শুয়ে একটু ঘুমোতে দাও। চিন্তা নেই, কাল সকালে উঠেই চলে যাব।—বলেই হাই তুললো নিবারণ। আবার নতুন করে ঘুম আসছে।

ভূত কিন্তু নড়লো না। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু এবার ওর মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে টের পেল

নিবারণ। কেমন যেন করুণ হয়ে উঠছে ভূতের মুখটা। অসহায় ভাব ফুটে উঠছে। দেখতে দেখতে টপ্ টপ্ করে দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো চাদরে। স্পষ্টই টের পেল নিবারণ।

ভূত কাঁদছে! এমন অসম্ভব কাণ্ডের কথা কেউ কখনও শুনেছে? কিন্তু সেই দৃশ্যই চোখের সামনে দেখলো নিবারণ। কিছুটা সময় তাকিয়ে রইলো হকচকিয়ে, তারপর দাবড়ে উঠলো, এসব হচ্ছে কি? এতক্ষণ উৎপাত করে সুবিধে না হওয়ায় এবার কান্নাকাটি ধরেছ? কিন্তু জেনে রাখ, রাত এ ঘরে না কাটিয়ে আমি নড়ছি না। আর তোমার মতো ঠুঁটো ভূতের সাধ্য নেই আমায় তাড়ায়...

এবার নিবারণের কথা আর শেষ হলো না, তার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠলো ভূত। কাঁদতে কাঁদতে করুণ নাকি সুরে বললো, দোহাই, বারবার ওকথা বলে আমায় নতুন করে দাগা দেবেন না স্যার। আমি তো মরেই আছি, মরার বাড়া আর কি হতে পারে।—বলতে বলতে আর একবার ডুকরে উঠলো।

এবার রীতিমতই অবাক হলো নিবারণ, এর সঙ্গে কৌতূহলও বাড়লো, বললো, তোমার কি ব্যাপার বল দেখি হে, তোমার পাল্লায় পড়ে ঘুমের দফারফা তো হলোই, এখন না হয় জমিয়ে একটা ভূতুড়ে গল্পই শুনি।

—গল্প না স্যার, খাঁটি সত্যি কথা। ভূত বাধা দিয়ে বললো, সত্যি বলছি মরে এত জ্বালা জানলে আগে আত্মহত্যাই করতাম না।

ভূত তার কাহিনী শুরু করলো :

জীবিতকালে ভূতের নাম ছিল বটু। তিন কুলে কেউ ছিল না। একাই থাকতো এই বাড়িটায় আর স্থানীয় এক কাগজকলে কাজ করতো। একদিন এক ঘোরতর দুর্ঘটনায় তার হাত দুটো কনুই থেকে কাটা গেল এবং সেই দুঃখে কিছুদিন বাদেই আত্মহত্যা করলো। এই পর্যন্ত ওর গল্প আগেও শুনেছে নিবারণ।

তার পরের কথাগুলো শোনা গেল সাক্ষাৎ ভূতের মুখ থেকে।

ভূত হয়েও বটু অন্যের পরিহাস আর আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পায়নি। এর জন্যে দায়ী ভূতেদেরই সমাজব্যবস্থা।

মানুষের মতো ভূতেদেরও নাকি একটা সমাজ আছে। ভূত-রূপ ধারণ করেই প্রতিটি ভূতকে সেখানে নিজের নাম 'রেজেস্ট্রি' করতে হয়। তারপর নতুন ভূত তার স্বভাব ও চরিত্র অনুযায়ী এক এক ধরনের দায়িত্ব পায়। যেমন কারুর দায়িত্ব মাছের বাজারে ঘোরাঘুরি করে ফাঁকতালে একটা ওজন মতো মাছ তুলে আনা, কারুর দায়িত্ব বেলগাছ বা নিমগাছ থেকে বেল বা নিমপাতা পাড়া আর কারুর কাজ শুধুই শ্যাওড়া গাছ, শ্মশান-মশান কিংবা আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে ভীতু লোকেদের ভয় দেখিয়ে ভূতের পুরনো ইজ্জত রক্ষা করা।

কিন্তু দু হাত কাটা বটুর ভাগ্যে এর একটা কাজও জুটলো না। কারণ ঠুঁটো হাতে এসব কোনো কাজ করাই বটুর পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝ থেকে ভূত সমাজের অবহেলা আর পরিহাস শুনে ফিরতে হলো বটুকে।

ফিরে এল ওর এই পুরনো বাড়িতেই। চরম আত্মগ্লানিতে আর একবার আত্মঘাতী হবার ইচ্ছে জাগলো মনে—কিন্তু হায়! ভূত হয়ে তাই বা কি করে সম্ভব!

অগত্যা ভূত সমাজ থেকে মুখ লুকিয়ে মনের দুঃখে বাড়িতে একা একাই দিন কাটছিল বটুর।

কিন্তু তার একা থাকার অধিকারেও হস্তক্ষেপ হলো। মাঘ

বিকট চেহারার এক মূর্তি ঠিক সামনেই

মাসের রাতের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এ বাড়িতে থাকার উপযুক্ত একটি মাত্র ঘরেও মানুষ এসে ঢুকলো—এবং সে কিছুতেই ঘর ছাড়তে রাজী নয়।

ভূতের কাহিনী শুনে নিবারণ বললো, কিন্তু একটা রাত মানুষের সংগে কাটাতেই বা তোমার আপত্তি কিসের বাপু?

ভূত চোখ কপালে তুলে বললো, কি বলছেন স্যার, ভূতের ইজ্জত তো আগেই খুইয়েচি, এরপর যদি মানুষের সংগে একঘরে রাত কাটাতে হয় তবে কি আর 'ভূতত্ব' বলে কিছু থাকে? এরপর তো ভূত সমাজ আমায় দেখলে থুতু দেবে। অথচ রাতটা যে বাইরে কাটাব সে উপায়ও নেই। মাঘের ঠাণ্ডা ভূতের পক্ষেও অসহ্য। বিশেষতঃ ভূত হবার পর থেকে বাইরে থাকার অভ্যেসটাও তৈরি হয়নি।—বলতে বলতে বিষণ্ণতায় বুজে এল শ্রীমান ভূত ওরফে বটুর কণ্ঠ।

ভূত জীবনেও যে এত সমস্যা থাকতে পারে, আগে কখনও ভাবেনি নিবারণ। গালে হাত দিয়ে একটু সময় বসে ভাবে সে। ভূতের জন্যে রীতিমত দুঃখই হতে থাকে। তারপর বলে, আচ্ছা, এই ভূত প্রাপ্তি থেকে তোমার কোনোভাবে মুক্তি নেই? শুনেছি গয়ায় পিণ্ডদান করলে নাকি...!

হুস্ করে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভূত, তারপর বললো, তা আমার জন্যে আর সে দায় কার পড়েছে বলুন? তিন কুলে কেউই নেই আমার।

—বেশ, আমিই তোমার পিণ্ডদান করবো, নিবারণ প্রগাঢ় সহানুভূতিতে ভূতকে আশ্বস্ত করে বলে,—কিন্তু বাপু, একটাই শর্ত আমার, আজকের বাকি রাতটা বিনা উৎপাতে আমায় ঘুমতে দিতে হবে। নিদ্রা আর ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে পড়ছে। বিরাট একটা হাই তুললো নিবারণ।

কিন্তু তারপরই আর ভূতকে দেখা গেল না। তার বদলে বিরাট এক কুচকুচে কালো টিকটিকি নিবারণের চোখের সামনে সরসর করে উঠে গেল কড়িকাঠের দিকে।

পরদিন বেশ বেলায় বিয়ে বাড়ির মাতব্বর ও বরযাত্রী দলের কয়েকজন যখন ভূতের বাড়িতে নিবারণকে খুঁজতে এল, নিবারণ তখনও তক্তাপোশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

এরপর বরযাত্রী দলের একজন নিবারণের ঘুম ভাঙিয়ে যখন বললো, নিবারণদা, চটপট তৈরি হয়ে নাও, আমাদের বাস আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টার্ট করবে, নিবারণ বললো, ও বাসে আমার আর যাওয়া হচ্ছে না রে, তোরা বরং চলে যা।

—সেকি, তুমি কোথায় যাবে?

—একটা কাজ সারবো গয়ায়, তারপর কলকাতায় ফিরবো।

শুনে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলো নিবারণের দিকে। মাতব্বর পর্যন্ত কেমন হকচকিয়ে যান। শুধু ঘরের কড়িকাঠের সেই কুচকুচে কালো টিকটিকিটা আনন্দে ল্যাজ আছড়ে ডেকে ওঠে—টিক্-টিক্-টিক্।

নিবারণের মনে হলো বটুই সায় দিয়েছে—ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্!

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

বিকম পাশ করে দুবার ব্যাংকের পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে একটা চাকরি পেয়েছি।

ব্যাংকের চাকরি পেতে বাড়ির সবাই খুব প্রসন্ন। আমিও নিশ্চিন্ত। মাইনে ভাল, কিছুদিন অন্তর নিজেদের উন্নতির জন্যে ধর্ণা ধর্মঘট শ্লোগান ইত্যাদি করে মাইনে বাড়িয়ে নেওয়া অতি সহজ ব্যাপার।

আমার বন্ধু সমীর, সেও ঢুকেছে অন্য ব্যাংকে আর এক বন্ধু অনিমেষ ল-লাইনে গেছে। ইচ্ছে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার কিন্তু হলো উকিল, তাও ইনকাম ট্যাক্সের। এখনকার দিনে এর চেয়ে রোজগারের আর ভাল রাস্তা নেই বোধ হয়।

সেদিন হঠাৎ সমীরের ফোন। আপিসে বসেই ধরলুম। সে বললে, শুনেছিস অনিমেষের বিয়ে হচ্ছে যে।

আমি বললুম, বাজে কথা,এ তো আজ নয়, অনেকদিন থেকে কথা চলছে।

না না, ঠিক হয়ে গেছে। আমি চিঠি পেয়েছি আজ সকালের ডাকে।

তাই নাকি? কই আমি পাইনি তো।

পাবি পাবি, আর বাড়ি গিয়েই হয়ত–

সত্যিই তাই। বাড়িতে গিয়ে চিঠি তো নয়, যেন বাহারে কার্ড একখানা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। খুলে পড়ে দেখি–শান্তনু, কার্ড পাঠালুম, বাড়ির লোক সব ঠিক করে ফেলেছে। কি আর করি বল। রাজী হতে হলো। পারলে এর মধ্যে একবার দেখা করিস।

পরদিন সমীরকে বললুম, অনিমেষের জন্যে একটা Present তো কিনতে হবে–

তাতো হবে–দুজনে এত দূরে থাকি যে একসংগে মোলাকাৎ হওয়া দুঃসাধ্য। কলকাতা এখন আমার কাছে এক দুর্গম অরণ্য মনে হয়। অরণ্য ভেদ করে তবু যাওয়া যায়–কিন্তু এই শহরে জ্যামজট ভেদ করে গতায়াত শুধু অসাধ্য নয়–প্রাণ যাবার রিস্কও আছে।

হঠাৎ অনিমেষের ফোন পেলাম। শান্তনু, বাড়িতে মস্ত বিপদ। একবার যদি আসিস।

কি বিপদটা বল আগে।

তনি মানে, তনুশ্রী কাল থেকে মিসিং। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত আজকে রাতে T.V তে ছবি দেখতে পাবি।

তনুশ্রী হলো অনিমেষের বোন। আমরা তনি তনি করে ডাকি। মেয়েটা সত্যি খুব ভাল। বি এ পড়ছে। দেখতে ডানাকাটা পরী নয় তবে সুন্দরী। আর খুব স্মার্ট।

পুলিশে খবর দিয়েছিস?

হ্যাঁ, সে তো পরদিনই দিয়েছি। কিন্তু পুলিশের ওপর ভরসা নেই।

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে দড়াম করে ভূতলে পড়লাম। তনুশ্রী মিসিং। এ কি করে হবে। অত স্মার্ট মেয়ে। সে কারও খপ্পরে পড়ার পাত্রী তো নয়–তবে অন্য কোনো বিপদও হতে

পারে তো।

সন্ধ্যেবেলা সমীর এসে হাজির। আরে না না তনি মিসিং হবার মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই কোথাও গেছে, খবর দিতে ভুলে গেছে–

চ–আমরা ওদের বাড়ি যাই, খবরটা ভাল করে জানতে হবে তো। আন্দাজে হাত গুনে জ্যোতিষীর মতো বললেই তো হবে না।

অনিমেষদের বাড়িটা আবার প্রায় নর্থ পোলে, মানে কলকাতার উত্তরে সিঁথি পেরিয়ে। যাই হোক গিয়ে হাজির হলুম।

মাসীমা দুদিন খাননি, চোখে ঘুম নেই।

তনুশ্রীর ছোট ভাই ছুটে এল আমাদের দেখে, শানুদা এসেছে মা।

কি হয়েছে মাসীমা? ব্যাপারটা কি বলুন তো, সমীর অনিমেষের মাকে জিগ্যেস করল।

সর্বনাশ হয়েছে বাবা, মেয়েটার কোনো হদিস পাচ্ছি না– একে-বা-রে নিরুদ্দেশ! কাঁদতে কাঁদতে বললেন মাসীমা।

কখন বেরিয়েছিল সে?

খেয়ে দেয়ে দুপুরে–

আচ্ছা, ওর বন্ধুদের বাড়ি খবর নেওয়া হয়েছে ?

সব জায়গায় ফোন করা হয়েছে–কিন্তু, কেউ জানে না– কোথা গেল সে?

আচ্ছা, মাসী পিসী বা দিদি কে আছেন যেখানে যেতে পারে?

ওমা! সে তো সব দূরে দূরে–সেখানেও টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

সমীরকে বললুম, জায়গা আর নামগুলো নোট করে নে তো।

সমীর বলল, আমি বলছি, সে নিশ্চয়ই কারু বাড়িতে গেছে। হয়ত চিঠি দিয়েছে। সেটা আসেনি। অনিমেষের বিয়ের কতদূর এগুলো বলুন।

মাসীমা চোখ মুছে বললেন, সে তো আর মাসখানেকও বাকি নেই, কিন্তু কি করে বিয়ে হবে বলতে পারিস?

কেন হবে না! আমি বললুম। দেখবেন দুচার দিনের মধ্যে তনুশ্রী ঠিক এসে যাবে। পুলিশ কি বলছে ?

ওরা কিছুই বলতে পারছে না।

একজন ডিটেকটিভ লাগাতে হবে।

সমীর কেবল বলে যাচ্ছে। কিছু করতে হবে না। দেখে নিস এর মধ্যে ঠিক এসে যাবে।

আরও এক সপ্তাহ কাটল। আমি ভাবছি অনিমেষের বিয়ের Present-এর কথা। কিনে তো রাখা যাক। সেদিন মাইনে পেয়ে হাতে অনেকগুলো টাকা রয়েছে। ভাবলুম, আজ একবার বেরিয়ে পড়ি যদি কিছু কেনা যায়। ও আবার যা ফ্যাশানেবল্ ছেলে একটু নতুন ধরনের কিছু দিতে হবে।

তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। হাঁটতে হাঁটতে একাই যাচ্ছি। সমীর গেছে সেওড়াফুলি তনির মাসীর বাড়ি, তাছাড়া সে আরো ঘুরবে ক'জায়গায়।

একি! সামনে একটা গলি। এটা আবার চীনাপট্টির ভেতর দিয়ে চলে গেছে। যাব ঐ দিকে? ক্ষতি কি? এখানে হয়ত নতুন কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি।

বেশ অনেকখানি ঢুকে দেখি একটা চীনা রেস্তোরাঁ। কিছু খেয়ে নিলে হয় না? না দরকার নেই। ওমা, প্রায় সামনেই দেখি একটা দোকান। ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা 'কিউরিও শপ'। বাহ্, এখানে কোনো একটা মজার নতুন জিনিস পেয়ে যেতে পারি।

দরজার কাছে একজন বিচিত্র-দর্শন লোক দাঁড়িয়ে। এ কি মালিক নাকি? চীনা না তিব্বতী বোঝা ভার। মুখখানা শুঁটকো, দুদিকে ঝোলা গোঁফ, মাথায় কালো টুপি। গায়ে জোব্বা ডার্ক ব্লু রঙের, তাতে ড্রাগনের ছবি সেলাই করা। চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন, খুব সাধারণ নয়, অনেকটা সাপের চাউনির মতো। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কাম ইন সার! বলুন কি চাই?

আমিও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভেতরে ঢুকলুম। ও হরি, ভেতরের মালপত্র দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছি। প্রকান্ড চীনে ভাস, অদ্ভুত মূর্তি। কিছু পাথরের, কিছু বা ব্রোঞ্জের। এ তো সবই দামী জিনিস হবে।

আমি একটা জিনিস চাই, বন্ধুর বিয়েতে present দেব।

ভেরি ওয়েল, অনেক আছে, দেখিয়ে দিন, যেটা পছন্দ করেন।

আপনি তো বেশ ভাল বাংলা বলেন। কোথায় বাড়ি আপনার? জিগ্যেস করি।

বলল, আগে হংকংয়ে ছিলাম, তারপর জাপানে কেটেছে বারো বছর। তারপর এলাম টিবেটে। অনেক ঘুরেছি মশাই। এ সব সংগ্রহ করা কি সোজা কথা! একটা আইল্যান্ডেও ছিলাম।

কি নামটা জানতে পারি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নাম চিয়াংডলি। দেখুন এবার পসন্দ করুন। একটা জিনিস দেখাব?

দেখান না।

একটা বীভৎস চেহারা, বদখত্ মুখ, মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে গেছি। এমন সময় সে একটা ছবি এনে আমার সামনে ধরল, বলল, দেখুন তো এটা।

এটা আর কি এমন। একটা মানুষের মুখের ওপরের অংশ। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। বললুম, এতে আর কি এমন আছে?

সে বলল, আচ্ছা, এইবার দেখুন তো।

আমি একটা টুলে বসেছিলুম। সে আমাকে বেষ্টন করে একধারে চলে গেল।

এখন লুক অ্যাট ইট, সার!

দেখলুম আশ্চর্য, সেই চোখ দুটো ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে

আছে। তারপর সে এল আর একপাশে আমার বাঁদিকে। সেখান থেকেও দেখছি ছবির চোখের তারা আমার দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ মাথায় এল, ও হয়ত হাত দিয়ে কোনো কায়দা করছে। বললুম, আর কিছু আছে তো দেখান। এনিথিং মোর?

সে আর একটা ছবি বার করল। পলকপড়া মেয়ের চাউনি তার মধ্যে। সেটাও যেদিক থেকে তাকাই আমার দিকে ঠিক দৃষ্টি। সে বলল, তাইওয়ান মোনালিসা, সার। বলে হেসে ফেলল।

হয়েছে, আমি বলি, আর কিছু? কেননা আমি তো এককালে পাপেট শো করতাম। চোখের তারার নাড়াচড়ার রহস্য আমার জানা ছিল।

সে বলল, কাম ইনসাইড, সাবধানে আসবেন কিন্তু। ঐ ড্রাগনটা ভারী পাজি।

আমি কাত হয়ে নানা মূর্তির গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকলুম। একটা ক্যাক্টাস গাছের কাঁটা লেগে প্যান্টটা বুঝি ছিঁড়ল। ভিতরে নানারকম জিনিস। একটা টেবিলে লাল ভেলভেটের ঢাকা চাপা কি যেন রয়েছে। আমি বললুম, ওটা কি হে?

ওটা ভেরি ভেরি কস্টলি, অনেক দাম, বুঝলেন?

দেখি না, দাম আমিও তো দিতে পারি।

দেখলুম, চিয়াংএর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে ভেলভেটের ঢাকাটা খুলতে নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। কিন্তু ভেতরের জিনিসটা যেন দেখাতে চায় না। আমিও ছাড়ব না। ওটা দেখাও—বললুম আমি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকাটা একটু তুলতে, আমি এক পলকের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

এই তো তোমার একটা ভাল জিনিস। এটার দাম কত পড়বে? বলে ফেলি আমি।

টেন থাউজান্ড দিলেও আমি ছাড়ব না এটা, আন্দারস্ট্যান্দ? মুখটা প্যাঁচার মতো করে বলল।

আমি বললুম, ওয়ান থাউজ্যান্ড দিতে পারি। দিয়ে দাও। আমি ওটা নেব।

জিনিসটা সত্যি আশ্চর্য। একটা ঈষৎ গোল জারের মতো গড়ন কিন্তু ওপরে কী সুন্দর পলকাটা। ওগুলো কি হীরে না অন্য ক্রিস্ট্যাল ভগবান জানেন। Star Wars ছবিতে ঐ রকম একটা গ্রহের চেহারা মনে পড়ছে।

আমি ঐটা চাই, কত নেবে বল, বললুম আমি।

লোকটার বদন যেন বিগড়ে গেছে, বলল, তোমার সাধ্য নেই, এটা নেবার। দেখ তো ভাল করে—বলেই সে আমার চোখের সামনে ওটা তুলে ধরল। ভেতরে যেন নীলাভ রঙ একটা দেখা যাচ্ছে। আর ওপরে দামী হীরের গা থেকে যে আলোর ছটা বেরয় তাই পড়ছে আমার চোখে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। তার মধ্যে ও কখন যে একটা তীব্র শক্তির টর্চের আলো ফেলেছে ঐটার মধ্যে দিয়ে আমার মুখে। এক

ভেলভেটের ঢাকাটা খুলতে নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল।

মিনিট মাত্র-ব্যস।

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর মনে হলো যেন আমি কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছি। ছোট হতে হতে পুতুলের মতো একেবারে—বসতে যাচ্ছি সে আমার কলার ধরে শূন্যে তুলল—তারপর—তারপর—সেই জারের মধ্যে পুরে ঢাকা চাপা দিল।

এ কি হলো! সর্বনাশ!—কিন্তু নীলাভ ওটা কি?

কাছে গিয়ে দেখি নীল শাড়ি—একটি মেয়ে—মেয়েটি আর কেউ না—তনুশ্রী। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শানুদা, তুমি এখানে? আমি বলি, তুই এখানে?

তনির মুখে যে কাহিনী শুনলুম সেও অবিকল আমারই মতো। সেও এসেছিল একটা কিউরিও কিনতে। তারপর ঐ শয়তানটা তাকে পুতুলের মতো বানিয়ে পুরেছে ঐ জারের মধ্যে।

দাদার বিয়ের কি হলো? বলল সে।

আর দাদার বিয়ে! তুই নিরুদ্দেশ! সে আর বোধহয় বিয়েই করবে না।

ছি ছি—এখন কি হবে? তুমি কেন এই ফাঁদে পা দিলে শানুদা? আমাদের বুঝি আর মুক্তি নেই।

অত ভাবিস না, দেখি না এই জারটা যদি ভাঙতে পারি—তাহলে—

পারবে না। পারবে না। যা মোটা কাচ আর তোমার আমার গায়ে কতটুকু জোর বল তো—কি হবে?—বলতে বলতে তনুশ্রী কাঁদতে লাগল।

আমরা দেখতে পেলুম এক মেমসায়েব এল দোকানে। সে একটা দশ ইঞ্চি উঁচু 'বনসাই' গাছ কিনে নিয়ে গেল। তারপর শয়তানটা আমাদের জারটার কাছে এসে এক পৈশাচিক হাসি হাসছে। বলছে, একসপেরিমেন্ড সাকসেসফুল। হো হো হো! সব জিনিসকে ছোত করতে পারব—একটা Bank-কে যদি পারি, তাহলে আমার টাকা পেতে কোনো কষ্ট নেই—দুটোই ভাল কাস্তমার পেয়েছিলাম। দুজনে এখন থাকো বন্দী!

আমি কথাগুলো ওপরের ছোট ছোট ফুটো দিয়ে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করা যায়? কিছুই মাথায় আসছে না। আমি তো প্রাণপণে ঘুঁষি মেরে লাথি মেরে ঐ কাঁচের দেয়াল ভাঙতে পারব না—আর তনুশ্রী বেচারা কেবল কাঁদছে।

তোর কাছে ভারী কি আছে বল তো? ঘা মারতে চাই। যদি কাঁচটা ফাটাতে পারি।

কি থাকবে, আমার লেডিজ ব্যাগটাই তো আছে। আর কি থাকবে। আর সেও তো এখন এতটুকু—

ওর মধ্যে কি আছে দেখি, খোল তো।

চিরুনি, পাউডার পাফ, লিপস্টিক, হাবিজাবি আর একটা আয়না। সেটা একটু সাইজে বড়। এর কোনোটা দিয়ে ঘা মারা যাবে না।

বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুর তখন। পশ্চিমের একটা ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে এসে পড়েছে আমাদের ওপর। আর ঠিক সেই সময় বেটা চিয়াংডলি আমাদের জারটা হাতে তুলে আনন্দে খুশিতে হেসে তাকিয়ে দেখছে আমাদের দিকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। যেন সোনার খনি পেয়েছে বলছে, একটা মেয়ে ছোট হলো, ছেলেও তাই হলো—এবার ব্যাংক—

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তনুশ্রীর আয়নাটা রোদ্দুরের দিকে এমনভাবে ধরলুম যে সেই প্রতিবিম্বিত আলোটা বেটার ঠিক চোখে সোজা গিয়ে পড়ল।

পলকাটা কাঁচের কী আশ্চর্য ক্ষমতা! চোখে পড়তেই সে এক বিকট চীৎকার দিয়ে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল জারটা মাটিতে। ভেঙে চুরমার। আমরা বেরিয়ে পড়লুম—আর ধীরে ধীরে আমাদের চেহারা বড় হতে হতে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

চিয়াংডলি তখন ইঁদুরের মতো হয়ে এদিক ওদিক করছে।

তনুশ্রী বলল, শানুদা, চল এই বেলা আমরা পালাই। দেরী করলে ও আবার—

সে কথা বলতে। বলেই আমি ওকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ছি এমন সময় এক মহিলা ওর বউ হবে হয়ত। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, মাস্টার হোয়ার? মিঃ ডংলি?

'হি মে বি ইনসাইড', বলেই তাকে ঠেলে রাস্তায় নামলুম। তনুশ্রী বলল, চল ছুট দিই।

ছুটলে লোক সন্দেহ করবে না?

জোরে পা চালিয়ে চললুম। আমাদের পাশ দিয়ে একটা কালো বেড়াল দোকানটার দিকে গেল। সর্বাঙ্গ ভুসোর মতো কালো, চোখ দুটো সবুজবর্ণ, বীভৎস—

একটা ট্যাক্সি পেলে ভাল হত, কিন্তু ঐ গলিতে সে আশা বৃথা। যাই হোক, কয়েক মিনিট জোরে পা চালিয়ে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ধরলুম।

বাড়ির গেটের কাছে আমাদের দেখে বাচ্চারা চীৎকার শুরু করেছে। দিদি এসেছে, দিদি এসেছে।

মাসীমা শয্যাগত। খবর পেয়ে উঠতে চেষ্টা করে পড়ে গেলেন। অনিমেষ বাড়ি নেই। অনিমেষের বাবা বললেন, সে বিয়ের Caterer-কে অর্ডার দেওয়া ছিল, তাই cancel করতে গেছে—তুমি বোস। তনি, আয় মা, আমার বুকে আয়। ক দিন কী দুশ্চিন্তায় যে ভুগছি না, কি আর বলব! দেখ না বাবা, শানু, এই যে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এতক্ষণ নানা পরামর্শ হচ্ছিল। তুমি বল তো, বাবা, ওকে কোথা থেকে উদ্ধার করলে—আহা, রোগা হয়ে গেছে গো—

আমি বললুম, আমি আসছি, অনিমেষকে আমি ফিরিয়ে আনি। বিয়ে তার হবেই—আমি আসছি।

চা জলখাবারের পর তনি আর আমি একটু যেই ঘটনাটা বলেছি, সমীর চীৎকার করে বলল, যা, গুল মারিস না—যত আজগুবি গল্প!

অনিমেষের বাবা বললেন, না, সব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। H.G.Wells-এর একটা গল্প পড়েছ? একটা দেশে সেখানকার সবাই অন্ধ। Gulliver-এর গল্পে লিলিপুটদের কথা আছে। আমি একটা লেখায় পড়েছিলুম, একটা দ্বীপে জাহাজডুবি হয়ে কয়েকজন গিয়ে পড়ে। তারপর একটা crystal পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো লেগে সবাই ছ'ইঞ্চির মতো ছোট হয়ে যায়। তারাই নাকি পরে লিলিপুট হয়ে যায়—

পুলিস অফিসার বলে উঠলেন, শুনুন শান্তনুবাবু, আপনি সেই দোকানটা আমায় দেখাতে পারেন? তাহলে আমরা ওদের পাকড়াও তো করবোই আর সব জিনিস, মানে, কিউরিও যা কিছু আছে বাজেয়াপ্ত করব।

আমি বললুম, ঠিক আছে, চলুন, সে তো আমার জানা রাস্তা। তনুশ্রীকে সঙ্গে নিলুম। অনেক লক্ষ্য করে আবিষ্কার করলুম সেই রাস্তা। তারপর সেই নোংরা সরু গলির মধ্যে ঢুকলুম।

বাড়িটা খুঁজে পেলুম। কিন্তু দোকানের সাইনবোর্ড কিছু নেই। সেটা হয়ত সরিয়ে ফেলেছে।

কোথায় মশাই, আপনার সেই চিয়াংডলির দোকান। এখানে তো কোনো কিউরিওর দোকানই দেখছি না।

ব্যাপারটা রহস্যজনক। তনুশ্রী বলল, দোকানটা যার, সেই শয়তানকে ইঁদুরের মতো দেখে কালো বেড়ালটা এক গালে নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছে। আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

তীরন্দাজ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

সমীর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর হাতে তীর-ধনুক।

চারপাশটা দেখে নিয়ে ও পা টিপে টিপে এগোতে লাগলো।

দূরে পাহাড়ের ওপর রোদের খেলা। বরফের ওপর রোদ পড়ে চকমক করছে। অন্যদিন হলে ও তাকিয়ে থাকতো ঐ দিকে। বিকেলের রোদ-ঝলমলে পাহাড় দেখতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। আরও ভালো লাগে ভোরবেলায় সূর্য ওঠার সময়।

কিন্তু আর সময় নেই। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রণি, জয়, বাপীরা নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। ওরা বোধহয় এতোক্ষণ বল খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কেন যে এই বিকেল বেলায় ড্রইং স্যার এসে হাজির হলেন। এইটা এঁকেছো, ঐটা এঁকেছো—কথা যেন ওঁর ফুরোয় না। সমীর যে ছটফট করছে—তা বোঝার ক্ষমতা আছে নাকি! শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে ড্রইং স্যারকে ম্যানেজ করে ও এসেছে। এখন যদি ড্রিল স্যার দেখতে পান তাহ'লে আর দেখতে হবে না।

সমীর একবার পেছন ফিরে দেখে নিলো। না কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এইবার সমীর ছুটতে শুরু করলো। স্কুল কম্পাউন্ড পার হয়ে ও এগিয়ে গেলো হস্টেলের পেছনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই।

ওরা বল খেলছে। টারগেটটা পড়ে আছে এক পাশে। রেডিওর দোকান থেকে চেয়ে-চিন্তে খানিকটা থারমোকোল যোগাড় করে তার ওপর গোল দাগ দিয়ে টারগেট বানিয়েছে। তীর ছুঁড়তে সমীরের ভীষণ ভালো লাগে। ওদের পাড়ার ঝর্ণাদি তীর ছোঁড়ায় প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়। সমীর ওর পেছনে পেছনে ঘুরতো। ঝর্ণাদিকে দিয়েই ও তীর-ধনুক কিনিয়েছিলো। ছটা তীর আছে ওর। প্রত্যেকটাতেই ওর নাম

খোদাই করা আছে। ধনুকটা, তীরগুলো ওর প্রাণ। রোজ বিকেলে ঝর্ণাদিদের সঙ্গে প্রাকটিশ করতো। ঝর্ণাদি বলতো, সমীর ভালো করে প্রাকটিশ কর। তুই নির্ঘাৎ বেঙ্গল টিমে চান্স পাবি। সেখানে ভালো করতে পারলে ইণ্ডিয়া টিমে। এই স্পোর্টসে কমপিটিশন কম। তাই চান্স পাওয়াও সোজা।

কিন্তু তা আর হলো না। কলকাতা ছেড়ে ওকে চলে আসতে হলো এই ছোট্ট পাহাড়ী শহরে। এখানকার স্কুলে ও পড়ে। হস্টেলে থাকে। বাড়ি থেকে আসার সময় তীর-ধনুকটা ঠিক এনেছে। বাবার একদম ইচ্ছে ছিলো না। ও কান্নাকাটি করে মাকে রাজী করিয়ে তবে আনতে পেরেছে।

এখানে এসেও আর এক মুশকিল। এসেই শুনেছে এখানকার ড্রিল স্যার কিরকম যেন হয়ে গেছেন। স্কুলে ইণ্টার-ক্লাশ ফুটবল টুরনামেণ্ট হতো। প্রাইজ ছিলো একটা বড় কাপ। সেটা তো সবার আগে বন্ধ করে দিয়েছেন। কাপটা যে কোথায় গেলো কেউ জানে না।

ড্রিল স্যার ভীষণ রাগী। ওঁর ভয়ে সারা স্কুল তটস্থ। ওঁর খেলা মানে শুধু ঐ জিমনাস্টিকস। তাও শুধু ভল্টিং হর্স আর প্যারালাল বার। প্রিন্সিপাল কিছু বলেন না। ছেলেরাই শুধু কষ্ট পায়। ফুটবল খেলতে ওরা সক্কলে ভালোবাসে, ক্রিকেট খেলতে ওরা ভালোবাসে, সমীর তো আবার আর্চারি ভালোবাসে।

সমীর একটা গাছের গায় টার্গেটটা লাগিয়ে দিলো। দূর থেকে কালো গোল গোল দাগগুলো দেখতে বেশ লাগে। মধ্যিখানে কালো গোল দাগ। ঐখানটায় তীর ছুঁড়ে মারতে হবে। গাছটার পেছনে এককালে রাস্তা ছিলো ঐ পোড়ো বাড়িটা পর্যন্ত। এখন পথটা জঙ্গলে ভরা। তবে পায় চলা পথ একটা আছে। ওরা একটা মোটর সাইকেলের চাকার দাগও দেখেছে।

টারগেটটা লাগিয়ে সমীর ফিরে আসতেই ওরা বল নিয়ে এগিয়ে এলো। বাপী বললো, আসছে শনিবার আমাদের স্কুলের ফুটবল ম্যাচ। সেণ্ট জোসেফের সঙ্গে।

স্যার রাজী হয়েছেন?

হ্যাঁ।

জয় বললো, কাল টিম হবে। তুই বোধহয় ক্যাপ্টেন হবি। আয় খানিকটা প্রাকটিশ করে নিবি।

পরে হবে। এখন আয় খানিকক্ষণ তীর ছুঁড়ি।

সমীর ধনুকে তীর জুতলো।

রণি বললো, সিক্সটি মিটার.....

ওরা সমীরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। সমীর তীর ছুঁড়ছে।

এক.....দুই.....তিন.....চার.....পাঁচ.....

সমীর শেষ তীরটা ছুঁড়েই ছুটলো টারগেটের দিকে। তিনটে তীর আটকে আছে টারগেটে! বাকি দুটো কই?

ওরা আশে পাশে খুঁজছে। এ-গাছ, ও-গাছ, ঝোপ-ঝাড়—না কোথাও নেই। সমীরের মন খারাপ হয়ে যায়। তখনই মোটর সাইকেলের হর্ন শুনে ওরা চমকে ওঠে। ভয়ে ভয়ে তাকাতেই দেখে, মোটর সাইকেল থামিয়ে ড্রিল স্যার ওদের দিকে তাকিয়েই সিটের ওপর বসে। ওঁর হাতে একটা তীর। মুখটা ভীষণ গম্ভীর। চোখে-মুখে রাগ।

তোমাদের বারণ করি নি এখানে এসে তীর ছুঁড়তে।

হ্যাঁ, স্যার।

তাহ'লে? আর একটু হলেই যে তীরটা আমার গায় লাগতো। কী হতো তাহ'লে?

সমীর মুখটা কাঁচুমাচু করে তাকায়।

স্যার তীরটা দিন—আর কোনোদিন এখানে এসে ছুঁড়বো না।

ঠিক তো!

হ্যাঁ স্যার!

ড্রিল স্যার হিরন্ময়বাবু তীরটা এগিয়ে দিলেন।

যাও, এখান থেকে চলে যাও। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এ সব জায়গায় না থাকাই ভালো।

ওরা পায় পায় পিছিয়ে এলো। যতোবার পেছন ফিরে তাকায় দেখে, স্যার মোটর সাইকেলের সিটের ওপর বসে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। সমীর ফিরে যেতে চাইছে না। ও একটা তীর এখনো ফিরে পায় নি। ওটা যে ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। না হলে সেটটা নষ্ট হয়ে যাবে। তীর পাঁচটা ওর প্রাণ।

সমীর বললো, স্যার চলে গেলেই আমরা ওখানে যাবো। তীরটা খুঁজে বের করতেই হবে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে—কোথায় খুঁজবি?

রণির কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো সমীর। বললো, খুঁজে বের করতেই হবে। মনে হচ্ছে তীরটা ঐ পোড়ো বাড়িটার দিকেই গেছে। কি রে যাবি তো?

রণি, বাপী আর জয় একসঙ্গে মাথা নাড়লো। স্যার চলে গেলেই ওরা আবার ওখানে ফিরে যাবে সমীরের হারিয়ে যাওয়া তীরটা খুঁজতে। ওরা বাঁ দিকে ঘুরেই স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লো। একটু পরেই গেটের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, স্যার চলে গেছেন। তার মানে ওরা এখন যেতে পারে। আর দেরি করলো না। চারজনে ছুটতে লাগলো এক্ষুণি যেখান থেকে এসেছে সেই দিকেই।

।। দুই ।।

চারজনে মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

না, কোথাও নেই।

সেই গাছটার আশে পাশে, পেছনে পথটার ওপর। রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যেও ওরা দেখলো। পেলো না। সমীরের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কোথায় গেলো তীরটা? খুঁজে বের করতেই হবে। সমীর তাকালো সামনের দিকে। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে পোড়ো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

রণি, জয় আর বাপী পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। সমীর তাকালো ওদের দিকে। বললো, চল ঐ বাড়িটার দিকে যাই।

সমীরের কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেলো ওদের তিনজনের। এদিকটায় আসতেই ওরা ভয় পায়। স্কুলের কোনো ছেলে আসে না। ভূতের ভয়। ঐ পোড়ো বাড়িটায় নাকি ভূতের আড্ডা। অনেকেই নাকি দেখেছে। সমীর ঐ দিকেই যেতে চাইছে।

সমীর তাড়া দেয়, কই চল!

ওরা নড়ে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

কি রে ভয় পাচ্ছিস?

ওরা চুপ করে থাকে।

ভূতের ভয়! ধ্যাত, ভূত বলে কিছু আছে নাকি? তোরা এতো ভীতু কেন? চল, চল—দেখবি কিচ্ছু নেই।

সমীর গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে যায়। রণি, জয় আর বাপীও চুপ করে থাকতে পারে না। ওরা পায় পায় এগোয়।

খানিকটা যেতেই বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। বিচ্ছিরি অবস্থা! একদম ভেঙে-টেঙে গেছে। বাড়িটার সামনে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। সমীরের পেছনে পেছনে ওরা তিনজন এসে দাঁড়ায় সেই ফাঁকা জায়গাটার সামনে। সমীরের কাঁধে তীর-ধনুক। বাপীর হাতে বল। রণি আর জয়ের খালি হাত।

সন্ধ্যে হয় হয়। জংগলে সন্ধ্যে একটু তাড়াতাড়িই নামে। ঝিঁঝি পোকা ডাকতে শুরু করেছে। জোনাকী দপদপ করছে এখানে ওখানে। অন্ধকার মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে।

হঠাৎ কেঁপে ওঠে জয়। তাড়াতাড়ি চেপে ধরে রণির হাত। পোড়ো বাড়ির ঠিক সামনে একটা কালো মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। মানুষের হাইট। সমস্ত শরীরটা কালো আলখাল্লায় ঢাকা। বাপী আঁতকে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, পোড়ো বাড়ির ভূত।

এই ভূতের কথাই ওরা এতোদিন শুনেছে। ভূতটা তখন দুলছে। একবার এদিক একবার ওদিক। জয়ের মনে হয়, ওদের ঘাড় মটকাতে ভূতটা বোধহয় ওদের দিকে এবার এগিয়ে আসবে। সমীর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওদের বেশ খানিকটা আগে। খুব একটা ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ওরা তিনজন আর থাকতে পারলো না। পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো। সমীর যে তখনও দাঁড়িয়ে আছে তা খেয়ালও করলো না।

সমীর নড়তে পারছে না। কে যেন আঠা দিয়ে ওর পা আটকে রেখেছে। ও হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভূতটাও একবার এদিকে একবার ওদিকে দুলছে। তারপর আস্তে আস্তে পিছিয়ে অন্ধকারে কোথায় যেন চলে গেলো। সংগে সংগেই ভেসে এলা গা-জল-করা হাসি.....

হা...হা...হা...হা.....
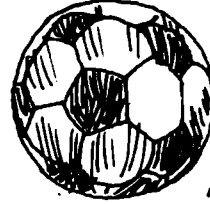
লাফিয়ে উঠেছে
গোলরক্ষক আর সমীর।

সমীর আর দাঁড়াতে পারলো না। এবার সেও পেছন ফিরে ছুটতে শুরু করলো। খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো সে। সে হাসির শব্দ আর ভেসে আসছে না। ও তখন স্কুলের কাছাকাছি। গেটের কাছে রণি, জয় আর বাপীকে দেখতে পেয়েছে। ওদের দেখে হারানো সাহস খানিকটা ফিরে পেলো সমীর। পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকালো। গাছ-গাছালির আড়ালে আবছা অন্ধকারে বাড়িটা এখন আর ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। ও পায় পায় স্কুলের গেটের দিকে এগিয়ে গেলো। একটা তীর ও খুঁজে পায় নি। বোধহয় ঐ পোড়ো বাড়িটার মধ্যেই আছে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ওকে আবার ওখানেই যেতে হবে। তীরটা খুঁজে বের করতেই হবে।

সেদিন স্কুলের ফুটবল ম্যাচ। সেন্ট জোসেফের সঙ্গে। আগের বছর সেন্ট জোসেফ জিতেছিলো। এবার ওদের হারাতেই হবে। শনিবার সকাল থেকেই তাই সমীররা ছটফট করছে। আড়াইটের সময় খেলা। ওদের মাঠেই খেলা। একটার মধ্যে সেন্ট জোসেফ এসে যাবে। আর বারোটার সময় সমীরদের স্কুলের খেলোয়াড়দের নাম নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। সমীর জানে, ও চান্স পাবেই। ক্যাপ্টেনও হতে পারে। তাই ওর মধ্যে এতোটুকুও চাঞ্চল্য নেই।

স্কুল টিমে কারা খেলবে তা তো মোটামুটি জানা। সেদিন তারা ভি.আই.পি.। সকলে ক্লাশ করছে আর ওরা কমনরুমে শুয়ে বসে কাটাচ্ছে।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে রণি এসে ঢুকলো কমনরুমে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। বললো, এক্ষুণি স্যার নাম টাঙিয়েছেন। ফার্স্ট টিমে তোর নাম নেই। তুই এক্সট্রার মধ্যে আছিস।

সে কী রে!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সকলে। সমীর যে স্কুলের সেরা খেলোয়াড় তা তো সকলেই জানে। তাহ'লে ও কী করে বাদ যায়!

খবরটা শুনে সমীর এতো অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে কথাই বলতে পারছিলো না। একটা দুঃখ বুকের মধ্যে আঁচড় করে দলা পাকিয়ে কণ্ঠার কাছে এসে আটকে যাচ্ছিলো। পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিলো। ও যে দল থেকে বাদ যেতে পারে এ ও কল্পনাও করতে পারে নি। রাগে, দুঃখে, অভিমানে সমীরের বুক ফেটে যেতে চাইছিলো। ঠিক করে ফেললো, ও মাঠেই যাবে না। যে ম্যাচে ওর স্কুলের ক্যাপ্টেন হবার কথা, সেই ম্যাচে ও দল থেকে বাদ পড়লো।

সমীর কমনরুম ছেড়ে হস্টেলে যাবে যাবে করছে এমন সময় ড্রিল স্যার হিরণ্ময়বাবু এসে হাজির।

ড্রেস আপ বয়েজ। ড্রেস আপ। কুইক।

অ্যাই, তুমিও ড্রেস করো।

সমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন হিরণ্ময়বাবু।

আমি তো স্যার টিমে নেই!

এক্সট্রায় তো আছো। ড্রেস করে মাঠে যাবে। তীর ছোঁড়া থেকে মাঠে গিয়ে বসে থাকা ভালো।

স্যার, সমীর আমাদের স্কুলের বেস্ট প্লেয়ার। ওকে.....

কে, কে বলেছে ও কথা। সমীর মোটেই বেস্ট প্লেয়ার নয়। শুধু ফুটবল খেলার দিকে যদি ওর মন থাকতো তাহ'লে হয়তো হতো। ও তীর ছুঁড়বে, ও অ্যাডভেঞ্চার করবে। বড্ড সাহস তোমার না?

জ্বলন্ত চোখে হিরণ্ময়বাবু তাকালেন সমীরের দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাদের ঐ মাঠে গিয়ে খেলা আমি বন্ধ করবোই।

রাগে গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হিরণ্ময়বাবু। ছেলেরা অবাক। তারা ওঁর রাগের কারণ একদম বুঝতে পারছে না। সমীর বুঝলো, পোড়ো বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে খেলা, তীর ছোঁড়া মোটেই পছন্দ করছেন না ড্রিল স্যার হিরণ্ময়বাবু। কিন্তু কেন? সমীরের মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন ভিড় করে আসে।

ওদের অনেক আগেই সেন্ট জোসেফের ছেলেরা মাঠে নেমে পড়েছে। সমীরও নেমে একটু গা ঘামিয়ে নিলো। ও খেলবে না। ড্রেস পরে লাইনের ধারে বসে থাকবে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে! ওর এই ছোট্ট জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে মাঠের বাইরে আসতে আসতে দুঃখে, কষ্টে ওর বুক ভেঙে যাচ্ছে। লজ্জায় ও কারো দিকে তাকাতে পারছে না। চোখ মাটির দিকে।

সাইড লাইনের ধারে চুপ করে বসে রইলো সমীর। টেন্স হয়ে আছে ও। ও কারো সহানুভূতি চায় না। চায় না কেউ এসে ওকে সান্ত্বনা দিক। তার দুর্বল মনে এখন ঘা পড়লে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়বে। এক মাঠ লোকের সামনে সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে। তাই চুপ করে বসে থাকে সমীর। কারো দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। সেন্ট জোসেফের ছেলেরা দারুণ চেপে খেলছে। সমীরদের স্কুল কিছুতেই পেরে উঠছে না। যে কোনো মুহূর্তে গোল হয়ে যেতে পারে।

হলোও ঠিক তাই। সেন্ট জোসেফের একজন খেলোয়াড় হঠাৎ বল ধরে মাঝ মাঠ থেকে তরতর করে এগিয়ে আসছে। তার গতির সঙ্গে কেউ পেরে উঠছে না। একজনের পর একজনকে কাটিয়ে সে আচমকা ঢুকে পড়লো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। তারপর সমীরদের গোলরক্ষককে কাটিয়ে বলটা জড়িয়ে দিলো জালে। সেন্ট জোসেফ এগিয়ে গেলো এক গোলে। সমীরদের স্কুল হারছে এক গোলে।

সমীরদের স্কুলের ছেলেরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবার আগেই প্রথম অর্ধের খেলা শেষ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের চারপাশ থেকে উঠলো প্রচণ্ড চিৎকার। তাদের দাবি,

সমীরকে খেলাতে হবে, সমীরকে খেলাতে হবে।

সমীর ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ও বুঝতে পারে হিরণ্ময়বাবু ওর ওপর ভীষণ রেগে আছেন। কেন তাও ও বুঝেছে। তার ওপর ছেলেদের চিৎকার নির্ঘাৎ ওঁকে আরও রাগিয়ে দেবে। ও চুপ করে বসে থাকে। হাফ টাইমে খেলোয়াড়রা এক জায়গায় এসে বসেছিলো। জলটল খাচ্ছিলো। হিরণ্ময়বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে ওদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু হলো। ঠিক ছিলো সমীরদের স্কুল ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে করে হোক গোলটা শোধ করে দেবে। কিন্তু সেন্ট জোসেফের ছেলেরা সে সুযোগ দিলো না। এমন ভাবে চেপে ধরলো, যে কোনো মুহূর্তে সমীররা আর একটা গোল খেয়ে যাবে। সমীরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো রণি, জয় আর বাপী। ওরাও চেঁচাতে ভুলে গেছে। মাঠে সমীরদের স্কুলের ছেলেরাই বেশি। ওরা চুপ করে আছে। একপাশ থেকে চেঁচাচ্ছে সেন্ট জোসেফের ছেলেরা।

সমীরদের স্কুলের তমাল একবার বল নিয়ে উঠে এলো। তার পাশাপাশি ছুটছিলো নরেন। তমাল নরেনকে বলটা ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেলো। কিন্তু সেন্ট জোসেফের লিংকম্যান বলটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো সমীরদের সীমানার মধ্যে। তারপর বল এ পা ও পা করে ধাঁই করে শট নিলো। স্টপার রানা হেড দিতে লাফিয়ে উঠেছিলো। বলটা ওর ঘাড়ে লেগে সোজা গোলে। সেন্ট জোসেফ দু গোলে এগিয়ে গেলো।

সংগে সংগে আবার সেই চিৎকার।

স্যার সমীরকে নামান, স্যার সমীরকে খেলান।

ছেলেদের মধ্যে উত্তেজনা দেখে হিরণ্ময়বাবু বোধহয় বাধ্য হয়েই সমীরের দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, তুমি নামো। গোল করা চাইই। না হ'লে.....

সমীরের মনে হলো—ও খেলবে না বলে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু মাঠের মধ্যে একটা সিন ক্রিয়েট করতে চাইলো না সে। খেলতে নামলো। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ওর গা-হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। তাছাড়া খেলার ইচ্ছেটাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

ও মাঝ মাঠে দাঁড়িয়েছিলো। তমাল হঠাৎ বল ঠেলে দিলো ওর পায়। বল পেতেই সমীর ভুলে গেলো সব কিছু। ও এগিয়ে চললো দুলকি চালে। সেন্ট জোসেফের একজন বাধা দিতে এলো তাকে। শরীরের ঝাঁকুনিতে তাকে ফেলে দিলো সমীর। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। দ্রুত এগিয়ে গেলো সে। ঢুকে পড়লো পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। সামনে তার সেন্ট জোসেফের গোলরক্ষক। পেছনে ছুটে আসছে তিনজন। ওদের দলের কেউই আশে পাশে নেই। সমীর পা তুললো। তাই দেখে গোলরক্ষক সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো। কিন্তু সমীর বলটা ঠেলে দিয়েছে অন্য দিকে। গো....ও....ল....

সমস্ত মাঠ যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। দারুণ গোল করেছে সমীর। জয়, রণি, বাপী লাফাচ্ছে। সেন্ট জোসেফ অবশ্য তখনও ২-১ গোলে এগিয়ে আছে।

আবার খেলা আরম্ভ হলো। নরেন-তমাল আর সমীর বল নিয়ে দ্রুত উঠে আসছে বারবার। ওদের আক্রমণের চাপে সেন্ট জোসেফের রক্ষণভাগে তখন বেসামাল অবস্থা। একটার পর একটা আক্রমণ ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়ছে।

খেলার সময় শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্তর কয়েক মিনিট বাকি। সেন্ট জোসেফের খেলোয়াড়রা নেমে এসে গোল আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই গোল করতে দেবে না।

হঠাৎ সমীরের পায় বল পড়লো। ও সংগে সংগে তমালকে ঠেলে দিয়ে ছুটে গেলো গোলের কাছাকাছি। তমাল উঁচু করে সেন্টার করলো। গোলের মুখে ভেসে আসছে বলটা। লাফিয়ে উঠেছে সেন্ট জোসেফের গোলরক্ষক আর সমীর। সমীর দেখলো হেড দিলেও ও গোল করতে পারবে না। তখনই চোখ

পড়লো বাবুরামের ওপর। বাবুরাম ফাঁকায় দাঁড়িয়ে। বলের কাছে সেন্ট জোসেফের সাত-আটজন খেলোয়াড়। কি করবে সংগে সংগে ঠিক করে ফেললো সমীর। কপালের ঠোকায় সে বলটা ফেললো বাবুরামের পায়। বাবুরাম এক মুহূর্তও দেরী করলো না। বলটা ঠেলে দিলো গোলে।

গো....ও...ল....

দ্বিতীয় গোলটাও শোধ করে দিলো সমীররা। এবং তা সম্ভব হয়েছে সমীরের জন্যেই।

।। তিন ।।

সন্ধ্যেবেলায় ওদের ঘরে হিরণ্ময়বাবু এসে হাজির।

ওরা সক্কলে বসে তখন গল্প করছে। স্কুলকে হারতে হারতে বাঁচিয়েছে সমীর। দারুণ খেলেছে সে। দুটো গোলই তার জন্যে হয়েছে—এই সব আলোচনা চলছে। সমীরকে গোড়া থেকে না নামানোর জন্যে হিরণ্ময়বাবুর সমালোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। ওদের স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার রোজারিও একটু আগে এসে সমীরকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। অন্য ছেলেদের মধ্যে ওকে ঘিরে রেখেছে জয়, রণি, বাপীরা। সমীরের জন্যে গর্বে ওদের বুক ফুলে উঠেছে। কিন্তু সমীরের কথা শুনে ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে। সমীর বললো, কাল একবার ঐ পোড়ো বাড়িটার ওখানে যাবো। তীরটা খুঁজে বের করতেই হবে।

সমীরের কথা শেষ হয়েছে আর প্রায় সংগে সংগেই হিরণ্ময়বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। কথাটা বোধহয় ওঁর কানে গিয়েছিলো। দেখে মনে হচ্ছিলো খুব রেগে গেছেন। ঢুকেই বললেন, কি বললে—কাল ঐ পোড়ো বাড়িটার কাছে যাবে?

ওরা চুপ। কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুচ্ছে না। ড্রিল স্যারের ওপর ওদের সকলেরই রাগ। উনি ওদের ঠিকমতো খেলতে দেন না। তার ওপর আজ আবার সমীরকে সেন্ট জোসেফের সংগে পুরো সময় খেলান নি।

হিরণ্ময়বাবু বললেন, সমীর তোমায় আমি আগেও বারণ করেছি আবারও করছি—পোড়ো বাড়ির দিকে যেও না। ওখানে ভূত আছে। বিপদ ঘটতে কতোক্ষণ। যদি আমার কথা না শোন তাহ'লে তোমাদের এগেনস্টে স্টেপ নেবো।

স্যার আমার তীরটা....

সমীরের কথা শেষ হলো না, হিরণ্ময়বাবু বলে উঠলেন,

চুলোয় যাক তোমার তীর। ওখানে ভূত আছে। সেদিন তোমরা নিজের চোখেই দেখলে। তারপরও ওখানে কেউ যায় নাকি! একদম যাবে না। গেলে বিপদে পড়বে।

আর একটা কথাও না বলে হিরণ্ময়বাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ভালো খেলার জন্যে, স্কুলকে হারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সমীরকে একবার থ্যাংকসও জানালেন না। উল্টে মেজাজ দেখিয়ে গেলেন। স্যারের ব্যবহার দেখে রণিরা ভীষণ অবাক হয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। একটু পরে সমীর বললো, আমি আবার ঐ পোড়োবাড়ির ওখানে যাবো। তীরটা আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। আমি কিছুতেই সেটটা নষ্ট করবো না। যে করেই হোক তীরটা খুঁজে বের করবো।

রণি, জয়, বাপীর চোখের সামনে তখন পোড়ো বাড়ির সেই আলখাল্লা-পরা ভূতটা নাচছে। ভয়ে কেঁপে ওঠে ওরা।

আমাদেরও সংগে যেতে হবে নাকি রে?

বাপীর কথা শুনে সমীর হেসে ফেললো,

অতো ভয় কিসের রে? না যেতে চাইলে যাবি না। আমি একাই যাবো।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ওরা তিনজনেই যাবে। কালই যাবে। সমীরের প্রিয় তীরটা খুঁজে বের করতেই হবে।

পরদিন স্কুলে দারুণ হৈচৈ। প্রেয়ারের পর প্রিন্সিপাল নিজে সমীরকে কনগ্রাচুলেট করলেন। বললেন, ওর জন্যেই স্কুল কাল হেরে যায় নি। আমি ওকে আমাদের সব ছাত্র আর মাস্টারমশাইদের পক্ষ থেকে কনগ্রাচুলেট করছি। সমীর যেন মন দিয়ে খেলে এবং স্কুলের সুনাম আরও বাড়ায়।

সেন্ট জোসেফ স্কুলের সংগে ড্র করার আনন্দে সারাটা দিন কেটে গেলো। বিকেলে ছুটির ঘন্টা বাজতেই রণি আর জয় এগিয়ে এলো।

কি রে যাবি?

যাবো!

ওদের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। পোড়ো বাড়ির ভূত সেদিন ওরা দেখেছে। ওদিকে যাবার ইচ্ছে ওদের এতোটুকুও নেই। ওরা জানে সমীর যাবেই। সমীরকে একা ছেড়ে দিতেও ভয় করে। গেলে ওরা একসংগেই যাবে। কিন্তু ঐ পোড়ো বাড়ির দিকে যেতে ভয়ে ওদের বুক কাঁপে।

ওরা হস্টেলে ফিরে যায়। দূরের পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। বিকেলের মিঠে রোদ জংগলের গাছের মাথায় মাথায়। নিচের দিকটায় একটু অন্ধকার ভাব।

বইখাতা রেখে ওরা ছুটলো কিচেনে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই ওরা পোড়ো বাড়ির দিকে যাবে। সমীর ঠিক করে রেখেছে খাওয়ার পর ঘরে গিয়ে ও তীর-ধনুকটা নেবে। হাতে একটা কিছু অস্ত্র থাকা ভালো। তা ছাড়া ও ঠিক করে রেখেছে, পোড়ো বাড়ির ভূতটা যদি আজ দেখা যায় তাহ'লে ও তাক করে তীর ছুঁড়বে। সত্যিই ভূত তো! ওর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে আছে। কথাটা অবশ্য রণি, জয়, বাপীকে বলে নি। বললে ওরা ওর সংগে যে কিছুতেই যাবে না সে বিষয়ে সমীর নিশ্চিন্ত। সমীর আজ এসপার-ওসপার করবেই। হারিয়ে যাওয়া তীরটা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে।

খেতে খেতে রণি বললো, আজ কিন্তু পোড়ো বাড়ির কাছে যাবো না!

এক ঢোক জল খেয়ে জয় বললো, ভূতটা যদি আজ আবার আসে!

সমীর শুনছিলো ওদের কথা। বললো, এলে আসবে। অতো ভয় পাবার কি আছে শুনি। আমার তো মনে হয় ও ভূতটা ভূতই নয়....

জল খেতে খেতে বিষম খেলো বাপী।

কী-ই কী বললি.... ?

সমীর চুপ করে যায় কথা বাড়ায় না। ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইছে। এই পাহাড়ী এলাকায় সন্ধ্যেটা একটু তাড়াতাড়িই নামে। দেরি হলে তীরটা খোঁজার জন্যে বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

ওরা কিচেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল। লাগোয়া ডাইনিং রুমে তখন ভিড় জমছে। দলে দলে ছেলেরা এসে বসে পড়ছে। বিকেলে খেয়েই ওরা খানিকটা খেলে নেবে। তাই সকলেরই তাড়া।

সমীরদের খাওয়া হয়ে গেছে। কিচেন থেকে বেরিয়ে ওরা এসে ঢুকলো ডাইনিং রুমে। ওদের দেখে অন্যরা হৈহৈ করে উঠলো। সেদিন খেলার পর থেকে সমীর দারুণ পপুলার হয়ে গেছে।

তমাল আর নরেন এক কোণে বসে খাচ্ছিলো। তমাল চিৎকার করে বললো, আমরা বল খেলবো। সমীর খেলবি ?

না রে, একটা জায়গায় যাবার আছে, কাল খেলবো।

ওরা আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এলো ডাইনিং রুম থেকে।

তোরা একটু দাঁড়া। এক্ষুণি আসছি।

সমীর ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো ওদের ঘরে। একটু পরেই তীর ধনুকটা নিয়ে নেমে এলো। এবার ও নিশ্চিন্ত। ওরা এগিয়ে গেলো। গেটটা পেরুবার ঠিক আগে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ওরা।

ড্রিলস্যার হিরণ্ময়বাবু গেট খুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। ওদের দেখে উনি যেন একটু চমকে উঠলেন। সমীরের কাঁধে ধনুক আর হাতে তীরগুলো দেখে হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন।

কোথায় যাচ্ছো ?

রাগে ওঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

স্যার—আমরা একটু আর্চারি প্রাকটিশ করতে....

আর্চারি প্রাকটিশ করতে !

তোমায় বলেছি না ওসব আর্চারি -ফারচারি এখানে চলবে না। সেদিন তীর ছুঁড়ে আমায় তো প্রায় মারতে বসেছিলে ! আবার যাচ্ছো সেখানে ! না, তোমাদের দেখছি কড়া হাতে শাস্তি দিতেই হবে।

একটু থেমে বললেন, যাও ঘরে চলে যাও—আজ আর কোনো খেলা-টেলা নয়।

গেটটা ঠেলে হস্টেল থেকে বেরিয়ে গেলেন ড্রিলস্যার হিরণ্ময়বাবু। একটু পরেই কানে এলো ওঁর মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্‌ শব্দ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সমীর। ওর পেছনে রণি, জয় আর বাপী।

ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো। কেউ কোনো কথা বলছিলো না। দূরে পাহাড়ের ওপর তুষার আর রোদের চকমকি খেলা। নিচে গাছ-গাছালির মাথায় সন্ধ্যের বিষণ্ণতা।

মিনিট দশেক আগে হিরণ্ময়বাবু চলে গেছেন। ওরা দাঁড়িয়েই ছিলো। হঠাৎ সমীর বললো,

তোরা ওপরে ঘরে চলে যা। আমি একটু ঘুরে আসছি।

কোথায় যাবি ?

রণির চোখে ভয় আর বিস্ময় মাখামাখি। জয় বললো,

একা একা পোড়ো বাড়ির দিকে যাস নে যেন।

বাপী বললো, স্যার যে বেরোতে বারণ করে গেলেন।

সমীর যেন কারো কথা শুনতেই পেলো না। যাবার জন্যে পা বাড়ালো। দু-এক পা এগিয়ে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো,

তোরা ঘরে চলে যা। আমি বেরুচ্ছি কাউকে বলিস না যেন !

॥ চার ॥

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা চারজন ঘরে ফিরে এসেছে। সমীরের মন ভালো নেই। আজও সন্ধ্যের মুখে সে পোড়ো বাড়ির ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তীরটা খুঁজেছে। পায় নি। তবে একটা জিনিস দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। মোটর সাইকেলের চাকার টাটকা দাগ ও দেখেছে পোড়ো বাড়ির দিককার পথের ওপর। একবার ওর মনে হয়েছিলো,এ কি হিরণ্ময়বাবুর মোটরসাইকেলের চাকার দাগ ! কিন্তু তা কেন হবে। স্যারের এদিকে আসার কি দরকার। সেদিন বিকেলে স্যার তো একটা তীর হাতে নিয়েই ওদের কাছে এসেছিলেন। বলেছিলেন, মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন, আর একটু হলেই তীরটা ওঁর গায় বিঁধতো ! তাই ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু স্যার কোথায় যাচ্ছিলেন সেদিন ? ঐ বনজঙ্গলের মধ্যে কোথাও যাবার জায়গা আছে নাকি ? আজ আবার মোটর সাইকেলের চাকার টাটকা দাগ দেখলো। যাক গে, ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না সমীর।

ওরা খেয়ে দেয়ে এসে এইসব কথাই আলোচনা করছিলো। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলেন হিরণ্ময়বাবু। ওঁকে দেখে ওরা চারজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। হিরণ্ময়বাবুকে দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে তিনি ভীষণ রেগে আছেন। চোখ-মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে। সোজা এগিয়ে গেলেন সমীরের দিকে, বললেন,

বিকেলে তোমাদের হস্টেল কম্পাউন্ডের বাইরে যেতে আমি নিষেধ করে গিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও তুমি কেন বেরিয়েছিলে ?

আমার তীরটা হারিয়ে গেছে স্যার। তাই খুঁজতে গিয়েছিলাম।

আমি কোনো কৈফিয়ত শুনতে চাই না। তুমি আমার কথা না শুনে হস্টেলের বাইরে গেছো। তুমি হস্টেল-সুপারের কথা শোন নি। অন্য ছাত্রদের মুখ চেয়ে তোমার এই দুর্বিনীত আচরণের জন্যে প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট করবো। তোমাকে এখান থেকে ট্রানসফার নিইয়ে ছাড়বো। আমারই হস্টেলে থাকবে আর আমার কথা কানেই তুলবে না। এ তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

সমীর চুপ করে ছিলো। একটাও কথা বলে নি। ও কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না ওর দোষটা কোথায়। বড়রা এক এক সময় এমন একগুঁয়ে আচরণ করেন যে বলার কিছু থাকে না। সমীর কিছুতেই ভেবে পায় না–হিরণ্ময়বাবুর অতো রেগে যাবার কারণটা কি! আর রাগে হিরণ্ময়বাবু যদি সত্যিই কিছু করে বসেন তাহলে তো খুবই মুশকিল হবে।

সমীরকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও রেগে যান হিরণ্ময়-বাবু। বলেন, তুমি সারা সন্ধ্যেটা হস্টেলের বাইরে ছিলে। বারণ করা সত্ত্বেও তুমি বেরিয়েছিলে।

স্যার আমি.....

তীরটা খুঁজতে গিয়েছিলে তো?

সমীরের কথায় বাধা দিয়ে হিরণ্ময়বাবু বলে ওঠেন। সমীরের ফিরতে একটু দেরি হয়েছিলো। সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু স্যার জানলেন কি করে? ওরা একটু অবাক হয়। আরও অবাক হয় যখন স্যারের কথায় ওরা জানতে পারে যে এই সন্ধ্যেবেলায় সমীর একা একা ঐ পোড়ো বাড়ির ওখানে গিয়েছিলো। ভয়-ডর বলে ওর কিছু নেই নাকি!

হিরণ্ময়বাবু বললেন, তোমার যা বলার কাল প্রিন্সিপালকে বোল। আমি তোমার নামে রিপোর্ট করবো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান হিরণ্ময়বাবু।

ওরা চারজনে চুপ করে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। ওরা জানে তীরটা সমীরের প্রাণ। কিন্তু তাই বলে এই সন্ধ্যেবেলায় ও গিয়ে হাজির হবে পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে। সেদিন ওরা সত্যি সত্যিই তো ভূত দেখেছে। কথাটা ওরা কাউকে বলে নি। কিন্তু তাই বলে তো আর মিথ্যে নয়। পোড়ো বাড়ির ভূতের কথা এতো কাল শুধু শুনতো। সেদিন ওরা নিজেরাই দেখেছে। তা সত্ত্বেও সমীর ওখানে গেলো। যদি কিছু হতো। স্যার তো রাগ করে কোনো অন্যায় করেন নি।

বাপী আস্তে আস্তে বললো, তোর ওখানে যাওয়াটা ঠিক হয় নি। যদি সত্যি কিছু হতো?

রণি বললো, তোর একটুও ভয় করলো না?

না। ভয় করবে কেন? তবে আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, স্যার কি করে জানলেন-আমি ওখানে গিয়েছিলাম।

জয় চিন্তিত মুখে বললো, তা তো হলো, কিন্তু কাল যদি প্রিন্সিপাল তোকে ডাকেন কি বলবি? সন্ধ্যের পর হস্টেলের বাইরে থাকা তো ঠিক নয়।

যা সত্যি তাই বলবো!

তারপর যদি কিছু হয়! বাপী ভয়ে ভয়ে বললো।

কি আবার হবে!

সমীর এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়লো। হোমওয়ার্ক শেষ করতে হবে তো!

পরদিন তখন ক্লাস চলছে। হঠাৎ সমীরের ডাক পড়লো। প্রিন্সিপাল ডাকছেন। সমীরের মুখ শুকিয়ে যায়। ও তাকালো রণি, জয় আর বাপীর দিকে। ওদের চোখেও ভয়। ওরা ভাবে-নি, হিরণ্ময়বাবু সত্যি সত্যিই সমীরের নামে প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট করবেন।

সমীর ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলো প্রিন্সিপালের রুমের দিকে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে।

মে আই কাম ইন স্যার?

কাম ইন....

সমীর ঘরে ঢুকলো। প্রিন্সিপাল গম্ভীর মুখে বসে আছেন। সমীরকে দেখে একটা লেখা কাগজ টেনে নিলেন। সমীর বুঝলো, হিরণ্ময়বাবুর রিপোর্ট।

তোমার এগেনস্টে রিপোর্ট করেছেন হিরণ্ময়বাবু। তুমি সন্ধ্যের পর হস্টেল ছেড়ে বেরিয়েছিলে কাল? পোড়ো বাড়ির দিকে গিয়েছিলে। তোমার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাও ছিল। আমাদের স্কুলের একজন ছাত্রর পক্ষে এ এক সাংঘাতিক অপরাধ। বলো তোমার কি বলার আছে।

সমীর ভয়ে কাঁপছিলো। ওর মুখ শুকিয়ে চুন। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। আস্তে আস্তে বললো, স্যার আমার আর্চারি খুব ভালো লাগে। কলকাতায় শিখতাম। আমার তীর-ধনুক দেখে ড্রিল স্যার খুব রেগে গিয়েছিলেন। আর্চারি শেখার আমার একটা বিলিতি বই ছিলো স্যার, সেটাও নিয়ে নিয়েছেন। স্কুলের মাঠে তীর ছোঁড়ার কোনো স্কোপ নেই দেখে আমি পোড়ো বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় তীর ছুঁড়তাম। আমাদের ক্লাসের আরও তিনজন আমার সঙ্গে থাকে। একটা তীর ক'দিন আগে হারিয়ে গেছে। তীরটা আমার খুব ফেবারিট। ওতে আমার নামও লেখা আছে। ঐটা খোঁজার জন্যেই ওখানে কাল গিয়েছিলাম।

আই সি! তুমি তাহ'লে তীরন্দাজ। শুনে ভালো লাগছে। তুমি কি জানো, এই স্কুলটা যিনি করে দিয়েছেন সেই নীলমাধববাবুরওতীর ছোঁড়ায় দারুণ হাত ছিলো। তিনি চাইতেন, আমাদের স্কুলে আর্চারির ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু তা আর হয় নি। ঐ পোড়ো বাড়িটাই নীলমাধববাবুর। ওটা এখন স্কুলের সম্পত্তি। ওঁর কেউ ছিলো না বলে সব কিছুই স্কুলকে দান করে গেছেন।

সমীর চোখ বড় করে প্রিন্সিপালের কথা শুনছিলো। ভয়

ভয় ভাবটা অনেক কেটে গেছে। সমীর তাকিয়েছিলো প্রিন্সিপালের দিকে। কী যেন ভাবছেন তিনি।

প্রিন্সিপাল তখন সমীরের কথাই ভাবছিলেন। সমীর যে সত্যি কথাই বলেছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। এও তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সমীরের ওপর হিরণ্ময়বাবুর নিশ্চয়ই খুব রাগ। তাই বোধহয় তিনি সমীরকে সেদিন পুরো সময় খেলান নি। অথচ তিনি নিজে সেদিন মাঠে দেখেছেন—ও কতো ভালো খেলে। ওর জন্যেই স্কুল সেদিন হারতে হারতে বেঁচে গিয়েছিলো। ভেতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে যার জন্যে হিরণ্ময়বাবু ছেলেটার বিরুদ্ধে ঐরকম রিপোর্ট দিয়েছেন। ঐরকম রিপোর্ট দিলে T.C. তো দিতেই হয়। তিনি তা দেবেন না। ছেলেটাকে তাঁর ভালো লেগেছে। ও মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়। বললেন, সন্ধ্যে বেলায় স্কুল থেকে বেরিয়ে তুমি ভীষণ অন্যায় করেছো। এ বড় সাংঘাতিক অপরাধ। এরকম আর কখনো করো না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। যাও ক্লাসে যাও। মন দিয়ে পড়ো। আর্চারিও চালিয়ে যাও। অসুবিধে হলে আমায় বলো। আমি নিজে হিরণ্ময়বাবুকে বলে দেবো। নীলমাধববাবুর স্কুলে কোনো তীরন্দাজের গায় যেন হাত না পড়ে।

সমীর প্রিন্সিপালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। খুশিতে ওর মুখ জ্বলজ্বল করছে। কী ভীষণ ভয়ই না পেয়ে গিয়েছিলো। প্রিন্সিপাল নিজে পারমিশান দিয়েছেন। এখন আর ওর তীর ছোঁড়ায় কোনো বাধা নেই। ও স্কুলের মাঠেই প্রাকটিশ করতে পারে । ও হাসিমুখেই ক্লাশে গিয়ে ঢুকলো।

॥ পাঁচ ॥

টিফিনের ঘন্টা বাজতেই ওকে এসে ঘিরে ধরলো রণি, জয় আর বাপী। সমীরের হাসি হাসি মুখ দেখে ওরা আগেই বুঝেছিলো যে কিছুই হয় নি। তবু ব্যাপারটা ওরা সমীরের মুখ থেকে শুনতে চায়। সমীরের জন্যে ওরাও ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলো।

সমীর ওদের সব বললো। প্রিন্সিপালের সংগে যা যা কথা হয়েছিল সব বললো। শুনতে শুনতে ওদের মুখে হাসি ফুটলো। কিন্তু সমীরের শেষ কথা শুনেই ওদের হাসি হাসি মুখগুলোয় ভয় ভয় ভাব। সমীর বললো, আজ বিকেলেই পোড়ো বাড়ির দিকে যাবো। স্যার তো ওদিকে যেতে বারণ করেন নি। আর্চারি প্রাকটিশ করতেও বলেছেন। শুধু সন্ধ্যের আগেই হস্টেলে ফিরে আসতে হবে। তা নাহ'লেই মুশকিল। প্রিন্সিপালও তো ওয়ার্নিং দিয়েছেন।

বাপী জিজ্ঞেস করলো, ওখানে গিয়ে কি করবি?

তোরা যেমন বল খেলিস খেলবি। আমি একটা গাছে আর্চারির টারগেটটা লাগিয়ে তীরটা খুঁজবো।

যদি হিরণ্ময়বাবু স্যার এসে যান?

চমকে হিরণ্ময়বাবু তাকান দরজার দিকে।

জয় ভয়ে ভয়ে বললো।

আসেন আসবেন। বিকেল বেলায় হস্টেলের আশেপাশে বেড়ানো বা খেলা করা তো মোটেই বারণ নয়। তাহ'লে? তোরা বলবি, আমরা খেলছি।

দেখতে দেখতে টিফিনের সময় শেষ। ওরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো। ওদের সকলের মুখেই চিন্তার ছায়া। যেমন ভয় করছে তেমনি খানিকটা উত্তেজনাও ওদের মধ্যে চেপে বসেছে। ওরা অপেক্ষা করছে ছুটির ঘন্টার জন্যে।

ছুটির পর ওরা ছুটে হস্টেলে চলে গেলো। কিচেনে গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়েই ছুট। সমীরের কাঁধে ধনুক, হাতে চারটে তীর। জয়ের হাতে একটা রবারের বল। বাপী নিয়েছে টারগেটটা।

ওরা ছুটছে। হস্টেল থেকে মাত্তর মিনিট দুয়েকের পথ। একটু চড়াইয়ে। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে পৌছে গেলো। ফাঁকা জায়গাটায় পৌছেই জয় বলটা ড্রপ দিয়ে শট মারলো। রণি ছুটলো বলটার পেছনে। বাপী চট করে টারগেটটা সমীরের হাতে ধরিয়ে দিয়েই মেতে উঠলো বল খেলায়। সমীর ধীরে সুস্হে এগিয়ে গিয়ে একটা গাছে টারগেটটা লাগিয়ে ফিরে

এলো ওদের কাছে। বললো, শোন আমি ঐ পোড়ো বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাবো। মনে হয় তীরটা ঐখানেই কোথাও আছে।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, তোরা ভয় পাসনে। তীরটা আজ আমি খুঁজে বের করবোই।

সমীরের চোখে মুখে দৃঢ়তা। আর ভয়ে ওদের তিনজনের বুক টিপটিপ। ভীষণ ভয় করছে ওদের। কি যে হবে কে জানে! আবার যদি ভূতটা আসে।

সমীর বললো, তোরা টারগেটটার কাছাকাছি বল নিয়ে খেল। আমি এদিকটায় দেখি।

টারগেটটা পার হয়ে সমীর পায় চলা পথটার কাছে চলে এলো। অস্পষ্ট হলেও চাকার দাগটা দেখা যায়। সমীর তন্ন তন্ন করে তীরটা খুঁজতে থাকে। একটু একটু করে এগোয় সে। ছোট গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যায়। কখন যে পোড়ো বাড়িটার একেবারে কাছে চলে এসেছে ও বুঝতেই পারে নি। ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে আছে বাড়িটা। চার-পাশ থেকে গাছ-গাছালি এসে ঘিরে ধরেছে। তারই মধ্যে পায় চলা পথ। সমীর এগিয়ে যায়। ওরা দূর থেকে দেখে সমীর পোড়ো বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর আর দেখতে পায় না। ভয়ে,দুর্ভাবনায় ওরা কেঁপে ওঠে। পোড়ো বাড়িটার দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ভূতের ভয়ও ওদের আতঙ্কিত করতে পারে না। প্রচন্ড উত্তেজনায় ওদের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। ওরা কল্পনাও করতে পারে নি–সমীর বাড়িটার মধ্যে ঢুকবে। সাহস থাকা ভালো। কিন্তু বেশি সাহস বিপদ ডেকে আনে। সেই ভয়ে ওরা কাঁটা। তাই ওরা আর নড়তে পারছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সমীরকে আর দেখতেই পাচ্ছে না। সময়ও কেটে যাচ্ছে। একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। সন্ধ্যের আগেই ওদের হস্টেলে ফিরতেই হবে। ভেবে পায় না ওরা কি করবে!

সমীর হঠাৎই ঢুকে পড়েছিলো পোড়ো বাড়িটার মধ্যে। যখন খেয়াল হলো তখন ভয় আর আতঙ্ক প্রথমটায় ওকে বিহ্বল করে দিয়েছিলো। তারপর আস্তে আস্তে ও সামলে নেয়। পোড়ো বাড়িটার মধ্যে ঢুকে যখন পড়েছে তখন সবটা ওকে দেখতেই হবে। শরীরটা ওর টান টান হয়ে ওঠে। মন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দু পা এগোতেই থমকে দাঁড়ায়। মস্ত একটা কালো রংয়ের আলখাল্লা ঝুলছে। আলখাল্লার মাথার কাছটা রেনকোটের টুপির মতো। তার ওপর বঁড়শি দিয়ে আটকানো। বঁড়শির সুতো পাশের মাছ ধরার হুইলে। সমীর বুঝলো ঐ হুইলের সুতো ঘুরিয়েই পোড়ো বাড়ির ভূত দেখানো হয়। আতঙ্ক ছড়ানো হয়। ওরাও দেখেছে। সেদিন ভয় পাবার কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পেলো।

আলখাল্লাটার পাশেই একটা ঘর। দরজা-টরজা ভেঙে পড়েছে। তবে ঘরটা যেন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। ঘরের একপাশে পায়ের ছাপ। সেদিকে এগিয়ে গেলো সমীর। যেতেই চমকে উঠলো। মাটিতে একটা বেশ বড় সাইজের কাপ পড়ে আছে। সমীর কাপটা হাতে তুলে নিলো। কাপটার বাইরে বড় বড় হরফে লেখা আছে–চ্যাম্পিয়ানস ট্রফি–ইন্টার ক্লাশ ফুটবল টুর্নামেন্ট। কাপটার কথা সমীর শুনেছে। হিরণ্ময়বাবু ওদের স্কুলে জয়েন করার কিছুদিন পরে কাপটা চুরি যায়। তারপর থেকে ওদের স্কুলের ইন্টার ক্লাশ ফুটবল প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছেন হিরণ্ময়বাবু। কিন্তু কাপটা এখানে এলো কি করে? সমীর বুঝতে পারে না। ওর যেন কি-রকম সব গোলমাল হয়ে যায়। ও কাপটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

সমীর ভেবেছিলো কাপটা নিয়ে পোড়ো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে যাবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আর দেরি করার উপায় নেই। হিরণ্ময় স্যার তো ওকে স্কুল থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। ওয়ার্নিং দিয়েছেন প্রিন্সিপাল।

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকে তাকাতেই ওর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। ওর তীরটা মাটিতে পড়ে আছে। সমীর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সেটার দিকে। তীরটা নিচু হয়ে নিতে গিয়েই ওর চোখ পড়ে পেছন দিকে। এক চিলতে আলো দরজার ফাঁক গলে এসে পড়লে যেরকম দেখায় ঠিক সেইরকম। সমীর পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় সেইদিকে।

ভয়ে ওর বুকটা কাঁপছে। দম বন্ধ করে ও এগুচ্ছে। ঐ ঘরটার কি দরজা আছে? মনে তো তাই হচ্ছে। সমীরের কাঁধে ধনুক। এক হাতে কাপটা অন্য হাতে পাঁচটা তীর। তীর খুঁজতে ও এসেছিলো। পেয়েও কিন্তু ফিরে যেতে পারছে না। প্রচন্ড কৌতূহল আর অসীম সাহস ওকে টেনে আনলো সেই আলোটার কাছে। সত্যিই তো দরজা আছে ঘরটার। একটুখানি ফাঁক। সেইখান দিয়েই আলো গলে বাইরে পড়েছে।

উত্তেজনায় ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। পা টিপে টিপে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয়।

আর সংগে সংগে ভয়ে, আশংকায় কেঁপে ওঠে সে। হাত থেকে পড়ে যায় কাপটা। ঘরের মধ্যে বসে আছে হিরণ্ময়বাবু। ওঁর সামনে এক গাদা মণি, মুক্তা, হিরে জহরত ছড়ানো।

কাপটা পড়ে যাবার শব্দে চমকে হিরণ্ময়বাবু তাকান দরজার দিকে। সমীরের সংগে চোখাচোখি হবার সংগে সংগে লাফিয়ে উঠে এসে চেপে ধরেন তাকে। টেনে নিয়ে যান ঘরে।

রাগে তাঁর চোখ দুটো জ্বলছে। হিস হিস করে বললেন, বড় বাড় বেড়েছে তোর। বারবার সাবধান করেছি। ভূতের ভয় দেখিয়েছি। তাও শুনলি না। তবে মর। ওপাশ থেকে একটা দড়ি টেনে নিয়ে সমীরের হাতদুটো পিছ-মোড়া করে বাঁধলেন হিরণ্ময়বাবু। তারপর পা দুটো।

সমীর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। তারই মধ্যে অবাক হয়ে দেখলো, ওর আর্চারি শেখার ইংরিজি বইটি মাটিতে পড়ে আছে। হিরন্ময়বাবু বইটা ওর কাছ থেকে নিয়ে আর ফেরত দেন নি। ঘরের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে। হিরন্ময়বাবু তাড়াতাড়ি পাথরগুলো ছোট্ট একটা থলির মধ্যে পুরে ফেললেন। তারপর হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ করে। তারপর সমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এগুলো দেখলি তো। এই পাথরগুলোর দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। কাল প্রথম ট্রেনেই আমি চলে যাবো। আর ফিরে আসবো না। এগুলো বিক্রি করে রাজার হালে থাকবো। আর তুই এই বন্ধ ঘরে খিদের জ্বালায়, জল তেষ্টায় শুকিয়ে মরবি। এই পোড়ো ভূতের বাড়িতে কেউ কোনোদিন তোকে উদ্ধার করতে আসবে না।

তুই একদিন আমার উপকারও করেছিলি আর্চারির বইটা দিয়ে। তাই তোকে বলে যাচ্ছি এই অমূল্য সম্পদ আমি কি করে পেলাম।

এই বাড়িটা নীলমাধববাবুর। তিনি স্কুলটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পত্তিও স্কুলের। নীলমাধববাবু আর্চারি ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্কুলে আর্চারির ট্রেনিং হবে। কিন্তু তা হলো না। ছেলেরা ফুটবল ছাড়া আর কিছু খেলতে চায় না। তাই ইন্টার ক্লাশ ফুটবল টুরনামেন্টের জন্যে তিনি ঐ কাপটা দিয়েছিলেন।

হিরন্ময়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাপটা নিয়ে এলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, আমি এই স্কুলে আসার পর প্রথম বারের ইন্টার ক্লাশ ফুটবল প্রতিযোগিতার দিন কাপটা পরিষ্কার করার জন্যে কোয়ার্টারে নিয়ে গেলাম। ব্রাসো দিয়ে ঘষার সময় হঠাৎ কাপটার মধ্যে চোখ পড়লো। মনে হলো ছোট ছোট হরফে কি যেন লেখা। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম–পারলাম না।

এখানে এসেই শুনেছিলাম, নীলমাধববাবুর অনেক দামী পাথর ছিলো। কিন্তু তার হদিস কেউ পায় নি। ওঁর মৃত্যুর পর এই বাড়িতে অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিলো কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি। মাঝে মাঝে গুপ্তধনের খোঁজে ঐ বাড়িতে কেউ কেউ যায়। এই পোড়ো বাড়ি, জায়গা জমি সবই স্কুলের সম্পত্তি।

আমি প্রথমেই ঠিক করলাম, এই বাড়িতে সকলের আসা বন্ধ করতে হবে। পোড়ো বাড়ির ভূতের গুজব আমিই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলায় কালো আলখাল্লা গায়ে দিয়ে ভয়ও দেখিয়েছি অনেককে। আমার উদ্দেশ্য সফল হলো। এ দিকে আর কেউ আসতো না। তারপর কাপটা এনে রাখলাম এখানে। ওর মধ্যের অক্ষরগুলো ঐ খাতায় লিখতাম।

হিরন্ময়বাবু আর্চারির বইটার পাশে পড়ে থাকা একটা খাতা দেখালেন। খাতার পাশে একটা পেনসিল পড়েছিলো। উনি বলে চললেন, কিছুতেই নীলমাধববাবুর ধাঁধার সমাধান করতে পারছিলাম না। তোর হাতে তীর ধনুকটা দেখে আমার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধিটা খেলে যায়। মনে হলো, নীলমাধববাবু আর্চারি খুব ভালোবাসতেন, ওঁর ধাঁধার উত্তর হয়তো আর্চারির টার্মগুলোর মধ্যেই পেয়ে যাবো। তাই তোর হাতে একদিন বইটা দেখে চেয়ে নিয়েছিলাম। আর আমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক তা বুঝতে পারলাম কয়েকদিনের মধ্যেই। হদিস পেয়ে গেলাম নীলমাধববাবুর গুপ্তধনের। কুবেরের ভাণ্ডার,লক্ষ লক্ষ টাকা দাম। কালই ও সব নিয়ে কলকাতায় চলে যাবো। রাজার হালে থাকবো।

হিরন্ময়বাবু উঠলেন। সমীরের দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে তালা লাগানোর শব্দ হলো। তারপর বেশ খানিকটা টানাটানির শব্দ শুনে সমীর বুঝলো ইঁট পাথর টাথর দিয়েও দরজাটা ব্লক করে দিলেন সমীর যাতে কিছুতেই খুলতে না পারে। তারপর একসময় হিরন্ময়বাবুর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলো।

গভীর নিস্তব্ধতা। ভয়ে সমীর কাঁটা। তার দুটো হাত পেছন থেকে বাঁধা। বাঁধা পা দুটোও। নড়ার ক্ষমতা নেই। এই ভাবেই তাকে মরতে হবে? একথা মনে হতেই একটা ঠান্ডা ভয়ের স্রোত সিরসির করে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেলো। না এখান থেকে বেরুবার কোনো উপায় নেই।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কই এখনও তো ওরা তাকে উদ্ধার করতে এলো না। আসবে না নাকি? না এইভাবে সে তিলে তিলে মরবে না। কিছুতেই না, কিন্তু কি করবে সে। ওর চোখ পড়লো মোমবাতিটার দিকে। গলতে গলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তার আগেই সমীরকে কিছু করতে হবে।

কিন্তু কি করবে সে? হাত-পা বাঁধা অসহায়ের মতো পড়ে আছে। হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা টানটান করে ও ঘষটাতে ঘষটাতে মোমবাতিটার দিকে এগুতে লাগলো। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মোমবাতির কাছে গিয়ে ঘুরে বসে বাঁধা হাত দুটো তুলে দিলো মোমবাতিটার ওপর। পুড়ে যাচ্ছে হাত। জ্বালা করছে। ভীষণ জ্বালা করছে। তবু হাত সরাচ্ছে না সমীর। দড়ি পুড়িয়ে হাতের বাঁধন ওকে খুলতেই হবে। মোমবাতিটা নিভে যাবার আগেই ওকে হাতদুটো মুক্ত করে নিতে হবে। তাহ'লে সে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে আগুনের ওপর হাত রেখেছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সমীর সহ্য করছে। ওকে বাঁচতেই হবে। হাতের বাঁধন খুলতেই হবে।

হঠাৎ দড়িটা ছিঁড়ে গেলো। খুলে গেলো হাতের বাঁধন। হাতদুটো চোখের সামনে তুলে ধরলো সমীর। পুড়ে, ঝলসে একাকার হয়ে গেছে। জ্বালা আর যন্ত্রণায় ওর দু চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

কিন্তু কান্নার সময় এখন নয়। সব কষ্ট ওকে সহ্য করতেই হবে। পোড়া হাত দুটো দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলতে চেষ্টা

হুস করে তীরটা বেরিয়ে যায়

করে। হাত দুটো কাঁপছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর সমীর ওর পায়ের বাঁধন খুলে ফেললো।

আর তখনই দপ করে নিভে গেলো মোমবাতিটা।

ভয়ে আতঙ্কে সমীর দিশাহারা।

পোড়ো বাড়ির অন্ধকার ঘরে একা সে। ভূতের ভয় পায় না। কিন্তু সাপ তো আছে। পাহাড়ী বিছে আসতে পারে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলেছে বটে। কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দরজাটা কোনদিকে কে জানে। ভেবে পায় না–কি করবে। আশা ছিলো রণি, জয়, বাপীরা তাকে উদ্ধার করতে আসবে। কই কেউ তো আসছে না।

রাত বাড়ে। পোড়ো বাড়ির বন্ধ ঘরে বারো-তেরো বছরের একটা ছোট ছেলে একা। ওর মনে পড়ে মার কথা। বাবার কথা। ভাই বোনেদের কথা। ও কি আর এখান থেকে বেরুতে পারবে না?

একটানা ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাচ্ছে সমীর। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ। রাত-জাগা পাখির কর্কশ চিৎকার শুনে শিউরে ওঠে। ওর গায় কাঁটা দেয়। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না সমীর। একটা ভীষণ কষ্ট বুকের তলা থেকে ঠেলে উঠে কণ্ঠার কাছে আটকে গেছে। ভয় আর ভাবনা কখন যে চোখের জল হয়ে বুক ভাসাচ্ছে বুঝতে পারে নি সমীর। সেই সঙ্গে পোড়া হাত দুটোতে অসম্ভব জ্বালা। সহ্য করতে পারছে না সমীর। মনে হচ্ছে, ও বুঝি আর কোনোদিন এই ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। ভয়, ভাবনা, যন্ত্রণা আর কষ্টর মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সমীর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ছয় ॥

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় সমীরের।

ঘরের পাশ দিয়ে দ্রুত একটা কিছু ছুটে যায়। একটা বোটকা গন্ধ।

সমীর প্রথমটায় বুঝতে পারছিলো না সে কোথায়। তারপর মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অবশ হয়ে এলো তার সমস্ত শরীর। মনের জোর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে সে। চারপাশটায় তাকায়। অন্ধকার অনেকটা সয়ে গেছে। অস্পষ্ট কিছু কিছু যেন দেখতে পায়। কিন্তু একটু যেন আলোর রেখা কোথা দিয়ে আসছে? এদিক ওদিকে তাকাতে তাকাতে চোখ পড়ে ওপরে।

হ্যাঁ ওপর দিয়েই চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছে ঘরে। সমীর আকাশ দেখতে চেষ্টা করে। একটা তারা কি দেখা যাবে না? মনে যে তাহ'লে খানিকটা জোর পায়। তারা দেখতে ওর ভীষণ ভালো লাগে।

চাঁদের আলো তখন ঘরের মধ্যে লম্বালম্বি হয়ে পড়েছে। এতোক্ষণে বুঝতে পারে সমীর। ফায়ার প্লেসের মাথাটা ভেঙে গেছে। সেখান দিয়ে আলো গলছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সমীর ঠিক করে ফেলে কি করবে। আর একটু সময় কাটুক। আলো বাড়ুক তারপর।

কিছুটা যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় সমীর। গায় কাঁটা দেওয়া ভয় ভয় ভাবটা আর নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে সে। এতোক্ষণে তার খিদে পায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ে সমীর।

ঘুম ভেঙে যায় একটু পরেই। পাখির ডাকে ভোরের ইশারা। সূর্য উঠবো উঠবো করছে। চাঁদ ডুবে গেছে। ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার। শুধু ছাদের কাছে এক টুকরো জমাট বাঁধা আলো। সেইদিকেই তাকিয়ে থাকে সমীর।

একটু একটু করে ফর্সা হয়। অন্ধকার ঘরটায় আলো আলো ভাব। সমীর এগিয়ে গিয়ে খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে নেয়। হাত দুটো ভীষণ জ্বালা করে ওঠে। পাত্তা দেয় না সমীর। পেনসিলটা নিয়ে লেখে,

আমি পোড়ো বাড়ির মধ্যে বন্দী সমীর।

একটা তীরের ফলায় কাগজটা বাঁধে। তারপর ধনুকটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ছিলা টানতে পারছে না। পোড়া হাত দুটো মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে। যন্ত্রণায় মুখটা নীল হয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত টিপে সে ওপরের ফাঁকটা লক্ষ্য করে তীরটা ছোঁড়ে।

সমীরের হাতের টিপ অসম্ভব ভালো। হুস করে ফাঁক গলে তীরটা বেরিয়ে যায়। কোথায় পড়বে কে জানে। কেউ খুঁজে পেলে ও বেঁচে যাবে। আজ নিশ্চয়ই আর একটু পরে রণি, জয় অন্য সকলকে নিয়ে আসবে। ওকে খুঁজবেই। নিশ্চয়ই ওকে উদ্ধার করবে ওরা। কিন্তু কখন? আর যে সহ্য করতে পারছে না সমীর!

সকাল হতেই রণিরা এসেছে। সংগে ওদের ক্লাশের আরও কয়েকজন। পোড়ো বাড়ির কাছে এসেই ওরা ঘোরাঘুরি করছিলো। হঠাৎ জয় চিৎকার করে উঠলো। ওরা ছুটে এলো। জয়ের হাতে সমীরের একটা তীর। তীরটার মাথায় কাগজ জড়ানো।

বাপী তাড়াতাড়ি কাগজটা খুলে নিয়ে পড়লো।

রণি বললো, এক্ষুণি প্রিন্সিপালের কাছে চল।

ওরা ছুটছে। পাহাড়ী শহরের উঁচু নিচু রাস্তা ধরে দশ-বারোটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে। সকাল বেলায় তিনি তখন বাগানে ঘুরছিলেন। ওদের দেখে ভীষণ অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। ওরা উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না। হাঁপাচ্ছে।

রণি কাগজটা এগিয়ে দিলো। পড়ে ভীষণ রেগে গেলেন প্রিন্সিপাল।

তোমরা কাল জানাও নি কেন?

স্যার, আমরা আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হিরণ্ময়বাবু আসতে দেন নি। উনি সন্ধ্যে থেকেই হস্টেলে ছিলেন। সকলকে সংগে নিয়ে গল্প করার নামে আমাদের চোখে চোখে রেখেছিলেন।

প্রিন্সিপাল আর কিছু বললেন না। ঘরে ঢুকে পুলিশে ফোন করলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা হস্টেলে চলে যাও। দুতিনজন থাকো। কাউকে কিছু বলবে না। সমীর যে কাল রাত্তিরে হস্টেলে ছিলো না–কাউকে বলবে না।

রণি, জয় আর বাপী রয়ে গেলো। অন্যরা ফিরে গেলো হস্টেলে। এতোক্ষণে ওরা নিশ্চিন্ত। সমীরকে এবার পাওয়া যাবেই। ভাবনায়, চিন্তায় ওরা সারা রাত ঘুমোয় নি।

একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এসে গেলো। ওরা রেডিই ছিলো। সকলে মিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলো পোড়ো বাড়ির সামনে।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমীরকে ঘর থেকে বের করা হলো। ওর চেহারা দেখে সকলে চমকে উঠলেন। এক রাতের মধ্যে কি অবস্থা হয়েছে ওর। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ও প্রিন্সিপালকে বললো, স্যার শীগগির হিরণ্ময়বাবুর বাড়ি চলুন। ওঁকে ধরতে হবে। ফার্স্ট ট্রেনে উনি এখান থেকে পালাচ্ছেন।

তারপর বাপীর দিকে তাকিয়ে বললো, তুই এই কাপটা নে। রণি আমার তীর ধনুক আর জয় বইটা নে। শীগগির। গাড়িতে যেতে যেতে আমি সব বলবো।

পুলিশের জিপ ছুটে চলেছে হিরণ্ময়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে। পথে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললো। এতক্ষণ সমীরের ওপর ভীষণ রেগেছিলেন প্রিন্সিপাল। তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, সমীরকে আর স্কুলে রাখবেন না। টি সি দিয়ে দেবেন। কিন্তু সব ঘটনার কথা শোনার পর ওঁর চোখে প্রশংসা। সমীরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে শুধু বললেন, সাবাস!

হিরণ্ময়বাবুকে ধরতে কোনো অসুবিধে হলো না। উনি হাতে সুটকেশ নিয়ে কোয়ার্টারের গেট খুলে বেরুচ্ছিলেন। বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ দেখে প্রথমে থমকে গিয়েছিলেন। তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গেলেন। পুলিশ ইনসপেক্টার চট করে গাড়ি থেকে নেমে তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো হিরণ্ময়বাবু।

হিরণ্ময়বাবু চিৎকার করে উঠলেন, কিন্তু কেন?

তখনই সমীরকে সংগে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন প্রিন্সিপাল।

হিরণ্ময়বাবু আর একটা কথাও বললেন না। পুলিশের সামনে প্রিন্সিপাল নিজে খুললেন সুটকেশটা। এক কোণে পাওয়া গেলো থলিটা।

খুলতেই সকালের রোদে পাথরগুলো ঝলমল করে উঠলো.....

সেই আলোর ছটা সমীরের মুখে।

অংক জগতের জাদু

জাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র)

থটরিডিং বা চিন্তাপাঠ

জাদুকরের হাতে মোট পাঁচটা কার্ড রয়েছে। প্রতিটি কার্ডই খোপ কাটা এবং তাতে নানারকম নম্বর লেখা আছে। কয়েকটা কার্ডে আবার চৌকো ফুটো কেটে জানলাও করা আছে। শুধু তাই নয়, কার্ডগুলোর ওপরদিকে লেখা আছে YES, আর তলার দিকে উল্টোভাবে NO লেখা আছে। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

জাদুকর এবার দর্শকদের একজনকে বললেন এক থেকে একত্রিশের মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা ভাবতে, আর সংখ্যাটা তিনি যেন কোনো মতেই আগে প্রকাশ না করেন। জাদুকর এবার তাঁকে কার্ডগুলো দিয়ে একটা বিশেষ কাজ করতে বললেন। কাজটা হলো, যদি তাঁর মনের সংখ্যাটা প্রথম কার্ডে থাকে তো তাহলে সেটার YES লেখাটা নিজের দিকে অর্থাৎ দর্শকের দিকে সোজা করে টেবিলে রেখে দিতে হবে। আর যদি না থাকে তো তাহলে কার্ডটা ঘুরিয়ে NO লেখাটা তাঁর নিজের দিকে সোজা করে রাখবেন। এই ভাবে সংখ্যাটা কার্ডে আছে বা নেই–সেই অনুযায়ী কার্ডগুলোকে YES বা NO দিকটাকে তাঁর নিজের দিকে সোজা করে একের-পর এক কার্ড পরপর চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে হবে। পুরো কাজটাই জাদুকরকে না দেখিয়ে করতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী দর্শক ভদ্রলোক একটা সংখ্যা ভেবে সেটা আছে কি নেই দেখে

CARD-1 YES

1	3		3
5	7		7
9	11		11
13	15		15
	17	17	19
	21	21	23
	25	25	27
	29	29	31

NO CARD-1

কার্ডগুলো ঘুরিয়ে পরের পর চাপা দিয়ে রাখলেন। জাদুকর এবার সব কটা কার্ড একসঙ্গে তুলে নিয়ে কপালে ছুঁয়ে চট্ করে বলে দিলেন দর্শক কোন সংখ্যাটা ভেবেছিলেন। এভাবে

CARD-2 YES

2	3	27	30
6	7		
10	11	23	14
14	15		
23	6	18	19
		22	23
22	7	26	27
		30	31

NO CARD-2

CARD-4 YES

8	9	28	14
10	11	8	9
12	13	25	10
14	15	26	29
		24	25
		26	27
		28	29
		30	31

NO CARD-4

পরপর বেশ কয়েকবার খেলাটা দেখালেন।

পুরোপুরি হিসেবের ম্যাজিক হলেও এটা দেখাতে কোনো অংক কষতে হবে না। আগের থেকেই হিসেব করে কার্ডগুলো তৈরি করা হয়েছে। কার্ডগুলো YES বা NO এবং এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি ক্রমিক অনুযায়ী একের পর এক চাপা দিয়ে রেখে সবসমেত এক সঙ্গে উঁচু করে ধরলে কার্ডগুলোর পেছন দিকে ওই জানলা কাটা ফুটো দিয়ে দর্শকের মনে মনে ভাবা সংখ্যাটাকেই একমাত্র দেখা যাবে। কার্ডে ছাপা নম্বরের স্থান আর জানলাগুলো খুব হিসেব করে লেখা এবং ফুটো করা আছে। পাঁচ নম্বর কার্ডের উল্টো পিঠে উত্তরগুলো পরপর ছক করে সাজানো আছে। YES এবং NO এই উত্তর অনুযায়ী সোজা বা উল্টো করে ঠিক মতো সাজিয়ে রাখলে

CARD-3 YES

4	5	6	7
6	7	12	13
12	13		
14	15		
28	29	20	21
30	31	22	23
		28	29
		30	31

NO CARD-3

CARD-5 YES

16	17		
18	19		
20	21		
22	23		
		24	25
		26	27
		28	29
		30	31

NO CARD-5

ফুটোগুলো নিজেরাই সাজানো হয়ে গিয়ে ওই উত্তরের ছক থেকে সঠিক উত্তরটাকে বেছে পেছন দিক দিয়ে দেখিয়ে দেবে। দর্শকেরা এটা জানতেও পারবেন না। কার্ডগুলো তুলে একত্র করবার সময় চট্ করে দেখে নিলেও হলো।

তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আবার আলাদা ভাবে এর সঙ্গে ওই খোপ আর নম্বর সমেত কার্ডগুলো ছেপে দিয়েছি।

ঘন লাইন দিয়ে চিহ্নিত জায়গাগুলো সাবধানে ব্লেড দিয়ে কেটে জানলা বানিয়ে নিও। প্রতিটি ছকের বাইরে চৌকো সীমানা করা আছে। ওই সীমানা বরাবর কাটলে প্রত্যেকটা কার্ড সমান সাইজের হবে। ঠিক মতো কেটে বন্ধুদের দেখিও। সবাই খুব চমকে যাবে।
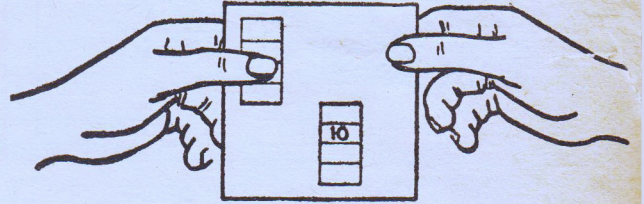
ছবির মজা
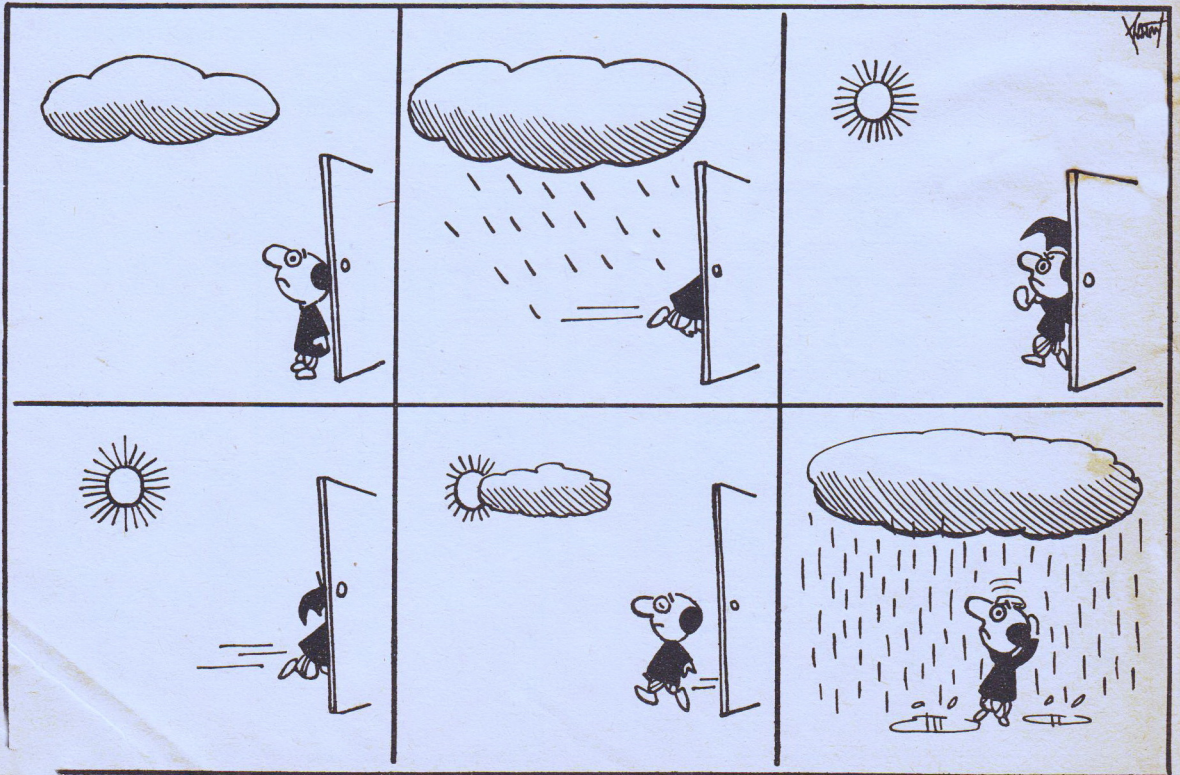
জন্মদিনের বিভ্রাট

আরতি বসু

ভোর থেকে বাড়িতে হুলুস্থুল কান্ড। বুলার আজ জন্মদিন। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে পিসি কিরণময়ী তাকে তালাবন্ধ করে দিয়েছে। একবার মাত্র তালাটা খোলা হয়েছিল মুখ-টুখ ধোওয়ার জন্য। তাও পিসি সংগে করে নিয়ে গেছে, নিয়ে এসেছে। নিজে দুধ গরম করে জানলা গলিয়ে দিয়ে গেছে। রাগে দুঃখে বুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। এই নাকি জন্মদিন! কী দরকার ছিল এমন জন্মদিন করার। শুধু কি বুলা। বাড়ির কাজের লোক মোক্ষদা আর চরণকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ভাঁড়ার ঘরে। ড্রাইভার মালি বন্ধ গ্যারেজে। এমনকি দারোয়ানকে পর্যন্ত আটকানো হয়েছে সিঁড়ির ঘরে।

একা কিরণময়ী ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়িময়। এই বারান্দায় যান তো পরক্ষণেই ছোটেন বাগানে।

ছাদের দরজা থেকে শুরু করে মেন গেট পর্যন্ত সর্বত্র পাঁচ সাতটা করে তালা লাগিয়েও তাঁর শান্তি নেই। কেবলই চিৎকার করছেন, পুলিশে দেব সব কটাকে। দশ বছর ঘানি টানাব। এত আস্পদ্দা! আমার ভাইঝিকে গুম করবে! তাও আবার আজকের দিনে!

বেলা নটা নাগাদ ইন্সপেক্টর সামন্তর জিপ গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই কিরণময়ী ছুটলেন চাবির গোছা নিয়ে। একে একে সাতটা তালা খোলা হলো, জিপ এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নিচে। ইন্সপেক্টর সামন্ত জিপ থেকে নামতে নামতে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এত জরুরী তলব!

কিরণময়ী হাঁকপাঁক করে উঠলেন, ব্যাপার সাংঘাতিক ইন্সপেক্টর। উঃ সেই সকাল থেকে যা যাচ্ছে। তবে ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে শিবুর কাছে আর মুখ দেখাতে পারতাম না।

ইন্সপেক্টর বুঝলেন, কিরণময়ী এত উত্তেজিত যে এখন তাঁর পক্ষে সব কিছু গুছিয়ে বলা সম্ভব নয়। কিরণময়ীকে একটা সোফায় বসিয়ে রেখে তিনি একবার পুরো বাড়িটা ঘুরে এলেন, বাড়ির দরজা জানলা আসবাব-পত্র সবকিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন আর তারই ফাঁকে প্রশ্ন করে করে কিরণময়ীর কাছ থেকে উদ্ধার করলেন, পুরো ঘটনাটা।

কিরণময়ী এ-বাড়িতে একাই থাকতেন। বছর দুয়েক হলো ভাইঝি বুলাকে কাছে এনে রেখেছেন। ওঁর ভাই শিবেনের বদলির চাকরি। এখান ওখান করার জন্য পাছে মেয়ের পড়াশোনার ক্ষতি হয় তাই এই ব্যবস্থা। সেই বুলার আজ সাত বছর পূর্ণ হলো। কিরণময়ী ঠিক করেছিলেন ভাইঝির জন্মদিনে বেশ একটু ঘটা করবেন।

নিজেই সব প্ল্যান করেছেন। ক্যাটারার ডেকরেটারের সংগে কথা বলা থেকে নিয়ে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠানো পর্যন্ত সবটি নিখুঁতভাবে করেছেন। আর ঠিক আজকের দিনটিতেই কিনা এই সাংঘাতিক বিপত্তি!

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আধঘন্টাটাক বাগানে বেড়ানো কিরণময়ীর বরাবরের অভ্যাস। আজও বেড়াচ্ছিলেন আর তখনই গেটের কাছে ঝাউগাছের গোড়া থেকে একটা ভিজে দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজ কুড়িয়ে পান। কৌতূহলী হয়ে সেটা খুলে পড়েই তাঁর চোখ কপালে উঠল। কারা যেন বুলাকে চুরি করে নিয়ে যাবার মতলব এঁটেছে। কাগজটাতে সাংকেতিক ভাষায় সেই কথাই লেখা আছে।

ইন্সপেক্টর কাগজটা দেখলেন। এলোমেলো ভাবে লেখা অস্পষ্ট কতকগুলো অক্ষর। তবে মূল ব্যাপারটা অস্পষ্ট নয়।
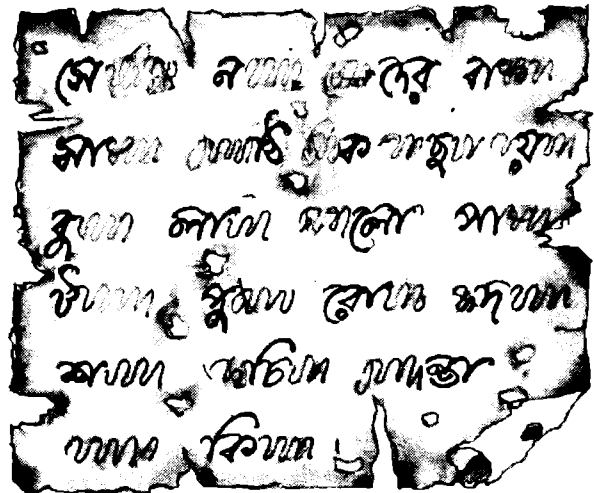
কাগজটা পকেটে পুরে ইন্সপেক্টর কিরণময়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়? কিরণময়ী বললেন, হয় বৈ কি। এ নিশ্চয়ই আমার বাড়ির লোকজনদের কাজ। ভেবেছে কাজের বাড়িতে গোলমালের সুযোগে মতলব হাসিল করবে। করাচ্ছি দাঁড়াও। সব কটাকে জেলে পুরব।

ইন্সপেক্টর কিরণময়ীর রাইটিং টেবিলের জিনিসপত্র

নেড়ে চেড়ে দেখছিলেন। রাইটিং প্যাডে একটা অসমাপ্ত চিঠি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই চিঠি আপনি লিখছিলেন?

—হ্যাঁ, কাল শিবেনকে লিখছিলাম, কেমন অয়োজন করেছি তার মেয়ের জন্মদিনের জন্য। সবে চিঠিটা নিয়ে বসেছি এমন সময় ক্যাটারার হরেন এসে হাজির। কী ব্যাপার? না আমের চাটনি নাকি এখন করা সম্ভব নয়, কারণ এ সময় কাঁচা আম পাওয়া যাবে না। বলে কিনা বুলার বন্ধুদের মধ্যে তো অনেকেই অবাঙালী, আমের আচার দিলে কেমন হয়। শুনুন কথা একবার।

—আপনার ক্যাটারার কেমন করে জানল যে বুলার অনেক

বন্ধু অবাঙালী।

—এ আর বোঝার অসুবিধা কি? ওকে তো আমি নিমন্ত্রিতদের পুরো লিস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম।
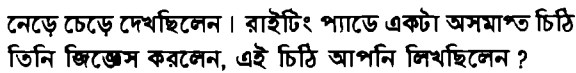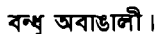
—তাই নাকি? তা ও কি সেই লিস্ট নিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

—আর বলেন কেন, যত সব মাথা-মোটার দল। আমিও পরিষ্কার বলে দিয়েছি, গোড়ায় যা কথা হয়েছে তা যদি না দিতে পার তাহলে কন্ট্র্যাক্ট ক্যানসেল, আমি অন্যলোক ডাকব। তাই শুনে গজগজ করতে করতে, সে চলে গেল।

ইন্সপেক্টর এবার হাসিমুখে এগিয়ে এসে কিরণময়ীর সামনের একটা চেয়ার টেনে বসলেন। পকেট থেকে সেই সাংকেতিক চিঠিটা বার করে কিরণময়ীর হাতে দিয়ে বললেন, আপনি বড্ড ঘাবড়ে গেছেন। তাই নিজের হাতের লেখা নিজেই চিনতে পারেন নি। এবার আমার এই লেন্সটা দিয়ে দেখুন দেখি কিছু বুঝতে পারেন কিনা।

কিরণময়ী দেখবেন কি বিস্ময়ে তাঁর চোখ তখন কপালে উঠেছে। ছিঃ ছিঃ আজকের দিনে থানা পুলিশ কী কেলেঙ্কারী!
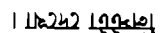
তোমরা কি বুঝেছ ব্যাপারটা। একটু ভাব। আর যদি একান্তই না বুঝতে পার তবে সমাধান দেখে নাও।

সেলিম নবীন কাদের বাবুয়া
শ্রাবণী মিষ্টি রিক লাছমি নয়না
বুবাই লাকি আলো পাপা
সমাস পুনম রোহিত সুদক্ষিণা
মমতা রুচিরা অজন্তা
বিরজু কিরণ।

সমাধান

ক্যাটারার এসেছিল বুলার বন্ধুদের নামের লিস্টটা সঙ্গে নিয়ে। কিরণময়ীকে বুঝিয়ে যদি মেনুটা বদলানো যায়। না পেরে বিরক্ত হয়ে কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে গেটের কাছে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। সেটা তার রান্নাঘরের তেলকালি মশলা লেগে আগেই নোংরা হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মালি সকালে গাছে জল দেওয়ায় ভিজে ও ছিঁড়ে গিয়েছিল। এবার লিস্টটা দেখো।

ছবি দেখে ভুল খোঁজ

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়
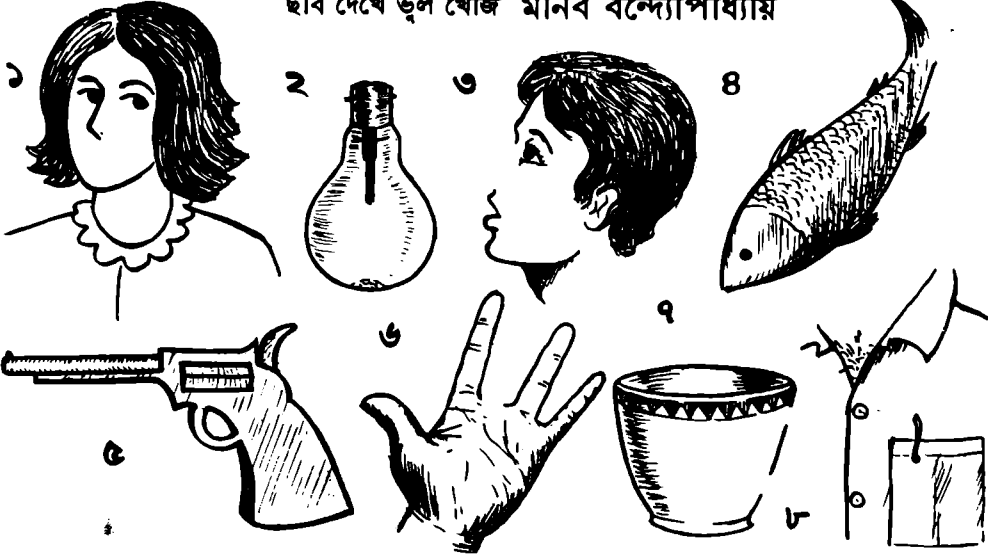
ছবি আঁকতে গিয়ে প্রত্যেকটি ছবিতেই একটি করে বড় ভুল অথবা ফাঁক থেকে গেছে। দু'মিনিট দেখে নিয়ে একটা কাগজে ভুলের তালিকা লিখে ফেল।

পৃথিবীতে কাগজ কিংবা ধাতুর তৈরি টাকা চালু হবার আগে, নানারকম জিনিস টাকার কাজ করত। চীনাদের প্রিয় মুদ্রা ছিল বর্শা, জুলুদের পাথরের আংটি।

আয়না মানুষের অনেক যুগের সাথী। তবে টিনের ওপর মার্কারির প্রলেপ দিয়ে প্রথম আয়না তৈরি হয়, ভেনিস শহরে ১৩০০ শতাব্দীতে। তার আগে চক্‌চকে উজ্জ্বল ধাতুর টুকরো যেমন তামা ব্রোঞ্জ রূপা সোনা ইত্যাদি আয়নার কাজ করত।
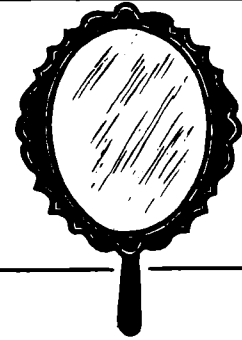
গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বয়সটিও দেহের মাঝে আঁকা হয়ে যায়। প্রতিবছর গাছের বৃদ্ধি দু'বার বৃত্তাকারে তার প্রস্থচ্ছেদে চিহ্নিত হয়। মোটা দাগেরটি বসন্তকালের সরুটি গ্রীষ্মের। অর্থাৎ বছর পিছু দুটি বৃত্ত গুণলেই গাছের আসল বয়স জানা যায়।

নতুন ধাঁধা

ভজন নয় গজল নয়
হচ্ছে সেটা খেয়াল
পুচ্ছহীনে ওজনকারি
মধ্যহীনে অম্ল ধরি
কও তো সে কি হয় ?

বিমল গোস্বামী
ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাংক
রাণীগঞ্জ শাখা বর্ধমান

২. ভারতের একটি নদী, একটি শহর এবং একজন দেবতাকে ছক কেটে এমন ভাবে বসাও যাতে ওপর নিচ ও পাশাপাশিতে প্রত্যেককে দু'বার করে পাওয়া যায় ?

প্রসুন চক্রবর্তী
আশ্রম রোড
হাইলাকান্দি/আসাম

ধাঁধার উত্তর
১। টনক ২। যমুনা, মুঙ্গের, নারদ
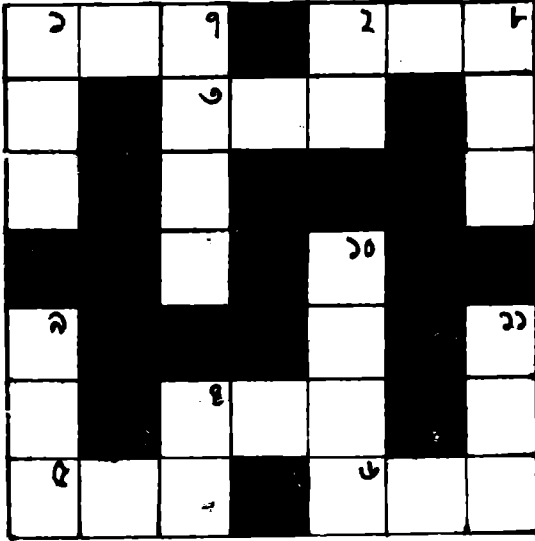
শর্মিলা রায় রামমোহন সাহা লেন/কলকাতা-৬

সূত্র

পাশাপাশি

[১] উত্তর প্রদেশের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প
[২] পশ্চিমবঙ্গের তৈলশিল্প কেন্দ্র
[৩] একটি রাগ
[৪] শুকবংশীয় পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত অস্ট্রেলিয়ার পাখি
[৫] মরক্কো দেশের রাজধানী
[৬] চলমান উদ্ভিদ (ছত্রাক জাতীয়)

ওপর নিচ

[১] পাঞ্জাবের সারশিল্প কেন্দ্র এবং হেভি ওয়াটার প্ল্যান্ট।
[২] পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। [৪] জীবজগতে 'ফিকাশ বেঙ্গালেনসিস' যার বৈজ্ঞানিক নাম।
[৭] কাঠঠোকরার আত্মীয়, দেখতে অনেকটা থ্রাশ পাখির মতোন। [৮] বন শহরের একটি নদী।
[৯] যুগোস্লাভিয়ার কারেন্সি।
[১০] সামুদ্রিক এবং জলাশয়ের অন্যতম বৃহৎ পাখি।
[১১] উত্তর গোলার্ধের মিষ্টি জলের হিংস্রতম মাছ।

শব্দমালার উত্তর :

পাশাপাশি– ১। নারোরা, ২। বদরা, ৩। ইমন, ৪। বদ্রীকা, ৫। রবাাট, ৬। নষ্টক ওপর নিচ– ১। নাঙ্গাল, ২। বন, ৪। বট, ৭। রাইনেক, ৮। রাইন, ৯। ডিনার, ১০। পেলিকান, ১১। পাইক

জানো কী

- বিশ্বের প্রথম উঁচু বাড়ি কোনটা ?
- অংকপুরীর অঙ্কর হিসেব মিলবে তো ?
- ডিঙ্গি ডোবার রাতে কেন ডিঙ্গি ডুবল ?
- মাছ ধরতে গিয়ে কাকে ধরা হলো ?
- সিপাহী বিদ্রোহের বীর হাবিলদার জলেশ্বর সিং কি করেছিলেন ?
- আগুন; আগুন, জলে আগুন লাগলে কি হয় ?
- সোনা রূপার কেউ ছিলো না। কি হলো তাদের ?
- ফ্রাঙ্ক ব্রমলি একটি বিখ্যাত ছবি এঁকেছিলেন। তার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথা থেকে ?

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে **শুকতারার** কার্তিক সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু।